নিকোলাই গোগল

রচনাসপ্তক

নিকোলাই গোগোল

রচনাসপ্তক

নিকোলাই গোগল

রচনাসপ্তক

'পৃথিবীতে বহুকাল এমন আর কোন লেখক ছিলেন না যিনি তাঁর নিজের জাতির পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গোগল ছিলেন রাশিয়ার পক্ষে।... তিনি আমাদের বলেন আমরা কী প্রকৃতির, কোথায় আমাদের ঘাটতি, কিসের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, কিসে বিতৃষ্ণা বোধ করতে হয়, কী ভালোবাসতে হয়। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল অজ্ঞতা ও স্থূলতার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত সংগ্রাম।... সবই ছিল প্রবল, অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা — নিজের জন্মভূমির হিতার্থে সেবার চিন্তায় অনুপ্রাণিত।'

নিকোলাই চের্নিশেভ্স্কি

মলাটের ওপর:

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল। প্রতিকৃতি। শিল্পী ফিওদর মলের। ১৯৪১ সাল। ক্যানভাস, তেলরঙ।

ISBN 5-05-000570-1

...গোগল অসাধারণ, শক্তিশালী ও উচ্চ প্রতিভার অধিকারী। অন্তত আজকের দিনে তিনি হলেন সাহিত্যের প্রধান, কবিদের মধ্যে প্রধান; পুশ্‌কিন যে স্থান রেখে গেছেন তিনি সেই স্থান গ্রহণ করছেন।

ভিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি, ১৮৩৫ সাল
('রুশ উপাখ্যান ও গোগলের উপাখ্যান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ থেকে)

...একেই বলে সুসন্তান—দেশের সন্তান!.. যিনি কোন্‌টা বেশি ভালো লাগতে পারে তা ভেবে লেখেন নি, এমন কি নিজের প্রতিভার পক্ষে সহজতর হতে পারে এমন জিনিসও নয়, যিনি লিখতে পেরেছেন এমন জিনিস, যা তাঁর স্বদেশের পক্ষে পরম উপকারী বলে গণ্য করেছেন।

নিকোলাই নেক্রাসভ, ১৮৫৫ সাল
(ইভান তুর্গেনেভের কাছে লিখিত পত্র, মস্কো, ১২ আগস্ট, ১৮৫৫ সাল)

নিকোলাই গোগল

রচনাসপ্তক

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

'তারাস বুলবা' — সম্পাদনা: অরুণ সোম

Н. В. Гоголь

ПОВЕСТИ

На языке бенгали

N. Gogol

STORIES

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г $\frac{4702010100-049}{031(05)-86}$ 091—86

ISBN 5-05-000570-1

সূচী

'দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা' থেকে

মে মাসের রাত অথবা জলেডুবি

কেবল শয়তানই জানে। এই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত লোকগুলো কোন একটা কাজ শুরু করল কি অমনি খরগোসের পেছনে তাড়া-করা শিকারী কুকুরের মতো কষ্ট আর জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করে, অথচ লাভ কিছু নেই; তাছাড়া যেখানে শয়তান হাত দেয়, লেজ ঘুরিয়ে তাণ্ডব বাধায় সেখানে ত জানারই উপায় নেই কোথা থেকে কী হয়— বুঝিবা আকাশ থেকেই!

১

হান্না

গানের সুরলহরী নদীস্রোতের মতো বয়ে চলল গ্রামের রাস্তার ওপর দিয়ে। এ হল এমন এক সময় যখন দিনের কাজকর্ম আর ঝামেলার পর পরিশ্রান্ত ছেলেছোকরা ও মেয়েরা অনাবিল সন্ধ্যার দীপ্তির মধ্যে হৈ হৈ করে দল বেঁধে এসে জোটে হতাশার নিত্যসঙ্গী ধ্বনিতরঙ্গে তাদের উল্লাসকে উজার করে ঢেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এদিকে ভাবমগ্ন সন্ধ্যা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো নীল আকাশকে আলিঙ্গন করে, সব কিছুকে একটা অনির্দিষ্ট ও দূরের করে তোলে। ইতিমধ্যে ঝাপসা অন্ধকার নেমে এসেছে; অথচ গান আর থামে না। বান্দুরা* হাতে নিয়ে গাইয়েদের দল থেকে চুপি চুপি সরে পড়ল গাঁয়ের মাথার ছেলে, তরুণ কসাক লেভ্‌কো। কসাকের মাথায়

* বান্দুরা — গিটার ধরনের বাদ্যযন্ত্র। — সম্পাঃ

মেষশাবকের চামড়ার দামী টুপি। কসাক রাস্তা দিয়ে হাঁটে, হাত দিয়ে তারে টুং টাং আওয়াজ তোলে আর নাচে। দেখতে দেখতে সে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল ছোট ছোট চেরিগাছে ছাওয়া এক কুটিরের দরজার সামনে। কার এই কুটির? কার বাড়ির দরজা? খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বাজনা বাজিয়ে গাইতে শুরু করল:

সূর্য হলে, সাঁঝ ঘনিয়ে আসে,
পরাণবঁধু এসো আমার পাশে।

'না, আমার ঝলমলে নয়নতারা সুন্দরীটি জোর ঘুম ঘুমোচ্ছে দেখছি।' গান শেষ করে জানলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কসাক বলল। 'হালিয়া! হালিয়া! তুমি কি ঘুমোচ্ছ, নাকি আমার সামনে বেরিয়ে আসতে চাও না? তোমার বোধ হয় ভয় হচ্ছে পাছে কেউ আমাদের দেখে ফেলে, নাকি গৌরবর্ণের মুখটা ঠাণ্ডায় বার করার ইচ্ছে নেই! ভয় পেয়ো না: কেউ নেই। সন্ধ্যায় গরমের আমেজ আছে। আর কেউ যদি এসে পড়েও আমি তোমাকে আমার আংরাখা দিয়ে আড়াল করে রাখব, আমার কোমরে বাঁধা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখব, দু হাতে তোমাকে ঢেকে রাখব — কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আর ঠাণ্ডা বাতাস যদি বয়ই আমি তোমাকে আমার বুকের কাছে চেপে ধরব, চুমো দিয়ে তোমাকে গরম করে তুলব, আমার মাথার টুপি তোমার ঐ গৌরবর্ণের পদযুগলে পরিয়ে দেব। আমার প্রাণ, আমার আদরের ছোট্ট পুঁটিটি, ওগো আমার কণ্ঠমালা! পলকের জন্যে দেখা দাও। জানলা দিয়ে অন্তত তোমার গৌরবর্ণের হাতটা বাড়িয়ে দাও।... না, তুমি ঘুমোচ্ছ না, দেমাকি মেয়ে!' সে আরও জোরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করল, তার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল মুহূর্তের ক্ষোভজনিত লজ্জার ভাব। 'আমাকে উপহাস করে তুমি মজা পাও, আচ্ছা, চললাম!'

এই বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, টুপিটাকে তেরছা করে মাথায় ঠেসে পরল এবং বান্দুরার তারে ধীরে ধীরে আঙুল বুলাতে বুলাতে সগর্বে জানলা থেকে সরে গেল। এই সময় দরজার কাঠের হাতল ঘুরতে আরম্ভ করল: ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল আর সাঁঝের আলো-আঁধারিতে বিজড়িত এক সপ্তদশী তরুণী ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কাঠের হাতল থেকে হাত না ছাড়িয়েই চৌকাট পেরোল। আধা অন্ধকারে তারার মতো স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে জ্বলছিল তার ঝলমলে নয়নতারা;

জ্বলজ্বল করছিল লাল প্রবালের মালা; এমন কি তার দুই গালে লজ্জায় যে লাল আভা ফুটে উঠল তা-ও যুবকের শ্যেনদৃষ্টি এড়াল না।

'কী অধৈর্য রে বাবা তোমার!' মেয়েটি চাপা গলায় বলল। 'সঙ্গে সঙ্গে রাগ! এরকম সময় বেছে নিলে কেন? রাস্তার ওপর যখন তখন লোকের দঙ্গল চলাফেরা করছে।... আমার সারা শরীর কাঁপছে...'

'ওগো, আমার ঝুমকোফুল, কাঁপার কিছু নেই। আরও ভালো করে আমার বুক ঘেঁষে দাঁড়াও!' যুবকের কাঁধে একটা লম্বা বেল্টের সঙ্গে বান্দুরা ঝুলছিল, সেটাকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটিকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের দরজার ধারে বসে পড়তে পড়তে সে বলল। 'তুমি জান, তোমাকে এক মুহূর্তও না দেখতে পেলে আমার বিশ্রী লাগে।'

'আমি কী ভাবি জান?' চিন্তামগ্ন হয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে তার কথায় বাধা দিয়ে মেয়েটি বলল। 'আমি কেবল যেন শুনতে পাই আমার কানের কাছে কিছু একটা ফিসফিসিয়ে বলছে যে এর পর আমাদের আর এমন ঘনঘন দেখাসাক্ষাৎ হবে না। তোমাদের এখানকার লোকজন ভালো নয়: মেয়েরা এমন হিংসের চোখে সব সময় তাকায়, আর ছেলেছোকরারা... আমি লক্ষ করেছি যে আমার মা পর্যন্ত এই কিছু দিন থেকে আমার দিকে দারুণ কটমট করে তাকাচ্ছে। সত্যি বলতে গেলে কি, পর মানুষদের কাছে আমি অনেক ফুর্তিতে ছিলাম।'

শেষ কথাগুলি বলার সময় তার মুখের ওপর কেমন যেন একটা ব্যাকুলতার ভাব খেলে গেল।

'আপন ভুঁয়ে মাত্র দুমাস — এর মধ্যেই কিনা মন খারাপ হয়ে গেল! হয়ত আমিও তোমার বিরক্তি ধরিয়ে দিলাম?'

'না না, তুমি আমার বিরক্তি ধরিয়ে দাও নি,' সে ঈষৎ হেসে বলল। 'আমার কালো-ভুরু কসাক, আমি তোমাকে ভালোবাসি! ভালোবাসি এই জন্যে যে তোমার চোখ খয়েরি, আর সে চোখে যখন তুমি তাকাও তখন আমার হৃদয় যেন হেসে ওঠে: তার খুশি-খুশি লাগে, ভালো লাগে; ভালোবাসি যখন তুমি অমায়িক ভঙ্গিতে তোমার কালো গোঁফ নাচাও; যখন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গান গাও, বান্দুরা বাজাও, তোমার ঐ গান আর বাজনা শুনতে ভালো লাগে।'

'ওঃ হালিয়া আমার!' যুবক তাকে আরও জোরে নিজের বুকে চেপে ধরে চুমো খেতে খেতে সরবে বলল।

'দাঁড়াও! আর নয়, লেভ্‌কো! আগে আমাকে বল দেখি, তোমার বাপের সঙ্গে কথা বলেছ কি?'

'কিসের কথা?' যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে সে বলল। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, আর তুমিও আমাকে চাও — এই কথা ত? বলেছি।'

কিন্তু 'বলেছি' কথাটি তার মুখে কেমন যেন হতাশাব্যঞ্জক শোনাল।

'তা কী হল?'

'কী করা যাবে তাকে নিয়ে? পাজী বুড়োটা সচরাচর যেমন করে থাকে, তেমনি শুনতে না পাবার ভান করল — যেন কালা: কিছু শুনতে পায় না। তার আবার গালাগাল করে বলল যে ভগবানই জানেন কোথায় বখাটেপনা করে বেড়াচ্ছি, ছেলেছোকরাদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হৈচৈ করে সময় কাটাচ্ছি। কিন্তু দুঃখ কোরো না হালিয়া আমার! কসাকের জবান, ওকে আমি রাজি করাবই।'

'হ্যাঁ, তুমি একবার মুখ ফুটে বললেই হল লেভ্‌কো, — তুমি যেমন চাও তেমনি হবে। আমি নিজেকে দিয়ে বিচার করে বলতে পারি: কখনও কখনও তোমার কথা হয়ত শুনতামই না, কিন্তু যেই তুমি কোন কথা বললে, ইচ্ছে না হলেও তুমি যা চাও তা-ই করে ফেলি। দেখ, দেখ!' এই বলে মেয়েটি তার কাঁধে মাথা রাখল, চোখ তুলে তাকাল ঊর্ধ্বপানে, যেখানে বিরাজ করছে ইউক্রেনের ঈষদুষ্ণ আকাশের অসীম নীলিমা; তাদের সামনের চেরিগাছের কোঁকড়া ডালপালার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে সেই আকাশের নিম্নাংশ। 'দেখ, ঐ যে দূরে মিটমিট করছে তারারা: একটা, দুটো, তিনটে, চারটে পাঁচটা... সত্যি কিনা, দেবদূতেরা আকাশে তাঁদের আলো-ঝলমল বাড়ির জানলাগুলো ফাঁক করে পৃথিবীতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, তাই না? তার মানে, ওঁরা আমাদের পৃথিবীকে তাকিয়ে দেখছেন? মানুষের যদি পাখির মতন ডানা থাকত তা হলে কেমন হত? — উড়ে যাওয়া যেত ওখানে, অনেক অনেক উঁচুতে... ওঃ কী ভয়ঙ্কর! আমাদের কোন ওক গাছই আকাশ ছুঁতে পারবে না। অথচ লোকে বলে, কোথায় নাকি, কোন্ দূর দেশে এমন এক গাছ আছে যার মাথা একেবারে আকাশের ভেতরে সরসর আওয়াজ তোলে, আর ভগবান নাকি ঐ গাছ বয়ে ইস্টারের উৎসবের আগে রাতের বেলায় পৃথিবীতে নেমে আসেন।'

'না, হালিয়া; ভগবানের আকাশ থেকে একেবারে পৃথিবী অবধি লম্বা একটা সিঁড়ি আছে। গুড ফ্রাইডের পরদিনের আনন্দোচ্ছল উৎসবের রাতে

পবিত্র দেবদূত প্রধানরা সেই সিঁড়ি নামিয়ে দেন; আর ভগবান যেই প্রথম ধাপে পা রাখেন অমনি অশুদ্ধ আত্মারা তীরবেগে উড়ে পালায়, দলে দলে এসে পড়ে নরকের আগুনে, এই জন্যেই ত খ্রীষ্টের পরবের দিন পৃথিবীতে একটাও দুষ্ট আত্মা থাকে না।'

'জল কী আস্তে আস্তেই না দুলছে — যেন দোলনায় বাচ্চা দোল খাচ্ছে!' পুকুর দেখিয়ে হান্না বলল। মেপ্‌ল গাছের অন্ধকারাচ্ছন্ন বন পুকুরটার চারধারে এক বিষণ্ণ পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল, আর পুসি-উইলোর ছন্নছাড়া শাখাগুলি তার গায়ে হেলে পড়ে গিয়ে যেন অঝোরে কান্না ঝরিয়ে চলছিল।

অক্ষম বৃদ্ধের মতো পুকুর তার শীতল আলিঙ্গনে ধরে রেখেছিল দূরের কালো আকাশকে, হিমশীতল চুম্বনে ছেয়ে দিচ্ছিল অগ্নিময় তারাদলকে, আর তারাগুলি যেন অচিরেই ঐশ্বর্যময় নিশাপতির আগমন অনুভব করে রাতের ঈষদুষ্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল। বনের কাছে, ঢিবির ওপরে খড়খড়ি এ'টে নিদ্রা যাচ্ছিল পুরনো কাঠের বাড়ি; শেওলা আর বুনো ঘাসে ছেয়ে গেছে তার ছাদ; জানলার সামনে ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আপেল গাছ; বন তার ছায়াঘন আলিঙ্গনে বাড়িটার ওপর ফেলেছে নির্জনতাজনিত বিষণ্ণতা; তার পাদদেশে বিছিয়ে আছে বাদামের উপবন, গড়িয়ে নেমেছে পুকুরের দিকে।

'আমার মনে আছে, যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পাচ্ছি,' বাড়িটা থেকে চোখ না সরিয়ে হান্না বলল, 'অনেক অনেক কাল আগে, যখন আমি ছোট ছিলাম, মা'র কাছে থাকতাম, তখন এই বাড়িটা সম্পর্কে শুনেছি লোকে কী যেন ভয়ংকর সব কথা বলত। লেভ্‌কো, তুমি নিশ্চয়ই জান, বল না!'

ওটার কথা ছেড়ে দাও, সুন্দরী আমার! মেয়েমানুষ আর মূর্খ লোকজন কীই বা না বলে। এতে কেবল তুমি উতলা হয়ে পড়বে, তোমার ভয় হবে, তুমি শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না।'

'ওগো আমার কালো-ভুরু, আদরের সাথী, বলই না!' তার গালে নিজের মুখ ঠেকিয়ে, তাকে আলিঙ্গন দিয়ে সে বলল। 'না! দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাকে ভালোবাস না, অন্য মেয়ের সঙ্গে তোমার ভাব আছে। আমি ভয় পাব না; আমি নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোব। এখন ত ঘুমই হবে না, যদি তুমি না বল। আমি যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকব, আর ভাবতে থাকব।... বল, লেভ্‌কো, বল!'

'দেখছি লোকে যে বলে মেয়েদের মধ্যে শয়তান বসে থেকে তাদের কৌতূহলে উৎসাহ যোগায় সেটা মিথ্যে নয়। তা হলে শোন। ওগো আমার প্রাণসখী, অনেক কাল আগে এই বাড়িতে বাস করত এক কসাক-অফিসার। তার ছিল এক মেয়ে, ফুটফুটে, তুষারের মতো ধবধবে, তোমারই মুখের মতো মুখ তার। কসাক-অফিসারের বৌ অনেক আগেই মারা যায়; সে অন্য আরেকজনকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করল। 'বাবা, তুমি যখন অন্য বৌ ঘরে আনবে তখন কি আর আমাকে আগের মতো আদর করবে?' 'করব রে বেটি; আগের চেয়েও বেশি আদর করে তোকে বুকে চেপে ধরব! করব রে বেটি, করব; আরও বেশি ঝকঝকে দুল আর মালা উপহার দেব!' অফিসার নতুন তরুণী বৌকে বাড়িতে এনে তুলল। তরুণী বধূটি দেখতে দিব্যি ছিল। তার গায়ের গৌরবর্ণের ওপর সামান্য রক্তিম আভা। কেবল সৎমেয়ের দিকে এমন ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকাল যে মেয়ে ত তাকে দেখামাত্রই চেঁচিয়ে উঠল। আর সারাদিনের মধ্যে এই রুক্ষ সৎমাটি যদি একটি কথাও বলত! রাত হল; কসাক-অফিসার তরুণী ভার্যাকে নিয়ে চলে গেল নিজের শোবার ঘরে, আমাদের সুন্দরী মেয়েটিও সদরবাড়িতে নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিল। তার বড় খারাপ লাগছিল; সে কাঁদতে লাগল। এমন সময় দেখতে পেল একটা ভয়ংকর কালো বেড়াল তার দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে; তার গায়ের লোম জ্বলজ্বল করছে, আর লোহার মতো নখরগুলো সে মেঝেতে ঠুকছে। মেয়েটি ভয়ে লাফিয়ে উঠে গেল বেঞ্চির ওপর — বেড়াল তার পেছন পেছন। সেখান থেকে লাফিয়ে সে গেল চুল্লির মাথার ওপরকার শোবার জায়গায় — বেড়ালও সেখানে, তারপর হঠাৎ তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরল। চিৎকার করে ওটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল; ভয়ংকর বেড়ালটা আবার গুড়ি মেরে আসে। মেয়েটা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। দেয়ালে ঝুলছিল বাপের তলোয়ার। তলোয়ার তুলে নিয়ে মেঝেতে ঝপাং করে এক কোপ — লোহার নখরসুদ্ধ থাবা খসে পড়ল আর বেড়াল কিঁউকিঁউ করতে করতে অন্ধকার কোনায় অদৃশ্য হয়ে গেল। নববধূ সারাদিন নিজের শোবার ঘর থেকে বেরোল না। তিন দিনের দিন যখন বেরিয়ে এলো তখন তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারি মেয়েটি অনুমান করল যে সৎমা তার ডাইনী আর সে তার হাত কেটে ফেলেছে। চার দিনের দিন কসাক-অফিসার মেয়েকে হুকুম দিল জল আনতে, কুটির ঝাড়ু দিতে — যেন সে একটা সাধারণ চাষী-মেয়ে; বলে দিল বাড়ির অন্দরমহলে সে যেন

মুখ না দেখায়। বেচারির অবস্থা কঠিন হয়ে উঠল, কিন্তু বাপের ইচ্ছে পূরণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় রইল না। পাঁচ দিনের দিন কসাক-অফিসার তার মেয়েকে খালি পায়ে বাড়ি থেকে বার করে দিল, এক টুকরো রুটি পর্যন্ত পাথেয় দিল না। একমাত্র তখনই মেয়েটি দু হাতে তার গৌরবর্ণের মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল: 'তুমি তোমার নিজের মেয়েকে মেরে ফেললে গো বাবা! তোমার আত্মা মহাপাতকী হল, তাকে নষ্ট করল এই ডাইনীটা! ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন; আর দেখাই যাচ্ছে, আমি, হতভাগিনী আমি যে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকি এটা তাঁর ইচ্ছে নয়!..' তাই ঐ যে, দেখতে পাচ্ছ ত...' বলে হান্নার দিকে ফিরে বাড়িটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল লেভ্‌কো। 'এদিকে তাকাও: ঐ যে বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে দারুণ খাড়া পাড়! ঐ পাড় থেকে মেয়েটি ঝাঁপ দেয় জলে। এই ভাবে শেষ হল তার ইহলীলা...'

'আর ডাইনী?' জলভরা চোখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কথার মাঝখানে ভয়ে ভয়ে হান্না জিজ্ঞেস করল।

'ডাইনী? বুড়িরা গল্প বানিয়েছে যে তখন থেকে জলে-ডোবা মেয়েরা সবাই জোছনা রাতে অফিসারের বাড়ির বাগানে উঠে আসে চাঁদের আলোয় শরীর গরম করতে; আর অফিসারের মেয়ে হয় তাদের দলের প্রধান। এক রাতে সে তার সৎমাকে পুকুরের কাছে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করে এবং চিৎকার তুলে জলের ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু ডাইনী সেখানেও চালাকি খাটায়: জলের নীচে এক জলে-ডোবা মেয়ের রূপ ধারণ করল। জলডুবিরা সবুজ নলখাগড়ার চাবুক দিয়ে তাকে প্রহার করতে গেলে এই ভাবে সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। বোঝ এখন, বিশ্বাস কর যত রাজ্যের মাগীদের গালগল্প! ওরা বলে যে মেয়েটা রোজ রাতে জলে-ডোবা মেয়েদের জড় করে আর একে একে প্রত্যেকের মুখ উঁকি মেরে দেখে জানার চেষ্টা করে তাদের মধ্যে ডাইনী কে; কিন্তু আজ পর্যন্ত জানতে পারে নি। আর যদি কোন লোকের দেখা পায় তার ওপর তৎক্ষণাৎ জুলুম করে আন্দাজে বলতে, রাজী না হলে তাকে জলে ডুবিয়ে মারার ভয় দেখায়। এই হল বুড়ো মানুষদের গালগল্প, হালিয়া!.. এখনকার যে মালিক, সে ঐ জায়গায় একটা ভাঁটিখানা বানাতে চায়, সেই উদ্দেশ্যে একজন শুঁড়িকে সে এখানে পাঠিয়েছে।... কিন্তু ঐ যে কথাবার্তা কানে আসছে। আমাদের দলের ওরা

গানবাজনা শেষ করে ফিরছে। চলি, হ্যালিয়া। নিশ্চিন্তে ঘুমোও, আর হ্যাঁ, মেয়েদের ঐ সব বানানো কথা নিয়ে ভেবো না।'

এই কথা বলে সে তাকে আরও নিবিড় আলিঙ্গন দিল, চুমো দিয়ে চলে গেল।

'বিদায়, লেভ্‌কো,' অন্যমনস্ক ভাবে অন্ধকার বনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বলল।

বিশাল আগুনের গোলার মতো চাঁদ এই সময় মহিমান্বিত ভঙ্গিতে ধরণীর বক্ষ ভেদ করে প্রকাশ পেতে লাগল। তার অর্ধেকটা তখনও মাটির নীচে, কিন্তু ইতিমধ্যেই গোটা পৃথিবী কী রকম যেন এক জমকাল আলোয় ভরে উঠেছে। পুকুরে লেগেছে ফুলকির পরশ। গাছপালার ছায়া গভীর শ্যামলিমার মধ্যে স্পষ্ট পৃথক পৃথক হয়ে দেখা দিতে লাগল।

চলি হান্না!' তার পেছন থেকে শোনা গেল, আর সেই সঙ্গে কে যেন তাকে চুমো দিল।

'তুমি ফিরে এসেছ!' পেছন ফিরে তাকিয়ে সে বলল, কিন্তু সামনে এক অচেনা ছোকরাকে দেখতে পেয়ে একপাশে সরে গেল।

'চলি হান্না!' আবার শোনা গেল, আবার কে যেন চুমো দিল তার গালে।

'আ মলো যা, আরও একজন দেখছি!' বিরক্ত হয়ে সে বলল।

'ওগো আমার হান্না, চলি!'

'আরও একজন!'

'চলি! চলি! চলি, হান্না!' চারদিক থেকে তাকে ছেয়ে ফেলল চুমো আর চুমো।

'আরে এখানে দেখছি ওদের পুরো একটা দঙ্গল!' পাল্লা দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য ব্যস্ত ছোকরাদের ভিড় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে আনতে চেঁচিয়ে বলল হান্না। 'অনবরত চুমো খেতে ওদের ভালোও লাগে! হা ভগবান, শিগ্‌গিরই রাস্তায় মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না দেখছি!'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, কেবল শোনা গেল লোহার ছিটকিনি আটকানোর ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ।

২

গাঁয়ের মাথা

ইউক্রেনের রাত আপনারা জানেন কি? না, আপনারা জানেন না ইউক্রেনের রাত। তাকে একবার ভালো করে দেখুন। আকাশের মাঝখান থেকে তাকিয়ে আছে চাঁদ। আকাশের নিঃসীম খিলান প্রসারিত হল, দুদিকে সরে গিয়ে হল নিঃসীম থেকে আরও নিঃসীম। তাতে আগুন লেগেছে, সে নিশ্বাস ফেলছে। গোটা ধরণীতে লেগেছে রুপোলি আলো। অপূর্ব বাতাস, ঈষৎ ঠান্ডার আমেজ অথচ গুমোট ভাব, পরম সুখাবেশে ভরপুর, আন্দোলিত হচ্ছে সৌরভের সাগর। দিব্য রজনী! মনোরম রজনী! অনুপ্রাণিত ভঙ্গিতে, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আঁধারে পরিপূর্ণ বনানী, তারা বিশাল বিশাল ছায়া ফেলছে নিজেদের গা থেকে। শান্ত আর নিস্তরঙ্গ এই পুষ্করিণীগুলি; তাদের জলের শীতলতা ও অন্ধকার বাগানের গভীর শ্যামলিমার প্রাকারে বিষণ্ন রূপে আবদ্ধ হয়ে আছে। বার্ড-চেরি আর চেরিগাছের অপাপবিদ্ধ গভীর অরণ্য ভয়ে ভয়ে উৎস-জলের শীতলতার মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের শিকড় আর থেকে থেকে পাতার মর্মরধ্বনি তুলছে — মনে হচ্ছে যেন প্রণয়লীলাপটু মনোহর নৈশ বায়ুপ্রবাহ যখন চুপিসারে এসে মুহূর্তের মধ্যে তাদের চুমো দিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা রেগে উঠছে, বিরক্ত হচ্ছে। সমস্ত দৃশ্যপট নিদ্রামগ্ন। এদিকে ঊর্ধ্বে সর্বত্র নিশ্বাসের প্রবাহ, সর্বত্র আশ্চর্য, সর্বত্র জাঁকজমক। আর মনেও একটা নিঃসীমতা, আশ্চর্যের ভাব, তার গহনে সুসম্বদ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে রুপোলি কল্পমূর্তির ভিড়। দিব্য রজনী! মনোরম রজনী! অরণ্য, পুষ্করিণী, স্তেপ — সব কিছু হয়ে উঠল সজীব। ঝরে পড়ল ইউক্রেনের বুলবুলের মহিমাময় প্রবল কণ্ঠগীতি, আর মনে হল আকাশের মাঝখানে চাঁদও যেন কান পেতে শুনছে তার সেই গান। ... উঁচু জায়গার ওপর পল্লীটি যেন কোন মায়ামন্ত্রে নিদ্রামগ্ন! চাঁদের আলোয় আরও বেশি, আরও চমৎকার ঝলমল করতে থাকে কুটিরের ভিড়; আরও চোখ ধাঁধানো হয়ে অন্ধকার থেকে ফুঁড়ে ওঠে তাদের নীচু দেয়ালগুলি। গান থেমে গেল। সব চুপচাপ। সজ্জনেরা এখন নিদ্রা যাচ্ছে। কোথায় যেন কেবল দেখা যাচ্ছে সঙ্কীর্ণ জানলার আলো। কেবল কোন কোন কুটিরের চৌকাটের সামনে পরিবারের লোকজন দেরি করে তাদের নৈশ আহার সারছে।

'আরে, হোপাক*) নাচ অমন করে নাচে না। দেখছি কোথায় যেন একটা গোলমাল হচ্ছে। বুড়োকত্তা বললেই হল আর কি?.. আচ্ছা দেখা যাক: দুম্ তানা! দুম্ তানা! দুম্, দুম্, দুম্!' এই ভাবে এক মাঝবয়সী মাতাল চাষা আপন মনে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলছিল। 'মাইরি বলছি, হোপাক নাচ অমন করে নাচে না! মিথ্যে বলব কেন? মাইরি বলছি, অমন নয়! আচ্ছা দেখা যাক! দুম্ তানা! দুম্ তানা! দুম্, দুম্, দুম্!'

'দেখ কাণ্ড, লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। ছেলেছোকরা হলেও বুঝতাম, বুড়ো শুয়োর, রাতদুপুরে রাস্তায় নেচে নেচে বাচ্চাদের হাসির খোরাক যোগাচ্ছে!' হাতে করে খড় নিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বলল। 'নিজের বাড়িতে যাও দেখি। অনেক আগে ঘুমানোর সময় হয়ে গেছে!'

'আমি যাব!' লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল। 'আমি যাব। আমি মাথা-টাথার থোড়াই পরোয়া করি। ওটা নিজেকে ভাবে কী! জাহান্নামে যাক ওর বাপ। হোক না মাথা, হিমের মধ্যে লোকের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢাললেই হল, নাক উঁচু করলেই হল আর কি! ওরে আমার মাথা, মাথা আমার। আমি নিজেই নিজের মাথা। ভগবান আমাকে মেরে ফেলুন! মেরে ফেলুন আমাকে ভগবান! আমি নিজেই নিজের মাথা। এই হল কথা, যাই বল তাই বল...' প্রথম যে কুটিরটা পড়ল সে দিকে যেতে যেতে সে বলে চলল, তারপর কুটিরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, আঙ্গুল দিয়ে জানলার শার্শি হাতড়াতে হাতড়াতে কাঠের হাতলটা খোঁজার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এই মাগী, দরজা খোল! এই মাগী চটপট, কী বলছি কী তোকে, শুনলি! কসাকের ঘুমোনোর সময় হয়ে গেছে!'

'এই কালেনিক, কোথায় চললে? এটা অন্যের বাড়ি!' একদল মেয়ে গানবাজনা-আমোদফুর্তি করে ফিরছিল — তারা পেছন থেকে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলল। 'তোমার নিজের বাড়ি দেখিয়ে দিতে হবে নাকি?'

'দেখাও গো আমার দরদী কনে-বউরা!'

'কনে-বউ? শুনলি লো তোরা,' একজন তার কথার খেই ধরে বলল, 'আহা কালেনিক আমাদের কী বিচক্ষণ গো! এর জন্যে ওর কুটির ত ওকে দেখিয়েই দিতে হয়... না, না, তা হবে না, আগে নাচ!'

---

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

'নাচতে হবে? ওঃ মেয়েগুলো ভেবে বারও করতে পারে!' হাসতে হাসতে আঙুল নেড়ে শাসিয়ে শাসিয়ে টেনে টেনে কথাগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে কালেনিক হোঁচট খেল, কেন না তার পা দুটো এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছিল না। 'তা সব্বাইকে চুমু খেতে দেবে ত? সব্বাইকে চুমু খাব, সব্বাইকে!' এই বলতে বলতে আঁকাবাঁকা পদক্ষেপে সে তাদের পিছু ধাওয়া করতে চলল। মেয়েরা সোরগোল তুলে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল; কিন্তু পরে কালেনিকের পায়ের গতি তেমন দ্রুত নয় দেখে উৎসাহ বোধ করে তারা অন্য দিকে ছুটে পালাল।

'ঐ যে তোমার ঘর!' যেতে যেতে তারা ওকে চেঁচিয়ে বলে যে-কুটিরটা দেখিয়ে দিল সেটা অনেকের কুটিরের চেয়েই বেশ বড় — গাঁয়ের মাথার কুটির।

তাদের কথা মতো কালেনিক শ্লথগতিতে চলল সেই দিকে, যেতে যেতে আবার গালিগালাজ বর্ষণ করতে লাগল মাথার উদ্দেশে।

কিন্তু কে এই মাথা, যার নামে এমন প্রতিকূল গল্পগুজব আর কথাবার্তা শোনা যায়? ও, এই মাথা হলেন গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি। কালেনিক যতক্ষণ তার গন্তব্যস্থলে পেঁছুচ্ছে ততক্ষণে আমরা নিঃসন্দেহে তার সম্পর্কে কিছু বলার অবকাশ পাব। গাঁয়ের সকলেই তাকে দেখামাত্র টুপিতে হাত ঠেকায়; আর তরুণীরা, সবচেয়ে কমবয়সী যারা, তারা শুভদিন কামনা করে: ছেলেছোকরাদের মধ্যে এমন কে আছে যে মাথা হতে না চায়! তাবৎ নস্যদানিতে মাথার প্রবেশ অবারিত, আর দশাসই চেহারার চাষী শ্রদ্ধাভরে মাথার টুপি খুলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে যখন মাথা নিজের স্থুল ও অমার্জিত আঙুলগুলি তার সস্তা চটকদার নস্যদানিতে ডুবিয়ে দেয়। তার ক্ষমতা গুটি কয়েক ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কী হবে, পঞ্চায়েতের জমায়েতে কিংবা গ্রামসংগঠনের সভায় মাথা সব সময় তার কর্তৃত্ব জাহির করে এবং বলতে গেলে নিজের ইচ্ছে মতো, যাকে তার খুশি তাকেই রাস্তাঘাট সমতল ও মসৃণ করতে অথবা পরিখা খুঁড়তে পাঠিয়ে দেয়। মাথা গোমড়ামুখো, তার চেহারা কঠোর, সে বেশি কথা বলতে ভালোবাসে না। অনেক অনেক কাল আগে অক্ষয় স্বর্গলোকবাসিনী মহারানী একাতেরিনা*) যখন ক্রিমিয়ায় যান তখন সে একজন পথপ্রদর্শক নির্বাচিত হয়; পুরো দুটি দিন সে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিল, এমন কি সম্রাজ্ঞীর কোচম্যানের সঙ্গে কোচবক্সে বসার মর্যাদাও সে পায়। আর ঠিক

সেই সময় থেকেই মাথাটি গভীর চিন্তামগ্ন ও গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝুলিয়ে রাখতে শেখে, পাকানো, ঝোলা, লম্বা গোঁফজোড়ায় হাত বুলোতে এবং আড়চোখে শ্যেনদৃষ্টি হানতে শেখে। আর সেই সময় থেকে, মাথার সঙ্গে লোকে যে বিষয় নিয়েই কথা শুরু করুক না কেন, সে যে মহারানীকে নিয়ে গিয়েছিল এবং রাজকীয় শকটে গাড়োয়ানের আসনে বসেছিল এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে মাথা কখনই ভোলে না। মাথা ভালোবাসে কখনও কখনও কালা সেজে থাকতে, বিশেষত যখন শুনতে পায় এমন জিনিস যা কানে তোলার আদৌ কোন বাসনা তার নেই। মাথা বাবুয়ানি বরদাস্ত করতে পারে না: সব সময় পরে থাকে ঘরোয়া বনাত কাপড়ের কালো রঙের লম্বা আলখাল্লা, আষ্টেপৃষ্টে পোশাকটাকে বাঁধে পশমের রঙিন কোমরবন্ধনী দিয়ে; কেউ তাকে এ ছাড়া আর কোন পোশাকে কখনও দেখে নি—অবশ্য মহারানীর ক্রিমিয়াযাত্রার সময়ের কথা বাদ দিলে। সে সময় তার পরিধানে ছিল নীল রঙা কসাকী ঢোলা-হাতা খাটো জামা। কিন্তু গোটা গাঁয়ের কেই বা আর সে-কথা মনে রেখে বসে আছে? আর সেই জামা ত সে তালাচাবি দিয়ে সিন্দুকে পুরে রেখে দিয়েছে। মাথা বিপত্নীক; তবে তার বাড়িতে বাস করে তার শ্যালিকা — সে-ই সকাল-সন্ধ্যার খাবার রাঁধে, বেঞ্চি ধোয়ামোছা করে, কুটির চুনকাম করে, তার জামার জন্য সুতো কাটে এবং গোটা বাড়ির তদারকি করে। গাঁয়ের লোকে বলাবলি করে যে ঐ মহিলা মাথার শালী-টালি কিছুই নয়। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মাথার অশুভাকাঙ্ক্ষী অনেক, যত রাজ্যের কুৎসা রটনায় তাদের আনন্দ। তবে এর একটা কারণ এমনও হতে পারে যে ফসল বোনার কাজে ব্যস্ত চাষী মেয়ে গিজগিজে মাঠে কিংবা যার অল্পবয়সী কন্যা আছে এমন কোন কসাকের বাড়িতে মাথার যাওয়াটা শ্যালিকা আদপেই পছন্দ করত না। মাথা বাঁকা; তবে তার নিঃসঙ্গ চক্ষুটি দুষ্ট অভিসন্ধিপূর্ণ, কোন ভালো চেহারার চাষী মেয়েকে দূর থেকে ঠিক দেখতে পায়। অবশ্য কোন তৈলচিক্কণ মুখের ওপর চোখ রাখার আগে সে বেশ ভালো করে দেখে নেবে শ্যালিকা কোন জায়গা থেকে তার ওপর নজর রাখছে কিনা। যাই হোক, মাথা সম্পর্কে যা বলার তার প্রায় সবই আমাদের বলা হয়ে গেল; অথচ মাতাল কালেনিক এখনও অর্ধেক রাস্তাও পেঁছুতে পারে নি, আরও অনেকক্ষণ সে নানা রকম বাছা বাছা শব্দে মাথাকে আপ্যায়ন করে চলল — অবশ্য যা যা তার অলস ও অসংলগ্ন, জড়িত জিহবায় আসতে পারে তাই দিয়ে।

৩

অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বী; ষড়যন্ত্র

'না ভাই না, এ চাই না! এ কী রকমের আমোদফুর্তি! লম্পটের জীবন কাটাতে তোমাদের কি একঘেয়ে লাগে না? তাছাড়া ভগবানই জানেন কতটা, তবে ইতিমধ্যে হল্লাবাজ বলে আমাদের দুর্নাম রটে গেছে। বরং ঘুমোতে যাও!' লেভ্‌কোর আমোদফুর্তিবাজ বন্ধুরা নতুন কোন দুষ্ট ফন্দি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে এলে সে বলল। 'আর নয় ভাইরা! তোমাদের রাতের শান্তি কামনা করি!' সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

'আমার নয়নতারা হান্না কি নিদ্রা যাচ্ছে?' চেরিগাছে ঘেরা আমাদের পরিচিত কুটিরটির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সে মনে মনে ভাবল। নিস্তব্ধতা ভেদ করে শোনা গেল মৃদুস্বরে কথাবার্তা। লেভ্‌কো দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছপালার মাঝখানে জামার সাদা ঝলকানি দেখা গেল।... 'এর মানে কী হতে পারে?' — ভেবে সে গুঁড়ি মেরে আরও কাছে এগিয়ে এসে গাছের পেছনে লুকিয়ে রইল। সামনাসামনি যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, চাঁদের আলোয় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।... এ যে হান্না! কিন্তু লেভ্‌কোর দিকে পিঠ রেখে এই যে ঢ্যাঙা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, এ কে? বৃথাই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল: লোকটার আপাদমস্তক ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। কেবল তার সামনের দিকটায়ই খানিকটা আলো পড়েছে; কিন্তু সামনের দিকে সামান্যতম পদক্ষেপের ফলে প্রকাশ হয়ে গিয়ে অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়ার বিপদ আছে। লেভ্‌কো তাই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রইল, ঠিক করল ওখান থেকে নড়বে না। মেয়েটি স্পষ্ট তার নাম উচ্চারণ করল।

'লেভ্‌কো? লেভ্‌কো এখনও দুগ্ধপোষ্য!' ভাঙা ভাঙা ও চাপা স্বরে ঢ্যাঙা লোকটা বলল। 'আমি যদি ওকে কখনও তোমার এখানে দেখতে পাই তাহলে ওর চুলের ঝুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলব।...'

'জানতে সাধ হয় কোন্ সে ইতর যে আমার চুলের ঝুঁটি টেনে ছিঁড়বে বলে বড়াই করে!' লেভ্‌কো মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা বাড়িয়ে দিল, চেষ্টা করল একটা কথাও যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে না যায়।

কিন্তু অপরিচিত লোকটি এর পর এত মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল যে কিছুই শোনার জো রইল না।

তার কথা শেষ হলে হান্না বলল, 'তোমার লজ্জা করে না! তুমি মিথ্যেবাদী; তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ; তুমি আমাকে ভালোবাস না; আমি কখনই বিশ্বাস করব না যে তুমি আমাকে ভালোবাস!'

'জানি,' ঢ্যাঙা বলে চলল, 'লেভ্‌কো আজেবাজে অনেক কথা তোমাকে বলেছে, বলে তোমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে (এই সময় ছোকরার মনে হল অপরিচিত লোকটির কণ্ঠস্বর একেবারে অপরিচিত নয়, কবে কোথায় যেন সে শুনেছে)। কিন্তু লেভ্‌কো আমার কাছ থেকে মজাটা টের পাবে 'খন!' অপরিচিত লোকটি সেই একই সুরে বলে চলল। 'ও ভাবে আমি বুঝি ওর সমস্ত ছলাকলা চোখে দেখতে পাই না। কুত্তার বাচ্চাটা একবার পরখ করেই দেখুক না আমার ঘুষির ওজন।'

এই কথায় লেভ্‌কো আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। লোকটার দিকে তিন পা এগিয়ে এসে তাকে চড় কষানোর উদ্দেশ্যে সে সমস্ত শক্তি নিয়ে হাত তুলল; অপরিচিত লোকটিকে দেখেশুনে মজবুত বলে মনে হলেও এই চড় খেয়ে তার জায়গায় খাড়া থাকার কথা নয়, কিন্তু এমন সময় তার মুখের ওপর আলো এসে পড়তে লেভ্‌কো স্তম্ভিত হয়ে গেল, দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার বাপ। কেবল নিজের অজানিতে মস্তক আন্দোলনে এবং দাঁতের ফাঁক দিয়ে মৃদু শিসে প্রকাশ পেল তার বিস্ময়। পাশে শোনা গেল সরসর আওয়াজ; হান্না চটপট ছুটে গিয়ে কুটিরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

'চলি, হান্না!' এই সময় চুপিসারে এগিয়ে এসে এক ছোকরা মাথামশাইকে আলিঙ্গন করে চেঁচিয়ে বলে উঠল; কিন্তু কড়া গোঁফের সাক্ষাৎ পেয়ে আঁতকে উঠে পেছনে লাফ দিল।

'চলি, সুন্দরী!' আরও একজন চিৎকার করল; কিন্তু এবারে এই ছেলেটা মাথার প্রচণ্ড ধাক্কায় তীরবেগে ছিটকে পড়ল।

'চলি, চলি, হান্না!' কয়েকটি ছোকরা তার কাঁধে ঝুলে পড়ে চেঁচাতে লাগল।

'গোল্লায় যা, হারামজাদা নচ্ছার ছোঁড়ারা!' ওদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে আর রাগে ওদের উদ্দেশে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে মাথা চেঁচাল। 'আমি আবার তোদের হান্না হলাম কোত্থেকে? তোদের বাপদের পেছন

পেছন তোরাও ফাঁসিকাঠে যা, শয়তান ছোঁড়ারা! যেন মধুলাগা মাছির মতো এ'টে রইল। হাম্নার মজাটা টের পাওয়াচ্ছি আমি!..'

'মাথা রে! মাথা! এ হল মাথা!' ছেলেরা চেঁচিয়ে বলতে বলতে এদিক-ওদিক ছুটে পালাল।

'ওঃ বাপ বটে!' বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর, গালিগালাজ করতে করতে মাথাকে চলে যেতে দেখে সেদিকে তাকিয়ে লেভ্‌কো বলল। 'তলে তলে এই তাহলে তোমার পাপবুদ্ধি! বাহবা! এদিকে আমি কিনা অবাক হয়ে যাই আর ভেবে কূল পাই না কাজের কথা ওঠালেই যে কানে না শুনতে পারার ভান করে এর অর্থ কী। রোসো বুড়ো হারামজাদা, অল্পবয়সী মেয়েদের জানলার আশেপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ানোর, অন্যের কনেকে কেড়ে নিতে যাবার ফল কী, তা তুমি আমার কাছ থেকে জানতে পাবে! এই ছেলেরা! এদিকে! এদিকে এসো!' সে হাত নেড়ে ছেলেছোকরাদের উদ্দেশে হাঁক দিল, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে আবার একসঙ্গে জড় হল। 'এদিকে চলে এসো! আমি তোমাদের ঘুমোতে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম কিন্তু এখন আমার মত পাল্‌টেছি, আমি এখন সারা রাতও তোমাদের সঙ্গে আমোদ-ফুর্তি করে বেড়াতে রাজি।'

'এই ত চাই!' গ্রামের প্রধান নিষ্কর্মা ও বখাটে বলে গণ্য চওড়া কাঁধওয়ালা, দশাসই চেহারার ছোকরাটি বলল। 'ভালোমতো ঘুরে বেড়াতে না পারলে, কান্ডকারখানা বাধাতে না পারলে আমার বড় বিশ্রী লাগে। কী একটা যেন নেই-নেই মনে হয়। যেন মাথার টুপি বা তামাক টানার নলটাই খোয়া গেছে; এক কথায়, আর যাই বল, কসাক নয়।'

'মাথাকে আজ একটু ভালো মতো খেপিয়ে দিতে তোমরা রাজি আছ?'

'মাথাকে?'

'হ্যাঁ, মাথাকে। সে আসলে ভেবেছে কি! আমাদের ওপর এমন মাতব্বরি করে, যেন কোন্ খাঞ্জাখাঁ এলেন! আমাদের ওপর হম্বিতম্বি করে, যেন আমরা ওর কেনা গোলাম। শুধুই কি তাই? — আমাদের মেয়েদের দিকেও হাত বাড়ায়। আমার ত মনে হয় সারা গাঁয়ে এমন কোন রূপসী মেয়ে নেই যার পেছন পেছন মাথা ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় নি।'

'ঠিক কথা, ঠিক কথা!' ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল।

'আমরা কি কারও কেনা গোলাম নাকি, বল দেখি ভাইরা? ওর মতো ঐ একই গোত্রে ত আমাদেরও জন্ম। ভগবানের আশীর্বাদে, আমরা হলাম

গিয়ে স্বাধীন কসাক! শোন ভাইরা, আমরা ওকে দেখাব যে আমরা স্বাধীন কসাক!'

'দেখাব!' ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল। 'আর হ্যাঁ মাথার কথাই যখন উঠল তখন মুহুরীটাই বা বাদ যায় কেন?'

'মুহুরীটাকেও বাদ দেব না! আমার মাথায় ঠিক মওকামতো মাথা সম্পর্কে একটা খাসা গান এসেছে। চল, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব,' বান্দুরার তারে হাত দিয়ে ঘা মেরে ঝঙ্কার তুলে লেভ্‌কো বলল। 'আর শোন, যে যেমন করে পার একটু আধটু ছদ্মবেশ করে নাও!'

'আমোদফুর্তি করে বেড়াও কসাকের ছোকরারা!' ষণ্ডামার্কা লম্পটটা পায়ের ওপর পায়ের লাথি মেরে হাতে তালি বাজিয়ে বলল। 'আহা কী দারুণ! এই না হলে স্বাধীনতা! ক্ষ্যাপামি শুরু করলেই মনে হয় অনেক কাল আগের বছরগুলো ফিরে এলো। মনটা খুশি-খুশি, বাঁধন-ছাড়া বলে মনে হয়, আর আত্মা যেন পৌঁছে যায় স্বর্গে। এই, ছেলের দল! ওহে, ফুর্তি কর, ফুর্তি কর!'

সঙ্গে সঙ্গে দঙ্গলটা সোরগোল তুলে রাস্তা ধরে চলল। আর ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধারা চিৎকারে জেগে উঠে জানলার খড়খড়ি তুলে দেখে নিদ্রাজড়িত হাতে ক্রুশ করে বলে: 'ব্যস্‌, শুরু হয়ে গেল ছোকরাদের বখাটেপনা!'

৪

ছোকরাদের বখাটেপনা

রাস্তার শেষপ্রান্তে তখনও আলো জ্বলছিল একমাত্র একটি কুটিরে। আর সেটা হল মাথার বাসস্থান। মাথা ইতিমধ্যে অনেক আগেই তার নৈশ আহার পর্ব সেরেছে এবং নিঃসন্দেহে অনেক আগে ঘুমিয়েও পড়ত; কিন্তু এই সময় তার বাড়িতে ছিল অতিথি — শুঁড়ি। স্বাধীন কসাকদের মাঝখানে ছোটখাটো এক টুকরো জমির অধিকারী কোন এক জমিদার ভাটিখানা তৈরি করার জন্য তাকে পাঠিয়েছে। আইকনের ঠিক নীচের কোণটিতে, সম্মানের আসনে বসে ছিল অতিথি — বেঁটে, মোটাসোটা গড়নের একজন লোক; যে ভাবে হুসহুস করে সে নিজের পাইপটা মুহুর্মুহু টানছিল,

পোড়া তামাকের ছাই আঙ্গুলে ঠাসছিল, এবং ঘন ঘন পিচ্ কেটে থুতু ফেলছিল তাতে তার সদাহাস্য খুদে খুদে চোখজোড়ায় ফুটে উঠছিল এক তৃপ্তির ভাব। তার মাথার ওপর ধোঁয়ার মেঘ দ্রুত বেড়ে উঠে তাকে নীল-নীল কুয়াসায় ঢেকে দিয়েছে। মনে হচ্ছিল কোন এক ভাটিখানার চওড়া চিমনি যেন চালের ওপর বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে শেষকালে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্কল্প নিয়ে মাথার কুটিরে টেবিলের পাশটিতে এসে জাঁকিয়ে বসে পড়েছে। তার নাকের নীচে উঁচিয়ে ছিল সংক্ষিপ্ত গোঁফজোড়া, কিন্তু তামাকের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তা এত অস্পষ্টভাবে ঝলকাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল মদ চোলাইয়ের বিশেষজ্ঞটি বুঝি শস্যগোলার বিড়ালের একচেটিয়া প্রভুত্বের ওপর টেক্কা মেরে একটা ইঁদুর ধরে সেটাকে নিজের মুখে ধরে রেখেছে। বাড়ির কর্তা হিশেবে মাথা বসে ছিল, তার পরনে ছিল কেবল জামা আর ক্যাম্বিশকাপড়ের সালোয়ার। তার শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন চোখদুটি ঘনায়মান সন্ধ্যার সূর্যের মতো অল্প অল্প করে কোঁচকাতে এবং মিটমিট করতে শুরু করেছে। টেবিলের শেষপ্রান্তে বসে বসে ধূমপান করছিল গাঁয়ের এক সেপাই, মাথার স্যাঙ্গোপাঙ্গোদের একজন। লোকটা কর্তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত পরে ছিল চাষাড়ে ঢিলে আলখাল্লা।

শুঁড়িকে উদ্দেশ্য করে, হাই তুলতে তুলতে নিজের মুখের ওপর ক্রুশ চাপা দিয়ে মাথা বলল, 'কখন আপনারা আপনাদের ভাটিখানা তৈরি করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'ঈশ্বরের কৃপা হলে এই শরৎকাল থেকেই চোলাইয়ের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। বাজী রেখে বলতে পারি, শরৎকালের পরবের দিনে মাথা মশাইয়ের পা রাস্তায় টলমল করে উঠবে।'

এই কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শুঁড়ির কুতকুতে চোখজোড়া লোপাট হয়ে গেল, চোখের বদলে দেখা দিল আকর্ণবিস্তৃত দুটি রেখা; হাসির দমকে তার গোটা দেহ দুলতে লাগল আর উৎফুল্ল ঠোঁটদুটি মুহূর্তের জন্য ধূমায়মান পাইপটা পরিত্যাগ করল।

'ভগবান করুন,' এই কথাটুকু উচ্চারণ করার সময় মাথার মুখে হাসি গোছের একটা ভাব প্রকাশ পেল। 'এখন ত ভগবানের আশীর্বাদে ভাটিখানা হয়েছে বেশ কিছু। অথচ সে আমলে, যখন আমি পেরেইয়াস্লাভস্কায়ার রাস্তায় মহারানীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই, আর তার সঙ্গে ছিলেন স্বর্গত বেজ্‌বরোদ্‌কো...*)

'হ্ঃ, কী সময়ের কথাই না মনে করলে স্যাঙাত। আরে তখন সেই ক্রেমেন্‌চুগ থেকে একেবারে রোম্‌নি অবধি জায়গার মধ্যে একটা বৈ দুটো শুঁড়িখানা ছিল না। আর এখন।... শুনেছ কি, পোড়ামুখো জার্মানগুলো কী ভেবে বার করেছে? বলছে, সব খাঁটি খ্রীষ্টান এখন যেমন কাঠ জ্বালিয়ে মদ চোলাই করে, শিগগিরই নাকি তার বদলে জাহান্নমের কোন্‌ ভাপ না কী যেন ব্যবহার করা হবে।' এই বলে শুঁড়ি চিন্তিত ভাবে তাকাল টেবিলের দিকে এবং টেবিলের ওপর পেতে রাখা নিজের হাত দুটোর দিকে। 'ভাপ দিয়ে — সে আবার কী রে বাপু? মাইরি বলছি, জানি না!'

'হা ভগবান, ক্ষমা কর, কী আহাম্মক এই জার্মানগুলো!' মাথা বলল। 'আমি হলে এই কুত্তার বাচ্চাগুলোর ওপর চাবুক হাঁকড়াতাম! ভাপ দিয়ে কোন কিছু ফুটানো যায় এমন কথা কে কবে শুনেছে! তাই ত বলি, কাঁচ শুয়োরছানার গায়ের মতো দগদগে করে ঠোঁট না পুড়িয়ে কি আর ঝোল মুখে তোলা যায়...'

চুল্লির ওপরে শোয়ার জায়গায় হাঁটু মুড়ে বসে ছিল মাথার শ্যালিকা। সেখানে থেকে সাড়া দিয়ে সে বলল: 'আচ্ছা ভাই, তুমি এই সারাটা সময় আমাদের এখানে বৌ ছাড়া একাই কাটাবে নাকি?'

'তাকে দিয়ে আমার কী হবে শুনি? কোন কাজের কাজ হলে না হয় বুঝতাম।'

'কেন, দেখতে ভালো নয় নাকি?' তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মাথা বলল।

'ভালো আর কোথায়! বুড়ি শাঁখচুন্নি। সারা বদনের চামড়া কোঁচকানো, যেন খালি টাকার থলি।' শুঁড়ির বেঁটেখাটো শরীরটা আবার প্রচণ্ড হাসির দমকে দুলতে লাগল।

এমন সময় দরজার বাইরে কিসে যেন হাতড়াতে শুরু করল, দরজা খুলে গেল, মাথার টুপি না খুলে একটা লোক চৌকাট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল এবং খানিকটা যেন চিন্তিত ভাবে কুটিরের মাঝখানে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘরের ছাদ নিরীক্ষণ করতে লাগল। লোকটি আমাদের পরিচিত, কালেনিক।

'এই ত আমি বাড়ি এসে গেছি!' উপস্থিত লোকজনের দিকে দৃক্‌পাত না করে দোরগোড়ায় বেঞ্চের ওপর বসে পড়তে পড়তে সে বলল। 'বোঝ কাণ্ড, শত্তুরের ব্যাটা, শয়তান পথটাকে টেনে টেনে কেমন লম্বা করে

দিয়েছে! চলছি ত চলছিই, পথের আর শেষ নেই। পাদুটো কেউ যেন পিষে গঁুড়ো গঁুড়ো করে দিলে গো। ওরে মাগী, ওখান থেকে ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লাটা বার করে আমাকে এখানে বিছিয়ে দে দেখি। না, না, চুল্লির ওপর তোর ওখানে আসছি না, মাইরি বলছি পারব না, পা টাটাচ্ছে! বার করে দে ওটা, ঐ ত ওখানে কাছেই আছে; কেবল দেখিস, তামাকের গঁুড়োর হাঁড়িটা উল্‌টে ফেলে দিস না। বরং না, থাক, ধরিস না, ধরিস না! তুই হয়ত আজ মাতালই হয়ে আছিস। থাক গে, আমি নিজেই বার করে নেব।'

কালেনিক সামান্য উঠে দাঁড়াল, কিন্তু একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাকে বেঞ্চের সঙ্গে গেঁথে রেখে দিল।

'এই জন্যেই ত ভালোবাসি,' মাথা বলল, 'অন্যের বাড়িতে এসে দিব্যি খবরদারি করছে, যেন নিজের বাড়ি পেয়েছে! ওটাকে মানে মানে বিদেয় করতে হয়!'

'রাখ স্যাঙাত, একটু জিরোতে দাও!' হাত ধরে ওকে বাধা দিয়ে শঁুড়ি বলল। 'এই লোকটা উপকারী; এ ধরনের লোক বেশি করে চাই — তাহলে আমাদের শঁুড়িখানা দিব্যি চলবে...'

কিন্তু এই কথাগুলি যে সে ভালোমানুষি দেখিয়ে বলেছে তা নয়। শঁুড়ি যত রাজ্যের লক্ষণাদি বিশ্বাস করত। যে লোক ইতিমধ্যে বেঞ্চের ওপর বসে পড়েছে তাকে তৎক্ষণাৎ খেদিয়ে দেওয়ার অর্থ, তার মতে, দুর্ভাগ্য ডেকে আনা।

'বুড়ো হলে এমনই হাল হয়!' বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ে কালেনিক বিড়বিড় করে বলল। 'দুটো ভালো কথা ত নয়ই, আবার বলে কিনা মাতাল; না না মোটেই না, মাতাল নই। মাইরি বলছি মাতাল নই! মিথ্যে বলতে যাব কেন? কথাটা খোদ মাথাকেও বলতে আমার আপত্তি নেই। মাথা আমার কে? টেঁসে যাক ব্যাটা, কুত্তার বাচ্চা! আমি ওর গায় থুতু ফেলি! ঐ কানা শয়তানটা যেন মাল-টানা গাড়ির নীচে চাপা পড়ে! আবার কিনা হিমের মধ্যে লোকের গায় জল ঢেলে দেয়...'

'এঃ দেখ দেখি! শুয়োর কিনা ঘরের ভেতর সেঁধোল, আবার টেবিলে থাবা বসাচ্ছে,' নিজের জায়গা থেকে উঠতে উঠতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল মাথা; কিন্তু এই সময় একটা বেশ ওজনদার পাথর জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে গড়িয়ে এসে পড়ল তার পায়ের গোড়ায়। মাথা থমকে দাঁড়াল। পাথরটা উঠিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আমি যদি জানতাম কোন্ হারামজাদা এটা ছঁুড়েছে

তা হলে পাথর ছোঁড়ার মজা টের পাইয়ে দিতাম। এ কী নষ্টামি!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হাতের পাথরটা নিরীক্ষণ করতে করতে সে বলে চলল। 'এই পাথর গলায় ঠেকে যেন ব্যাটা মরে...'

'থাম! থাম! ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন স্যাঙাত!' শুঁড়ি ফেকাসে হয়ে গিয়ে বাধা দিয়ে বলল। 'ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন, পরকালে, বা ইহকালেও ভগবানের নাম করে কেউ কাউকে যেন এমন গালাগাল না দেয়!'

'এলেন একজন ওটার হয়ে ওকালতি করতে! মরুক গে ব্যাটা!..'

'অমন কথা মনেও এনো না স্যাঙাত! তুমি নিশ্চয়ই জান না আমার স্বর্গীয় শাশুড়ী ঠাকরুনের কী অবস্থা হয়েছিল?'

'শাশুড়ী ঠাকরুনের?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাশুড়ী ঠাকরুনের। সন্ধেবেলায়, এই এখন যে রকম সময় তার থেকে হয়ত বা কিছুটা আগেই, সকলে বসেছে সন্ধের খাবার খেতে: আমার শাশুড়ী ঠাকরুন, শ্বশুর মশাই, ঠিকে ঝি, ঠিকে চাকর আর গোটা পাঁচেক বাচ্চাকাচ্চা। শাশুড়ী বড় কড়াই থেকে খানিকটা পুলি জামবাটিতে ঢেলে দিলেন যাতে অতটা গরম না থাকে। কাজকর্মের পর সবারই দারুণ খিদে পেয়েছিল, জুড়ানো পর্যন্ত কেউ সবুর করতে চায় না। কাঠের লম্বা লম্বা কাঠিতে পুলি গেঁথে তুলে তুলে সকলে খাওয়া শুরু করল। এমন সময় কোথা থেকে কে জানে, এসে হাজির হল একটা লোক — ভগবানই জানেন তার কুলশীল — বলে, তাকেও খেতে দিতে হবে। তা ক্ষুধার্ত লোককে কি আর না খাইয়ে পারা যায়! তারও হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটি কাঠি। অতিথিটি কেবলই পুলি পাচার করে ফেলে, যেমন ভাবে গোরু বিচালি গেলে। যতক্ষণে অন্যেরা একটি করে খাওয়ার পর আরেকটির জন্য কাঠি ডুবিয়েছে ততক্ষণে বাটির তলা বড়লোকদের বাড়ির মেঝের মতো মসৃণ। শাশুড়ী আরও ঢাললেন; ভাবলেন, অতিথির পেট ভরেছে, এবারে কিছুটা কম তুলবে। কিসের কী! আরও ভালো করে সাঁটাতে লাগল। 'আ মোলো যা, পুলি গলায় ঠেকে মরণও হয় না!' উপোসী শাশুড়ী এই কথা মনে মনে ভেবেছেন কি ভাবেন নি, অমনি লোকটা হেঁচকি তুলে ঢলে পড়ল। সকলে তার দিকে ছুটে গেল — প্রাণ বেরিয়ে গেছে। বিষম খেয়ে মারা গেল।'

'বজ্জাত পেটুকটার ঐ রকমই হওয়া উচিত!' মাথা বলল।

'যাই হোক না কেন, গড়াল অন্য রকম: তখন থেকে শাশুড়ীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রাত হতে না হতে লোকটার ভূত এসে দর্শন দেয়। হারামজাদাটা চিমনীর ওপর এসে বসে থাকে, দাঁতে কামড়ে ধরে থাকে পুলি। দিনের বেলায় সব চুপচাপ, তার কোন পাত্তা নেই; অথচ যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো — চালের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে কুত্তার বাচ্চা চিমনীর ওপর সওয়ার হয়ে বসে আছে।'

'পুলি দাঁতে কামড়ে ধরে?'

'হ্যাঁ, পুলি দাঁতে কামড়ে ধরে।'

'তাজ্জব ব্যাপার স্যাঙাত! আমি অবশ্য স্বর্গত মহারানীর ক্ষেত্রে অনেকটা এই রকম একটা ঘটনা শুনেছিলাম...'

বলতে বলতে মাথা থেমে গেল। বাইরে, জানলার নীচে শোনা গেল গোলমাল আর ধেই ধেই নাচের শব্দ। প্রথমে বান্দুরার তারে মৃদু ঝঙ্কার উঠল, তার সঙ্গে এসে মিলল কণ্ঠস্বর। তারের ঝঙ্কার আরও গমগম করতে লাগল; বেশ কিছু কণ্ঠ সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করল, গান ঘূর্ণিবেগে সোরগোল তুলল:

শুনেছ কি কথা অদ্ভুত?
আমাদের মাথাগুলো হল কি বেজুত!
বাঁকা-মাথা মাথাটার, ওরে,
মাথার তক্তা সব গেছে নড়েচড়ে।
মাথাটার মাথা, পিপে-কারিগর
বাঁধ দিয়ে লোহার পতর্!
মাথাটায় কর বরষণ
চাবুকের বাড়ি শন্‌শন!

মাথা পাকাচুলো, বাঁকাচোরা তায়;
বুড়ো বজ্জাত, অতি নচ্ছার!
কী যে আবদার, লালসা বেজায়:
ব্যাটা মেয়ে-ঘেঁষা, অতি নচ্ছার!
ছেলেদের 'পরে হয়েছে চড়াও!
কফিনের ঘরে তোর হবে স্থান,
গোঁফে ধরে টান, ঘাড়ে দুটো দাও!
ঝুঁটি ধরে সবে হেঁই মার টান!

ছেলেগুলির এতদূর স্পর্ধা দেখে মাথা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুঁড়ি খানিকটা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল: 'খাসা গান, স্যাঙাত!

খাসা! খারাপটা কেবল এই যে মাথার মোটেই সুখ্যাতি করছে না...' এই বলে কেমন যেন একটা মধুর বিগলিত ভাব নিয়ে টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে আরও শোনার জন্য প্রস্তুত হল, কেন না ওপাশে জানলার নীচে শোনা যাচ্ছিল হো হো হাসি আর চিৎকার-চেঁচামেচি: 'আবার! আবার!'

কিন্তু মর্মভেদী দৃষ্টি সেই মুহূর্তে দেখতে পেত যে মাথার অনেকক্ষণ এক জায়গায় স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ বিস্ময় নয়। এই ভাবে কেবল বুড়ো শিকারী বিড়ালই মাঝে মাঝে আনাড়ী ইঁদুরকে নিজের লেজের কাছাকাছি দৌড়োদৌড়ি করতে দেয়, আর সেই অবসরে চটপট মতলব ভেঁজে নেয় কী ভাবে তার গর্তে ঢোকার পথটা আটকানো যায়। মাথার নিঃসঙ্গ চোখটা জানলার দিকে স্থির নিবদ্ধ থাকলে কী হবে, সে ইতিমধ্যে সেপাইকে হাতের ইশারা করে দিয়ে দরজার কাঠের হাতল ধরে ছিল। এমন সময় রাস্তায় চিৎকার চেঁচামেচি উঠল। শুঁড়ির অনেক গুণের মধ্যে কৌতূহলও যুক্ত ছিল, তাই সে তড়িঘড়ি তার পাইপে তামাক ঠেসে দৌড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এলো; কিন্তু দুষ্টু ছেলেছোকরার দল ততক্ষণে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে।

'না না, আমার হাত থেকে তোর ছাড়ান নেই!' কালো ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লার পশমের দিকটা উলটে-পরা একজনের হাত ধরে টানতে টানতে মাথা চেঁচিয়ে বলল।

শুঁড়ি এই ফাঁকে কাছে ছুটে এসে শান্তি ভঙ্গকারী লোকটির মুখ দেখতে গেল, কিন্তু লম্বা দাড়ি আর বিচিত্র রঙচঙ মাখানো ভয়ঙ্কর মুখ দেখে তাকে ভয়ে পিছিয়ে যেতে হল।

'না, না আমার হাত থেকে তোর ছাড়ান নেই!' মাথা চেঁচাতে চেঁচাতে হিড়হিড় করে তার বন্দীকে টেনে নিয়ে চলল বার-বারান্দার দিকে, এদিকে বন্দীও চুপচাপ অনুসরণ করল তাকে, যেন চলেছে তার নিজের বাড়িতে। 'কাপ্‌, ভাঁড়ারঘরের দরজা খোল্‌!' সেপাইকে বলল মাথা। আমরা ওকে অন্ধকার ভাঁড়ারঘরে পুরে রাখব! আর তারপর মুহুরীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলব, সেপাইদের জুটিয়ে এনে সবগুলো দাঙ্গাবাজকে পাকড়াও করব, আর আজই ওদের সকলের নামে লিখে পাঠাব!'

বার-বারান্দার গলিতে একটা ছোট তালা ঝুলছিল। সেপাই ঝনঝন আওয়াজ তুলে ভাঁড়ারঘরের দরজা খুলল। এই সময় বন্দী বার-বারান্দার অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ দারুণ হেঁচকা টান মেরে তার হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো।

'যাবি কোথায়?' খপ করে আরও জোরে তার ঘাড় চেপে ধরে মাথা চেঁচিয়ে বলল।

'ছেড়ে দাও, আমি!' মিহি গলায় লোকটা বলল।

'ওতে কোন সুবিধে হবে না। কোন সুবিধে হবে না রে ভাই! কেবল মেয়েলি গলায় কেন, শয়তানের গলায় কিঁউকিঁউ কর না কেন — আমাকে ঠকাতে পারবে না!' এই বলে তাকে অন্ধকার ভাঁড়ারঘরের মধ্যে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দিল যে বেচারি বন্দী মেঝেতে পড়ে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল। এবারে সেপাইকে সঙ্গে করে মাথা চলল মুহুরীর কুটিরের দিকে। স্টীমারের মতো হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুঁড়িও তাদের অনুসরণ করল।

তারা তিনজনেই চিন্তিত ভাবে মাথা নীচু করে চলতে লাগল, এমন সময় অন্ধকার গলির মোড়ে কপালে প্রচন্ড ঠোক্কর খেয়ে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, উত্তরে সেই একই রকমের আর্তকণ্ঠ ধ্বনিত হল। মাথা চোখ কুঁচকে তাকাতে আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেল মুহুরীকে, তার সঙ্গে দু'জন সেপাই।

'আমি ত তোমার কাছেই চলেছি মুহুরীমশাই।'

'মান্যবর মাথামশাই, আমিও চলেছি তোমার কাছে।'

'তাজ্জব ব্যাপার মুহুরীমশাই।'

'অদ্ভুত কান্ডকারখানা, মাথামশাই।'

'কী ব্যাপার?'

'ছেলেরা খেপে উঠেছে। দলে দলে রাস্তায়ঘাটে উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে। তোমার মহিমা এমন সব ভাষায় কীর্তন করে চলেছে যে তা মুখে আনতে লজ্জা হয়; পাষন্ড মাতালও তার পাপমুখে ও কথা উচ্চারণ করতে ভয় পাবে। (মোটা সুতীর কাপড়ের রঙচঙে সালোয়ার আর মদের গাঁজলা রঙের ফতুয়া পরনে ক্ষীণকায় মুহুরী এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ ঘাড় সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছিল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়ে আনছিল তার পূর্বাবস্থায়।) একটু তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল, হতচ্ছাড়া বদ ছোঁড়াগুলোর কদর্য গানে আর ঠকঠক আওয়াজে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হল। ইচ্ছে ছিল ব্যাটাদের আচ্ছা করে কড়কে দিই, কিন্তু সালোয়ার আর ফতুয়া পরে নিতে যতক্ষণ লাগল ততক্ষণে সব কটা যে যেখানে পারে সটকে পড়েছে। তবে পালের গোদাটা কিন্তু আমাদের হাত ছেড়ে পালাতে পারে নি। বাছাধন এখন গান গাইছে ঐ কুটিরটার ভেতরে, আসামীকে ওখানে

আটকে রাখা হয়েছে। বাছাধন কে তা জানার জন্যে আমার মন ছটফট করছিল, কিন্তু বদন তার ঝুলকালি মাখা, যেন সাক্ষাৎ শয়তান, যে কিনা পাপীদের জন্যে লোহা পিটিয়ে পেরেক বানায়।'

'আচ্ছা, ওটার পরনে কী বলুন ত মুহুরীমশাই?'

'ভেড়ার লোমের কালো আলখাল্লা উল্‌টে গায়ে পরেছে কুত্তার বাচ্চা, মাথামশাই।'

'মিথ্যে কথা বলছ না ত মুহুরীমশাই? যদি এমন হয় যে এই পাজীটা এখন বসে আছে আমার ভাঁড়ারঘরে?'

'না, মাথামশাই। রাগ করবে না যদি বলি তুমি মোটেই ঠিক বলছ না।'

'আলো দাও! আমরা ওটাকে দেখব!'

আলো নিয়ে আসা হল, দরজা খোলা হল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে মাথার মুখ হাঁ হয়ে গেল — সে সামনে দেখতে পেল শ্যালিকাকে।

'আচ্ছা বল দেখি,' এই বলে শ্যালিকা শুরু করল, 'তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেয়েছে? তুমি যখন আমাকে অন্ধকার ভাঁড়ারঘরের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে তখন তোমার ঐ কানা মুণ্ডুটার ভেতরে ঘিলুর ছিটেফোঁটাও ছিল কি? ভাগ্যি ভালো বলতে হবে যে লোহার ছিটকিনিতে মাথা ঠুকে যায় নি। আমি তোমাকে চেঁচিয়ে আমি বলে জানান দিই নি? হতচ্ছাড়া ভালুকটা লোহার থাবা দিয়ে খপ্‌ করে ধরল, তার পর আবার ধাক্কা মারে! পরপারে শয়তান যেন তোকে ধাক্কা মারে!..'

শেষ কথাগুলি সে উচ্চারণ করল দরজার বাইরে রাস্তার দিকে মুখ করে, যেখানে সে কোন্‌ কারণে যে বেরিয়ে ছিল তা নিজেই জানে।

'হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তুমিই বটে!' মাথা সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল। 'তুমি কী বল মুহুরীমশাই, ঐ পাজী মাথাভাঙাটা কি একটা বদমাশ নয়?'

'বদমাশ, মাথামশাই।'

'এই বখা ছেলেদের সবগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তাদের যার যার নিজের কাজে লাগানোর সময় হয় নি কি?'

'অনেক আগে সময় হয়েছে, অনেক আগে মাথামশাই।'

'ওরা নচ্ছার, ভেবেছেটা কী শুনি? আমার যেন মনে হল রাস্তায় শালীর চিৎকার শুনতে পেলাম।... ওরা নচ্ছার, এদের মাথায় ঢুকেছে যে আমি ওদের সমান। ওরা ভাবে আমি বুঝি ওদের ভাই-টাই, সাধারণ কোন কসাক!' অতঃপর সামান্য কাশি এবং চারদিকে আড়চোখে দৃষ্টিপাত থেকে

আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে মাথা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'সতেরো শ... জাহান্নামে যাক, ঐ সব সাল-টাল ... মরে গেলেও মুখ দিয়ে বেরোয় না; মানে, তখনকার কমিসার লেদাচির আমলে আর কি, হুকুম দেওয়া হয়েছিল সবার চেয়ে চালাক-চতুর দেখে কোন কসাককে যেন বাছা হয়। হুঁ!' এই 'হুঁ' কথাটা সে উচ্চারণ করল তর্জনী ওপরে তুলে, 'সবার চেয়ে চালাক-চতুর দেখে! মহারানীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি তখন...'

'সে আর বলতে! এ ত সকলেই জানে মাথামশাই। সকলেই জানে কেমন রাজকীয় স্নেহ-ভালোবাসা তুমি পেয়েছিলে। এখন তাহলে স্বীকার কর, আমার কথাই সত্যি: ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লা উল্‌টে-পরা ঐ বদ ছোঁড়াটাকে ধরেছ বলাটা তোমার মোটেই ঠিক হয় নি, তাই না?'

'আচ্ছা ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লা উল্‌টে-পরা ঐ বদমাশটাকে যদি বাগেই পাওয়া যায় তাহলে ওকে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্ত হিশেবে হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে সাজার মতো সাজা দিতে হয়। লোকে বুঝুক শাসনক্ষমতা কাকে বলে! মাথাকে রাখা হয়েছে কার তরফ থেকে, জারের তরফ থেকেই যদি না হয়? তার পর ধরা যাবে অন্য ছেলেছোকরাদের: আমি ভুলে যাই নি, এই হতভাগা বখাটে ছোঁড়াগুলো আমার সবজিবাগানের ভেতরে এক পাল শুয়োর তাড়া করে ছেড়ে দিয়েছিল, শুয়োরগুলো আমার বাগানের বাঁধাকপি আর শসা তছনছ করে দেয়; আমি ভুলে যাই নি, এই শয়তানের ছাগুলো আমার ফসল মাড়াই করতে রাজী হয় নি; আমি ভুলে যাই নি... কিন্তু গোল্লায় যাক ওরা, আমার এক্ষুনি জানা দরকার ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লা উল্‌টে-পরা ঐ বদের ধাড়িটা কে।'

'দেখা যাচ্ছে ওটা একটা রামঘুঘু!' এই সব কথাবার্তা চলার সময় শুঁড়ির গালদুটো অবরোধকারী কামানের মতো অবিরাম ধোঁয়ায় ভরে উঠছিল; এবারে বেঁটে পাইপটাকে ঠোঁট থেকে সরিয়ে ধোঁয়ার পুরো ফোয়ারা ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল। 'এরকম লোককে যাই বল না কেন, শুঁড়িখানায় রাখলেও মন্দ হয় না; তবে তার চেয়েও ভালো হয় গির্জার ঝাড়লণ্ঠনের বদলে ওকগাছের মগডালে ঝুলিয়ে দিলে।'

এ ধরনের রসিকতা শুঁড়ির কাছে আদৌ মুর্খামি বলে মনে হল না, তাই অন্যদের অনুমোদনের অপেক্ষা না করে সে তৎক্ষণাৎ খ্যাঁকখ্যাঁক হাসিতে নিজেকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিল।

এই সময় তারা মাটির ওপর প্রায় ধসে-পড়া, ছোট কুটিরটার কাছাকাছি চলে এসেছে; আমাদের পথযাত্রীদের কৌতূহল বৃদ্ধি পেল। সকলে দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। মুহুরী চাবি বার করল, তালার সামনে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলল; কিন্তু ওটা ছিল তার সিন্দুকের চাবি। অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেল। পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে সে হাতড়াতে লাগল এবং চাবির খোঁজ না পেয়ে গালিগালাজ বর্ষণ করে চলল। অবশেষে তার রঙচঙে মোটা সুতীকাপড়ের সালোয়ারে যে বিশাল পকেট ছিল, ঝুঁকে পড়ে সেটার অতল গহ্বর থেকে চাবি বার করতে করতে সে বলল: 'এই যে পেয়েছি!' এই কথায় আমাদের নায়কদের হৃৎপিন্ডগুলি যেন মিলেমিশে এক অখন্ড আকার ধারণ করল, আর সেই বিশাল হৃৎপিন্ডটি এত জোরে স্পন্দিত হতে লাগল যে তালার ঝনাৎ শব্দেও তার নার্ভাসে ধুকপুকোনি চাপা পড়ল না। দরজার পাল্লা খোলা হল, সঙ্গে সঙ্গে... মাথা হয়ে গেল কাগজের মতো ফেকাসে; শুঁড়ি অনুভব করল ঠান্ডা শিরশিরে ভাব, তার চুলগুলি যেন আকাশে উড়ে যেতে চায়; মুহুরীর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ; সেপাইদের পা মাটিতে গেঁথে রইল, তাদের মুখ সেই যে একসঙ্গে হাঁ হয়ে গিয়েছিল সে হাঁ বন্ধ করার মতো অবস্থা আর তাদের ছিল না: তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাথার শ্যালিকা!

শ্যালিকাও তাদের চেয়ে কম আশ্চর্য হয় নি, তবে সে খানিকটা হুঁশ ফিরে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

'দাঁড়া!' বিকট চিৎকার করে এই কথা বলেই শ্যালিকার মুখের ওপর মাথা দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। 'মশাই! এ হল শয়তান!' সে বলে চলল। 'আগুন! চটপট আগুন! সরকারী কুঠির জন্যে আফশোষ নেই। জ্বালাও ওটাকে, জ্বালিয়ে দাও, যাতে শয়তানের হাড়গোড়ের চিহ্নমাত্র মাটিতে পড়ে না থাকে!'

দরজার বাইরে এই ভয়ঙ্কর নিদান শুনতে পেয়ে শ্যালিকা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

'আরে কী কর ভাই তোমরা!' শুঁড়ি বলল। 'ভগবানের কৃপায় মাথার চুল ত তোমাদের প্রায় বরফের মতোই সাদা, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি এখনও কিছু হয় নি দেখছি: সাধারণ আগুনে ডাইনী পুড়বে না! এরকম যখন-তখন নিজেকে যে পাল্টাতে পারে, তাকে পুড়িয়ে মারার ক্ষমতা রাখে একমাত্র পাইপের আগুন! দাঁড়াও, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি!'

এই বলে সে খড়ের গাদার ওপর পাইপ থেকে গরম ছাই ঢেলে ফুঁ দিতে লাগল। এই সময় বেচারি শ্যালিকা রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠল, সে গলা চড়িয়ে ওদের কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, ক্ষান্ত করতে চাইল।

'দাঁড়াও ভাই! খামোকা পাপের ভাগী হতে যাওয়া কেন; এমনও ত হতে পারে যে ওটা শয়তান নয়,' মুহুরী বলল। 'ঐ ওটা, মানে যেটা ওখানে বসে আছে, সে যদি ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে রাজী হয় তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে শয়তান নয়।'

প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

'ক্ষ্যামা দে, ধরিস নে বলছি, শয়তান!' দরজার ফাঁকে ঠোঁট ঠেকিয়ে মুহুরী বলল। 'জায়গা থেকে যদি না নড়িস তাহলে আমরা দরজা খুলে দেব।'

দরজা খোলা হল।

'ক্রুশ কর্!' যদি পশ্চাদপসরণ করতে হয়, এই সম্ভাবনায় যেন নিরাপদ স্থানের খোঁজে পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল মাথা।

শ্যালিকা ক্রুশ করল।

'কিসের শয়তান! এ যে ঠিকই শালী!'

'তা বলি ভাই কোন্ দুষ্টগ্রহ তোমাকে এই গর্তে টেনে আনল?'

শ্যালিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল যে ছেলেদের দল রাস্তায় তাকে জাপটে ধরে এবং বাধাদান সত্ত্বেও কুটিরের চওড়া জানলা দিয়ে তাকে ভেতরে গলিয়ে দিয়ে খড়খড়ি এ'টে দিয়েছে। মুহুরী তাকিয়ে দেখল চওড়া খড়খড়ির কব্জাগুলি ভাঙা, কেবল ওপর থেকে সেখানে পেরেক মেরে লাগানো আছে কাঠের ঠেঙা।

'এই যে তুই, কানা শয়তান!' ঝঙ্কার তুলে শ্যালিকাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মাথা নিজের চোখ দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে ক্রমাগত পিছু হটার চেষ্টা করতে থাকে। শ্যালিকা তার উদ্দেশে বলে চলল: 'তোমার মতলব আমার জানা আছে: তোমার ইচ্ছে ছিল আমাকে পুড়িয়ে মারা, আমাকে পুড়িয়ে মারতে পারলে তুমি খুশি হতে কেননা তাতে ছুঁড়িদের পেছন পেছন ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ানো আরও সহজ হত, তখন আর পাকাচুলো দাদুর ভাঁড়ামি দেখার কেউ থাকত না। আজ সন্ধ্যায় হান্নার সঙ্গে তোমার কী কথাবার্তা হয় ভেবেছ আমি জানি না? হুঁ হুঁ! আমি সব জানি। আমাকে বোকা বানানো অত সহজ নয়, তোর

ঐ নিরেট মাথা দিয়ে ত নয়ই। আমি অনেক সয়ে থাকি, পরে কিন্তু রাগ করো না...’

এই বলে সে ঘ্নষি দেখিয়ে মাথাকে হতভম্ব করে রেখে দ্রুত প্রস্থান করল। ‘না, এখানে শয়তান একটা গ্নর্তর কাণ্ডই বাধিয়েছে দেখছি,’ মাথার চাঁদি জোরে জোরে চুলকোতে চুলকোতে সে ভাবল।

‘ধরেছি!’ এই সময় সেপাইরা এসে চেঁচিয়ে জানাল।

‘কাকে ধরেছ?’ মাথা জিজ্ঞেস করল।

‘ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লা উল্‌টো করে পরা শয়তানটাকে।’

‘এদিকে দাও ওটাকে।’ যে বন্দীটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল তার হাত খপ্‌ করে ধরে মাথা চেঁচিয়ে বলল। ‘তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি: আরে এটা ত মাতাল কালেনিক!’

‘কী ফেসাদ রে বাবা! আমাদের হাতের কাছেই ছিল, মাথামশাই!’ সেপাইরা জবাব দিল। ‘গলির ভেতরে হতচ্ছাড়া ছোঁড়াগ্নলো ঘিরে ফেলল, নেচেক্নদে জ্বালাতনের একশেষ করে জিভ দেখাতে লাগল, হাত থেকে ফসকে পালাতে লাগল... জাহান্নামে যাক!.. আর ওটার বদলে এই দাঁড়কাকটা যে কী করে আমাদের হাতে এলো তা একমাত্র ভগবানই জানেন!’

‘আমার এবং সমস্ত নাগরিকের শাসনক্ষমতা বলে আজ্ঞা দেওয়া হল,’ মাথা বলল, ‘এই ম্নহ্নর্তে ডাকাতটাকে ধরা হোক, এক কথায় রাস্তায় যাকে পাবে তাকেই ধর, ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো সিধে করার জন্যে...’

‘মাফ করবে, মাথামশাই!’ ওদের কেউ কেউ পায় ল্নটিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল। ‘দেখতে যদি ওদের ঐ বদনগ্নলো: ভগবানের দিব্যি, আমাদের জন্ম হয়েছে, দীক্ষান্ত হয়েছে কিন্তু অমন বিতিকিচ্ছিরি ম্নখ কখনও দেখি নি। পাপের কথা আর কী বলব মাথামশাই, ভালোমান্নষকে এমন ভয় দেখায় যে এরপর কোন ওঝাই আর ওদের মাথার ভূত ছাড়াতে যাবে না।’

‘তোদের মাথার ভূতের আমি নিকুচি করেছি! কী পেয়েছ কী শ্ননি? কথা শ্ননতে চাও না? তোমরা ওদের হাতে হাত মিলিয়েছ তাই না? তোমরা কি বিদ্রোহ করছ? কী ব্যাপার? অ্যাঁ, বলি ব্যাপারটা কী?.. তোমরা ডাকাতি শ্নর্ন করেছ?.. তোমরা... আমি ওপরওয়ালাকে জানাব! এক্ষ্ননি বলছি! শ্ননছ, এক্ষ্ননি। দৌড়ো, ডানায় ভর করে ওড়! আমি যেন তোমাদের... তোমরা যেন আমাকে...’

সকলে এদিক-ওদিক ছিটকে পালাল।

জলছবি

এই সমস্ত কাণ্ডকারখানার জন্য যে লোকটি দায়ী সে কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কথা না ভেবে, বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়ে ধীরেসুস্থে চলছিল পুরনো বাড়ি আর পুকুরটার দিকে। আশা করি বলে দিতে হবে না যে এ হল লেভ্‌কো। তার পরনে ভেড়ার চামড়ার কালো আলখাল্লা—বোতাম খোলা। টুপি ধরা ছিল হাতে। তার সর্বাঙ্গ বয়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছে। চাঁদের মুখোমুখি দাঁড়ানো ম্যাপল বন গরিমা ও বিষণ্ণতায় মেশানো কালিমালিপ্ত হয়ে আসছিল। নিথর পুষ্করিণী ক্লান্ত পথিকের উপর স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ বর্ষণ করল, তাকে বাধ্য করল পাড়ে বিশ্রাম নিতে। সর্বত্র শান্ত; বনের গহনে শোনা যাচ্ছিল কেবল নাইটিঙ্গেলদের উচ্চ নিনাদ। ঘুম কিছুতেই বাধা মানছিল না, চোখের পাতা দ্রুত মুদে আসছিল; ক্লান্ত অঙ্গ আচ্ছন্ন ও অবশ হয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত; মাথা ঢলে পড়ল।... 'না, এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব দেখছি!' এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কচলাল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল: তার সামনে রাত যেন উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। চাঁদের আলোর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে এসে মিশেছে কেমন যেন একটা অদ্ভুত, মন মাতাল-করা দীপ্তি। এমন জিনিস দেখার সুযোগ তার আর কখনও ঘটে নি। আশেপাশে এসে নেমেছে রুপোলি কুয়াসা। সমস্ত মাটি জুড়ে বয়ে চলেছে প্রস্ফুটিত আপেলগাছ আর রাতের ফুলের ঘ্রাণ। পুকুরের নিথর জলের দিকে তাকাতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল: প্রাচীন জমিদার বাড়িটা মাথা উলটে পড়ে আছে, পুকুরের ভিতরে তাকে দেখা যাচ্ছিল পরিচ্ছন্ন এবং কেমন যেন একটা সুস্পষ্ট মহিমায় মণ্ডিত। বিষাদাচ্ছন্ন খড়খড়ির জায়গায় দেখা যাচ্ছিল কাচের ঝলমলে জানলা-দরজা। পরিচ্ছন্ন কাচের ভেতর দিয়ে চিকচিক করছিল সোনার গিল্‌টি কাজ। এই বারে মনে হল যেন জানলা খুলে গেল। সে কাঁপল না, পুকুর থেকে চোখ তুলল না, রুদ্ধশ্বাসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল পুকুরের গভীরে, দেখতে পেল সামনের জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে কার যেন গৌরবর্ণের হাতের কনুই, তার পর উঁকি মারল সুন্দর একটা ছোট্ট মাথা, ঘন লাল চুলের রাশি ভেদ করে স্নিগ্ধ দীপ্তি দিতে লাগল উজ্জ্বল দুটি চোখ; মাথাটা হেলে গিয়ে ভর দিল কনুইয়ের ওপর। সে দেখতে পেল

মেয়েটা মৃদু মাথা দোলাচ্ছে, হাতছানি দিচ্ছে, হাসছে।... লেভ্‌কোর হৃৎপিন্ড সঙ্গে সঙ্গে ধুকপুক করে উঠল।... জলে কাঁপন লাগল, জানলা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সে নিঃশব্দে পুকুর থেকে সরে গিয়ে বাড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করল: বিষাদাচ্ছন্ন খড়খড়িগুলি ছিল খোলা; চাঁদের আলোয় জানলার শার্সি ঝকমক করছে। 'এই ত বোঝা যাচ্ছে, জনশ্রুতির ওপর তেমন একটা ভরসা করা উচিত নয়,' সে মনে মনে ভাবল। 'বাড়িটা নতুন; সদ্য রঙ করা, মনে হয় যেন আজই রঙ করা হয়েছে। এখানে কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে,' এই ভেবে সে নিঃশব্দে আরও কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার ভেতরে কোন সাড়া শব্দ নেই। নাইটিংগেলদের মধুর গানের তীব্র ও গমগমে সুর প্রতিধ্বনি তুলছিল, আর সেই সুর যখন অবসন্নতা ও পরম সুখাবেশের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল বলে মনে হতে লাগল তখন শোনা গেল ফড়িংদের খস্‌খস্‌ ও ঝিঁঝিঁ আওয়াজ কিংবা পেছল ঠোঁট দিয়ে জলার কোন পাখির জলের প্রশস্ত দর্পণে আঘাত করার গুঞ্জন। লেভ্‌কো নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করল কেমন যেন একটা মধুর নীরবতা ও বিস্তার। বান্দুরার তার বেঁধে সে বাজিয়ে গাইতে শুরু করল:

ওগো তুমি চাঁদ, ও আমার চাঁদ!
ঝলমলে তারা, তুমিও!
যেথা সুন্দরী আছে আঙিনায়,
সেইখানে দীপ জ্বালিও।

জানলার পাল্লা নিঃশব্দে খুলে গেল, আর সেই একই মাথা, যার প্রতিবিম্ব সে দেখেছিল পুকুরের জলে, উঁকি মারল, কান পেতে, মন দিয়ে শুনতে লাগল গান। তার দীর্ঘ পক্ষ্মরাজীতে অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে চোখদুটি। তাকে দেখাচ্ছিল কাগজের মতো, চাঁদের দীপ্তির মতো পান্ডুর: কিন্তু কী আশ্চর্য, কী চমৎকার! সে হাসল... লেভ্‌কো চমকে উঠল।

'আমাকে কোন একটা গান গেয়ে শোনাও গো নওজোয়ান কসাক!' মৃদুস্বরে সে বলল তার মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে আর ঘন অক্ষিপক্ষ্ম সম্পূর্ণ নামিয়ে দিয়ে।

'আমার গৌরবর্ণের সুন্দরী, তোমাকে কী গান গেয়ে শোনাই বল ত?'

তার পান্ডুর মুখ বয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা।

'বন্ধু,' সে বলল, তার কথার মধ্যে এমন একটা মর্মস্পর্শী সুর শোনা গেল যা ছিল ব্যাখ্যাতীত। 'বন্ধু, আমার সৎমাকে খুঁজে বার করে দাও! তুমি যা বলবে আমি করতে রাজী আছি। আমি তোমাকে এর জন্যে পুরস্কার দেব। আমি তোমাকে দামী দামী উপহার ঢেলে দেব। আমার আছে রেশমী সুতোয় সেলাই-করা জামার হাতার জন্য চিকনের কাজ, আছে প্রবাল, হার। আমি তোমাকে মুক্তো বসানো কোমর-বাঁধুনি উপহার দেব। আমার সোনা আছে... বন্ধু, আমার সৎমাকে খুঁজে বার করে দাও! ওটা একটা ভয়ঙ্কর ডাইনী: তার জন্যে ইহজগতে আমার শান্তি ছিল না। সে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, সাধারণ চাষাভুষোর কাজ করিয়েছে আমাকে দিয়ে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ: সে তার পাপ ডাকিনীবিদ্যা দিয়ে আমার গালের গোলাপী আভা উঠিয়ে নিয়েছে। আমার ধবধবে ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ: এগুলো ধুয়ে ওঠানো যায় না! ধুয়ে ওঠানো যায় না! কোন মতোই ধুয়ে ওঠানো যায় না এই দাগগুলো, তার লোহার নখবসানো নীল দাগ। আমার ধবধবে পাদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখ: এই দু পায়ে অনেক হেঁটেছি; কেবল গালিচার ওপর দিয়েই নয়, গরম বালুর ওপর দিয়ে, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি আর কাঁটা ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়েও হেঁটেছি; আর আমার চোখদুটো, আমার চোখদুটোর দিকে একবার তাকাও: এত জল যে চোখ মেলা যায় না।... ওকে খুঁজে বার কর বন্ধু, খুঁজে বার করে দাও আমার সৎমাকে!'

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ উঁচুতে উঠতে উঠতে থেমে গেল। তার পান্ডুর মুখ বয়ে অঝোরে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা। যুবকের বুকের মধ্যে এসে জমা হল করুণা ও বিষাদে পরিপূর্ণ কেমন যেন একটা গুরুভার অনুভূতি।

'তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজী, সুন্দরী!' আন্তরিক উচ্ছ্বাসের বশে সে বলল। 'কিন্তু কী ভাবে, কোথায় তাকে পাব?'

'দেখ, দেখ!' মেয়েটি দ্রুত বলল। 'সে এখানে! পুকুরের পাড়ে আমার সখীদের মাঝখানে, ওদের দলে ভিড়ে নাচগান করছে, চাঁদের কিরণে শরীর গরম করছে। কিন্তু সে ধড়িবাজ, ধূর্ত। জলে ডোবা মেয়ের রূপ নিয়েছে; কিন্তু আমি জানি, আমার মন বলছে সে এখানে। ও থাকাতে আমি কষ্ট পাই, আমার দম আটকে আসে। ওর ভেতর দিয়ে আমি মাছের মতো অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে পারি না। আমি ডুবে যাই, ঝপ করে তলিয়ে যাই চাবির মতো। ওকে খুঁজে বার কর, বন্ধু!'

লেভ্‌কো তীরের দিকে তাকাল: মিহি রূপোলি কুয়াসার মধ্যে ঝলকাচ্ছিল মেয়েদের হালকা ছায়ামূর্তি; রজনীগন্ধায় আকীর্ণ তৃণভূমির মতো শুভ্র বসন তাদের পরনে; তাদের কণ্ঠে ঝলমল করছিল সোনার হার, পুঁতি আর মুদ্রার মালা, মোহরের কণ্ঠালঙ্কার; কিন্তু তারা ছিল বিবর্ণ; তাদের দেহ যেন স্বচ্ছ মেঘের গড়া ভাস্কর্য আর তা যেন রূপোলি চাঁদের কিরণে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে জ্বলজ্বল করছিল। নাচগানের দলটি গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার আরও কাছে এগিয়ে এলো। কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল।

'এসো খেলা যাক, এসো কাক-কাক খেলা যাক!' তারা সকলে কলকল করে উঠল, যেন গোধূলির শান্ত লগ্নে নদীসন্নিহিত নলখাগড়ার বনে বাতাসের বায়বীয় ওষ্ঠস্পর্শ লেগেছে।

'কে কাক হবে?'

দান ফেলা হল — ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। লেভ্‌কো তাকে নিরীক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হল। মুখ, পরনের পোশাক — সবই তার তেমনি, যেমন অন্যদের। কেবল লক্ষ করা গেল এই যে কাকের ভূমিকায় সে আগ্রহ নিয়ে খেলছিল না। মেয়ের দল লম্বা সার বেঁধে দাঁড়াল, তারা চটপট হিংস্র শত্রুর আক্রমণ থেকে ছুটে পালাচ্ছিল।

'না, আমি কাক হতে চাই না!' মেয়েটি ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বলল। 'মা-মুরগী বেচারির কাছ থেকে তার ছানা ছিনিয়ে নিতে আমার মায়া লাগে!'

'তুমি ডাইনী নও!' লেভ্‌কো মনে মনে ভাবল।

'কে কাক হবে?'

মেয়েরা আবার দান ফেলার জন্য তৈরি হল।

'আমি কাক হব!' ওদের মাঝখান থেকে একজন সাড়া দিয়ে বলল।

লেভ্‌কো এক দৃষ্টিতে তার মুখ নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। মেয়েটা বেশ সাহসের সঙ্গে, চটপট সারির পেছনে তাড়া করল এবং শিকার বাগানোর উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। এই সময় লেভ্‌কো লক্ষ করল যে তার শরীরটা অন্যদের শরীরের মতো ঝকমক করছে না, শরীরের ভেতরে কালো একটা কী যেন চোখে পড়ছিল। হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল: কাক সারির ভেতরের একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাকে খপ্‌ করে ধরেছে; আর লেভ্‌কোর মনে হল যেন

কাকরূপিণী মেয়েটার নখর বেরিয়ে এসেছে, তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে হিংস্র উল্লাস।

'ডাইনী!' হঠাৎ লেভ্‌কো আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বাড়িটার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল।

জানলার মেয়েটা হেসে উঠল, মেয়ের দল চেঁচামেচি করতে করতে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে চলল কাকরূপিণী ডাইনীকে।

'তোমাকে কী পুরস্কার দেওয়া যায় বন্ধু? আমি জানি, তুমি সোনা চাও না: তুমি হান্নাকে ভালোবাস; কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর বাপ হান্নার সঙ্গে তোমার বিয়েতে বাধা দিচ্ছে! এখন আর সে কোন বাধা দিতে পারবে না; এই চিরকুটটা নাও, তাকে দিও...'

গৌরবর্ণের হাত বেরিয়ে এলো। মেয়েটির মুখে কেমন যেন এক আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। লেভ্‌কোর বুকের ভেতরে একটা দুর্বোধ্য শিহরন জাগল, তার অবসন্ন হৃদয় দুরদুর করে উঠল। সে চিরকুটটা খপ্‌ করে নিয়ে নিল এবং... জেগে উঠল।

৬

জাগরণ

'আমি কি সত্যি সত্যিই ঘুমোচ্ছিলাম?' ছোট টিলার ভূমি থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লেভ্‌কো মনে মনে বলল। 'এত জীবন্ত, যেন জাগ্রত অবস্থায় দেখলাম!.. আশ্চর্য, আশ্চর্য।' সে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকতে আওড়াল।

তার মাথার ওপরে স্থির হয়ে আছে চাঁদ, তাতে বোঝা যাচ্ছিল এখন মাঝরাত। সর্বত্র নীরবতা। পুকুর থেকে শীতল প্রবাহ ভেসে আসছিল; পুকুরের ওপরে করুণ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল জরাজীর্ণ বাড়ি — তার খড়খড়িগুলি বন্ধ। শেওলা আর লম্বা লম্বা বুনো আগাছা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে বহুকাল হল লোকজন ওটাকে ছেড়ে চলে গেছে। এমন সময় সে খুলল তার হাতের মুঠো, যেটা ঘুমের সময় সর্বক্ষণ এমনভাবে পাকানো ছিল যেন খিল ধরেছে; খোলার সঙ্গে সঙ্গে মুঠোর ভেতরে চিরকুটের

অস্তিত্ব অনুভব করে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'ইস্, যদি লেখাপড়া জানতাম!' ওটাকে এদিক-ওদিক, চারদিক থেকে সামনে মেলে ধরতে ধরতে সে ভাবল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার পেছন থেকে আওয়াজ শোনা গেল।

'ঘাবড়িও না, ওকে সোজা জাপটে ধর! ভয় পাবার কী আছে? আমরা সংখ্যায় দশজন। আমি বাজী রেখে বলছি এটা একটা লোক; শয়তান নয়!' মাথা তার সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, আর লেভ্‌কো অনুভব করল কয়েক জোড়া হাত তাকে চেপে ধরেছে, সেগুলির মধ্যে কোন কোনটি আবার আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিল। 'তোমার ভয়ঙ্কর বদনখানা একবার দেখাও দেখি বন্ধু! লোকজনকে অনেক ধোঁকা দিয়েছ, আর নয়!' তার কলার আঁকড়ে ধরে মাথা বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় হয়ে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। 'লেভ্‌কো, আমার ছেলে!' চেঁচিয়ে এই কথা বলে সে অবাক হয়ে, হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল। 'কুত্তার বাচ্চা, তুই! দেখ দেখি, বজ্জাত কোথাকার! আর আমি ভাবছি কিনা কে এই বদমাশ, কোন্ শয়তানে আলখাল্লা উলটে পরে গা ঢাকা দিয়ে কাণ্ডকারখানা বাধাচ্ছে! দেখা যাচ্ছে কিনা এসব করছিস তুই, বাপের অকাল কুষ্মাণ্ড সন্তান, রাস্তায় রাস্তায় হাঙ্গামা করে বেড়াচ্ছিস, গান বাঁধছিস। এ-হে-হে, লেভ্‌কো! আর এটা কী রে? তোর পিঠ চুলবুল করছে মনে হচ্ছে! ওকে বেঁধে ফেল!'

'দাঁড়াও, বাবা! এই চিরকুটটা তোমাকে দেবার হুকুম আছে,' লেভ্‌কো বলল।

'ওসব চিরকুট-ফিরকুটের সময় এখন নয় চাঁদ! ওকে বেঁধে ফেল!'

'দাঁড়াও, মাথামশাই!' মুহুরী চিরকুটের ভাঁজ খুলে বলল, 'এ যে দেখছি কমিশনারের হাতের লেখা!'

'কমিশনারের?'

'কমিশনারের?' যন্ত্রচালিতের মতো আওড়াল সেপাইরা।

'কমিশনারের? আশ্চর্য কাণ্ড! আরও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াল!' লেভ্‌কো মনে মনে ভাবল।

'পড়, পড়!' মাথা বলল। 'কমিশনার কী লিখছেন?'

'শোনা যাক কী লেখেন কমিশনার!' দাঁতে পাইপ চেপে ধরে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে শুঁড়ি বলল।

মুহুরী গলা খাঁকারি দিয়ে পড়তে শুরু করল:

'মাথা ইয়েভ্‌তুখ্‌ মাকোগনেন্‌কোর প্রতি নির্দেশ। আমরা অবগত হইলাম যে তুমি বৃদ্ধ আহাম্মক, পূর্বেকার বকেয়া আদায় এবং স্বীয় পল্লীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের পরিবর্তে মূর্খামির পরিচয় দিতেছ, কদর্য কর্মে লিপ্ত হইয়াছ...'

'দেখ দেখি, হা ভগবান!' থামিয়ে দিয়ে বলল মাথা, 'কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!'

মুহুরী আবার শুরু করল:

'মাথা ইয়েভ্‌তুখ্‌ মাকোগনেন্‌কোর প্রতি নির্দেশ। আমরা অবগত হইলাম যে তুমি বৃদ্ধ আহা...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! দরকার নেই!' মাথা চেঁচিয়ে বলল। 'আমি যদিও শুনি নি, তবু জানি যে আসল ব্যাপারটা এখনও আসে নি। ওর পরে কী আছে পড়!'

'অতএব আমার আজ্ঞা এই যে অনতিবিলম্বে তোমার পুত্র লেভ্‌কো মাকোগনেন্‌কোকে তোমাদিগের পল্লীর কসাক-কন্যা হান্না পেত্রিচেন্‌কোভার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ কর, অপিচ সদর রাস্তার সেতু মেরামত করিবে এবং সরাসরি সরকারী কাছারি হইতে আগত হইলেও আমার নির্দেশ ব্যতিরেকে স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ভাড়া করা অশ্ব আদালতের আমলাদিগকে দিবে না। আমার আগমনের পর যদি দেখি আমার এই নির্দেশ প্রতিপালিত হয় নাই, তাহা হইলে একমাত্র তুমিই দায়ী হইবে। কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনাণ্ট কোজ্‌মা দেরকাচ-দ্রিশ্‌প্যানভ্‌স্কি।'

'হুঁ, এই ব্যাপার!' মুখ হাঁ করে মাথা বলল। 'শুনলে তোমরা, শুনলে কথাটা: সব ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব হল মাথার, তাই তার কথা শুনতে হয়! বিনা বাক্যি ব্যয়ে শুনতে হয়! অন্যথায়, অপরাধ নেবে না... আর শোন্‌ তোকে বলি,' লেভ্‌কোর উদ্দেশে সে বলল, 'কমিশনারের আজ্ঞামতে—যদিও আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, এটা তিনি জানলেন কী করে — আমি তোর বিয়ে দেব; তবে তার আগে আমার চাবুকের স্বাদ তোকে পেতে হবে! জানিস ত ঐ যে যেটা আমার দেয়ালে আইকনের কাছাকাছি জায়গায় ঝোলানো আছে? কাল তোর ওপর ওটা পরখ করে দেখব।... এই চিরকুটটা তুই পেলি কোথায়?'

ঘটনার এরকম আকস্মিক গতি পরিবর্তনে লেভ্‌কো আশ্চর্য হয়ে

গেলেও প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করে, কী ভাবে চিরকুটটা তার হাতে এসেছিল সে সম্পর্কে অন্য একটা জবাব মাথা খাটিয়ে বার করার মতো কাণ্ডজ্ঞান সে হারাল না।

'গতকাল সন্ধেবেলায় আমি গিয়েছিলাম শহরে,' সে বলল, 'সেখানে দেখা হয়ে গেল কমিশনারের সঙ্গে। উনি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছিলেন। আমি আমাদের এই গাঁ থেকে আসছি জানতে পেরে তিনি আমাকে এই চিরকুটটা দিলেন আর জান বাবা, মুখে এই কথা জানিয়ে দিতে বললেন যে ফিরতি পথে আমাদের এখানে এসে দুপুরের খাওয়া খাবেন।'

'উনি তাই বললেন বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই ও বললেন।'

'শুনলে তোমরা?' মাথা ভারিক্কি চালে তার সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশে বলল। 'খোদ কমিশনার আসছেন সগোত্রের লোকের কাছে, মানে আমার কাছে, দুপুরের খাওয়া খেতে। হুঃ হুঃ!' সঙ্গে সঙ্গে মাথা তর্জনী ওপরে তুলল এবং মাথাটাকে এমন ভঙ্গিতে ঘোরাল যেন কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে; তারপর আবার বলল: 'কমিশনার, শুনলে, কমিশনার আমার এখানে আসছেন দুপুরের খাওয়া খেতে! কী বল তুমি, মুহুরীমশাই, আর স্যাঙাত, তুমি, এটা নেহাৎই একটা ফাঁকা সম্মানের ব্যাপার নয়। তাই না?'

'তাছাড়া, আমি যতদূর মনে করতে পারি,' মুহুরী পোঁ ধরে বলল, 'কমিশনারকে দুপুরের খাওয়া খাওয়ানোর সৌভাগ্য আর কোন মাথার হয় নি।'

'সব মাথাই মাথার যুগ্যি নয়!' আত্মতৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা বলল। তার মুখটা বেঁকে গেল এবং অনেকটা দূরাগত বজ্রধ্বনির মতো, উৎকট খনখনে হাসির মতো কিছু একটা তার মুখে বেজে উঠল। 'কী বল, মুহুরীমশাই, মানী অতিথির জন্য এই হুকুম জারী করা বোধ হয় দরকার যাতে প্রত্যেক বাড়ি থেকে নিদেনপক্ষে একটি করে মুরগীর ছানা আর এই ধর না কেন থান কাপড় বা ঐ রকম আরও কিছু আনা হয় — অ্যাঁ কী বল?'

'দরকার মানে, দরকার ত বটেই, মাথামশাই!'

'তাহলে বিয়ে কখন হবে বাবা?' লেভ্‌কো জিজ্ঞেস করল।

'বিয়ে? তোর বিয়ের মজাটা আমি বার করছি!.. তবে হ্যাঁ, মানী অতিথির খাতিরে... কালই ধর্মগুরু তোদের বিয়ে দেবে। জাহান্নামে যা তোরা!

কমিশনার নিজের চোখে দেখুন আনুগত্য কাকে বলে! যাক গে, ওহে বন্ধুরা, এখন ঘুমানো দরকার! যে যার বাড়ি চলে যাও!.. আজকের ঘটনায় আমার মনে পড়ে গেল সেই সময়ের কথা যখন আমি...' এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ভ্রূকুটি করে তার সেই অভ্যস্ত গম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'হল, এই বারে মাথা শুরু করে দেবে মহারানীকে গাড়ি করে নিয়ে যাবার কাহিনী!' এই বলে লেভ্‌কো আনন্দে দ্রুত পদক্ষেপে চলল নীচু নীচু চেরিগাছে ঘেরা পরিচিত কুটিরটার দিকে। 'ওগো আমার লক্ষ্মী, অপরূপ মেয়েটি, ভগবান তোমাকে স্বর্গসুখ দিন,' সে মনে মনে ভাবল। 'স্বর্গরাজ্যে তুমি যেন পবিত্র দেবদূতদের মাঝখানে থেকে আমোদ করতে পার! এই রাতে যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল তার কথা কাউকে বলব না, বলব কেবল তোমাকেই, হান্না। একা কেবল তুমিই আমার কথা বিশ্বাস করবে আর আমার সঙ্গে মিলে দুর্ভাগ্য জলডুবি মেয়েটার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করবে!'

ততক্ষণে সে কুটিরের কাছাকাছি চলে এসেছে: জানলা খোলা; জানলা ভেদ করে চাঁদের কিরণ গিয়ে পড়েছে তার সামনে ঘুমন্ত হান্নার ওপর; হান্না মাথা রেখেছে হাতের ওপর; দুই গালে মৃদু আভা জ্বলছে; ঠোঁটদুটো নড়ছে, অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করছে তার নাম। 'ঘুমোও সুন্দরী, ঘুমোও! এই পৃথিবীতে যা কিছু ভালো আছে তার স্বপ্ন দেখ, কিন্তু তাও আমাদের জাগরণের চেয়ে সুন্দর হবে না!' হান্নার ওপর ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে জানলা বন্ধ করে দিয়ে স্থান ত্যাগ করল। এর কয়েক মিনিট বাদে গ্রামের সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল; কেবল চাঁদ একা ইউক্রেনের জমকাল আকাশের অনন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে অপূর্ব ও আশ্চর্য দীপ্তি বিস্তার করে ভেসে বেড়াতে লাগল। অমনই মহিমায় ঊর্ধ্বে নিশ্বাস ফেলছে আকাশ; আর রজনী, দিব্য রজনী মহা সমারোহে হতে চলেছে নিঃশেষিত। অমনই অপরূপ রূপে ধারণ করেছে ধরণী আশ্চর্য রুপোলি ঔজ্জ্বল্যে; কিন্তু এখন কেউ আর তাতে মাতাল হচ্ছে না: সকলে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। কেবল থেকে থেকে কুকুরের ডাক নীরবতা ভঙ্গ করছে এবং মাতাল কালেনিক আরও অনেকক্ষণ ধরে ঘুমন্ত রাস্তার উপর দিয়ে টলতে টলতে চলেছে তার কুটিরের সন্ধানে।

ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা

১

কিয়েভের শেষপ্রান্তে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড: কসাক-ক্যাপ্টেন গরোবেৎসের ব্যাড়িতে তার ছেলের বিয়ের উৎসব। বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে ক্যাপ্টেনের বাড়িতে। সেকালে লোকে ভালোমতো খাওয়াদাওয়া পছন্দ করত, আরও বেশি ভালোবাসত পান করতে, আর তার চেয়েও বেশি — আমোদপ্রমোদ করতে। নীপার-কসাক মিকিৎকাও এলো নিজের লালচে-বাদামী ঘোড়ায় চেপে পেরেশ্‌লিয়াই প্রান্তর থেকে, সরাসরি উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসব সেরে — সেখানে সে সাত দিন সাত রাত পোলীয় স্বল্পস্বত্বভোগী ভদ্রমণ্ডলীকে লাল সুরায় আপ্যায়ন করে। ক্যাপ্টেনের পাতানো ভাই দানিলো বুরুলবাশও এলো। সে এসেছে নীপারের অপর তীর থেকে। সেখানে দুই পাহাড়ের মাঝখানে তার খামার বাড়ি। তার সঙ্গে আছে তরুণী বধূ কাতেরিনা ও তাদের এক বছরের ছেলে। অতিথিদের অবাক করে দিল শ্রীমতী কাতেরিনার গৌরবর্ণের মুখশ্রী, জার্মান মখমলের মতো তার কালো ভ্রূযুগল, বনাত কাপড়ের সাজ, নীল রেশমের অন্তর্বাস আর রুপোর নাল লাগানো হাইবুট; কিন্তু তারা আরও অবাক হল এই দেখে যে বুড়ো বাপ তার সঙ্গে আসে নি। মাত্র এক বছর সে নীপার তীরে বাস করছে। একুশ বছর বেপাত্তা হয়ে থাকার পর ফিরে এসেছে তার মেয়ের কাছে — তত দিনে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, মেয়ের একটি পুত্রসন্তানও জন্মেছে। সে উপস্থিত থাকলে সম্ভবত অনেক আজব আজব কাহিনী বলতে পারত। আর, বলতে পারবেই বা না কেন, যখন এত দীর্ঘ কাল পরদেশে থেকেছে! সেখানে সব এখানকার মতো নয়: লোকজন অন্য ধরনের, খ্রীষ্টের ভজনালয়ও সেখানে নেই।... কিন্তু সে ত এলোই না।

অতিথিদের পরিবেশন করা হল সুগন্ধী মশলা ও শুকনো ফলের আরক

মেশানো ভোদ্‌কা, কিসমিস ও প্লাম আর বেশ বড় একটা থালায় গোল রুটি। নীচের অংশের ভেতরে টাকা পুরে রুটিটাকে সেঁকা হয়েছিল, তাই বাজিয়েরা কিছুক্ষণের জন্য বাজনা থামিয়ে যার যার পাশে বাঁশি, বেহালা, খঞ্জনি রেখে দিয়ে রুটির ঐ অংশের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হল। ইতিমধ্যে যুবতী ও কিশোরীরা কারুকার্যখচিত রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবার তাদের সারি থেকে বেরিয়ে এলো; আর ছেলেছোকরার দল কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে তাদের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হল — এমন সময় বুড়ো ক্যাপ্টেন বরবধূকে আশীর্বাদ করার জন্য দুটো আইকন নিয়ে এলেন। এই আইকনদুটি তিনি পান পরম সাধুপুরুষ মহাস্থবির বার্থলমেইয়ের কাছ থেকে। বিগ্রহের অলঙ্করণে ঐশ্বর্য নেই, সোনা-রুপোর কোন দীপ্তি সেখানে নেই, কিন্তু যার বাড়িতে এই আইকনদুটি আছে, কোন অশুভ শক্তির সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে। আইকন তুলে ক্যাপ্টেন সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা উচ্চারণ করতে যাবেন... এমন সময় মাটিতে যে-সমস্ত বাচ্চা খেলা করছিল তারা দারুণ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল; আর অতঃপর লোকজনও পিছু হটে গেল, সকলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক কসাককে। লোকটা যে কে, কারও জানা ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে সে অতি চমৎকার কসাক নাচ নেচেছে এবং তার চারপাশের লোকজনকে হাসিতে মাতিয়ে তোলারও অবকাশ পেয়েছে। ক্যাপ্টেন যখন আইকন তুললেন তখন হঠাৎ লোকটার মুখের চেহারা পালটে গেল: নাক বড় হয়ে একপাশে হেলে গেল, খয়েরি রঙের চোখের জায়গায় দেখা দিল সবুজ চোখ, ঠোঁট হয়ে গেল নীল, থুতনি থরথর করে কাঁপতে লাগল, বর্শার মতো ছুঁচালো আকার ধারণ করল, মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কশের দাঁত আর মাথার পেছনে উঁচু হয়ে উঠল কুঁজ. কসাক হয়ে গেল বুড়ো।

'সেই লোকটা! সেই লোকটা!' ভিড়ের মধ্যে সকলে গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি হয়ে দাঁড়িয়ে রব তুলল।

'আবার মায়াবী এসে হাজির হয়েছে!' মায়েরা যে যার ছেলেপুলেকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলল।

ক্যাপ্টেন গুরুগম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এসে লোকটার মুখোমুখি আইকন তুলে ধরে উচ্চ স্বরে বললেন:

'দূর হ শয়তানের মূর্তি, এখানে তোর ঠাঁই নেই!' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ের মতো দাঁত কড়মড় করে, ফোঁস ফোঁস করতে করতে অদ্ভুত বুড়োটা উধাও হয়ে গেল।

লোকজনের মধ্যে চলল, চলল আর সোরগোল তুলল দুর্যোগ কবলিত সমুদ্রের মতো যত রাজ্যের জনশ্রুতি ও গল্পগুজব।

'এই মায়াবীটা কে?' অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ লোকেরা জিজ্ঞেস করতে লাগল।

'বিপদ ঘটবে!' বৃদ্ধরা মাথা নাড়িয়ে বলল। সর্বত্র, ক্যাপ্টেনের সুবিস্তৃত অতিথিশালার সর্বত্র জুড়ে লোকে দলে দলে জটলা বেঁধে অদ্ভুত মায়াবী সম্পর্কে কাহিনী শুনতে লাগল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই একেক ধরনের বলল, কেউই তার সম্পর্কে ঠিক কিছু বলতে পারল না।

প্রাঙ্গণে গড়িয়ে নিয়ে আসা হল মধুবীর পিপে, গ্রীসদেশের সুরার বালতিও কম রাখা হল না। সকলে আবার আমোদ-ফুর্তিতে মেতে উঠল। বাদকেরা বাদ্যযন্ত্রে ঝঙ্কার তুলল; কম বয়সী মেয়ে-বৌরা আর উজ্জ্বল রঙের ঢোলা হাতা খাটো জামা পরনে বেপরোয়া কসাকসমাজ মাতামাতি শুরু করে দিল। নব্বই-একশ বছরের বুড়োবুড়িরা নেশার ঝোঁকে তাদের সুখের অতীতের কথা মনে করে নাচতে নেমে গেল। গভীর রাত অবধি ভোজনপর্ব চলল, ভোজন যেমন হল লোকে আজকাল আর অমন ভোজন করে না। অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে যেতে লাগল, কিন্তু অল্প লোকই ঘরে ফিরে যেতে পারল: অনেকেই ক্যাপ্টেনের সুবিস্তৃত আঙ্গিনায় রাত কাটানোর জন্য থেকে গেল; তার চেয়েও বেশি সংখ্যক কসাক অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আপনাআপনিই ঘুমিয়ে পড়ল বেঞ্চের নীচে, মেঝের ওপর, ঘোড়ার পাশে, গোয়ালঘরের কাছাকাছি জায়গায়; নেশার ঘোরে কসাকের মাথা যেখানে টলে পড়ে গেল সেখানেই পড়ে রইল এবং নাসিকাগর্জনে কাঁপিয়ে তুলল গোটা কিয়েভ।

২

জগৎ জুড়ে মৃদু দীপ্তি বিস্তার করছে: চাঁদ দেখা দিয়েছে পাহাড়ের আড়াল থেকে। তুষারের মতো শুভ্র, মিহি কাপড়ের পর্দায় যেন সে ঢেকে

দিল নীপারের পার্বত্য তীরভূমি, আর ছায়া চলে গেল আরও দূরে, দেবদারুর ঘন জঙ্গলের ভেতরে।

নীপারের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বজরা। সামনে বসে আছে দুই ছোকরা। তাদের মাথায় কালো কসাক-টুপি তেরছা করে পরা। দাঁড়ের নীচ থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ছে জলের ছিটে, যেন চকমকি পাথর থেকে উড়ছে আগুন।

কসাকেরা গান গাইছে না কেন? ইউক্রেনে যে এখন পোলীয় রোমান ক্যাথলিক যাজকরা*) ঘুরে ঘুরে কসাক জনসাধারণকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করছে সে সম্পর্কে তারা কোন কথা বলছে না, লবণ হ্রদের উপকূলে খান সাম্রাজ্যের*) দুদিন ব্যাপী অভিযানের প্রসঙ্গও নয়। কী ভাবে তারা গান গাইবে, কী ভাবে বলবে দুঃসাহসী কীর্তিকাণ্ডের কথা! তাদের কর্তা দানিলো চিন্তাগ্রস্ত, তার লাল বনাতের ঢিলে কামিজের হাতা নৌকো থেকে ঝুলে পড়ে জল ছেঁচে তুলছে; তাদের কর্ত্রী কাতেরিনা ধীরে ধীরে শিশুসন্তানকে দোল দিচ্ছে, এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। কর্ত্রীর বনাতের সাজের ওপর অন্য কোন বস্ত্রের আবরণ না থাকায় তার ওপর এসে পড়ছে ধূসর ছাই-ছাই জলরাশি।

নীপারের মাঝ থেকে উঁচু উঁচু পাহাড়, বিস্তৃত তৃণভূমি আর শ্যামল বনভূমি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ঐ পাহাড়গুলি যেন পাহাড় নয়: তাদের পাদদেশ নেই, ঊর্ধ্বভাগের মতো নিম্নভাগেও তীব্র চূড়া, আর তাদের নীচে ও উপরে উঁচু আকাশ। টিলাগুলির উপর ঐ যে সমস্ত বন আছে সেগুলি যেন বন নয়: যেন বনের অধিষ্ঠাতা বুড়ো দাদুর উস্কোখুস্কো মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সে মাথার নীচে জলে ধুয়ে যাচ্ছে তার দাড়ি। আর দাড়ির নীচে এবং জলের উপরেও উঁচু আকাশ। ঐ সমস্ত তৃণভূমি—তৃণভূমি নয়: যেন একটা সবুজ রঙের বন্ধনী গোলাকার আকাশকে মাঝখান থেকে বেষ্টন করে রেখেছে আর তার উপরের ও নীচের অর্ধাংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাঁদ।

শ্রীযুক্ত দানিলো আশেপাশে কোন দিকে তাকাচ্ছে না, সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার তরুণী বধূকে।

'কী গো নতুন বৌ, আমার কাতেরিনা সোনা, মুসড়ে পড়লে কেন?'

'ওগো দানিলো, কর্তা গো, আমি মুসড়ে পড়ি নি! মায়াবী সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শুনে আমি ভয় পেয়ে গেছি। লোকে বলে যে সে নাকি অমন ভয়ংকর হয়েই জন্মেছে... তাই ছোটবেলা থেকেই কেউ তার সঙ্গে

খেলতে চাইত না। শোন, দানিলো মশাই কী ভয়ঙ্কর কথা লোকে বলে: ওর নাকি সব সময় মনে হত যে সব্বাই ওকে উপহাস করছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন লোককে হয়ত সে দেখল আর অমনি তার মনে হল সে বুঝি হাঁ করে দাঁত বার করছে। পর দিন সেই লোকটাকে পাওয়া যেত মরা অবস্থায়। আমার আশ্চর্য লাগল, ভয়ঙ্কর লাগল যখন আমি এই কাহিনীগুলো শুনি,' এই বলে কাতেরিনা রুমাল বার করে কোলে ঘুমন্ত শিশুর মুখ মুছল। রুমালে তার নিজের হাতে লাল রেশমী সুতোয় বোনা ছিল পাতা আর বেরীফল।

শ্রীযুক্ত দানিলো কোন কথা না বলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল অন্ধকারের দিকে যেখানে দূরে, বনের ওপারে দেখা যাচ্ছিল মাটির বাঁধের কালো দেহরেখা, আর বাঁধের পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল পুরনো কেল্লা। ভ্রূযুগলের উপর সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠল তিনটি বলিরেখা আর বাঁ হাত দিয়ে সে বুলোতে লাগল তার পুরুষালী গোঁফ।

'মায়াবী বলেই যে ভয়ঙ্কর তা নয়,' সে বলল। 'ভয়ঙ্কর এই কারণে যে সে অলক্ষুণে অতিথি। কোন্ খেয়ালে সে এখানে এলো? আমি শুনেছি যে পোল্‌রা কোন একটা দুর্গ বানাতে চায় নীপার-কসাকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে। ধরলাম এটা সত্যি... যদি এমন কথাও কানে আসে যে সে কোন ডেরা বানিয়েছে, তাহলে আমি সেই শয়তানের বাসা ভেঙে ছারখার করব। আমি বুড়ো মায়াবীটাকে এমন ভাবে পুড়িয়ে ফেলব যে কাকপক্ষীরও ঠোকরানোর কিছু থাকবে না। তবে আমার মনে হয় ওর সোনাদানা ও সম্পত্তি-টম্পত্তি নেই এমন নয়। এই জায়গায়ই থাকে শয়তানটা। ওর কাছে যদি সোনা পাওয়া যায়... আমরা এখন যে জায়গাটার পাশ দিয়ে যাব সেখানে কতকগুলো ক্রস পোঁতা আছে—ওটা হল কবরখানা! এখানে কবরের নীচে পচছে ওর দুরাত্মা পিতৃপুরুষেরা। লোকে বলে তারা সকলে টাকার বদলে আত্মা আর ছিন্নভিন্ন গাত্রবস্ত্রসমেত নিজেদের বিকিয়ে দিতে ইতস্তত করত না শয়তানের কাছে। ওর কাছে যদি সত্যি সত্যিই সোনাদানা থাকে তাহলে এখন আর দেরি করার কোন কারণ নেই: যুদ্ধে ত আর সব সময় এমন সুযোগ...'

'জানি, তোমার মতলব কী। ওর মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে ভালো কিছুরই আভাস আমি পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি কী ঘন ঘন নিশ্বাসই না ফেলছ, কেমন

কটমট করে তাকাচ্ছে, তোমার ভুরু চোখের ওপর এসে পড়ে তোমাকে কী রুক্ষই না দেখাচ্ছে!..'

'চোপ্‌ রও মাগী!' দানিলো ক্রুদ্ধ হয়ে বলল। 'তোমাদের সঙ্গে যে সংশ্রব রাখতে যাবে সে নিজেই মাগী বনবে। ওরে ছোকরা, আমার পাইপে আগুন দে ত দেখি।' দাঁড়িদের একজনের উদ্দেশে শেষ কথাগুলি বলল সে। দাঁড়ি ছোকরাটা তার নিজের পাইপ থেকে গরম ছাই ঝেড়ে প্রভুর পাইপে ঢেলে দিতে লাগল। 'আমাকে মায়াবীর ভয় দেখাচ্ছে!' শ্রীযুক্ত দানিলো বলে চলল। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে না শয়তানকে না ক্যাথলিক পাদ্রীকে — কাউকেই কসাক ডরায় না। আমরা যদি আমাদের বউদের কথা শুনতাম তাহলে কত লাভই না হত! কী বল ভাই তোমরা? আমাদের স্ত্রী বলতে তামাকের পাইপ আর ধারাল তলোয়ার!'

কাতেরিনা চুপ করে গিয়ে চোখ নামাল নিদ্রামগ্ন জলরাশির দিকে; এদিকে বাতাস জলের বুকে ছোট ছোট লহরীর কম্পন তুলল আর সমস্ত নীপারের ওপর খেলে গেল রাতের আঁধারের মাঝখানে নেকড়ের লোমের মতো রুপোলি আভা।

বজরা বাঁক নিয়ে চলল বনজঙ্গলে ভর্তি তীরভূমি ধরে। তীরে দৃষ্টিগোচর হল সমাধিক্ষেত্র: ভিড় করে আছে জরাজীর্ণ ক্রসের স্তূপ। ক্রসগুলির মাঝখানে কোন বুনো ফলগাছের ঝোপ জমায় না, কোন ঘাসের শ্যামলিমাও চোখে পড়ে না, কেবল চাঁদ তার স্বর্গীয় উচ্চাসন থেকে তাদের উপর উত্তাপ সঞ্চার করছে।

'শুনছ ভাই, তোমরা চিৎকার শুনতে পাচ্ছ? কে যেন সাহায্যের জন্য আমাদের ডাকছে!' কর্তা দানিলো দাঁড়িদের উদ্দেশে বলল।

'আমরা চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন ওপার থেকে,' সঙ্গী ছোকরারা কবরখানার দিকে দেখিয়ে বলল।

কিন্তু সব শান্ত হয়ে এলো। বজরা বাঁক নিয়ে বঙ্কিম উপকূল ঘুরে চলতে শুরু করল। এমন সময় দাঁড়িদের হাত থেকে দাঁড় খসে পড়ল, তারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কর্তা দানিলো থমকে গেল: তার কসাক ধমনীতে খেলে গেল আতঙ্ক ও হিমশীতল প্রবাহ।

একটা সমাধির ক্রস নড়েচড়ে উঠল, আর কবরের নীচ থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল এক বিশুষ্ক প্রেতমূর্তি। কোমর অবধি তার দাড়ি; লম্বা লম্বা তার হাতের নখ — হাতের আঙ্গুলের চেয়েও লম্বা। নিঃশব্দে সে দু হাত

ঊর্ধ্বে তুলল। তার মুখ সমানে কাঁপতে কাঁপতে বেঁকে গেল। মনে হচ্ছিল সে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করছে। 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! দম বন্ধ হয়ে আসছে!' বন্য, অমানুষিক কণ্ঠে সে কাতরে উঠল। তার কণ্ঠস্বর ছুরির মতো বুকে আঁচড় কেটে গেল। তারপর হঠাৎই প্রেতমূর্তি মাটির নীচে চলে গেল। নড়েচড়ে উঠল আরেকটি ক্রস, এবারেও উঠে এলো এক প্রেতমূর্তি, আরও ভয়ংকর চেহারার, আগেরটার চেয়েও মাথায় উঁচু; আগাগোড়া ঝোপেড়া, হাঁটু পর্যন্ত দাড়ি, আর অস্থিসার নখর তার আরও দীর্ঘ। আরও বন্য কণ্ঠে সে করে উঠল আর্তনাদ: 'আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!' বলেই সে চলে গেল মাটির নীচে। নড়েচড়ে উঠল তৃতীয় ক্রস, উঠে দাঁড়াল তৃতীয় প্রেতমূর্তি। মনে হল একমাত্র অস্থি যেন মাটি ফুঁড়ে ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়াল। দাড়ি তার একেবারে পায়ের গোড়ালি অবধি; দীর্ঘ নখরযুক্ত আঙ্গুলগুলি এসে বিঁধেছে মাটিতে। সে ভয়ংকর ভঙ্গিতে দুহাত ঊর্ধ্বে তুলল, দেখে মনে হল যেন চাঁদের নাগাল ধরতে চায়, আর তার আর্তনাদ শুনে মনে হল বুঝি কেউ তার হলদেটে হাড়গুলোকে করাত দিয়ে কাটছে।

কাতেরিনার কোলের শিশু চেঁচাল, তার ঘুম ভেঙে গেল। কর্ত্রী নিজেও চেঁচিয়ে উঠল। দাঁড়িদের টুপি খসে পড়ে গেল নীপারে। খোদ কর্তা আঁতকে উঠল।

হঠাৎ সব মিলিয়ে গেল, যেন কিছুই ঘটে নি; তৎসত্ত্বেও অনুচররা কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়ে হাত লাগাতে পারল না।

তরুণী বধূ ভয় পেয়ে গিয়ে চিৎকাররত শিশুকে কোলে দোলাচ্ছিল। দানিলো বুরুলবাশ উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকাল, তাকে বুকে চেপে ধরে কপালে চুমু দিল।

'ভয় পেয়ো না কাতেরিনা! তাকিয়ে দেখ: কিছু নেই!' চারপাশ দেখিয়ে সে বলল। 'এটা মায়াবীর কারসাজি। লোকজনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে সে যাতে তার নোংরা বাসার নাগাল কেউ না পায়। এতে কেবল মেয়েদেরই ভয় পাইয়ে দিতে পারে। দাও, ছেলেটাকে এদিকে আমার কোলে দাও!' এই বলে কর্তা দানিলো ছেলেকে উপরে তুলে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো। 'কী রে ইভান, তুই মায়াবীদের ভয় করিস না? বল্, 'না বাপ, আমি কসাক।' হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, কান্না থামা! বাড়ি এসে গেলাম বলে।

এই ত বাড়ি এসে গেলাম—মা পেট ভরে জাউ খাওয়াবে, তোকে দোলায় ঘুম পাড়াবে, গান গাইবে:

দোল দোল দোদুল দোলে!
খোকা দোলায় দোলে!
খোকা সোনা বাড়ে — সবার মনে ভরে!
কসাক-গৌরব বাড়ে,
খোকা শত্রু দমন করে!

শোন কাতেরিনা, আমার মনে হয় তোমার বাবা আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চান না। এলেন বিষণ্ণ, রুক্ষ মূর্তি নিয়ে, যেন রেগে আছেন... তা, অসন্তুষ্ট যদি, তাহলে আসাই বা কেন? কসাকদের মুক্তির জন্যে পান করতে চাইলেন না! কোলে করে বাচ্চাটাকে দোলালেন না। গোড়ায় আমি বিশ্বাস করে আমার মনের সব কথা তাকে বলে ফেলি আর কি, কিন্তু কেমন যেন ভরসা হল না, আর আমার মুখেও বাক্য সরল না। কসাকের দিল্ ওঁর নেই! কসাকের দিল্ এমনই যে যেখানেই দু'জনের দেখা হোক না কেন একে অন্যের কাছে বুকের পাঁজর খুলে বেরিয়ে আসবেই!.. কী ভাই, শিগ্গিরই কি আমরা তীরে ভিড়ব? আরে, আমি তোমাদের নতুন টুপি দেব'খন। আর স্তেৎস্কো, তোমাকে দেব মখমল আর সোনায় মোড়া। আমি ওটা এক তাতারের কাছ থেকে মাথা সমেত খসিয়ে আনি। ওর সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমার দখলে আসে; কেবল ওর আত্মাটাকেই আমি মুক্তি দিই। কই হে, ভিড়াও! এই ত ইভান, আমরা এসে গেলাম, অথচ তুই কেবলই কাঁদছিস! ওকে নাও, কাতেরিনা!'

সকলে নামল। পাহাড়ের আড়াল থেকে দেখা গেল খড়ের ছাউনি: এ হল দানিলো কর্তার পিতৃপুরুষের ভিটে। তার পেছনে আবার পাহাড়, আর সেখানে কেবল প্রান্তর, সেই প্রান্তর ধরে একশ' ভার্স্ট যাও না কেন, একটি কসাকও নজরে পড়বে না।

৩

শ্রীযুক্ত দানিলোর খামার বাড়িটি অবস্থান করছে দুই পাহাড়ের মাঝখানে, নীপারের অভিমুখী সঙ্কীর্ণ উপত্যকায়। তার বসতবাড়ি

সামান্য ধরনের: সাধারণ কসাকের কুটির যেমন হয়ে থাকে তেমনি দেখতে, তাতে আছে কেবল একটা বড় ঘর; কিন্তু সেখানেই তার, তার স্ত্রীর, বুড়ি চাকরানী আর দশজন বাছাই নওজোয়ান সঙ্গীর ঠাঁই হয়ে যায়। চালের ঠিক নীচেই, দেয়াল জুড়ে আটকানো রয়েছে ওক কাঠের তাক। সেখানে ঘনবদ্ধ হয়ে আছে ভোজ উপলক্ষে ব্যবহার্য হাঁড়িকুড়ি আর জামবাটি। সেগুলির মাঝখানে আছে রুপোর বড় বড় পানপাত্র আর সোনাবাঁধানো ছোট ছোট পানপাত্র — কোন কোনটি উপহার, কোন কোনটি বা যুদ্ধে অর্জিত। কিছু নীচে ঝুলছে দামী দামী গাদ্য বন্দুক, তলোয়ার, হারকুইবাস বন্দুক ও বর্শা। সেগুলি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তাতার, তুর্ক ও পোলদের তুলে দিতে হয়েছে তার হাতে। কিন্তু তাদের অনেকগুলিরই ভেঙেচুরে খাঁজ পড়ে গেছে। সেগুলির দিকে তাকিয়ে শ্রীযুক্ত দানিলো যেন চিহ্ন দেখে মনে করতে পারে তার লড়াইয়ের ঘটনা। দেয়ালের নিম্নাংশে, নীচে আছে ওক কাঠের চাঁছাছোলা, মসৃণ কয়েকটি বেঞ্চি। বেঞ্চিগুলির কাছাকাছি, চুল্লির ওপরকার শোয়ার জায়গাটার সামনে ছাদের আংটায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দোলা। বড় ঘরটার মেঝে আগাগোড়া পিটিয়ে মসৃণ করা, মাটিতে নিকানো। বেঞ্চের ওপর শয়ন করে সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত দানিলো। চুল্লির ওপরে — বুড়ি-ঝি। দোলায় মজা করে আর দুলতে দুলতে ঘুমোয় শিশুসন্তান। মেঝের ওপর সার বেঁধে রাত্রিযাপন করে নওজোয়ানরা। তবে কসাকের কাছে মুক্ত আকাশের কাছাকাছি জায়গায় মসৃণ মাটির ওপর নিদ্রা যাওয়া শ্রেয়; পাখির পালকের শয্যা বা গদির প্রয়োজন তার হয় না; সে মাথার নীচে বিছিয়ে রাখে টাটকা খড়, স্বচ্ছন্দে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দেয় নিজের শরীরটা। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে নক্ষত্রখচিত ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকাতে এবং কসাকের অস্থিতে অস্থিতে স্নিগ্ধতা সঞ্চারকারী রাতের ঠাণ্ডায় কাঁপতে তার মজা লাগে। আড়মুড়ি ভেঙে, ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করতে করতে সে পাইপ টানে আর ভেড়ার চামড়ার গরম কোটটায় আরও জুত করে দেহ ঢাকে।

গতকালের আমোদপ্রমোদের পর বুরুলবাশের ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হল, ঘুম থেকে উঠে সে এক কোনায় বেঞ্চের ওপর বসে বিনিময়-করে-পাওয়া নতুন তুর্কী তলোয়ারটিতে শান দিতে লাগল; আর শ্রীমতী কাতেরিনা সোনালি সুতোয় রেশমী তোয়ালের ওপর কাজ তুলতে বসল। এমন সময় ক্রুদ্ধ হয়ে, ভুরু কুঁচকে, ভিনদেশী পাইপ দাঁতে চেপে প্রবেশ করল

কাতেরিনার বাবা; সে তার মেয়েকে লক্ষ করে কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল তার এত দেরি করে বাড়ি ফেরার কারণ কী।

'শ্বশুরমশাই, এ ব্যাপারে ওকে জিজ্ঞেস না করে আমাকেই জিজ্ঞেস করা উচিত! জবাব দিতে হলে স্বামীই দেয়, স্ত্রী নয়। অপরাধ হবে না যদি বলি আমাদের এখানে এটাই রীতি!' দানিলো নিজের কাজ থেকে বিরত না হয়েই বলল। 'হয়ত অন্য কোন বিধর্মী দেশে এটা হয় না — আমি অবশ্য জানি না।'

শ্বশুরের কঠিন মুখে টকটকে রঙ ফুটে উঠল, তার চোখে খেলে গেল হিংস্র ঝলক।

'বাপ যদি নিজের মেয়ের ওপর নজর না রাখে তাহলে কে রাখবে শুনি!' সে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল। 'বেশ, আমি তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি এত রাত অবধি কোথায় ঘোরাঘুরি করছিলে?'

'হ্যাঁ এই হল কাজের কথা, শ্বশুরমশাই! এর উত্তরে আমি তোমাকে বলব, মেয়েরা যাদের কাঁথা জড়িয়ে রাখে সেই অবস্থা থেকে আমি বহুকাল হল দূরে চলে এসেছি। আমি জানি কী ভাবে ঘোড়ার পিঠে বসতে হয়। ধারাল তলোয়ারও হাতে ধরতে জানি। আরও কিছু কিছু কাজ জানি।... আমি যা করি তার জন্য কারও কাছে কৈফিয়ত না দেবার শিক্ষাও আমার আছে।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, দানিলো, আমি জানি তুমি ঝগড়াবিবাদ চাও! যে লোক নিজেকে গোপন করে রাখে, তার মাথায় নির্ঘাত কোন দুষ্টবুদ্ধি আছে।'

'যা ভালো মনে কর তা-ই ভাবতে পার,' দানিলো বলল, 'আমিও যা ভালো বুঝি তা-ই ভাবি। ভগবানের আশীর্বাদে আজ অবধি একটাও অসৎ কাজ করি নি; সব সময় নিজের ধর্মবিশ্বাস আর স্বদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছি — এমন কাজ কখনই করি নি যেমন করে থাকে কোন কোন ভবঘুরে; ধর্মবিশ্বাসীরা যখন প্রাণপণ লড়াই করে, তখন ভগবানই জানেন, তারা কোথায় ঘুরে বেড়ায়, অথচ পরে এসে উদয় হয় অন্যের বোনা ফসলের ভাগীদার হতে। এরা ইউনিয়েটদের মতনও নয়*), ভগবানের গির্জায় অবধি উঁকি মারে না। এই ধরনের লোকদেরই ধরে ভালোমতো জেরা করতে হয় কোথায় তারা ঘুরে বেড়ায়।'

'এঃ ভারী আমার কসাক! তুমি জান না বোধ হয় গুলি আমি তেমন

ভালো ছ্‌ড়তে পারি না: মাত্র একশ' সাজেন দ্‌র থেকে আমার গ্‌লি হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারে। আর আমার কোপ মারাটাও অন্যের পক্ষে ঈর্ষা করার মতো নয়: যে দানা ফুটিয়ে জাউ বানানো হয় আমার তলোয়ারের কোপে মান্‌ষের দেহ তার চেয়েও কুচি কুচি হয়ে যায়।'

'আমি তৈরি,' এই বলে শ্রীয্‌ক্ত দানিলো চটপট শ্‌ন্যে তলোয়ার হাঁকিয়ে ক্রুসচিহ্ন আঁকল, যেন আগে থেকেই তার জানা ছিল কেন ওটাতে শান দিয়েছে।

'দানিলো!' তার হাত ধরে ফেলে ঝুলে পড়ে জোরে চেঁচিয়ে বলল কাতেরিনা। 'ভেবে দেখ, মাথা গরম না করে একবারটি তাকিয়ে দেখ কার গায়ে হাত তুলছ! বাবা, তোমার চুল বরফের মতো সাদা, আর তুমি কিনা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ছোকরার মতো ক্ষেপে গেলে!'

'শোন বউ!' ভয়ঙ্কর স্বরে হ্‌ঙ্কার দিয়ে বলল শ্রীয্‌ক্ত দানিলো, 'তুমি ত জান, এটা আমি পছন্দ করি না। মেয়েমান্‌ষের যে কাজ সাজে সেই কাজ কর গিয়ে, যাও!'

তলোয়ারের ভয়ঙ্কর ঝন্‌ঝনা উঠল; লোহার উপর লোহার ঘা পড়ল, আর দ্‌ই কসাকের সর্বাঙ্গে ধ্‌লোর মতো ছড়িয়ে পড়ল ফুলকি। কাতেরিনা কাঁদতে কাঁদতে খাস কামরার ভেতরে চলে গেল, শয্যায় আছড়ে পড়ে কান বন্ধ করল যাতে তলোয়ারের ঘাতপ্রতিঘাতের শব্দ শ্‌নতে হয়। কিন্তু দ্‌ই কসাকে এমন একটা খারাপ লড়ছিল না যে তাদের হানাহানির আওয়াজ চাপা থাকতে পারে। কাতেরিনার হৃৎপিণ্ড ভেঙে খানখান হয়ে যেতে চাইছিল। সে তার সর্বাঙ্গে শ্‌নতে পাচ্ছিল ধ্‌ক ধ্‌ক ধ্‌নির প্রবাহ। 'না, সহ্য করতে পারছি না, আর সহ্য করতে পারব না... হয়ত বা ইতিমধ্যেই সাদা শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে ছ্‌টছে লাল টকটকে রক্ত, হয়ত এখন আমার আদরের মান্‌ষটি অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে, আর আমি কিনা শ্‌য়ে আছি এখানে!' এই ভেবে পাণ্ডুর হয়ে গিয়ে কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে প্রবেশ করল কুটিরে।

কসাক দ্‌'জন সমান তালে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে মেতে উঠেছে। ওদের কেউই কারও চেয়ে কম যায় না। ক্যাতেরিনার বাবা আক্রমণ করে—শ্রীয্‌ক্ত দানিলো পিছ্‌ হটে। শ্রীয্‌ক্ত দানিলো আক্রমণ করে ত কড়া মেজাজী বাপ পিছ্‌ হটে, কিন্তু আবার সমানে সমানে। প্‌রোদমে টগবগ করছে। দ্‌'জনেই

তলোয়ার সবেগে তুলল... উঃ! তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্‌... এবং প্রচন্ড শব্দে ছিটকে এক পাশে গিয়ে পড়ল দুটি অসিফলক।

'ধন্যবাদ তোমাকে ভগবান!' কাতেরিনা বলল, কিন্তু আবার চেঁচিয়ে উঠল যখন দেখতে পেল ওরা দু'জনে দুই গাদা বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে। বারুদভরার ঘরটা ঠিকঠাক করে নিয়ে ওরা তাগ করল।

শ্রীযুক্ত দানিলো গুলি ছুঁড়ল — লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বাপ তাগ করল... বুড়ো মানুষ; তরুণের মতো দৃষ্টি তেমন প্রখরও নয়, তবে হাত তার কাঁপে না। গুড়ুম করে গুলির আওয়াজ হল।... শ্রীযুক্ত দানিলোর পা টলে গেল। কসাকের ঢিলে কামিজের বাঁ আস্তিন লাল টকটকে রক্তে রাঙা হয়ে গেল।

'না!' সে হুঙ্কার দিল, 'অত সস্তায় আমি তোমার কাছে নিজেকে বিকোচ্ছি না। বাঁ হাত নয়, ডান হাতই হল কর্তা। আমার এখানে দেয়ালে ঝুলছে তুর্কী পিস্তল; এই পিস্তল সারা জীবনে একবারও আমাকে বেইমানি করে নি। নেমে এসো দেখি দেয়াল থেকে, আমার পুরনো সাথী! বন্ধুর সহায় হও!' দানিলো হাত বাড়াল।

'দানিলো!' মরিয়া হয়ে তার হাত ধরে এবং তার পায়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল কাতেরিনা। 'আমার নিজের জন্যে তোমার কাছে মিনতি করছি না। আমার একটাই মাত্র পরিণতি: যে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে সে অযোগ্য স্ত্রী; নীপার, ঠান্ডা নীপার হবে আমার কবর।... কিন্তু চেয়ে দেখ ছেলের দিকে, দানিলো একবার ছেলের দিকে দেখ! বেচারি বাছাকে কে দেবে স্নেহ-ভালোবাসা? কে তাকে আদর করবে? কে তাকে শেখাবে কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে উড়ে বেড়াতে, মুক্তি ও বিশ্বাসের জন্যে লড়াই করতে, কসাকদের মতো পান করতে আর ঘুরে বেড়াতে? আমার ছেলে উচ্ছন্নে যাবে, উচ্ছন্নে যাবে আমার ছেলে। তোর বাপ তোকে চিনতে চায় না! দ্যাখ, কেমন মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ও! এইবারে আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি! তুমি একটা পশু, মানুষ নও! তোমার হৃদয়টা নেকড়ের আর আত্মাটা খল নিকৃষ্ট জীবের। আমি ভেবেছিলাম তোমার মনে অন্তত এক বিন্দু করুণাও আছে, তোমার পাষাণ দেহের ভেতরে জ্বলছে মানুষের অনুভূতি। আমি দেখছি গন্ডমূর্খের মতো ঠকে গেছি। তোমার এতে আনন্দ হবে। তুমি যখন শুনতে পাবে পাষন্ড হিংস্র জন্তুর মতো পোলরা তোমার ছেলেকে ফুটন্ত জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, যখন তোমার ছেলে ছুরির ফলার নীচে আর্তনাদ করবে তখন তোমার হাড়গোড় কবরের নীচে উল্লাসে

নৃত্য করতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিনেছি! ছেলের দেহের নীচে আগুন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে দেখে তুমি মহানন্দে কবর থেকে উঠে মাথার টুপি দিয়ে সেই আগুনে হাওয়া করবে!'

'থাম, কাতেরিনা! আয় আমার আদরের ধন, ইভান, আমি তোকে চুমো দিই! না, বাছা আমার, কেউ তোর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তুই বড় হয়ে স্বদেশের গৌরব বাড়াবি; তুই মাথায় মখমলে টুপি পরে, হাতে ধারাল তলোয়ার নিয়ে ঘূর্ণির মতো উড়ে উড়ে চলবি কসাকদের আগে আগে। দাও বাবা, হাত দাও! আমাদের মধ্যে যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাব আমরা। তোমার সামনে যে অন্যায় করেছি তার জন্যে দোষ স্বীকার করছি। কী হল, হাত দিচ্ছ না কেন?' কাতেরিনার বাবা মুখে না আক্রোশের, না আপসের ভাব নিয়ে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে দানিলো তার উদ্দেশে বলল।

'বাবা!' কাতেরিনা তাকে আলিঙ্গন করে, চুমো খেয়ে বলল। 'অমন নিষ্ঠুর হয়ো না, দানিলোকে ক্ষমা কর, ও আর কখনও তোমার মনে কষ্ট দেবে না!'

'বাছা আমার, একমাত্র তোর মুখ চেয়েই ক্ষমা করছি!' কাতেরিনাকে চুমো দিয়ে সে যখন জবাবে এই কথা বলল তখন তার চোখে অদ্ভুত ঝলক খেলে গেল। কাতেরিনা সামান্য শিউরে উঠল: চুম্বন এবং চোখের অদ্ভুত ঝলকটাও তার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। সে টেবিলে কনুইয়ের ভর রাখল। টেবিলের ওপর তখন আহত হাতটা রেখে শ্রীযুক্ত দানিলো ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে ভাবছিল কোন অপরাধ না করে ক্ষমা চেয়ে কাজটা বোধ হয় খারাপই হল, কসাকসুলভ হল না।

৪

দিনের দীপ্তি প্রকাশ পেল, তবে রৌদ্রোজ্জ্বল নয়: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঠ, বন আর সুবিস্তৃত নীপারের বুকে ঝরে পড়ছে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। শ্রীমতী কাতেরিনার ঘুম ভাঙল, কিন্তু সে নিরানন্দ: তার চোখ ছলছল করছে, সে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও ব্যাকুল।

'ওগো প্রাণনাথ, সোনা আমার, এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম!'

'কী সেই স্বপ্ন, আমার আদরের কাতেরিনা সুন্দরী?'

'স্বপ্নটা অদ্ভুত ঠিকই, অথচ এত স্পষ্ট যেন জাগ্রত অবস্থায় দেখছি— স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে আমার বাবাই সেই কদাকার লোকটি যাকে আমরা ক্যাপ্টেনের বাড়িতে দেখেছি। কিন্তু তোমার কাছে আমার মিনতি, স্বপ্নকে বিশ্বাস করো না। স্বপ্নে লোকে কত আজেবাজে জিনিসই না দেখে! মনে হল আমি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, আমার ভয় হচ্ছে, আর তার প্রতিটি কথায় আমার শিরা-উপশিরা আর্তনাদ করে উঠছে। তুমি যদি শুনতে তার কথা...'

'কী সে বলল, আমার কাতেরিনা সোনা?'

'বলল: 'তুমি আমার দিকে তাকাও কাতেরিনা, আমি সুন্দর! লোকে মিছেই বলে যে আমি বিশ্রী। আমি হব তোমার যোগ্য স্বামী। দেখ আমার চোখের দৃষ্টি!' এই বলে সে আমার দিকে আগুনঝরা চোখে তাকাল, আমি চেঁচিয়ে জেগে উঠলাম।'

'হ্যাঁ, স্বপ্ন অনেক সত্যি কথা বলে। যাই হোক তুমি জান কি যে পাহাড়ের ওপারের অবস্থা তেমন শান্ত নয়? পোলগুলো আবার যেন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। গরোবেৎস আমার কাছে বলে পাঠাল আমি যেন না ঘুমোই। সে মিছিমিছিই দুশ্চিন্তা করছে; আমি অমনিতেই ঘুমোই না। আমার সঙ্গীসাথীরা এই রাতে গাছ কেটে ফেলে বারোটা অবরোধ তৈরি করেছে। পোলিশ-লিথুয়ানীয়দের সীসার মিঠে ফল দিয়ে আপ্যায়ন করব, আর পোলগুলো চাবুকের ঘায়েও তিড়িংবিড়িং নাচবে।'

'বাবা কি একথা জানে?'

'তোমার বাপ আমার ঘাড়ে চেপে বসে আছে! আজ অবধি তার মনের নাগাল আমি পেলাম না। আমার মনে হয় ভিনদেশে অনেক দুষ্কর্ম সে করেছে। আসল কারণটাই বা কী? এক মাস হল বাস করছে, অন্তত একবারও যদি ভালোমানুষ কসাকের মতো আমোদপ্রমোদ করত! মাধ্বী খেতে অস্বীকার করল! শুনছ কাতেরিনা, ব্রেস্তের ইহুদীগুলোর কাছ থেকে ঝেড়েঝুড়ে যে মাধ্বী নিয়ে এলাম তা মুখে তুলল না। এই ছোকরা!' শ্রীযুক্ত দানিলো হাঁক দিল। 'চট করে একবারটি মাটির নীচের ভাঁড়ারে গিয়ে খানিকটা ইহুদী মাধ্বী নিয়ে আয় দেখি! গরিলকা ভোদ্‌কা অবধি খায় না! কী যা তা কান্ড! আমার মনে হয় কি কাতেরিনা সুন্দরী, লোকটা প্রভু খ্রীষ্টকেও বিশ্বাস করে না। অ্যাঁ? তোমার কী মনে হয়?'

'ভগবান জানেন কী বলছ তুমি দানিলো!'

'আজব কাণ্ড, সুন্দরী!' কসাক ছোকরার হাত থেকে মাটির পাত্রটি নিতে নিতে সে বলে চলল, 'বজ্জাত ক্যাথলিকগুলো পর্যন্ত ভোদ্‌কা বলতে অজ্ঞান; কেবল তুর্করাই মদটা খায় না। কী রে স্তেৎস্কো, মাটির নীচের ভাঁড়ারে অনেকটা মাধ্বী সাঁটিয়েছিস বুঝি?'

'সামান্য একটু চেখে দেখলাম কর্তা!'

'মিছে কথা বলছিস, কুত্তার বাচ্চা! দেখছিস গোঁফের ওপর কেমন মাছি এসে ছেঁকে ধরেছে! আমি চোখ দেখেই বলে দিতে পারি আধা বালতি মেরে দিয়েছিস! ওঃ এই হল কসাক! কী বেপরোয়া জাত রে বাবা! বন্ধুর জন্যে সব কিছু করতে রাজী, আর নেশার জিনিস শেষ করবে নিজে। আমার মনে হয় আমি অনেক কাল হল নেশা করছি, কী বল গো কাতেরিনা? অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, অনেক কাল হল! আর হালে...'

'ভয় নেই, ভয় নেই, এক পাত্রের বেশি খাচ্ছি না! আরে এই যে তুর্কী মোল্লা ঢুকছেন দরজা দিয়ে!' শ্বশুরকে অবনত হয়ে দরজায় প্রবেশ করতে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল।

'বলি মেয়ে, ব্যাপারটা কী?' মাথার টুপি খুলে এবং অপূর্ব পাথর বসানো তলোয়ার ঝোলানো কোমরবন্ধনী ঠিকঠাক করে নিয়ে বাপ বলল, 'সূর্য এতক্ষণে মাথার ওপর উঠে গেছে, অথচ দুপুরের খাবার এখনও তৈরি নেই।'

'দুপুরের খাবার তৈরি হয়ে আছে বাবাঠাকুর, এক্ষুনি আনছি! পুলিপিঠের হাঁড়িটা নামা!' বুড়ি ঝি তখন কাঠের বাসনপত্র মুছছিল, তারই উদ্দেশে কথাগুলি বলল কর্ত্রী কাতেরিনা। 'দাঁড়া, আমিই বরং নামিয়ে আনছি,' কাতেরিনা বলল, 'আর তুই গিয়ে ছোকরাদের ডেকে নিয়ে আয়।'

সকলে মেঝেতে গোল হয়ে বসল: আইকনের মুখোমুখি বসল বাবাঠাকুর, তার বাঁ দিকে কর্তা দানিলো, ডান দিকে কর্ত্রী কাতেরিনা আর নীল হলুদ কামিজ পরনে দশজন অতি বিশ্বস্ত নওজোয়ান।

'এই পুলিটুলি আমার ভালো লাগে না!' খানিকটা খেয়ে চামচ রেখে দিয়ে বাবাঠাকুর বলল, 'কোন স্বাদ নেই!'

'জানি, তোর বেশি ভালো লাগে ইহুদীদের সেমাই,' মনে মনে বলল দানিলো।

এরপর দানিলো শ‍ুনিয়ে শ‍ুনিয়েই বলল, 'প‍ুলির কোন স্বাদ নেই, এমন কথা বলছ কেন শ্বশ‍ুরমশাই? খারাপ বানানো হয়েছে নাকি? আমার কাতেরিনা এমন প‍ুলি বানায় যে আমাদের কম্যান্ডাণ্ট সাহেবও ক্বচিৎ অমন জিনিস খাবার স‍ুযোগ পায়। ওগ‍ুলো তাচ্ছিল্য করার জিনিস মোটেই নয়। এ হল খ‍্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসীদের খাবার! সমস্ত সাধ‍ুসন্ত ও মহাপ‍ুর‍ুষরা প‍ুলি খেতেন।'

বাপ কোন উচ্চবাচ্য করল না; শ্রীয‍ুক্ত দানিলোও চুপ করে গেল।

পরিবেশন করা হল বাঁধাকপি আর প্লাম সহযোগে ব‍ুনো শ‍ুয়োরের রোস্ট।

'আমি শ‍ুয়োর-টুয়োর পছন্দ করি না!' চামচ দিয়ে বাঁধাকপি সামনে টেনে আনতে আনতে কাতেরিনার বাবা বলল।

'শ‍ুয়োর পছন্দ না করার কারণ কী?' দানিলো বলল, 'একমাত্র তুর্করা আর ইহ‍ুদীরাই শ‍ুয়োর খায় না।'

বাপের ভ্র‍ুকুটি আরও তীব্র আকার ধারণ করল।

ব‍ুড়ো বাপ খেল কেবল দ‍ুধে সেদ্ধ প্যাতলা জাউ, আর ভোদ্‌কার বদলে জামার নীচ থেকে একটা বোতল বার করে কালো রঙের কী একটা যেন জল পান করল।

দ‍ুপ‍ুরের খাওয়াদাওয়ার পর দানিলো বীরপ‍ুর‍ুষোচিত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল, তার ঘ‍ুম ভাঙল কেবল সন্ধ্যানাগাদ। উঠে বসে কসাকবাহিনীর উদ্দেশে কাগজপত্র লিখতে শ‍ুর‍ু করল; আর কর্ত্রী কাতেরিনা চুল্লির ওপরের শয্যায় বসে বসে পা দিয়ে দোলা ঠেলতে লাগল। শ্রীয‍ুক্ত দানিলো বসে বসে বাঁ চোখে লেখার ওপর দ‍ৃষ্টি ফেলে, আর ডান চোখে তাকায় জানলার দিকে। জানলা থেকে দেখা যায় অনেক দ‍ূরে পাহাড়-পর্বত ও নীপারের ঔজ্জ্বল্য। নীপারের ওপারে অরণ্যের নীলিমা। তার ঊর্ধ্বদেশে স্পষ্ট হয়ে ঝলক দিচ্ছে নৈশ আকাশ। কিন্তু দ‍ূরের আকাশ বা নীলাভ বনানী— কোনটাতেই শ্রীয‍ুক্ত দানিলো বিভোর নয়: উদ্‌গত ঐ যে অন্তরীপটার ওপর প‍ুরনো কেল্লার কালো দেহরেখা চোখে পড়ছে, সে তাকিয়ে তাকিয়ে ওটাকে দেখছে। তার মনে হল কেল্লার সঙ্কীর্ণ গবাক্ষে যেন আলোর ঝলক দেখা দিল। কিন্তু সর্বত্র শান্ত। এটা সম্ভবত তার মনের ভুল। কেবল শোনা যাচ্ছিল নীচে নীপারের চাপা কল্লোল, আর তিন দিক থেকে একের পর এক এসে পড়ছিল ম‍ুহ‍ুর্ম‍ুহ‍ু জাগ্রত তরঙ্গমালার অভিঘাত। নীপার বিদ্রোহ করে না।

সে বৃদ্ধের মতো গরগর করছে, বিড়বিড় করছে; তার কিছুই মনঃপূত হচ্ছে না; তার ধারেকাছের সব কিছু পাল্‌টে গেছে; উপকূলের পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল ও তৃণভূমির বিরুদ্ধে তার চাপা আক্রোশ আছে, তাদের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ বহন করে নিয়ে চলেছে কৃষ্ণসাগরের কাছে।

এমন সময় নীপারের প্রশস্ত বক্ষে একটা নৌকোর কালো আকৃতি দেখা গেল, মনে হল কেল্লায় আবার কিসের যেন ঝলক খেলে গেল। দানিলো মৃদু শিস দিতে সেই শিসের আওয়াজ শুনে ছুটে এলো তার বিশ্বস্ত অনুচর।

স্তেৎস্কো, শিগ্‌গির ধারাল তলোয়ার আর বন্দুক নিয়ে আমার পেছন পেছন চলে আয় দেখি!'

'তুমি কি চললে নাকি?' শ্রীমতী ক্যাতেরিনা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ গো, চললাম। জায়গাগুলো সব ভালো করে দেখা দরকার, দেখা দরকার সব ঠিকঠাক আছে কিনা।'

'আমার কিন্তু একা থাকতে বড় ভয় লাগছে। আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে। ঐ একই স্বপ্ন যদি আবার দেখি? এমন কি আমার সন্দেহ হচ্ছে ওটা সত্যি সত্যিই স্বপ্ন কিনা—সবটা ছিল এতই জীবন্ত।'

'তোমার সঙ্গে বুড়ি থাকবে; আর বার-বারান্দায় ও উঠোনে কসাকেরা ঘুমোচ্ছে!'

'বুড়ি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর কসাকদের কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। শোন, দানিলো কর্তা গো, আমাকে তালাচাবি দিয়ে ঘরে রেখে যাও, চাবিটা নিজের কাছে রাখ। তাহলে আমার অতটা ভয় লাগবে না; আর কসাকেরা শুয়ে থাকুক দোরগোড়ায়।'

'তা-ই হোক!' বন্দুকের গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে এবং বন্দুকের বারুদ পোরার ঘরে ঢালতে ঢালতে দানিলো বলল।

অনুগত সহচর স্তেৎস্কো ইতিমধ্যে পুরোদস্তুর কসাকের সাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দানিলো মাথায় দিল আস্ত্রাখান টুপি, জানলা বন্ধ করল, দরজায় খিল দিল, তালা লাগাল এবং তার নিদ্রিত সঙ্গীসাথী কসাকদের মাঝখান দিয়ে চুপিসারে আঙ্গিনা থেকে বের হয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

আকাশ প্রায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নীপার থেকে ভেসে আসছে মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বায়ু। দূর থেকে যদি শঙ্খচিলের কাতর ধ্বনি শোনা না যেত তা হলে মনে হত সব যেন স্তব্ধ। এমন সময় যেন একটা খসখস

আওয়াজ হল।... কাটাগাছের তৈরি অবরোধকে আড়াল করে ছিল একটা কাঁটা ঝোপ — তারই পেছনে বুরুলবাশ নিঃশব্দে বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। লাল ঢোলা কামিজ পরা কে যেন পাহাড় থেকে নামছে। তার এক পাশে ঝুলছে তলোয়ার, সঙ্গে দুটি পিস্তল।

'এত দেখছি শ্বশুর!' ঝোপের আড়াল থেকে তাকে নিরীক্ষণ করে শ্রীযুক্ত দানিলো বলল। 'এই সময় কেন এবং কোথায় তার যাবার দরকার পড়ল? স্তেৎস্কো! হাঁ করে থাকিস নে, দু চোখ খোলা রেখে লক্ষ রাখ বাবাঠাকুর কোন দিকে যায়।' লাল ঢোলা কামিজ পরনে লোকটি একেবারে তীরভূমিতে নেমে এসে উদ্‌গত অন্তরীপটির দিকে মোড় নিল। 'আচ্ছা! এই তাহলে ব্যাপার!' শ্রীযুক্ত দানিলো বলল। 'দেখলি ত স্তেৎস্কো, ও যে দেখছি মায়াবীটার কোটরের দিকেই চলল।'

'হ্যাঁ, ঠিকই, অন্য কোথাও নয় কর্তা! তা নইলে আমরা অন্য পাশে ওকে দেখতে পেতাম। কিন্তু ও কেল্লার কাছে এসেই হাওয়া হয়ে গেল।'

'দাঁড়া দেখি, বেরিয়ে আসি, তারপর চল ওর পিছু নেওয়া যাক। এখানে কিছু একটা গোপন রহস্য আছে। না, কাতেরিনা, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে তোমার বাব্য লোক সুবিধের নয়; ও এমন এমন সব কাজ করল যেগুলো আমাদের খ্রীষ্টানদের সাজে না।'

কর্তা দানিলো আর তার বিশ্বস্ত অনুচরটিকে এখন এক ঝলক দেখা গেল উঁচু তীরভূমিটার উপর। তারপর আর তাদের দেখা গেল না। কেল্লার চারধারের গহন অরণ্য তাদের ঢেকে ফেলল। ওপরের জানলায় টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই কসাক ভাবে কী করে ভেতরে যাওয়া যায়। না কোন তোরণ না দরজা — কিছুই চোখে পড়ে না। আঙিনা থেকে প্রবেশপথ অবশ্যই আছে; কিন্তু সেখানে কী ভাবে প্রবেশ করা যায়? দূর থেকে শোনা যাচ্ছে শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ আর কুকুরদের ছুটোছুটির শব্দ।

'এতক্ষণ ভাবছি কেন!' জানলার সামনে একটা উঁচু ওকগাছ দেখতে পেয়ে দানিলো বলল। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাক রে ছোঁড়া! আমি ওকগাছটায় উঠি; ওখান থেকে জানলায় সরাসরি উঁকি মারা যায়।'

এই বলে যাতে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ না হয় তার জন্য সে তার তলোয়ার নীচে ফেলে দিল, আর ডালপালা ধরে উঠে গেল ওপরে। জানলায় তখনও আলো জ্বলছিল। জানলার ঠিক পাশে একটা ডালের

ওপর বসে সে এক হাত দিয়ে গাছ জড়িয়ে ধরে দেখল: ঘরে মোমবাতি নেই, অথচ আলো দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে সব নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতীকচিহ্ন। অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে, কিন্তু রীতিমতো আজব ধরনের: তুর্ক বল, ক্রিমিয়ার লোক বল, পোল বল, খ্রীষ্টান বল, এমন কি অত যাদের নাম ডাক সেই সুইড জাতির লোকজনও অমন অস্ত্র বহন করে না। ছাদের নীচে সামনে-পেছনে ঝলক দিয়ে দিয়ে উড়ছে বাদুড়ের দল; দেয়াল, দরজা আর কাঠের মেঝের ওপর খেলে যাচ্ছে তাদের ছায়া। এমন সময় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাড়াই দরজা খুলে গেল। লাল ঢোলা কামিজ পরনে কে যেন প্রবেশ করেই সোজা এগিয়ে গেল সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলটার দিকে। 'এই ত, এ যে দেখছি শ্বশুর!' শ্রীযুক্ত দানিলো খানিকটা নীচে নেমে গিয়ে আরও শক্ত করে গাছের গা ঘেঁষে রইল।

কিন্তু জানলা দিয়ে কেউ দেখছে কিনা সে দিকে লক্ষ করার অবকাশ লোকটির ছিল না। মুখ গোমড়া করে, তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে এসে সে টেবিলের চাদর এক ঝটকায় টেনে ফেলে দিল — অকস্মাৎ সমস্ত ঘর জুড়ে ধীরে ধীরে বয়ে গেল স্বচ্ছ নীল আলোর প্রবাহ। কেবল আগেকার ম্লান সোনালি আলোর তরঙ্গ মিশে না গিয়ে ডুবে যেতে লাগল যেন নীল সমুদ্রের ভেতরে, আর থরে থরে প্রসারিত হয়ে গেল যেন মর্মরপাথরের গায়ে। এবারে সে টেবিলের ওপর রাখল একটা হাঁড়ি, হাঁড়ির ভেতরে ফেলতে লাগল কী যেন কতকগুলো ঘাসপাতা।

শ্রীযুক্ত দানিলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু তার গায়ে আর লাল ঢোলা কামিজ দেখতে পেল না; সেই জায়গায় তার পরনে দেখা গেল চওড়া সালোয়ার, যেমন পরে থাকে তুর্করা; কোমরবন্ধনীতে পিস্তল; মাথায় অদ্ভুত ধরনের এক টুপি, তাতে আগাগোড়া হিজিবিজি কী সব লেখা — না রুশী অক্ষরে, না পোলীয় অক্ষরে। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল — মুখও বদলাতে শুরু করেছে: নাক বেড়ে লম্বা হয়ে ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়ল; মুখ মুহূর্তের মধ্যে আকর্ণ প্রসারিত হয়ে গেল; মুখের ভেতর থেকে একটা দাঁত বেরিয়ে এক পাশে বেঁকে গেল — দেখা দিল সেই মায়াবী, যাকে দেখা গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের বাড়ির বিয়ের আসরে। 'তোমার স্বপ্ন তা হলে ঠিকই, কাতেরিনা!' বুরুলবাশ মনে মনে ভাবল।

মায়াবী টেবিলের চারধারে পায়চারি করতে লাগল, দেয়ালের চিহ্নগুলিও দ্রুত বদলে যেতে লাগল, আর বাদুড়েরা আরও তীব্র বেগে ওপরে-নীচে,

আগে-পিছে উড়ে চলল। নীল আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে যেন একেবারে নিভে গেল। বড় ঘরটায় এখন জ্বলছে মৃদু গোলাপী আলো। মনে হচ্ছিল যেন অনুচ্চ ঘণ্টাধ্বনি তুলে অপূর্ব আলোর বন্যা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বয়ে চলল, তারপর হঠাৎই গেল মিলিয়ে, নেমে এলো তমিস্রা। শোনা যাচ্ছিল কেবল একটা আওয়াজ, যেন সাঁঝের শান্ত সময়ে জলের দর্পণের গায়ে ঘূরপাক খেতে খেতে, রুপোলি উইলোকে জলের ভেতরে আরও নীচে নুইয়ে দিতে দিতে বাতাস খেলায় মেতেছে। শ্রীযুক্ত দানিলোর মনে হল যেন সদরঘরে চাঁদ জ্বলজ্বল করছে, তারাদল ঘুরে বেড়াচ্ছে, অস্পষ্টভাবে ঝলক দিচ্ছে কালো-নীল আকাশ, এমন কি রাতের বাতাসের শীতল প্রবাহের ঘ্রাণ যেন তার মুখে এসে লাগল। শ্রীযুক্ত দানিলোর যেন মনে হল (এই সময় সে ঘুমোচ্ছে কিনা বোঝার জন্য নিজের গোঁফ স্পর্শ করে দেখতে লাগল) বড় ঘরে এখন যেন আর আকাশ দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তার নিজেরই খাস কামরা: দেয়ালে ঝুলছে তার তাতারী ও তুর্কী তলোয়ার; দেয়ালের কাছেই তাক, তাকে গৃহস্থালীর বাসনকোসন, তৈজসপত্র; টেবিলে রুটি আর নুন; দোলা ঝুলছে... কিন্তু মূর্তির বদলে উঁকি মারছে বিকট সমস্ত মুখ; চুল্লির ওপরকার শয্যায়... কিন্তু কুয়াসা ঘন হয়ে এসে সব ঢেকে দিল আবার ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। আবার অপূর্ব ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গোটা কামরা আলোকিত হয়ে উঠল গোলাপী আলোয়, আবার মায়াবী তার অদ্ভুত পাগড়ি মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধ্বনি আরও তীব্র ও গাঢ় হতে লাগল, মৃদু গোলাপী আলো হতে শুরু করল উজ্জ্বলতর, আর মেঘের মতো সাদা কী যেন ভেসে চলেছে ঘরের মাঝখানে; শ্রীযুক্ত দানিলোর মনে হল এই মেঘ যেন মেঘ নয়, একটা নারীমূর্তির মতো কী যেন দাঁড়িয়ে আছে; কেবল, বোঝা যাচ্ছে না কী দিয়ে সে তৈরি — বাতাসে তৈরি নাকি? কী করেই বা কোন কিছুর ওপর ভর না দিয়ে, মাটি স্পর্শ না করে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীর ভেদ করে দেখা যাচ্ছে গোলাপী আলো আর দেয়ালে ঝলকাচ্ছে চিহ্নগুলি? এইবারে সে যেন তার স্বচ্ছ মাথাটা একটু নাড়াল: তার পাণ্ডুর নীল চোখে প্রকাশ পাচ্ছে মৃদু দীপ্তি; চুলের রাশি পাকিয়ে এসে পড়ছে তার কাঁধের ওপর, যেন উজ্জ্বল ধূসর কুয়াসা; ঠোঁটে পাণ্ডুর লাল আভা, যেন স্বচ্ছ শুভ্র বর্ণের প্রভাতী আকাশ ভেদ করে ঝরে পড়ছে উষার প্রায় অদৃশ্যগোচর রক্তিমা; ভ্রূযুগল ম্লান মসিবর্ণের... আরে! এ যে কাতেরিনা! এই সময়

দানিলো অনুভব করল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন লোহার নিগড়ে বাঁধা; সে কথা বলার চেষ্টা করল, ঠোঁট নাড়ল; কিন্তু কোন আওয়াজ বার করতে পারল না।

মায়াবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার নিজের জায়গায়।

'কোথায় ছিলি তুই?' সে এই কথা জিজ্ঞেস করতে তার সামনে দাঁড়ানো মূর্তিটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'ওঃ! তুমি আমাকে ডাকলে কেন?' মৃদু কাতরাতে কাতরাতে সে বলল। 'আমি কী আনন্দেই ছিলাম! আমি ছিলাম ঠিক সেই জায়গায় যেখানে আমি জন্মেছিলাম, যেখানে আমার জীবনের পনেরো বছর কেটেছে। ওঃ, কী চমৎকার সেখানে! কী সবুজ আর সুগন্ধী সেই ঘাসে ঢাকা মাঠ যেখানে আমি ছোটবেলায় খেলা করতাম: সেই মেঠো ফুল আর আমাদের সেই কুটির, সবজি বাগান! ওঃ, আমার দরদী মা আমাকে কী রকম জড়িয়েই না ধরল! তার চোখে সে কী ভালোবাসা! মা আমাকে সোহাগ করল, আমার ঠোঁটে, গালে চুমো খেল, ঘন চিরুণী দিয়ে আমার গাঢ় বাদামী চুলের বিনুনী আঁচড়ে দিল... বাবা!' সে তার ম্লান চোখের দৃষ্টি মায়াবীর প্রতি নিবদ্ধ করে বলল, 'আমার মাকে তুমি কেটে ফেললে কেন?'

মায়াবী কঠোর ভঙ্গিতে আঙ্গুল তুলে শাসাল।

'তোকে আমি এই কথা বলতে কখনও বলেছি?' বায়বীয় সুন্দরী প্রতিমা কাঁপতে লাগল। 'তোর কর্ত্রী এখন কোথায়?'

'আমার কর্ত্রী কাতেরিনা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি তাতে খুশি হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেলাম। অনেক কাল হল মাকে দেখার আমার ইচ্ছে। আমি হঠাৎ হয়ে গেলাম পনেরো বছরের মেয়ে। আমার সমস্ত শরীর হল পাখির মতো হালকা। তুমি আমাকে ডাকলে কেন?'

'গতকাল আমি তোকে যা যা বলেছি সব মনে আছে ত?' মায়াবী এত মৃদু স্বরে বলল যে প্রায় শোনাই যায় না।

'মনে আছে, মনে আছে; কিন্তু শুধু এটা ভোলার জন্যে আমি কীই না দিতে রাজী! বেচারি কাতেরিনা! ওর আত্মা যা জানে তার অনেকই ও জানে না।'

'এটা কাতেরিনার আত্মা,' শ্রীযুক্ত দানিলো মনে মনে ভাবল; কিন্তু তখনও নড়াচড়া করতে তার সাহসে কুলোল না।

'অনুশোচনা কর, বাবা! প্রত্যেকবার তুমি খুন করার পর মড়া মানুষ যে কবর থেকে উঠে আসে এটা কি ভয়ঙ্কর নয়?'

'আবার তোর সেই প্রনো কথা!' মায়াবী তাকে বাধা দিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলল। 'আমি আমার মনের সাধ মেটাব, তোকে দিয়ে আমার যা খ্রশি করিয়ে নেব। কাতেরিনা আমাকে ভালোবাসবে!..'

'ওঃ, তুমি একটা দানব, আমার বাপ নও!' সে কাতর কণ্ঠে বলল। 'না, তোমার ইচ্ছে অন্যায়ী হবে না! এটা ঠিক যে তুমি তোমার দ্বুষ্ট মন্ত্রবলে আত্মাকে ডেকে আনার এবং তাকে যন্ত্রণা দেবার অধিকার পেয়েছ; কিন্তু একমাত্র ভগবানই আত্মাকে দিয়ে তাঁর নিজের খ্রশিমতো কাজ করাতে পারেন। না, যতক্ষণ আমি কাতেরিনার দেহে আছি ততক্ষণ সে কখনই ঈশ্বরবিরোধী কাজ করতে পারবে না। বাবা, সামনেই শেষ বিচারের দিন! তুমি যদি আমার বাপ নাও হতে তাহলেও আমার প্রিয়, বিশ্বস্ত স্বামীকে ছেড়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে পারতে না। আমার স্বামী যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত নাও হত তাহলেও আমি তার বির্দ্ধে ব্যভিচার করতাম না, কেন না যারা শপথভঙ্গের অপরাধে অপরাধী, যারা অবিশ্বাসী, ঈশ্বর তাদের আত্মাকে ভালোবাসেন না।'

এই বলে শ্রীয্বক্ত দানিলো যে জানলার নীচে বসে ছিল তারই উপর দ্ৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কোন্ দিকে তাকিয়ে দেখছিস? ওখানে তুই কাকে দেখতে পেলি?' মায়াবী চিৎকার করে বলল।

বায়বীয় কাতেরিনা চমকে উঠল। কিন্তু শ্রীয্বক্ত দানিলো ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ হল মাটিতে নেমে পড়ে বিশ্বস্ত অন্বচর স্তেৎস্কোর সঙ্গে তার নিজের এলাকার পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছে। 'ভয়ংকর, ভয়ংকর!' সে আপন মনে বলল, তার কসাক হৃদয়ে অন্বভব করল কেমন যেন একটা ভীর্বতা। শিগ্বগিরই সে এসে পেঁছিল নিজের বাড়ির আঙিনায়। সেখানে কসাকরা আগের মতোই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, কেবল একজন জেগে পাহারায় বসে থেকে পাইপ ফ্রকছে। আকাশ তখনও ছেয়ে আছে তারায় তারায়।

৫

'আমাকে জাগিয়ে কী ভালোই না করলে!' কাতেরিনা তার জামার কাজ করা আস্তিন দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এবং সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে বলল। 'কী ভয়ংকর স্বপ্নই না দেখলাম!

নিশ্বাস নিতে আমার বুকে দারুণ ভার লাগছিল। উঃ!.. আমার মনে হচ্ছিল আমি মারা যাচ্ছি...'

'কী স্বপ্ন বল দেখি, আচ্ছা এটা নয় কি?' এই বলে বুরুলবাশ যা যা দেখেছিল তার বিবরণ স্ত্রীকে দিতে লাগল।

'তুমি এটা কী করে জানলে গো?' কাতেরিনা বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'কিন্তু না, তুমি যা বলছ তার অনেক কিছু আমার অজানা। না, বাবা যে আমার মাকে খুন করেছে এটা আমি স্বপ্নে দেখি নি; কিংবা প্রেতমূর্তিও নয় — ওসব কিছুই আমি দেখি নি। না, দানিলো, তুমি পুরো ঠিক বলছ না। ওঃ কী ভয়ঙ্কর আমার বাবা!'

'তুমি যে অনেক জিনিস দেখতে পাও নি এতে অবাক হবার কিছু নেই। তোমার আত্মা যতটা জানে তার দশ ভাগের এক ভাগও তুমি জান না। তুমি কি জান যে তোমার বাপ খ্রীষ্টবিরোধী? গত বছরই, যখন আমি পোলদের সঙ্গে মিলে ক্রিমিয়ার তাতারদের ওপর হানা দিতে তৈরি হই (তখনও এই অবিশ্বাসী জাতির সঙ্গে আমি হাতে হাত মিলিয়ে চলি) তখন ব্রাৎস্কি মঠের প্রধান — লোকটা সাধুসন্ত গো — আমাকে বলেছিলেন যে যে-কোন মানুষের আত্মাকে তলব করার ক্ষমতা খ্রীষ্টবিরোধী লোকের আছে; আর মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার আত্মা ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়, দেবদূতদের সঙ্গে উড়ে বেড়ায় ঈশ্বরের সদর কামরার আশেপাশে। গোড়া থেকে তোমার বাপের ভাবভঙ্গি আমার পছন্দ নয়। আমি যদি জানতাম যে তোমার বাপ এমন তাহলে তোমাকে বিয়ে করতাম না; আমি তোমাকে ত্যাগ করতাম, খ্রীষ্টবিরোধী কুলের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতানোর পাপে আমি আমার আত্মাকে কলুষিত করতাম না।'

'দানিলো!' কাতেরিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তোমার কাছে আমি কি কোন অপরাধে অপরাধী? ওগো, প্রাণনাথ, আমি কি ব্যভিচারিণী হয়েছি? আমার ওপর তোমার এই রোষ কেন? আমার সেবায় কি কোন আনুগত্যের অভাব আছে? তুমি তোমার ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে খানাপিনায় মেতে যখন নেশা করে বাড়ি ফিরেছ তখন কি আমি তোমাকে কোন কটু কথা বলেছি? তোমার জন্যেই কি আমি জন্ম দিই নি এমন ছেলের যার ভুরুজোড়া কালো?..'

'কেঁদো না, কাতেরিনা, আমি এখন তোমাকে জানি, তোমাকে কোন মতেই ত্যাগ করব না। সমস্ত পাপের দায় তোমার বাপের!'

'না, তাকে আমার বাপ বলবে না! সে আমার বাপ নয়। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি তাকে অস্বীকার করছি, অস্বীকার করছি বাপকে! সে খ্রীষ্টবিরোধী, ধর্মত্যাগী! উচ্ছন্নে যাক, ডুবে মরুক — তাকে বাঁচানোর জন্যে আমি হাত বাড়িয়ে দেব না। গোপন শেকড়-বাকর খেয়ে শুকিয়ে মরুক — জল খেতে দেব না। তুমিই আমার বাপ!'

৬

শ্রীযুক্ত দানিলোর গভীর পাতাল কুঠুরিতে নিশ্ছিদ্র প্রহরায় লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে মায়াবী; অনতিদূরে নীপারের তীরের ওপর পুড়ছে তার পৈশাচিক কেল্লা, আর প্রাচীন প্রাচীরের চারধারে এসে ভিড় করছে, আঘাত করছে রক্তরাঙা তরঙ্গমালা। গভীর পাতাল কুঠুরিতে মায়াবীকে ধরে রাখা হয়েছে তুক করার জন্য নয়, ঈশ্বরবিরোধী কাজের জন্যও নয় — সে সবের বিচারক ভগবান; তাকে ধরে রাখা হয়েছে গোপন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, ইউক্রেনীয় জাতিকে ক্যাথলিকদের কাছে বিকিয়ে দেওয়ার এবং খ্রীষ্টীয় গির্জা পোড়ানোর উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্মবিশ্বাসী রুশভূমির শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে। মায়াবী বিষণ্ণ; তার মাথার ভেতরে রাতের মতো কালো হয়ে ঘনিয়ে আসছে চিন্তা। তার জীবনের আর মাত্র একটি দিন বাকি আছে, আগামী কাল তাকে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। আগামী কাল তার প্রাণদণ্ড হওয়ার কথা। তার মৃত্যুদণ্ড খুব একটা সহজ উপায়ে হবে না, তাকে যদি কড়াইয়ে জ্যান্ত সিদ্ধ করা হয় কিংবা তার পাপদেহের চামড়া টেনে টেনে তোলা হয় তাহলে সেটাকে অসীম করুণাই বলতে হবে। মায়াবী বিষণ্ণ হয়ে মাথা নীচু করে আছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার অনুশোচনা হয়ত এখনই শুরু হয়ে গেছে, তবে তার পাপ সে রকম নয় যাতে সে ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে পারে। তার সামনে, মাথার উপরে সঙ্কীর্ণ গবাক্ষ, লোহার শিক আড়াআড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ান। শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ তুলে সে গবাক্ষের দিকে এগিয়ে গেল তার মেয়ে পাশ দিয়ে যায় কিনা দেখার উদ্দেশ্যে। মেয়ে নম্র, সে মনে রাগ পুষে রাখে না পায়রার মতো, বাপের ওপর তার কি দয়া হবে না... কিন্তু না, কেউই নেই। নীচে চলে গেছে পথ; সে

পথ দিয়ে কোন জনপ্রাণী যাবে না। আর একটু নীচে ছুটছে নীপার; কারও দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই; সে ফুঁসছে, বেড়িতে বাঁধা বন্দী তার একঘেয়ে আওয়াজ শুনে শুনে হতাশ হয়ে পড়ছে।

ঐ ত রাস্তায় কাকে যেন দেখা যাচ্ছে — একজন কসাক! কয়েদী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার সব ফাঁকা। এবারে দূরে কে যেন নেমে আসছে।... হাওয়ায় উড়ছে তার সবুজ রঙের উর্ধ্ববসন, মাথায় জ্বলজ্বল করছে সোনালি টুপি... এই ত ও! সে জানলার আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। এবারে কাছাকাছি চলে এসেছে...

'কাতেরিনা! বেটি! দয়া কর্, তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি!..'

তবে ও নির্বাক, ও শুনতে চায় না, জেলখানার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত, দেখতে দেখতে চলে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটা দুনিয়াটা ফাঁকা। নীপারের কল্লোল হতাশা জাগিয়ে তোলে। হৃদয়ে চেপে বসে বিষণ্ণতা। কিন্তু মায়াবী কি উপলব্ধি করতে পারছে এই বিষণ্ণতা?

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে চলল। সূর্য অস্ত গেল। এখন আর সূর্য নেই। এবারে নামল সন্ধ্যা: স্নিগ্ধতা। কোথায় যেন একটা বলদ হাম্বারব করছে; কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে আওয়াজ — সম্ভবত কোথাও লোকজন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে আমোদ-ফুর্তি করতে করতে; নীপারের ওপর ঝলক দিচ্ছে নৌকো... একজন কয়েদীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ কার আছে! আকাশে রুপোলি কাস্তে ঝলক দিয়ে উঠল। ঐ ত রাস্তা দিয়ে উলটো দিক থেকে কে যেন আসছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা দুঃসাধ্য। এ যে কাতেরিনা, ফিরছে।

'বেটি, খ্রীষ্টের দোহাই! ক্ষিপ্ত নেকড়েছানারাও তাদের মাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে না, বেটি, অন্তত একবার তোর অপরাধী বাপের দিকে ফিরে চা!' ও শুনল না, চলতে লাগল। 'বেটি, তোর হতভাগিনী মার দোহাই!..' কাতেরিনা থমকে দাঁড়াল। 'আর, আমার শেষ কথাটা শুনে যা!'

'আমাকে ডাকছ কেন, অনাচারী? আমাকে বেটি বলে ডেকো না! আমাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আমার হতভাগিনী মার দোহাই দিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে কী পেতে চাও?'

'কাতেরিনা। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে: আমি জানি, তোর স্বামী আমাকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে মাঠে ছেড়ে দিতে চায়, হয়ত বা আরও ভয়ঙ্কর কোন মৃত্যুদণ্ডও ভেবে বার করতে পারে...'

'কিন্তু তোমার পাপের উপযুক্ত কোন দণ্ড এই পৃথিবীতে আছে কি? দণ্ডের অপেক্ষায় থাক; কেউ তোমার হয়ে প্রার্থনা জানাতে আসবে না।'

'কাতেরিনা! আমি প্রাণদণ্ডের ভয় করি না, কিন্তু পরলোকের যন্ত্রণা... তুই নিরপরাধ, কাতেরিনা, তোর আত্মা স্বর্গে ভগবানের কাছাকাছি উড়তে থাকবে; আর তোর অনাচারী বাপের আত্মা দগ্ধ হবে অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে, সে আগুনে আর কোন দিনই নিভবে না: উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে জ্বলতে থাকবে; এক ফোঁটা শিশির কেউ ফেলবে না, কোন বাতাসের ঝাপটা বইবে না...'

'এই দণ্ড মকুব করার ক্ষমতা আমার নেই,' কাতেরিনা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল।

'কাতেরিনা! দাঁড়া, একটা কথা শুনে যা: তুই আমার আত্মাকে উদ্ধার করতে পারিস। তুই এখনও জানিস না ঈশ্বর কত মঙ্গলময় ও করুণাময়। সেণ্ট পলের কথা তুই শুনেছিস কি? কী পাপীই না তিনি ছিলেন, কিন্তু অনুশোচনা করার পর তিনি হলেন পুণ্যাত্মা।'

'তোমার আত্মার পরিত্রাণের জন্যে আমি কী করতে পারি?' কাতেরিনা বলল, 'আমি অবলা নারী, এই নিয়ে ভাবা কি আমার সাজে?'

'আমি যদি এখান থেকে বেরোতে পারতাম তাহলে আমি সব ছেড়েছুড়ে দিতাম। অনুশোচনা করব: কোন গুহায় চলে যাব, পশুলোমের রুক্ষ বসন অঙ্গে ধারণ করব, দিনরাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। কেবল নিষিদ্ধ অসাত্ত্বিক আহার কেন, মাছও মুখে তুলব না! ঘুমোনোর সময় বসন পেতে শয্যা করব না। সর্বক্ষণ ভজনা করব, শুধুই ভজনা করব! আর করুণাময় ঈশ্বর যদি আমার পাপের অন্তত একশভাগের একভাগও লাঘব না করেন তাহলে গলা পর্যন্ত নিজের দেহ মাটিতে পুঁতব কিংবা পাথরের চার দেয়ালের মধ্যে নিঃসঙ্গ বন্দী জীবন যাপন করব; আহার গ্রহণ করব না, জল স্পর্শ করব না, আমি মরব; আর আমার যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে যাব মঠের সন্ন্যাসীদের, যাতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত তারা আমার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে।

কাতেরিনা চিন্তায় পড়ল।

'আমি যদি দরজা খুলেও দিই তোমার বেড়ি ভাঙার সাধ্য আমার হবে না।'

'বেড়ির ভয় আমি করি না,' সে বলল। 'তুই বলছিস ওরা আমার হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বেঁধেছে? না, আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়েছি,

হাতের বদলে বাড়িয়ে দিয়েছি শুকনো কাঠ। এই দ্যাখ, আমাকে, কোন শেকল-টেকল নেই!' ঘরের মাঝখানে এগিয়ে এসে সে বলল। 'আমি এই দেয়ালগুলোকেও ভয় করতাম না, ভেদ করে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু এ দেয়াল যে কী রকম তা তোর স্বামীও জানে না। এ দেয়াল বানিয়েছিলেন এক পুণ্যাত্মা তপস্বী। যে চাবি দিয়ে সেই পুণ্যাত্মা তাঁর আশ্রম কুঠরি বন্ধ করতেন সেটা দিয়ে দরজার তালা না খুলে এখান থেকে কয়েদীকে বার করে আনার সাধ্য কোন অশুভ শক্তির নেই। মহাপাতকী আমিও মুক্তি পাবার পর মাটি খুঁড়ে নিজের জন্য ঠিক এমনই এক আশ্রম কুঠরি বানাব।'

'শোন, আমি তোমাকে বার করে দেব; কিন্তু তুমি যদি আমাকে ঠকাও,' কাতেরিনা দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর অনুশোচনা করার বদলে যদি আবার শয়তানের দোসর হও?'

'না, কাতেরিনা, আমার জীবনের আর বেশি বাকি নেই। প্রাণদন্ড ছাড়াই আমার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। তুই কি মনে করিস আমি অনন্ত নরকযন্ত্রণার হাতে নিজেকে সঁপে দেব?'

তালার ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ হল।

'চললাম! করুণাময় ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন, বেটি আমার!' মায়াবী তাকে চুমো খেয়ে বলল।

'আমাকে ছুঁয়ো না, তুমি মহাপাতকী, শিগ্‌গির এখান থেকে চলে যাও!' কাতেরিনা বলল। মায়াবী অবশ্য ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।

'আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি,' বিহ্বল দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে সে বলল। 'স্বামীর কাছে এখন আমি কী জবাব দেব? আমার উদ্ধারের আশা নেই। আমাকে এখন জ্যান্ত কবরে যেতে হবে!' এই বলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে প্রায় পড়ে গেল কাঠের গুঁড়িটার ওপর, যেখানে কয়েদী এতক্ষণ বসে ছিল। 'কিন্তু আমি একটা আত্মাকে উদ্ধার করলাম,' সে মৃদুস্বরে বলল। 'আমি ঈশ্বরের অভীষ্ট কর্ম সাধন করলাম। কিন্তু আমার স্বামী।... এই প্রথম তাকে আমি ঠকালাম। ওঃ কী ভয়ঙ্কর, কী কঠিনই না লাগবে তার সামনে অসত্য বলতে। ঐ যে কে যেন আসছে! এটা ও! আমার স্বামী!' সে মরিয়া আর্তনাদ করে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'আমি গো, বেটি আমার! ওরে আমার প্রাণের বাছা রে, আমি!' সংবিৎ ফিরে পেতে কাতেরিনা শুনতে পেল, সামনে দেখতে পেল বুড়ি ঝিকে। বুড়ি ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছিল এবং কাতেরিনার মাথার ওপর বিশুষ্ক হাত বাড়িয়ে ঠান্ডা জলের ছিটে দিচ্ছিল।

'আমি কোথায়?' কাতেরিনা উঠে বসে চার দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে বলল। 'আমার সামনে নীপারে গর্জাচ্ছে, আমার পেছনে পাহাড়ের সারি... এ তুই কোথায় এনে ফেললি আমাকে, আইমা?'

'এনে ফেললাম বলিস না, বল সরিয়ে নিয়ে এলাম; আমি তোকে কোলে করে বয়ে নিয়ে এসেছি মাটির তলার গুমোট কুঠুরি থেকে। আমি তালা আটকে রেখে এসেছি, যাতে কর্তা দানিলো তোর ওপর চোটপাট না করতে পারেন।'

'আর চাবি কোথায়?' কাতেরিনা নিজের কোমরবন্ধনীর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল। 'চাবি দেখতে পাচ্ছি না ত।'

'তোর স্বামী খুলে নিয়ে গেছে বাছা, মায়াবীটাকে দেখার জন্যে।'

'দেখার জন্যে?.. আমার আর রক্ষে নেই, আইমা!' কাতেরিনা আর্তস্বরে বলল।

'ঈশ্বর আমাদের দয়া করুন, বেটি! কেবল, চুপ করে থাক বেটি, কেউ কিচ্ছুটি জানতে পারবে না।'

'ওটা পালিয়ে গেছে, ইতর পাষণ্ডটা ভেগেছে! কাতেরিনা, শুনলে তুমি? ওটা পালিয়েছে!' শ্রীযুক্ত দানিলো তার স্ত্রীর উদ্দেশে বলল। তার দুই চোখে আগুন ঝরে পড়ছে; কোমরের পাশে তলোয়ার ঝাঁকুনি খেয়ে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ তুলল।

ভয়ে স্ত্রী আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'ওকে কেউ ছেড়ে দিল নাকি গো?' সে কাঁপতে কাঁপতে উচ্চারণ করল।

'তুমি ঠিকই বলেছ, ছেড়ে দিয়েছে; তবে ছেড়ে দিয়েছে শয়তান। চেয়ে দেখি, তার জায়গায় লোহার বেড়ি দেওয়া আছে একটা কাঠের গুঁড়ি। ভগবান দেখালেন বটে যে কসাকের থাবাকে শয়তান ডরায় না! আমার কসাকদের একজনও যদি অন্তত ঘুণাক্ষরেও এরকম চিন্তার প্রশ্রয় দিত,

আর আমি যদি জানতে পারতাম... তা হলে কী ধরনের প্রাণদণ্ড যে দিতাম জানি না!'

'আর যদি আমি হতেম?' কাতেরিনার মুখ ফসকে আপনাআপনিই বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সে থেমে গেল ভয় পেয়ে।

'তোমার মাথায় যদি খেলত তাহলে তুমি আর আমার স্ত্রী থাকতে না। আমি তাহলে তোমাকে বস্তার ভেতরে পুরে সেলাই করে ডুবিয়ে দিতাম নীপারের ঠিক মাঝখানে।'

কাতেরিনার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তার মনে হল মাথার চুল যেন খাড়া হয়ে উঠেছে।

৮

সীমান্তবর্তী সড়কের এক সরাইখানায় পোলরা জড় হয়েছে, আজ দুদিন হল তাদের ভোজসভা চলছে। ইতরগুলো সংখ্যায় খুব একটা কম নয়। জুটেছে সম্ভবত কোথাও হানা দেবার উদ্দেশ্যে: তাদের সঙ্গে গাদা বন্দুকও আছে; অশ্বতাড়নীর ঠন্‌ঠন্‌, তলোয়ারের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ হচ্ছে। কর্তারা আমোদফূর্তি করছে, বড়াই করছে, নিজেদের অসাধারণ কার্যকলাপের কথা বলছে, সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে, ইউক্রেনীয় জাতিকে নিজেদের গোলাম বলে উল্লেখ করছে, গম্ভীরভাবে গোঁফে তা দিচ্ছে আর গম্ভীর চালে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে বেঞ্চের ওপর গা এলিয়ে দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে ক্যাথলিক পাদরিও আছে। তাদের পাদরিটিও তাদের জুড়িদার বটে, হাবভাবেও আদৌ খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকের মতো নয়: পান করছে, তাদের সঙ্গে মাতামাতি করছে, পাপমুখে কুৎসিত কথাবার্তা বলে চলছে। অনুচরবৃন্দও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না: ছিন্নভিন্ন ঢিলে কামিজের ঢোলা হাতা কাঁধের পেছনে ফেলে মাতব্বরের ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন কাজে ব্যস্ত। তাস খেলছে, একে অন্যের নাকের ওপর তাস ছুঁড়ে মারছে। সঙ্গে যোগাড় করে এনেছে পরের ঘরের বৌদের। চিৎকার-চেঁচামেচি, মারপিট! কর্তারা মেতে উঠেছে, নানা রকম মস্করা করছে: কোন ইহুদীর দাড়ি চেপে ধরে তার অশুদ্ধ কপালে এঁকে দিচ্ছে ক্রুশচিহ্ন; মেয়েদের ওপর ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছে আর তাদের পাপিষ্ঠ পাদরির সঙ্গে মিলে

ক্রোকোভিয়াক নাচ নাচছে। রুশদেশের মাটিতে তাতারদের আমলেও এমন প্রগলভতা দেখা যায় নি। মনে হয় পাপাচারের শাস্তিস্বরূপ এহেন অবমাননা সহ্য করা ঈশ্বর তার কপালে লিখেছেন। ওদের সমবেত হৈ হল্লার মধ্যে শোনা যাচ্ছে নীপারের অপর তীরে শ্রীযুক্ত দানিলোর খামারবাড়ির কথা, তার সুন্দরী স্ত্রীর কথা।... দলটা কোন ভালো মতলবে এসে জোটে নি!

৯

শ্রীযুক্ত দানিলো তার সদর ঘরে টেবিলের পাশে বসে আছে কনুইয়ে ভর দিয়ে, আর ভাবছে। চুল্লির ওপরের শয্যায় বসে আছে শ্রীমতী কাতেরিনা, সে গান গাইছে।

'কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছে গো আমার!' শ্রীযুক্ত দানিলো বলল। 'আমার মাথা ব্যথা করছে, বুকের ভেতরটাও ব্যথা করছে। কেমন যেন ভার ভার লাগছে আমার! মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও মরণ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'ওগো আমার প্রাণনাথ! তোমার মাথাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দাও! এমন অশুভ চিন্তা তুমি মনে ঠাঁই দিচ্ছ কেন?' কাতেরিনা মনে মনে এই কথাগুলি ভাবা সত্ত্বেও মুখে বলতে সাহস করল না। তার অপরাধী মন স্বামীর সোহাগ নিতে বেদনা বোধ করছিল।

'বউ, একটা কথা বলি শোন!' দানিলো বলল, 'আমি যখন এ পৃথিবীতে থাকব না, তখন ছেলেটাকে ত্যাগ কোরো না। ওকে যদি তুমি ত্যাগ কর তাহলে ইহলোকে, এমন কি পরলোকেও ঈশ্বর তোমাকে সুখ দেবেন না। স্যাঁতসেঁতে মাটির নীচে আমার হাড় বড় কষ্ট পেয়ে পচবে; তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাবে আমার আত্মা।'

'এ তুমি কী বলছ গো! তুমিই না আমাদের, অবলা নারীদের উপহাস করতে? আর এখন কিনা নিজেই কথা বলছ অবলা নারীর মতো? তোমাকে আরও অনেক কাল বাঁচতে হবে।'

'না, কাতেরিনা, আমার মন বলছে, মরণ আর দূরে নেই। পৃথিবীতে কেমন যেন বিষণ্ণ বিষণ্ণ লাগছে। কঠিন সময় আসছে। ওঃ, মনে পড়ে,

আমার মনে পড়ে সেই সব বছরের কথা; সেগুলো আর ফিরে আসার নয়! আমাদের বাহিনীর সম্মান আর গৌরব সেই বুড়ো কনাশেভিচ*) তখনও বেঁচে ছিল! আমার চোখের সামনে যেন এখন দেখতে পাচ্ছি, এগিয়ে চলেছে কসাক রেজিমেণ্ট! সে ছিল এক স্বর্ণ অধ্যায়, কাতেরিনা! বৃদ্ধ কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব বসেছেন কালো ঘোড়ার পিঠে। হাতে তাঁর ঝকঝক করছে ধাতুর পাতে মুখ বাঁধানো লাঠি; চতুর্দিকে পদাতিক সৈন্য; দুপাশে নড়ছে নীপার কসাকদের লাল সমুদ্র। কম্যাণ্ডাণ্ট কথা বলতে শুরু করলেন — অমনি সব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের আগেকার কার্যকলাপ আর লড়াইয়ের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বৃদ্ধ কেঁদে ফেললেন। ওঃ তুমি যদি জানতে কাতেরিনা, তখন আমরা তুর্কদের সঙ্গে কেমন লড়াইটা করেছিলাম! আমার মাথায় এখন অবধি দেখতে পাবে কাটা দাগ। চারটে গুলি আমার দেহের চার জায়গা ভেদ করে যায়। একটা জখমও পুরোপুরি সারে নি। সেই সময় আমরা কত সোনাই না লুটেছিলাম। কসাকরা মাথার টুপি বোঝাই করে দামী দামী পাথর তুলে নিয়ে এসেছিল! তুমি যদি জানতে কাতেরিনা, কী রকম সব ঘোড়া আমরা তখন হাতিয়েছিলাম! ওঃ তেমন যুদ্ধ আর আমাকে করতে হচ্ছে না! আমার মনে হয় না আমি বুড়িয়ে গেছি। দেহ আমার চাঙ্গা আছে; কিন্তু কসাক-তরবারি হাত থেকে খসে পড়ছে, জীবন কাটাচ্ছি বিনা কাজে, আর কেন যে বেঁচে আছি নিজেই জানি না। ইউক্রেনে আইনশৃংখলা নেই: কর্ণেল আর ক্যাপ্টেনরা কুকুরের মতো নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করে দিয়েছে। সকলের মাথার ওপর বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তা বলতে কেউ নেই। আমাদের অভিজাত সম্প্রদায় সব কিছু বদলে পোলদের আচার ব্যবহার অবলম্বন করেছে, ধূর্ততার আশ্রয় গ্রহণ করেছে... তারা রোমের পোপের অধীনে ঐক্যধর্ম গ্রহণ করে*) আত্মা বিকিয়ে দিয়েছে। ইহুদী সম্প্রদায় হতভাগ্য জাতির ওপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। আহা কী সময়, কী সময়! অতীত সময়! কোথায় গেল আমার সেই বছরগুলো?.. এই ছোকরা, মাটির তলার কুঠুরিতে যা ত, আমার জন্যে এক হাঁড়ি নিয়ে আয়! পান করব অতীতের সেই সৌভাগ্যের জন্যে আর বিগত সময়ের জন্যে!'

'অতিথিদের কী দিয়ে অভ্যর্থনা জানাব কর্তা? ঘেসো মাঠের দিক থেকে পোলরা আসছে।' কুটিরে প্রবেশ করে জানাল স্তেৎস্কো।

'জানি কী জন্যে ওরা আসছে,' দানিলো জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

'ওহে আমার অনুগত অনুচরেরা, ঘোড়ায় জিন লাগাও! সাজ পরাও! খাপখোলা তলোয়ার হাতে ধর! সীসের গুঁড়ো সঙ্গে নিতে ভুলো না! অতিথিদের যোগ্য অভ্যর্থনা জানানো চাই!'

কিন্তু কসাকরা ঘোড়ায় চেপে বসে তাদের গাদা বন্দুকে গুলি ভরতে না ভরতে পোলরা শরৎকালের গাছ থেকে মাটিতে ঝরে পড়া পাতার মতো পাহাড় ছেয়ে ফেলল।

'হ্যাঁ, এখানে দেখছি এমন লোকজন আছে যাদের ওপর শোধ তোলা যেতে পারে!' স্থূলকায় পোল ভূস্বামীদের সোনার সাজ পরা ঘোড়ায় চেপে দুলতে দুলতে গুরুগম্ভীর চালে সামনে চলতে দেখে দানিলো বলল। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে আরও একবার খাসা আমোদপ্রমোদ করার সৌভাগ্য আমাদের হবে! কসাকের মনপ্রাণ শেষ বারের মতো মেতে উঠুক তামাসায়! ভাইসব, আমোদপ্রমোদ কর, আমাদের উৎসবের দিন এসে গেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় জুড়ে চলল রঙ্গকৌতুক, শুরু হয়ে গেল ভোজসভা: অবলীলাক্রমে চলছে তলোয়ার, উড়ছে গুলি, অশ্বেরা হ্রেষাধ্বনি করছে, পা ঠুকছে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে মাথা খারাপ হওয়ার জো; ধোঁয়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সব মিলেমিশে একাকার। কিন্তু কোথায় শত্রু, কোথায় মিত্র কসাকে ঠিক ধরতে পারে; গুড়ুম করে গুলি ছুটল — ঘোড়া থেকে উলটে পড়ল বীরপুরুষ ঘোড়সওয়ার; সাঁই আওয়াজ তুলল তলোয়ার — জড়িয়ে জড়িয়ে জিভ নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল মাথা।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত দানিলোর কসাক টুপির লাল চুড়োটা চোখে পড়ে; চোখের ওপর ঝলক দিচ্ছে নীলবর্ণ ঢিলে কামিজের ওপর সোনালি কোমরবন্ধনী; ঘূর্ণিপাকের মতো আন্দোলিত হচ্ছে কালো ঘোড়ার কেশর। পাখির মতো সে ঝলক দিচ্ছে কখনও এখানে কখনও ওখানে; হাঁকডাক করে দামাস্কাসী তলোয়ার নাড়িয়ে সে ডাইনে বাঁয়ে কোপ মেরে চলেছে। কোপ মার কসাক! আমোদ কর! তামাসায় মেতে উঠুক বীর হৃদয়; কিন্তু সোনার সাজ আর কামিজের দিকে নজর দিও না! সোনা আর রত্ন পায়ে মাড়াও। তলোয়ারের খোঁচা মার কসাকে। আমোদ কর কসাক! কিন্তু পেছনে ফিরে দেখ: পাষণ্ড পোলরা ইতিমধ্যেই কুটিরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, ভীতসন্ত্রস্ত গোরুভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণির বেগে শ্রীযুক্ত দানিলো ঘুরল পেছন দিকে, তার টুপির লাল

চুড়ো এখন ঝলকাচ্ছে কুটিরগুলোর কাছাকাছি, আর ফাঁকা হয়ে আসছে তার চার পাশের ভিড়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে লড়াই করে চলেছে পোলরা আর কসাকরা। দুই পক্ষই কমে আসছে সংখ্যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত দানিলোর ক্লান্তি নেই: দীর্ঘ বর্শা দিয়ে জিন থেকে ভূপাতিত করে ঘোড়সওয়ারকে, দামাল ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট করে পদাতিককে। আঙ্গিনা সাফ হয়ে এসেছে, পোলরা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করেছে; কসাকরা এখন নিহতদের গা থেকে সোনার কাজ করা কামিজ আর দামী দামী সাজ খুলছে; শ্রীযুক্ত দানিলো এখন পিছু ধাওয়ার আয়োজন করছে, সে নিজের লোকজনকে ডাকার উদ্দেশ্যে দৃষ্টিপাত করল... প্রচণ্ড ক্রোধে টগবগ করে উঠল তার সর্বাঙ্গ: তার চোখের সামনে দেখা দিল কাতেরিনার বাপ। ঐ ত সে পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে গাদা বন্দুক তাক করছে। দানিলো ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সোজা সেই দিকে।... ওহে কসাক, মরতে চলেছ!.. গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল — মায়াবীও মিলিয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। কেবল বিশ্বস্ত অনুচর স্তেৎস্কো দেখতে পেল লাল পোশাকে আর অপূর্ব টুপির ঝলক। কসাক টাল খেয়ে উলটে পড়ল মাটির ওপর। বিশ্বস্ত অনুচর স্তেৎস্কো ছুটে গেল তার কর্তার দিকে — তার কর্তা মাটিতে দেহ ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে আছে, উজ্জ্বল চোখদুটো বন্ধ। বুকের ওপর টগবগ করছে লাল টকটকে রক্তের ধারা। কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচরের আগমন সে সম্ভবত টের পেল। চোখের পাতা আস্তে আস্তে সামান্য খুলল, তার চোখদুটো চকচক করে উঠল: 'বিদায় স্তেৎস্কো! কাতেরিনাকে বলিস ছেলেকে যেন ত্যাগ না করে। আমার বিশ্বাসী অনুচরেরা, তোমরাও তাকে ত্যাগ করো না।' এই বলে সে নীরব হয়ে গেল। অভিজাত দেহপিঞ্জর থেকে কসাকের আত্মা উড়ে গেল, ঠোঁটজোড়া ধারণ করল নীলবর্ণ। কসাক চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

বিশ্বস্ত অনুচর ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাতছানি দিয়ে ডাকল কাতেরিনাকে: 'আসুন ঠাকরুন, আসুন: আপনার কর্তা খানিকটা আমোদ ফুর্তি করেছেন। মাতাল অবস্থায় উনি পড়ে আছেন স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর। অনেকক্ষণ উনি আর প্রকৃতিস্থ হতে পারবেন না।'

কাতেরিনা দুই হাত মেলে ঝাপটা দিয়ে একটা কাটা আঁটির মতো আছড়ে পড়ল মৃতদেহের ওপর। 'আমার স্বামী, তুমিই কি এখানে চোখ বুজে পড়ে আছ? উঠে দাঁড়াও লক্ষ্মী বাজ পাখিটি আমার, তোমার হাতটা

বাড়িয়ে দাও। একটু উঠে দাঁড়াও! অন্তত একবারটি ফিরে চাও তোমার কাতেরিনার পানে, তোমার ঠোঁটদুটো নাড়াও, অন্তত একটা কথাও বল গো!... কিন্তু তুমি যে চুপ করে রইলে, চুপ করে রইলে যে গো! তুমি নীল হয়ে গেছ কৃষ্ণ সাগরের মতো। তোমার হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে না। তুমি এত ঠাণ্ডা কেন গো কর্তা? দেখছি, আমার চোখের জলে তেমন তাপ নেই, তা দিয়ে তোমাকে গরম করে তোলা অসাধ্য! দেখছি আমার কান্না জোরাল নয়, তা দিয়ে তোমাকে জাগান যায় না। তোমার ফৌজকে এখন কে চালাবে? কে তোমার কালো ঘোড়া ছুটিয়ে উঁচু গলায় হুঙ্কার তুলে কসাকদের সামনে তলোয়ার নাড়াবে? কসাকরা, ওগো কসাক ভাইরা! তোমাদের সম্মান আর গৌরবের পাত্র কোথায়? তোমাদের সম্মান আর গৌরবের পাত্র চোখ বুজে পড়ে আছে স্যাঁতসেঁতে মাটির বুকে। আমাকেও সমাধি দাও, সমাধি দাও ওর সঙ্গে! আমার চোখের ওপর ঝুরঝুর করে মাটি ফেলে দাও! আমার সাদা বুকের ওপর চাপিয়ে দাও ম্যাপল কাঠের তৈরি কফিনের তক্তা! আমার সৌন্দর্যে আমার আর কাজ নেই!'

কাতেরিনা কাঁদে আর বিলাপ করে; এদিকে সমস্ত দিগন্তটা ঢেকে পড়ছে ধূলিজালে: সাহায্যের জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে বৃদ্ধ কসাক ক্যাপ্টেন গরোবেৎস।

১০

শান্ত আবহাওয়ার সময় নীপার অপূর্ব, তখন তার টইটম্বুর জলরাশি স্বচ্ছন্দে ও স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে বন ও পাহাড় ভেদ করে ধাবিত হয়। কোন কলকল ধ্বনি নেই, কোন গর্জন নেই। তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় না তার গরিমান্বিত বিস্তার চলছে কি চলছে না, মনে হয় আগাগোড়া কাচে ঢালা, যেন শ্যামল ধরণীর ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে ঢেউ খেলিয়ে চলেছে নীল দর্পণের কোন পথ, যার বিস্তারের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, দৈর্ঘ্যের কোন শেষ নেই। সেই সময় প্রখর সূর্যেরও ভালো লাগে শীর্ষদেশ থেকে কাচস্বচ্ছ শীতল জল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে এবং তার বুকে কিরণমালা নিমজ্জিত করতে, উপকূলবর্তী বনের ভালো লাগে জলরাশির বুকে প্রতিবিম্বিত হতে। কোঁকড়া সবুজ গাছপালা! মেঠো ফুলের সঙ্গে ভিড় করে তারাও চলেছে জলের দিকে,

অবনত হয়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করছে, দেখে দেখে তাদের আর আশ মিটছে না, নিজেদের উজ্জ্বল রূপ দেখতে দেখতে তারা আর মুগ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না, তার উদ্দেশে মৃদু হাসে, ডালপালা নেড়ে তাকে জানায় অভিনন্দন। মাঝ-নীপারে দৃষ্টিপাত করার সাহস কিন্তু তাদের হয় না: সূর্য আর নীল আকাশ ছাড়া আর কেউ তার দিকে তাকাতে পারে না। কদাচিৎ কোন পাখি নীপারের মাঝখান পর্যন্ত উড়ে আসে। নীপার জমকাল। তার সমতুল নদী পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। গ্রীষ্মকালের উষ্ণ রাতেও নীপার অপূর্ব। তখন মানুষ, পশুপাখি — সকলেই নিদ্রিত; কেবল ঈশ্বর একা পরম গরিমাভরে আকাশ ও পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং পরম গরিমাভরে আন্দোলন করেন তার দিব্যজ্যোতি। সেই দিব্যজ্যোতি থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে নক্ষত্র। নক্ষত্ররা জ্বলে, পৃথিবীর মাথার ওপর আলো দেয়, আর সকলে একসঙ্গে নিজেদের জলাঞ্জলি দেয় নীপারে। নীপার তার কালো তলদেশে ধরে রাখে সকলকে। আকাশে নিভে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের একটিরও নিস্তার নেই তার হাত থেকে। ঘুমন্ত কাকের দলে ছাওয়া কালো বন, ভাঙাচোরা প্রাচীন পাহাড়পর্বত ঝুঁকে পড়ে অন্তত তাদের দীর্ঘ ছায়া দিয়ে হলেও নীপারকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে — কিন্তু বৃথাই! নীপারকে আড়াল করতে পারে এমন কিছুই দুনিয়ায় নেই। সে তার নীল, ঘন নীল স্নিগ্ধ জলপ্রবাহ নিয়ে বয়ে চলেছে যেমন মধ্যাহ্নে তেমনি মাঝরাতে; যত দূরে মানুষের চোখের দৃষ্টি যেতে পারে তত দূর পর্যন্ত দেখা যায় তাকে। সোহাগভরে এবং রাতের ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তীরভূমির বেশ কাছ ঘেঁষে যেতে যেতে সে নিজের ওপর ছড়িয়ে দেয় রুপোলি জলধারা; সে জলধারা ঝলকে ওঠে দামাস্কাসী তলোয়ারের ফলার মতো; আর নীপার, নীলবর্ণ নীপার আবার ঢলে পড়ে নিদ্রায়। নীপার তখনও অপূর্ব এবং তার সমতুল আর কোন নদী দুনিয়ায় নেই! আকাশে যখন পর্বতাকার নীল মেঘ দেখা দেয়, যখন কালো বনের শিকড় পর্যন্ত নড়তে থাকে, ওক গাছ মড়মড় করে এবং মেঘ চিরে বিদ্যুৎ মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বচরাচর আলোকিত করে তোলে তখন নীপার ভয়ঙ্কর। পর্বতপ্রমাণ জলরাশি গর্জায়, পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে, ঝলকাতে ঝলকাতে, কাতরাতে কাতরাতে পিছু হটে যায়, ক্রন্দনধ্বনি তোলে, দূরে আঝোর জল ঝরায়। ছেলে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে বিদায় দিতে গিয়ে এমন ভাবেই

বিলাপ করে কসাকের বুড়ি মা। মহা ফুর্তিতে ও খোশমেজাজে কোমরে হাত দিয়ে নওজোয়ানের ভঙ্গিতে কাত করে টুপি মাথায় দিয়ে সে চলেছে কালো ঘোড়ায় চেপে; আর মা তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে তার পেছন পেছন, চেপে ধরছে রেকাব, ধরছে লাগাম, সেগুলির উপর হাত বুলাচ্ছে আর অঝোরে তপ্ত অশ্রু ঝরাচ্ছে।

সংঘর্ষরত তরঙ্গমালার মাঝখানে উদ্‌গত তীরভূমিতে দেখা যাচ্ছে ভয়ংকর কালো কালো পোড়া গুঁড়ি আর পাথরের ঢাঁই। তীর ঘেঁষে চলেছে একটা নৌকো, সেটা একবার ওপরে উঠছে, আরেকবার নীচে নামছে আর তীরের গায়ে আছাড় খাচ্ছে। বুড়ো নীপার যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে তখন কে এই কসাক সাহস করে শালতি চেপে ভ্রমণে বেরিয়েছে? মনে হয় লোকটার জানা নেই যে নীপার মাছি-গেলার মতো মানুষকে গিলে খেতে পারে?

নৌকো তীরে ভিড়ল, সেখান থেকে নেমে এলো মায়াবী। তার মনমেজাজ ভালো নয়; কসাকরা তাদের নিহত প্রভুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যে রকম প্রতিশোধ-মিছিল বার করেছিল তার কথা ভেবে সে বিচলিত। পোলদের কম খেসারত দিতে হয় নি: যাবতীয় সাজসজ্জা আর কামিজসমেত চুয়াল্লিশজন কর্তাব্যক্তি ও তেত্রিশজন গোলাম কচুকাটা হয়ে গেছে; আর বাদবাকিদের ঘোড়াসমেত বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতারদের কাছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে।

পোড়া কাঠের গুঁড়িগুলির মাঝখান দিয়ে পাথরের ধাপ বয়ে সে নীচে নেমে এলো; সেখানে মাটির গভীরে ছিল তার সুরঙ্গ-ঘর। দরজার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ না তুলে সে নিঃশব্দে প্রবেশ করল, চাদরে ঢাকা টেবিলের ওপর হাঁড়ি রেখে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে তার ভিতরে অজানা কী যেন সব ঘাসপাতা ফেলতে লাগল। কোন এক অদ্ভুত কাঠের তৈরি কুঁজো নিয়ে সেটাতে জল ভরল এবং ঠোঁট নাড়িয়ে বিড় বিড় করে উদ্ভট-উদ্ভট মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে জল ঢালতে লাগল। ঘরটায় গোলাপী আলো দেখা দিল; আর তখন তার মুখ দেখতে হল ভয়ংকর। মুখটাকে দেখাচ্ছিল রক্তাক্ত, মুখের ওপর ফুটে উঠছিল গভীর কালো বলিরেখা, আর চোখে যেন জ্বলছে আগুন। মহা পাতকী! দাড়িতে অনেককাল হল পাক ধরেছে, মুখে বলিরেখার খাঁজ, গোটা শরীর শুকিয়ে গেছে, অথচ এখনও ঈশ্বরবিদ্বেষী মতলব হাসিল করে চলেছে। ঘরের মাঝখানে ভেসে বেড়াতে লাগল সাদা মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মতো একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার মুখে।

কিন্তু হঠাৎ কেন সে নড়াচড়ার সাহস হারিয়ে হাঁ করে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেনই বা তার মাথার চুল কর্কশ লোমের মতো খাড়া হয়ে উঠল? তার সামনে মেঘের ভেতরে ফুটে উঠল কার যেন অদ্ভুত মুখ। তার কাছে এসে হাজির হল অনিমন্ত্রিত, অনাহূত এক আগন্তুক; যত সময় যেতে থাকে ততই বেশি করে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে সেই মুখ, স্থির দুই চোখের দৃষ্টি এসে বেঁধে। মুখের আদল, ভ্রূ, চোখ, ঠোঁট — সবই তার অপরিচিত। জীবনে সে কখনও তাকে দেখে নি। সে মুখ তেমন একটা ভীতিপ্রদ হয়ত নয়, অথচ একটা অদম্য আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসল। এদিকে সেই অচেনা আশ্চর্য মাথাটি মেঘ ভেদ করে ঐ একই রকম স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মেঘ ইতিমধ্যে কেটে গেছে; এদিকে অজ্ঞাত চেহারা আরও তীব্র আকার ধারণ করল, তীক্ষ্ন দৃষ্টি তার মুখের ওপর থেকে সরল না। মায়াবীর সর্বাঙ্গ কাগজের মতো ফেকাসে হয়ে গেল। সে বিকৃত স্বরে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠে হাঁড়িটা উলটে দিল। ... সব মিলিয়ে গেল।

১১

'শান্ত হ, আদরের বোনটি আমার!' বৃদ্ধ কসাক-ক্যাপ্টেন গরোবেৎস বললেন। 'স্বপ্ন কদাচিৎ সত্যি কথা বলে।'

'একটু শোও বোন!' বুড়োর তরুণী পুত্রবধূ বলল। 'ওঝা-বুড়িকে ডেকে আনছি; এমন কোন শক্তি নেই যে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। সে তোমার এই ভেতরের অস্থিরতা ঝেড়ে বার করবে।'

'কোন ভয় নেই!' ক্যাপ্টেনের ছেলে তলোয়ার হাতে ধরে বলল, 'তোমাকে কেউ অপমান করতে পারবে না।'

কাতেরিনা বিষণ্ণ, ঘোলাটে চোখে সকলের দিকে তাকাল, সে কোন ভাষা খুঁজে পেল না। 'আমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছি। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' শেষকালে সে বলল:

'আমাকে সে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না! আজ দশ দিন হল আমি কিয়েভে আপনাদের এখানে আছি; কিন্তু আমার শোক বিন্দুমাত্র কমে নি। ভেবেছিলাম অন্তত প্রতিশোধ নেবার জন্যে চুপে চুপে ছেলেকে বড় করে তুলব।... ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর তাকে আমি দেখতে পেলাম স্বপ্নের মধ্যে! ঈশ্বর না করুন, আপনাদের যেন দেখতে না হয়! আমার বুক এখনও ধড়ফড়

করছে। সে গর্জন করে বলল, 'কাতেরিনা, আমি তোর বাচ্চাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব যদি আমাকে বিয়ে না করিস।...'' এই বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে ছুটে গেল দোলার দিকে। শিশু ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে কচি কচি দুই হাত বাড়াল।

এই কথা শুনে ক্যাপ্টেনের ছেলে ক্রোধে টগবগ করতে লাগল, জ্বলে উঠল।

ক্যাপ্টেন গরোবেৎস নিজেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন:

'হতভাগা পাষণ্ডটা একবার এখানে আসার চেষ্টা করে দেখুক; দেখতে পাবে বুড়ো কসাকের হাতে শক্তি আছে কিনা। ঈশ্বর সাক্ষী,' সন্ধানী চোখজোড়া ওপরে তুলে তিনি বললেন, 'দানিলো ভাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার জন্যে কি আমি ছুটে আসি নি? সবই তাঁর পবিত্র ইচ্ছা! যখন পৌঁছুলাম তখন ওকে দেখতে পেলাম শীতলশয্যায়, যে শয্যায় কসাককুলের অনেক অনেক মানুষ শুয়ে আছে। তবে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে প্রতিশোধ-মিছিল কি কম জমকাল হয়েছিল? আমরা কি অন্তত একটা পোলকেও জীবিত ফিরে যেতে দিয়েছি? শান্ত হ' বাছা আমার! তোমাকে অপমান করার সাধ্য কারও হবে না — এমন কি যদি আমি না থাকি, আমার ছেলেও না থাকে।'

বৃদ্ধ কসাক ক্যাপ্টেন তাঁর কথা শেষ করে দোলার দিকে এগিয়ে এলেন, শিশুও তাঁর কোমরবন্ধনীতে রুপোয় বাঁধানো লাল পাইপ আর চকমকি পাথরের থলি ঝুলতে দেখে তাঁর দিকে কচি কচি দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠল।

'বাপকে বেটা হবে,' বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন কোমরবন্ধনী থেকে পাইপ খুলে শিশুকে দিতে দিতে বললেন, 'দোলা থেকে উঠতে না উঠতেই পাইপ ফুঁকতে চায়।'

কাতেরিনা মৃদু নিশ্বাস ফেলে দোলায় দোল দিতে লাগল। সকলে ঠিক করল একসঙ্গে রাতটা কাটাবে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কাতেরিনাও ঘুমিয়ে পড়ল।

আঙ্গিনায় এবং কুটিরেও সব শান্ত; ঘুমোচ্ছিল না কেবল প্রহরারত কসাকেরা। হঠাৎ কাতেরিনার ঘুম ভেঙে গেল, সে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেরও নিদ্রাভঙ্গ হল। 'ওকে খুন করেছে, কেটে ফেলেছে!' আর্তনাদ করে সে ছুটল দোলার দিকে।

সকলে দোলা ঘিরে দাঁড়াল, আর দোলায় মৃত শিশুকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না। এই অশ্রুতপূর্ব খলতার কথা তারা ভাবতেই পারছিল না।

১২

ইউক্রেন প্রদেশ ছাড়িয়ে দূরে, পোল্যাণ্ড পেরিয়ে, জনবহুল লেম্বের্গ নগরও অতিক্রম করে চলেছে উঁচু উঁচু চূড়াওয়ালা পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন পাথরের শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে জমির ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে আছে, পুরু পাথরের বেড়ি দিয়ে তাকে আটকে রেখেছে, যাতে কল্লোলিত ও উদ্দাম সমুদ্র তার ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ভালাখিয়া ও সেদ্‌মিগ্রাদ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শৈলমালা গালিচ ও হাঙ্গেরীয় জাতির রাজ্যসীমার মাঝখানে*) এক বিশাল অশ্বখুরের নালের আকার ধারণ করেছে। আমাদের এ দিকে এ ধরনের পাহাড় নেই। এই পর্বতমালার দিকে চোখ মেলে তাকাতে স্পর্ধা হয় না; কোন কোনটির চূড়ায় মানুষের পাদস্পর্শ পর্যন্ত পড়ে নি। এগুলির দৃশ্যও অপূর্ব: ক্রীড়াচঞ্চল সমুদ্র কি ঝটিকাগ্রস্ত হয়ে প্রশস্ত তটভূমি প্লাবিত করে ঘূর্ণিবায়ুতে বীভৎস তরঙ্গমালাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে, আর সেই তরঙ্গমালা কি পাথর বনে গিয়ে শূন্যদেশে স্থির হয়ে থেকে গেছে? আকাশ থেকে কি ভারী মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে নেমে এসে মাটির বুকে চেপে বসেছে? কেন না তাদের গায়েও সেই একই রকম ধূসর রঙ, আর সূর্যের আলোয় তাদের চূড়া ঝকঝক করে, ফুলকি ঝরায়। কার্পেথীয় পর্বতমালা অবধি শোনা যাবে রুশ ভাষা, পাহাড়ের ওপারেও কোথাও কোথাও মাতৃভাষার কাছাকাছি শব্দ শোনা যাবে; আর তার পরই যে সমস্ত জায়গা সেখানে ধর্ম অন্য, ভাষাও অন্য। সেখানে বাস করে হাঙ্গেরীয় জাতি। জনসংখ্যা তাদের নেহাৎ কম নয়। তারা ঘোড়ায় চড়ে, হানাহানিতে এবং পানে কসাকদের চেয়ে কম যায় না; আর ঘোড়ার সাজ ও দামী কামিজের জন্য পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রা বার করে দিতেও তারা কুণ্ঠিত নয়। পর্বতশ্রেণীর মাঝখানে আছে বিশাল বিশাল, সুবিস্তীর্ণ সরোবর। সেগুলি কাচের মতো স্থির, কাচের মতোই তাদের গায়ে প্রতিফলিত হয় পাহাড়ের উলঙ্গ শীর্ষদেশ আর শ্যামল পাদদেশ।

কিন্তু এই মাঝরাতে নক্ষত্রমালা যখন দীপ্তি দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, তখন কে চলেছে বিশাল কালো ঘোড়ায় চেপে? অমানুষিক আকৃতির কোন্ বীরপুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন পাহাড়ের তলদেশ দিয়ে? দৈত্যাকার অশ্বসমেত কার রূপ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সরোবরের উপর নিস্তরঙ্গ জলে? কার ভয়ংকর ছায়া অবিরাম ছুটে চলেছে পাহাড় পর্বতের উপর দিয়ে? চকচক করছে উৎকীর্ণ চিত্রফলকে শোভিত বর্ম; কাঁধে বর্শা; জিনের গায়ে ঝন্ঝন্ করছে তলোয়ার; শিরস্ত্রাণ কপালের ওপর এসে ঠেকেছে; গোঁফের কালো রেখা দেখা যাচ্ছে; দু চোখ বোজা; চোখের পল্লব নামানো — তিনি নিদ্রিত। আর নিদ্রিত অবস্থাতেই ধরে রেখেছেন লাগাম; তার পেছনে ঐ একই ঘোড়ায় আছে এক বালক-ভৃত্য, সেও নিদ্রিত আর নিদ্রিত অবস্থাতেই বীরপুরুষটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। কে ইনি, কোথায়, কেন চলেছেন? — কে তাঁকে জানে? দিনের পর দিন তিনি পেরিয়ে চলেছেন পাহাড়-পর্বত। দিন ঝলমল করে, সূর্যোদয় হয়, তাঁকে দেখা যায় না; কেবল কদাচিৎ পাহাড়ী লোকেরা লক্ষ করেছে পাহাড়ের ওপর কার যেন দীর্ঘ ছায়া সরে সরে যাচ্ছে, অথচ আকাশ নির্মল, সেখানে মেঘ ভাসছে না। রাতের অন্ধকার নামতে না নামতেই আবার দেখা যায় তাঁকে, তার প্রতিবিম্ব পড়ে সরোবরের বুকে, আর তাঁর পেছন পেছন কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলে তাঁর ছায়া। দেখতে দেখতে তিনি অনেক পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে এসে উঠলেন ক্রিভানে। কার্পেথীয় পর্বতমালার মাঝখানে এর চেয়ে উঁচু পাহাড় আর নেই; রাজাধিরাজের মতো সে আর সকলের চেয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। এখানেই এসে থামল ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার মগ্ন হলেন আরও গভীর নিদ্রায়, আর মেঘরাশি নেমে এসে ঢেকে দিল তাঁকে।

১৩

'স্-স্-স্... আস্তে আইমা! অমন ঠকঠক আওয়াজ করো না, আমার বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ছেলেটা অনেকক্ষণ চেঁচিয়েছে, এবারে ঘুমোচ্ছে আমি বনে যাব, আইমা! আরে আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? তুই দেখতে ভয়ংকর: তোর চোখ থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে সাঁড়াশী... ওঃ কী লম্বা! আর জ্বলছে যেন আগুন! তুই বোধ হয় ডাইনী! ওঃ, তুই যদি ডাইনী হোস তাহলে এখান থেকে দূর হ। তুই

আমার ছেলেকে চুরি করবি। এই ক্যাপ্টেনটা কী নিরেট: সে ভাবছে কিয়েভে থাকতে আমার দিব্যি লাগছে। না, এখানে আমার স্বামী, আমার ছেলেও এখানে, তাহলে বাড়িঘর কে দেখাশোনা করবে? আমি বেরিয়ে পড়েছি এত চুপে চুপে যাতে কুকুরবেড়ালেরও কানে না যায়। আইমা, তুই ডবকা ছুঁড়ি হতে চাস — এটা মোটেই কঠিন নয়: কেবল নাচতে হবে এই রকম করে, এই দ্যাখ, যেমন আমি নাচছি...' এ ধরনের অসংলগ্ন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাতেরিনা উন্মত্ত দৃষ্টিতে চার দিকে তাকাতে তাকাতে কোমরে হাত ঠেকিয়ে ছুট দিল। সে আর্তস্বর তুলে পা ঠুকতে লাগল; কোন মাত্রা ও তালের বালাই না রেখে বেজে চলল তার রুপোর বেড়ি। তার গৌরবর্ণের গ্রীবার উপর লটপট করে দুলতে লাগল এলো কালো চুল। সে পাখির ভঙ্গিতে দু'হাত ঝাপটাতে ঝাপটাতে এবং মাথা নাড়াতে নাড়াতে অবিরাম উড়ে চলল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন অবসন্ন হয়ে হয় পাথরের ওপর আছড়ে পড়বে, নয়ত এই দুনিয়া ছেড়ে উড়ে চলে যাবে।

বুড়ি আইমা বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার গভীর বলিরেখা বয়ে চলল অশ্রুর বন্যা। কর্ত্রীর এই দশা দেখে বিশ্বস্ত অনুচরদের বুকের ওপর যেন ভারী পাথর চেপে বসল। দেখতে দেখতে সে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল, এখন সে গোরালিৎসা নাচ নাচছে, এই ভেবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অলস ভাবে পা ঠুকছে। 'জান ভাই, আমার মালা আছে!' অবশেষে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'তোমাদের কিন্তু নেই! আমার স্বামী কোথায়?' হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠে কোমরবন্ধনী থেকে তুর্কী ছোরা তুলে নিল। 'না! আমার যেমন ছুরি দরকার এটা সে রকম নয়।' এ কথার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ ভরে উঠল জলে, মুখে দেখা দিল কাতর ভাব। 'আমার বাপের হৃৎপিণ্ডটা অনেক দূরে, এতে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। তার হৃৎপিণ্ড লোহা পিটিয়ে তৈরি। সেই লোহাকে নরকের আগুনে তাতিয়ে পিটিয়েছে এক ডাইনী। কী হল, আমার বাপটা আসছে না কেন? সে কি জানে না যে ওটাকে টুকরো টুকরো করার সময় হয়ে এসেছে? মনে হয় তার ইচ্ছে, আমি নিজেই যাই...' কথাটা শেষ না করেই সে অদ্ভুত হেসে উঠল। 'একটা মজার ঘটনা আমার মনে এসেছে; মনে পড়ে গেল স্বামীকে কবর দেবার ঘটনা! ওকে ত জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছিল... কী হাসিটাই যে আমার পেয়ে গিয়েছিল!... শোনো, তোমরা সকলে শোনো!' এবারে কথার বদলে সে শুরু করল গান:

স্লেজগাড়ি ছোটে দুরদার;
গাড়িতে কসাক পড়ে—
গুলিবেঁধা, কাটা লাশ তার,
ডান হাতে বর্শাটা ধরে।
বর্শা বয়ে দরদর ধারে
রক্তনদী ভাসে জবজবে।
ডুমুরের গাছ নদীপাড়ে,
গাছে কাক ডাকে কা-কা রবে।
কসাকের মা'টা কাঁদে বড়।
কেঁদো না গো, কেন শোক কর?
ব্যাটা তোর করে এলো বিয়ে,
সুন্দরী কনে সাথে নিয়ে।
ধু ধু মাঠে পাতাল-কুঠুরি,
তাতে নেই দরজা-জানালা।
সাঙ্গ হল এইখানে পালা।
মাছের নাচে চিংড়ি হল জুড়ি…
ভালো না বাসিস যদি আমাকে তাহলে তোর মার
নির্ঘাত হবে সন্নিপাত

এই ভাবে তার কাছে সব গান মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার। আজ বেশ কয়েক দিন হল সে তার নিজের কুটিরে বাস করছে, কিয়েভের কথা শুনতেই চায় না, উপাসনা করে না, লোকজন দেখলে ছুটে পালিয়ে যায়, আর সকাল থেকে ভর সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার ওকবনে। খোঁচা খোঁচা ডালপালা তার গৌরবর্ণের মুখে ও কাঁধে আঁচড় বসিয়ে দেয়; বাতাসে মুক্তবেণী এলোমেলো ওড়ে; তার পায়ের নীচে বহুকালের পুরনো পাতার রাশি মর্মরধ্বনি তোলে — কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। গোধূলির আলো নিভে আসে, আকাশে নক্ষত্রের উদয় তখনও হয় নি, চাঁদের আলোও দেখা দেয় নি, বনের ভেতরে হাঁটতে তখন গা ছমছম করে: খ্রীষ্টধর্মের জাতকর্মানুষ্ঠান হওয়ার আগেই যে সব বাচ্চা মরেছে, তাদের ভূতেরা আঁচড়াআঁচড়ি করে গাছ বয়ে ওঠে, সরু সরু ডালপালা আঁকড়ে ধরে, ফুঁপিয়ে কাঁদে, হো হো করে হাসে, রাস্তার ওপর এবং বিছুটির বিশাল জঙ্গলে কুণ্ডলী পাকিয়ে গড়াগড়ি যায়; নীপারের তরঙ্গমালা ভেদ করে ছুটে আসে সলিলসমাধিপ্রাপ্ত কুমারীর দল; তাদের সবুজ মাথা থেকে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে চুলের রাশি, জলরাশি কলকল শব্দে তাদের দীর্ঘ চুল

বয়ে ঝরছে মাটিতে, আর জল ভেদ করে যেন কাচের কামিজ ভেদ করে দীপ্তি দিচ্ছে কোন কুমারী; মুখে তার খেলে যাচ্ছে অপূর্ব হাসি, আরক্তিম হয়ে উঠছে তার দুই গাল, চোখজোড়া মনোলোভা... মনে হয় এই বুঝি সে প্রেমের দীপ্তিতে জ্বলে উঠবে, এই বুঝি চুমোয় চুমোয় ছেয়ে দেবে... পালাও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত মানুষ! তার ঠোঁট — জমাট বরফ, শয্যা — হিমশীতল জল; সে তোমাকে সুড়সুড়ি দিতে দিতে নদীর ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে। কাতেরিনা কারও দিকে তাকায় না, উন্মাদিনী কাউকে ভয় পায় না, ভর সন্ধ্যায় সে তার ছুরি হাতে ছুটে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায় বাপকে।

অতি প্রত্যূষে এক সুঠাম গড়নের আগন্তুক এসে হাজির। পরনে তার লাল কামিজ। কর্তা দানিলোর খবর সে জিজ্ঞেস করল। সব শোনার পর আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছল আর কাঁধ ঝাঁকাল। সে বলল যে পরলোকগত বুরুলবাশের সঙ্গে একত্রে সে লড়াই করেছে; একসঙ্গে তারা লড়াই করেছে ক্রিমীয় ও তুর্কদের বিরুদ্ধে; কখনও কি স্বপ্নেও ভেবেছে যে দানিলো মহাশয়ের এই পরিণতি হবে? আগন্তুক আরও অনেক ঘটনার বিবরণ দিল, কাতেরিনা ঠাকরুনকে দেখতে চাইল।

আগন্তুক যে-সমস্ত কথা বলেছিল কাতেরিনা গোড়ায় তার কিছুই শোনে নি; শেষকালে তার যেন বুদ্ধিবিবেচনা ফিরে এলো — মনোযোগ দিয়ে লোকটার কথা সে শুনতে লাগল। আগন্তুক বলল দানিলোর সঙ্গে সে বাস করত যেমন ভাই থাকে ভাইয়ের সঙ্গে; বলল, একবার ক্রিমীয়দের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাটির ঢিবির নীচে তাদের গা ঢাকা দিতে হয়!... কাতেরিনা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সমস্ত কথা শুনতে লাগল।

'সেরে উঠবে!' অনুচররা তাকে দেখে মনে মনে ভাবল। 'এই আগন্তুকটি ওকে সারিয়ে তুলবে। ও এখন বিচক্ষণ মানুষের মতোই শুনছে!'

ইত্যবসরে আগন্তুক বলতে শুরু করল যে একবার দিলখোলা কথাবার্তার সময় দানিলো মহাশয় তাকে বলেছিল: 'দেখ ভাই কোপ্রিয়ান, ঈশ্বরের তেমন মতি হলে আমাকে যদি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়, তাহলে আমার বউকে নিয়ে তোমার ঘরে তুলো, সে তোমার বউ হোক...'

কাতেরিনা ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করল। 'আরে!' সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ যে সে-ই! বাপ্!' বলেই সে ছুরি হাতে তার দিকে ধেয়ে গেল।

লোকটা তার হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করল। অবশেষে ছিনিয়ে নিয়ে হাত উঁচাল — এবং করে বসল একটা ভয়ঙ্কর কাজ: বাপ হত্যা করল তার উন্মাদিনী কন্যাকে।

কসাকরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, তারা তাকে ধাওয়া করতে গেল; কিন্তু মায়াবী এই ফাঁকে ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে চেপে বসে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

১৪

কিয়েভের বাইরে এক অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল। কসাক-প্রভু ও কম্যান্ডাণ্টরা সকলে এসে জুটল, অবাক হয়ে দেখতে লাগল এই অলৌকিক কাণ্ড: অকস্মাৎ বহুদূর পর্যন্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। দূরে দেখা দিল লিমানের নীল রেখা, লিমানের ওপারে কৃষ্ণসাগরের জলরাশির প্লাবন। অভিজ্ঞ লোকেরা সমুদ্রের বুক থেকে ঊর্ধগামী পাহাড় দেখে চিনতে পারল ক্রিমিয়াকে, তারা চিনতে পারল জলাভূমি সিভাশ। বাঁ হাতে দেখা যাচ্ছিল গালিচভূমি।

'আর ওটা কী?' দূরে আকাশের গায়ে অনেকটা মেঘেরই মতো ধূসর ও সাদা চূড়ার আভাস দেখতে পেয়ে সেই দিকে নির্দেশ করে সমবেত লোকজন বয়োবৃদ্ধদের জিজ্ঞেস করল।

'ওটা হল কার্পেথীয় পাহাড়।' বয়োবৃদ্ধরা বলল, 'ঐ পাহাড়গুলোর মাঝখানে এমন সব পাহাড় আছে যাদের গা থেকে যুগযুগান্তর ধরে তুষার সরে না, আর মেঘ সেখানে আটকে থাকে, রাত্রিবাস করে।'

এমন সময় দেখা দিল আরেক নতুন আশ্চর্য: সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের গা থেকে মেঘ উড়ে গেল, আর তার চূড়ায় দেখা গেল আগাগোড়া বীরপুরুষের সাজসজ্জায় সজ্জিত এক ঘোড়সওয়ারকে; ঘোড়সওয়ারের চোখ বোজা, আর তাকে এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

এই সময় আতঙ্কিত, বিস্মিত লোকজনের মাঝখানে একজন লোক লাফিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল এবং কেউ পিছু ধাওয়া করছে কিনা, দু'-চোখে যেন তার সন্ধান করতে করতে বন্য দৃষ্টিতে এপাশে ওপাশে তাকাতে তাকাতে দ্রুত, সর্বশক্তিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। লোকটা ছিল সেই মায়াবী।

কেন সে অমন ভয় পেয়ে গেল? আশ্চর্য বীরপুরুষকে ভালো করে দেখার পর সে আঁতকে উঠল, যখন চিনতে পারল, একদিন মন্ত্র পড়তে গিয়ে যে অনাহূত মুখ তার সামনে দেখা দিয়েছিল তা এই বীরপুরুষেরই মুখ। সে নিজেও ধারণা করতে পারছিল না কেন এই দৃশ্য দেখে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটল যতক্ষণ না সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, উঁকি মারল নক্ষত্রের দল। এবারে সে বাড়ির দিকে ফিরল, হয়ত তার উদ্দেশ্য ছিল অশুভ শক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া এই আশ্চর্য ঘটনার অর্থ। পথের মাঝখানে পড়ল একটা শাখানদী, সে ঠিক করল ঘোড়ার পিঠে চেপেই সংকীর্ণ নদীটা লাফিয়ে পার হবে, এমন সময় ঘোড়াটা পুরো কদমে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ ফেরাল আর — আশ্চর্য কান্ড, হেসে উঠল! অন্ধকারের মধ্যে তার ভয়ংকর ঝকঝকে দু পাটি সাদা দাঁত বেরিয়ে এলো। মায়াবীর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। সে নিদারুণ আর্তনাদ করে উঠল, ক্ষোভে, উন্মাদনায় কেঁদে ফেলল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সোজা কিয়েভের দিকে। তার মনে হচ্ছিল যেন চার দিক থেকে সকলে ছুটে আসছে তাকে ধরতে: অন্ধকার বনের গাছপালাও যেন জীবন্ত হয়ে কালো দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে, দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করছে তাকে শ্বাসরোধ করে মারার উদ্দেশ্যে; তারাদল যেন তার আগে আগে ছুটছে, যেন পাপীটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে সকলের কাছে; পথ নিজেও যেন তার পিছু ধাওয়া করে চলেছে। মায়াবী মরিয়া হয়ে ছুটে চলল কিয়েভে, তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে।

১৫

গুহার ভেতরে, প্রদীপের সামনে একাকী বসে ছিলেন তপস্বী, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ পবিত্র গ্রন্থের উপর। আজ বহু বছর হল তিনি নিজের এই গুহার ভেতরে আবদ্ধ হয়ে আছেন। নিজের জন্য তৈরি করেছেন তক্তার একটা কফিন, শয্যার বদলে তিনি শয়ন করেন তার ভেতরে। বৃদ্ধ তপস্বী তার গ্রন্থ বন্ধ করে রেখে প্রার্থনা শুরু করলেন। ...এমন সময় ছুটে ভেতরে এসে প্রবেশ করল এক অদ্ভুত চেহারার, বিকটদর্শন লোক। পুণ্যাত্মা তপস্বী

এমন একজন লোককে দেখে এই প্রথম আশ্চর্য হয়ে গিয়ে সরে দাঁড়ালেন। লোকটার সর্বাঙ্গ শুকনো পাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল। তার চোখজোড়া বীভৎস রকম তেরছে গেছে, ভীতসন্ত্রস্ত চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে ভয়ঙ্কর আগুন; তার বিকৃত মুখ দেখে বুক কেঁপে ওঠে।

'ফাদার, প্রার্থনা কর! প্রার্থনা কর।' সে মরিয়া হয়ে চিৎকার করে বলল, 'প্রার্থনা কর পাতকীর আত্মার জন্য!' এই বলে সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

পুণ্যাত্মা তপস্বী ক্রুশচিহ্ন এঁকে পুঁথি বার করলেন, পৃষ্ঠা খুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে পিছু হটে গেলেন। পুঁথি তার হাত থেকে পড়ে গেল।

'না, তুই মহা পাতকী। তোর ক্ষমা নেই! এখান থেকে পালা! তোর জন্যে প্রার্থনা করতে পারব না!'

'পারবে না?' উন্মাদের মতো চিৎকার করে বলল পাপিষ্ঠ।

'চেয়ে দ্যাখ: পুঁথির পবিত্র অক্ষরগুলো রক্তে ভরে উঠেছে। এমন আর একটিও পাপী দুনিয়ায় কখনও দেখা যায় নি!'

'তুমি আমাকে উপহাস করছ ফাদার!'

'চলে যা, মহাপাতকী তুই। আমি তোকে উপহাস করছি না। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। তোর সঙ্গে একসাথে থাকা, কোন মানুষের পক্ষে ভালো নয়!'

'না, না! তুমি আমাকে উপহাস করছ, ও কথা বোলো না... আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ঠোঁট কেমন ফাঁক হয়ে এলো: ঐ ত তোমার বুড়ো দাঁতের সাদা পাটি বেরিয়ে পড়েছে!..'

এই বলে সে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, খুন করল পুণ্যাত্মা তপস্বীকে।

কিসের যেন একটা ভারী কাতরানি শোনা গেল, মাঠ আর বনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলল সেই কাতরানি। বনের অন্তরাল থেকে ঊর্ধ্বে উঠল দীর্ঘ নখরযুক্ত শীর্ণ, বিশুষ্ক হাত; কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল।

এখন আর আতঙ্ক বা কোন কিছুই সে অনুভব করতে পারল না। তার মনে হচ্ছিল সব কেমন যেন ঘোলাটে। কান ভোঁ ভোঁ করছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, নেশা করলে যেমন হয়; আর চোখের সামনে যা যা আছে সে সবই যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মাকড়সার জালে। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে

উঠে সে সোজা চলল কানেভের*) দিকে, ভাবল সেখান থেকে চেরকাসির ভেতর দিয়ে সোজা পথ ধরবে ক্রিমিয়ার দিকে, তাতারদের উদ্দেশ্যে — কেন তা সে নিজেই জানে না। একদিন গেল, দু'দিন গেল, সে চলছে ত চলছেই, অথচ কানেভের দেখা নেই। পথ ত এটাই; অনেক আগেই তার দেখা পাবার কথা, কিন্তু কানেভের দেখা নেই। দূরে ঝকঝক করে উঠল গির্জার মাথা। কিন্তু এ ত কানেভ নয়, এ যে শুম্‌স্ক। মায়াবী এই ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে গেল যে সে চলে এসেছে সম্পূর্ণ অন্য দিকে। ঘোড়া দাবড়ে ছুটল পেছনে, কিয়েভের দিকে; এক দিন বাদে দেখা গেল শহর; কিন্তু কিয়েভ নয়, গালিচ — কিয়েভ ছাড়িয়ে, শুম্‌স্কের থেকেও দূরের শহর, হাঙ্গেরীয়দের দেশ থেকে খুব একটা দূরে নয়। কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে সে আবার ঘোড়ার মুখ পেছন দিকে ফেরাল, কিন্তু অনুভব করল যে আবার চলেছে উল্‌টো দিকে, কেবলই সামনের দিকে। পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে বলতে পারে মায়াবীর মনে কী আছে: আর কেউ যদি উঁকি মেরে দেখতে পারত সেখানে কী ঘটছে তাহলে সে হয়ত রাতের পর রাত ভালোমতে নিদ্রা যেতে পারত না, একবারও হাসতে পারত না। তার মনে যা ছিল সেটা বিদ্বেষ নয়, আতঙ্ক নয়, নিদারুণ আক্ষেপ নয়। পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই যা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। তার ভেতরটা জ্বালা করছিল, পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল, তার ইচ্ছে হচ্ছিল গোটা জগৎটাকে তার ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে ফেলে, কিয়েভ থেকে গালিচ পর্যন্ত লোকজন সমেত, সবসুদ্ধ সমস্ত ভূমি তুলে নিয়ে তাকে কৃষ্ণসাগরের জলে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু এটা তার করার ইচ্ছে হচ্ছিল বিদ্বেষবশত নয়; না, সে নিজেই জানত না, কেন। যখন সে অদূরে, সম্মুখে দেখতে পেল কার্পেথীয় পর্বত-মালা আর ধূসর মেঘের টোপর দিয়ে চাঁদি-ঢাকা ক্রিভানের উঁচু চূড়া, তখন তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। এদিকে ঘোড়া ছুটছে ত ছুটছেই, ছুটতে ছুটতে চলেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। এমন সময় মেঘ কেটে গেল, আর তার সামনে ভয়ঙ্কর মহিমান্বিত রূপ নিয়ে দেখা দিল ঘোড়সওয়ার।... মায়াবী চেষ্টা করল থামতে, সে সজোরে লাগাম টেনে ধরল; ঘোড়াটা কেশর খাড়া করে বন্য হ্রেষাধ্বনি করে উঠল, ছুটে চলল সেই বীরপুরুষের দিকে। এই সময় মায়াবীর মনে হল তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে, আর নিশ্চল ঘোড়সওয়ার যেন নড়েচড়ে উঠে হঠাৎ তার চোখ খুলল; তার দিকে মায়াবীকে ধেয়ে আসতে দেখে হেসে উঠল। বজ্রপাতের মতো পাহাড়পর্বতের

ওপর ছড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর হাসি, প্রতিধ্বনিত হল মায়াবীর বুকের ভেতরে, কাঁপিয়ে দিল তার সমস্ত অন্তরাত্মা। তার মনে হল শক্তিমান কে যেন তার মধ্যে প্রবেশ করেছে, তার অন্তরাত্মার ভেতরে বিচরণ করছে এবং হাতুড়ির ঘা মারছে তার হৃৎপিন্ডে, শিরায়-উপশিরায়।... এমনই ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সেই হাসি তার ভেতরে।

ঘোড়সওয়ার ভয়ঙ্কর হাত বাড়িয়ে মায়াবীকে আঁকড়ে ধরল, তাকে শূন্যে তুলল। পলকের মধ্যে প্রাণত্যাগ করল মায়াবী, চোখ সে খুলল মৃত্যুর পর। কিন্তু এখন সে মৃতদেহ, তার দৃষ্টি মরা মানুষের দৃষ্টি। না জীবিত, না মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত মানুষ — কেউই তাকায় না এমন ভয়ংকর দৃষ্টিতে। সে তার মৃত চোখ ঘুরালো, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কিয়েভ থেকে, গালিচভূমি থেকে, কার্পেথীয় থেকে হুবহু তারই মত দেখতে প্রেতাত্মারা দল বেঁধে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

একে অন্যের চেয়ে মাথায় উঁচু, একে অন্যের চেয়ে অস্থিসার, বিবর্ণ, অতি বিবর্ণ — তারা ঘোড়সওয়ারকে ঘিরে দাঁড়াল। ঘোড়সওয়ার হাতে ধরে রেখেছেন ভয়ঙ্কর শিকার। বীরপুরুষ আরও একবার হেসে শিকারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন গভীর খাতের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মারা সকলে মিলে লাফিয়ে পড়ল খাতের ভেতরে, তারা লাশটাকে ধরে ফেলে তার গায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। আরও একটি — সকলের চেয়ে লম্বা, সকলের চেয়ে ভয়ংকর, মাটির ভেতর থেকে ওঠার চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না, মাটির ভেতরে সে এমন শক্ত হয়ে গেঁথে গেছে যে ওঠার সাধ্য তার হল না। আর সে যদি উঠত তা হলে কার্পেথীয়, সেদ্‌মিগ্রাদ এমন কি তুরস্ক ভূমিও*) উলটে যেত; মাত্র একটুখানি নড়েচড়ে উঠেছিল, তাতেই দুনিয়াসুদ্ধ কম্পমান। সর্বত্র উলটে পড়ে বহু ঘরবাড়ি, চাপা পড়ে বহু মানুষ।

কার্পেথীয় পর্বতে প্রায়ই শোনা যায় শন্ শন্ আওয়াজ, যেন হাজার হাজার পেষাই কলের চাকা জলে ঘুরছে। এ হল সেই খাতে নিরুপায় প্রেতাত্মাদের মড়া কামড়ানোর কড়মড়। কোন মানুষ এই খাত চোখে দেখে নি, এর পাশ দিয়ে যেতে লোকে ভয় পায়। গোটা পৃথিবী জুড়ে, অনেক সময়ই দেখা যায় কোন ভূমির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কাঁপে: এটা কী কারণে ঘটে, শিক্ষিত লোকজন তার ব্যাখ্যা করেন, তারা বলেন সমুদ্রের কাছাকাছি কোথাও পাহাড় আছে, যার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অগ্নিশিখা এবং বয়ে চলে জ্বলন্ত নদীস্রোত। কিন্তু হাঙ্গেরিতে এবং

গালিচভূমিতে যে সমস্ত বয়োবৃদ্ধ লোক আছেন তাঁরা ব্যাপারটা আরও ভালো জানেন, তাঁরা বলেন যে আসলে মাটিতে শিকড়-গেড়ে-বসা প্রকাণ্ড, অতি প্রকাণ্ড এক প্রেতাত্মা ওঠার জন্য মাথা চাড়া দেয়, আর তারই ফলে পৃথিবী কাঁপে।

১৬

গ্লুখোভ শহরে লোকজন জমায়েত হয়েছে বৃদ্ধ বান্দুরাবাদকের কাছে। এক ঘণ্টা হয়ে গেল তারা শুনছে অন্ধ বাদকের বান্দুরা বাজনা। আজ পর্যন্ত কোন বান্দুরাবাদক এমন আশ্চর্য আশ্চর্য গান গায় নি, এত চমৎকার গাইতেও পারে নি। প্রথমে সে শুরু করল আগেকার দিনের কম্যাণ্ডাণ্টের আমল সম্পর্কে, সাগাইদাচ্নি ও খ্মেল্নিৎস্কির কথা।*) তখন ছিল আরেক সময়: কসাকসম্প্রদায়ের গৌরবের কাল, কসাকেরা ঘোড়ার পায়ের তলায় শত্রুদের পিষ্ট করত, তাদের উপহাস করার স্পর্ধা কারও হত না। বৃদ্ধ আমুদে গানও গাইল এবং গাইতে গাইতে চোখজোড়া লোকজনের ওপর এমন ভাবে নাচাল যে মনে হয় তাতে যেন দৃষ্টিশক্তি আছে; আর হাড়ের মিরজাব লাগানো আঙুল তারের গায়ে উড়তে লাগল মাছির মতো, মনে হচ্ছিল যেন তারগুলি আপনাআপনিই বেজে চলেছে। চারপাশে লোকজন, প্রাচীনেরা মাথা নীচু করে আছে, নবীনেরা বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে আছে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলার মতো সাহস পর্যন্ত তাদের হচ্ছিল না।

'দাঁড়াও,' বৃদ্ধ বলল, 'আমি তোমাদের গেয়ে শোনাব বহুকাল আগের একটা কাহিনী।'

লোকে আরও ঘন হয়ে সরে এলো, অন্ধ তখন গাইতে শুরু করল:

'মহামহিম স্তেপান তখন সেদ্মিগ্রাদের প্রিন্স।*) সেদ্মিগ্রাদের প্রিন্স আবার পোলদেরও রাজা ছিলেন। তাঁরই আমলে বাস করত দুই কসাক: ইভান আর পেত্রো। তারা দুটিতে বাস করত যেন ভাইয়ে ভাইয়ে। 'দ্যাখ ইভান, যে যা পাবে সব আধাআধি ভাগ হবে: আমাদের একজনের আনন্দে আরেকজন আনন্দ পাবে, একজন কেউ দুঃখ পেলে দুজনেই দুঃখ পাবে; একজন কোন শিকার পেলে তার আধাআধি ভাগ হবে; আমাদের কেউ যদি কোন কারণে বন্দী হয় তা হলে তার খালাসের টাকার জন্য অন্য জন সর্বস্ব বিক্রি করবে, তাতেও না হলে নিজেই বন্দীত্ব বরণ করবে।' আর

সত্যিই তাই, কসাক দু'জন যা কিছু পেত সবই আধাআধি ভাগ করে নিত; অন্যের গোরুভেড়ার পাল বা ঘোড়া ভাগিয়ে নিয়ে এলেও আধাআধি ভাগ করে নিত।

* * *

রাজা স্তেপান তুর্কদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিন সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ করে চলেছেন তুর্কদের সঙ্গে, কিন্তু কিছুতেই তাদের তাড়াতে পারছেন না। এদিকে তুর্কদের ছিল একজন পাশা, সে এমনই যে দশজন বাছাই সৈন্যের দল নিয়ে একা পুরো একটা রেজিমেন্টকে ধ্বংস করতে পারে। রাজা স্তেপান ঘোষণা করলেন কোন সাহসী লোক যদি ঐ পাশাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় তাঁর কাছে ধরে আনতে পারে তাহলে তাকে, একজনকেই এমন পারিশ্রমিক দেবেন যা দেওয়া হয় পুরো একটা বাহিনীকে। 'চল ভাই, পাশাকে ধরে আনতে যাই!' ভাই ইভান বলল পেত্রোকে। দুই কসাক গেল দু দিকে।

* * *

পেত্রো ধরতে পারত কি পারত না অন্য কথা, কিন্তু ইভান ততক্ষণে গলায় ফাঁস পরিয়ে পাশাকে টেনে নিয়ে এসেছে খোদ রাজার কাছে। 'বাহবা, এই ত চাই!' এই বলে রাজা স্তেপান হুকুম দিলেন যে পুরো বাহিনী একা যতটা পারিশ্রমিক পায় তাকে একজনকেই যেন ততটা দেওয়া হয়; তিনি আরও হুকুম দিলেন তার ইচ্ছেমতো জায়গায় যেন তাকে জমি দেওয়া হয় আর দেওয়া হয় পশুপাল — সংখ্যায় যতটা সে চায়। রাজার কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়ে সেই দিনই ইভান সব কিছু তার আর পেত্রোর মধ্যে সমান দু ভাগে ভাগাভাগি করে নিল। পেত্রো রাজার দেওয়া পারিশ্রমিকের অর্ধেক নিল, কিন্তু ইভান যে রাজার কাছ থেকে অমন সম্মান পেল এটা তার সহ্য হল না, তাই মনের গভীরে প্রতিহিংসার ফন্দি আঁটল।

* * *

দুই বীরপুরুষ চলছিল কার্পেথীয় পর্বতমালা ছাড়িয়ে রাজার কাছ থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া জমির অধিকার নেবার উদ্দেশ্যে। কসাক ইভান

ঘোড়ার পিঠে নিজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলছিল তার ছেলেকে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো — ওরা চলছে ত চলছেই। বাচ্চা ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল, ইভান নিজেও ঝিমোতে লাগল। নিদ যেও না হে কসাক, পাহাড়ের পথ বিপজ্জনক!.. কিন্তু কসাকের ঘোড়া এমন যে নিজেই সব জায়গায় পথঘাট চেনে, ঠোকর খাবে না, হোঁচট খাবে না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে আছে গভীর খাদ, তলা চোখে পড়ে না; মাটি থেকে আকাশ যতখানি, সেই খাদের তলাও ততখানি। খাদটার ওপর দিয়ে, ঠিক তার গা ঘেঁষে গেছে পথ — দু'জন লোক পাশাপাশি পেরোলেও পেরোতে পারে, কিন্তু তিনজনে কোনমতেই নয়। ঝিমন্ত কসাককে নিয়ে ঘোড়া সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে লাগল। পাশে পাশে চলছিল পেত্রো, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, আনন্দে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে পাতানো ভাইটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল খাদের ভেতরে। কসাক আর তার শিশুপুত্র সমেত ঘোড়াটা পড়ল গিয়ে খাদের মধ্যে।

* * *

কসাক কিন্তু পড়তে পড়তে একটা গাছের ডাল ধরে ফেলেছিল, তাই কেবল ঘোড়াটাই গিয়ে পড়ল খাদের তলায়। সে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসতে লাগল; প্রায় উঠে এসেছে, চোখ তুলে দেখতে পেল পেত্রো বর্শা উঁচিয়ে রেখেছে তাকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলে দেবার উদ্দেশ্যে। 'হা ভগবান, এই কী তোমার বিচার? আপন ভাই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবার উদ্দেশ্যে বর্শা উঁচিয়ে ধরেছে — এ দৃশ্য দেখার চেয়ে চোখ তুলে না তাকালেই ভালো হত!... ভাই রে! আমাকে বর্শার খোঁচা মার, আমার কপালে যদি তা-ই লেখা থাকে, কিন্তু ছেলেটিকে নে! নিরপরাধ শিশু কী এমন দোষ করেছে যে তাকে এরকম ভয়ানক ভাবে মারা যেতে হবে?' পেত্রো হেসে উঠল, সে তাকে বর্শা দিয়ে ধাক্কা মারল, কসাক সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্র সমেত পড়ে গেল খাদের তলায়। পেত্রো সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে বাস করতে লাগল পাশার মতো। পেত্রোর মতো অত ঘোড়ার পাল আর কারও ছিল না। অত ভেড়ার পালও আর কোথাও ছিল না। শেষকালে পেত্রো মারা গেল।

* * *

পেত্রো মারা যাবার পর ঈশ্বর পেত্রো ও ইভান দু'ভাইয়েরই আত্মাকে তলব করলেন বিচারের জন্য। 'এই লোকটা মহা পাপিষ্ঠ।' ঈশ্বর বললেন। 'ইভান! আমি সহজে এর দণ্ডবিধান করতে পারব না; তুমি নিজেই এর দণ্ড ভেবে বার কর!' ইভান অনেকক্ষণ ভাবল কী দণ্ড দেওয়া যায়, শেষ কালে বলল: 'এই লোকটা আমাকে চরম অপমান করেছে: ভাইয়ের প্রতি বেইমানি করেছে জুডাসের মতো, আর পৃথিবীতে আমার ন্যায়সঙ্গত বংশরক্ষা থেকে, আমার বংশধারা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আর ন্যায়সঙ্গত বংশহীন, বংশধারাবিহীন মানুষ হল জমিতে অবহেলাভরে ফেলে দেওয়া এবং অযথা নষ্ট হওয়া শস্যবীজের মতো। অঙ্কুর নেই — কেউ জানতেও পেল না যে বীজ ফেলা হয়েছিল।

* * *

ভগবান, এমন কর যাতে ওর বংশের কেউ পৃথিবীতে সুখ না পায়! যাতে ওর কুলের শেষ লোকটি হয় এমন দুর্বৃত্ত, যেমনটি পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নি! আর তার প্রতিটি দুষ্কর্মের জন্যে যেন তার পিতৃপিতামহ কবরেও শান্তি না পায় এবং যে-যন্ত্রণা জগতে কারও জানা নেই এমন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়ায়! আর জুডাস পেত্রোর যেন ওঠার সাধ্য না থাকে এবং তার ফলে সে যেন ভোগ করে আরও তীব্র যন্ত্রণা; সে যেন উন্মাদের মতো মাটি খায় এবং মাটির নীচেই ছটফট করতে থাকে!

* * *

আর ঐ লোকটির দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের যখন সময় আসবে, তখন হে ভগবান, আমাকে ঐ খাদ থেকে ঘোড়ায় করে তুলে নিয়ে যেও সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপরে। ও তখন আমার কাছে আসবে, আর আমি ওকে ঐ পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব অতলস্পর্শী খাদের ভেতরে,

সেই মুহূর্তে সব প্রেতাত্মারা তার পিতৃপিতামহরা, জীবিতকালে যার যেখানেই বাস হোক না কেন, সকলেই যেন পৃথিবীর নানা দিক থেকে তার দিকে ধেয়ে আসে, সে যে যন্ত্রণা তাদের দিয়েছে তার জন্য তাকে কামড়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা যেন তাকে অনন্তকাল চিবোয়, আমি আনন্দ করি তার যন্ত্রণা দেখে। আর ঐ জুডাস পেত্রোটা যেন মাটি থেকে উঠতে না পারে, সে নিজেও যেন নিজেকে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য ছটফট করে, চিবোয়ও যেন, কিন্তু যত চিবোয় ততই বেশি করে যেন তার হাড় বাড়তে থাকে, যাতে তার যন্তণা যেন হয় আরও তীব্র। সেই যন্ত্রণা হবে তার কাছে অতি ভয়ঙ্কর: কেন না প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও প্রতিহিংসা নিতে না পারার চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর মানুষের নেই।'

* * *

'ভয়ঙ্কর দণ্ড তুমি ভেবে বার করেছ হে মানুষ!' ঈশ্বর বললেন। 'যা বললে তা-ই হবে, কিন্তু তোমাকেও অনন্তকাল বসে থাকতে হবে ওখানে তোমার ঘোড়ার পিঠে, আর যতক্ষণ তুমি তোমার ঘোড়ার পিঠে বসে থাকবে ততক্ষণ তোমার সদ্‌গতি হবে না!' যা যা বলা হল হুবহু তা-ই ঘটল: আজ অবধি কার্পেথীয় পর্বতে ঘোড়ার পিঠে চেপে আছে সেই আশ্চর্য বীরপুরুষ, দেখছে অতলস্পর্শী খাদের ভেতরে প্রেতাত্মারা কেমন করে মড়ার গায়ে কামড় বসাচ্ছে, উপলব্ধি করছে কেমন করে মাটির নীচে শায়িত প্রেতাত্মা বেড়ে চলেছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে নিজের হাড়গোড় কামড়াচ্ছে এবং সমস্ত পৃথিবীকে নাড়াচ্ছে...'

অন্ধ পুরো গানটা শেষ করল; শেষ করে সে আবার বাদ্যযন্ত্রের তারে আঙুল চালাতে লাগল; সে এবারে গাইতে শুরু করল ফোমা ও ইয়েরেমা* সম্পর্কে, স্ক্লিয়ার স্তোকোজা সম্পর্কে হাসির গান।... কিন্তু ছেলেবুড়ো কারোরই তখন পর্যন্ত সংবিৎ ফিরে আসার লক্ষণ দেখা গেল না। তারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে, ভাবতে লাগল প্রাচীনকালের ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা।

---

* ফোমা ও ইয়েরেমা — লৌকিক রূপকথার দুই চরিত্র। — সম্পাঃ

'মিরগোরদ'
থেকে

সাবেকী জমিদার পরিবার

উপ রাশিয়ায়* সচরাচর যাঁরা সাবেকী বলে আখ্যাত, দূর দূর পল্লীগ্রামের সেই সমস্ত নিভৃতবাসী ভূস্বামীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আমার বড় প্রিয়। দেয়াল যেখানে এখনও বৃষ্টির জলে ধৌত হওয়ার অপেক্ষায় আছে, যেখানে ছাদে এখনও সবুজ ছাতলা পড়ে নি, দেউড়ির পলেস্তারা খসে গিয়ে বেরিয়ে আসে নি লাল ইট, সেই সমস্ত নতুন নতুন মসৃণ দালানকোঠার সম্পূর্ণ বিপরীত এই মানুষগুলি — তারা জরাজীর্ণ, রূপময় ছোট ছোট ঘরবাড়ির মতো নিজস্ব বর্ণবৈচিত্র্যহেতু সুন্দর। আমি মাঝে মাঝে ভালোবাসি ক্ষণিকের জন্য নেমে আসতে এই অসাধারণ নিভৃত জীবনের গণ্ডিতে, যেখানে ক্ষুদ্র অঙ্গনের চতুর্দিকের বেষ্টনী, আপেল ও প্লাম গাছে পরিপূর্ণ বাগানের কঞ্চির বেড়া, তার পরিমণ্ডলী — উইলো, এল্ডার আর নাশপাতির ঝোপে ছাওয়া, এক পাশে হেলে-পড়া পল্লী-কুটিরের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য নেই কোন বাসনার। এগুলির অনাড়ম্বর অধিকারীদের জীবনযাত্রা বড় শান্ত — এত শান্ত যে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতে হয়, মনে হয় যেন কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ায় বিক্ষোভ সঞ্চারকারী অশুভ শক্তির অশান্ত আবির্ভাব — এসবের আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই, সেগুলি আপনি দেখেছেন কেবল উজ্জ্বল, ঝলমলে স্বপ্নের ঘোরে। এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা নীচু বাড়ি — বাড়ির চারদিক ঘিরে কালচে রঙের ছোট ছোট কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি দরদালান, যাতে ঝড়বৃষ্টি ও শিলাবর্ষণের সময় না ভিজে জানলার খড়খড়ি বন্ধ করা যায়। এর পেছনে আছে সুবাসিত বার্ড-চেরি গাছ, রক্তিম চেরি ফলে আর সীসারঙের আবছা প্রলেপে ঢাকা প্লামের চুনি-নীলা রঙের সমুদ্রে প্লাবিত সারি সারি নীচু নীচু ফলগাছ, একটা

* ইউক্রেনে।

ঝাঁকড়া ম্যাপ্‌ল্‌ গাছ, যার ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বিছানো আছে গালিচা; বাড়ির সামনে খর্বাকৃতি কাঁচ তাজা ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত আঙ্গিনা, যার ওপর দিয়ে গোলাবাড়ি থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত এবং রান্নাঘর থেকে বাবুদের অন্দর পর্যন্ত চলে গেছে পায়ে পায়ে মাড়ানো পথরেখা; একটা দীর্ঘগ্রীব হাঁস তুলোর মতো ফুরফুরে, নবজাত ছানাদের সঙ্গে জল পান করছে; বেড়ার ওপর দড়িতে টাঙানো শুকনো নাশপাতি ও আপেল, আর হাওয়া খেলানোর জন্য বাইরে ঝুলিয়ে রাখা গালিচা; গোলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফুটিতে বোঝাই একটা গাড়ি; জোয়াল থেকে ছাড়ানো একটা বলদ অলস ভঙ্গিতে তার পাশে শুয়ে আছে—এ সবই আমার মনে সঞ্চার করে অনির্বচনীয় মাধুর্য, হয়ত বা এই কারণে যে সেগুলি এখন আমার চোখের আড়ালে। আর যাদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ, সে সবই আমাদের প্রিয়। সে যাই হোক না কেন, যখন আমার ঢাকনাখোলা ঘোড়াগাড়ি এই বাড়ির দেউড়ির দিকে এগিয়ে আসে তখনই আমার মন আশ্চর্য মধুর ও শান্ত ভাবে ভরপুর হয়ে ওঠে; ঘোড়াগুলি ফুর্তিতে দেউড়ির নীচ দিয়ে টগবগ করে ছুটে যায়, গাড়োয়ান দিব্যি ধীরেসুস্থে কোচবক্স থেকে নেমে আসে, পাইপে তামাক ঠাসে—যেন সে তার নিজের বাড়িতে এসেছে; এমন কি জবুথবু গোছের ছোট, বড়, মাঝারি দো-আঁশলা কুকুরগুলির ডাকও আমার কানে সুধা বর্ষণ করে। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই অনাড়ম্বর নিভৃত স্থানের অধিপতিদের, বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের, যাঁরা বেরিয়ে এসে জানান সাদর অভ্যর্থনা। তাঁদের মুখ আমি আজও দেখতে পাই কখনও কখনও কায়দাদুরস্ত টেইল-কোটের মাঝখানে, কোলাহল ও ভিড়ের মধ্যে; আর তখন অকস্মাৎ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে জাগরস্বপ্ন, আমার সামনে ভেসে ওঠে বিগত কালের স্মৃতি। তাঁদের মুখের রেখায় বরাবরই আঁকা থাকে এমন একটা উদারতা, এমন আন্তরিকতা ও অকপট ভাব যে আপনা থেকেই, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ত বটেই, যাবতীয় স্পর্ধিত স্বপ্নচারিতাকে বিসর্জন দিয়ে অলক্ষিতে, মনেপ্রাণে চলে যেতে হয় বিউকোলীয় রাখালিয়া জীবনে*[১]।

আমি আজও ভুলতে পারি না বিগত যুগের দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে, যাঁরা, দুর্ভাগ্যবশত আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমার মন আজও করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আমি মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করি যখন মনে মনে ভাবি যে কালক্রমে যদি কখনও আসি তাঁদের এককালের বাসস্থানে—যে বাসস্থান আজ শূন্য—তাহলে দেখতে পাব

বিধ্বস্ত কুটিরের স্তূপ ও বদ্ধ পুষ্করিণী; আর যেখানে এককালে খাড়া ছিল নীচু কুঠিবাড়িটা, সেখানে রয়েছে আগাছায় ভরাট খাত—আর কিছুই নয়। দুঃখ হয়! আগে থেকেই একথা ভেবে আমি দুঃখ পাই! যাই হোক কাহিনীর দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক।

যাঁদের সম্পর্কে আমি বলতে শুরু করেছি তাঁরা হলেন দুই বুড়ো-বুড়ি—আফানাসি ইভানভিচ তোভ্স্তোগুব আর তার স্ত্রী পুল্খেরিয়া ইভানভ্না। আমি যদি চিত্রশিল্পী হতাম, আর যদি ক্যানভাসে আঁকতে চাইতাম ফিলেমন ও বাউকিসকে*) তাহলে তাঁদের ছাড়া আর কোন আদর্শ আমি কখনই বেছে নিতাম না। আফানাসি ইভানভিচের বয়স ষাট, পুল্খেরিয়া ইভানভ্নার—পঞ্চান্ন। আফানাসি ইভানভিচ দীর্ঘকায়, সব সময় পরে থাকতেন মোটা পশমী বস্ত্রে ঢাকা ভেড়ার চামড়ার আলখিল্লা, বসে থাকতেন ঘাড় গুঁজে আর যখন কিছু বলতেন, কিংবা নিছকই শুনতেন, সব সময় তাঁর মুখে লেগে থাকত হাসি। পুল্খেরিয়া ইভানভ্না ছিলেন খানিকটা গম্ভীর প্রকৃতির, প্রায় কখনই হাসতেন না; কিন্তু তাঁর চোখেমুখে আঁকা ছিল এত উদারতা, যা যা ভালো জিনিস তাঁদের আছে সে সমস্ত উজার করে দিয়ে লোকজনকে আপ্যায়ন করার জন্য এত আগ্রহ, যে এমন কোন হাসি সম্ভবত খুঁজে পাবেন না যা তাঁর দরদী মুখের পক্ষে বড় বেশি মিষ্টি। তাঁদের মুখের হালকা বলিরেখার বিন্যাস ছিল এত মধুর যে কোন শিল্পী দেখতে পেলে নির্ঘাত সেগুলি হরণ করতেন। ঐ বলিরেখা দেখে সম্ভবত আঁচ করা যেতে পারত তাঁদের সমগ্র জীবন, নির্মেঘ, নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা, যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, একাধারে সরলমতি এবং বিত্তবান পরিবারগুলি। এদের জীবনযাত্রা সর্বদাই সেই সমস্ত নীচ প্রকৃতির ইউক্রেনীয়দের বিপরীত, যারা বেরিয়ে এসেছে আলকাতরাওয়ালা ও ব্যাপারী শ্রেণীর লোকজন থেকে, যারা পঙ্গপালের মতো রাজস্ব বিভাগ আর সরকারী অফিস ছেয়ে ফেলেছে, যারা তাদেরই দেশবাসীদের কাছ থেকে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়, নালিশের বন্যায় সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ডুবিয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করে এবং সাড়ম্বরে তাদের পদবীর ইউক্রেনীয় 'ও' পরিসমাপ্তির সঙ্গে 'ভ্' জুড়ে রুশী বনে যায়। না, ইউক্রেনের প্রাচীন ও আদি বংশধারার আর সব লোকজনের মতো এঁদেরও এই ঘৃণ্য ও নগণ্য প্রাণীগুলির সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা লক্ষ করে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। তাঁরা কখনও একে অন্যকে 'তুমি' বলে উল্লেখ করতেন না, সব সময় বলতেন 'আপনি': আপনি, আফানাসি ইভানভিচ; আপনি, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না। 'চেয়ারটা কি আপনি বসতে গিয়ে ভেঙেছেন আফানাসি ইভানভিচ?' 'ও কিছু না, রাগ করবেন না পুলখেরিয়া ইভানভ্‌না, আমিই ভেঙেছি।' তাঁদের কোন কালে কোন ছেলেপুলে ছিল না, আর সেই কারণেই তাঁদের সমস্ত অনুরাগ ঘনীভূত হয় পরস্পরের মধ্যে। যৌবনে, কোন এক সময় আফানাসি ইভানভিচ অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করেন, পরে সেকেন্ড মেজরও হন, কিন্তু সে অনেক কাল আগেকার কথা, এতকাল আগেকার কথা যে স্বয়ং আফানাসি ইভানভিচও প্রায় কখনও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন না। আফানাসি ইভানভিচ বিয়ে করেন তিরিশ বছর বয়সে, যখন তিনি ছিলেন জোয়ান, পরতেন কলকাদার হাত কাটা ছোট কোট। এমন কি তিনি বেশ কৌশলেই পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নাকে ঘরে আনেন—পাত্রীর আত্মীয়-স্বজনের মত ছিল না তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবার। তবে একথা এখন তিনি তেমন একটা মনেই আনেন না, অন্তত কথাবার্তায় কখনও উল্লেখ করেন না।

অতীতের এই সমস্ত অসাধারণ ঘটনার স্থান নিয়েছে তাঁদের শান্ত ও নিভৃত জীবনযাত্রা, তন্দ্রাজড়িত অথচ সুসমঞ্জস এক ধরনের কল্পলোক, যা আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন পল্লীগ্রামের বাড়ির ঝুল-বারান্দায় বাগানের মুখোমুখি বসে থাকতে থাকতে, যখন গাছপালার পাতার ওপর চড়চড় করতে করতে কলকল স্রোতে জলধারা বইয়ে দিয়ে, জমকাল আওয়াজ তুলে সুমধুর বারিধারা আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চার করে তন্দ্রার আবেশ, যখন ইত্যবসরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চুপিসারে উঠতে থাকে রামধনু এবং ভগ্নপ্রায় খিলানের আকারে আকাশে ছড়িয়ে দেয় তার ম্লান সাতরঙা আলো। কিংবা শ্যামল ঝোপঝাড়ের ভেতরে ডুব দিয়ে যেতে যেতে আপনার গাড়ি যখন আপনাকে দোল দেয়, যখন স্তেপের কোয়েল ডেকে ওঠে এবং শস্যের মঞ্জরী ও মেঠো ফুলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধী লতাপাতা গাড়ির দরজার ভেতর দিয়ে গলে এসে আপনার হাতে ও মুখে মধুর স্পর্শ দিয়ে যায়।

তাঁর কাছে যে সব অতিথি আসত তাদের কথাবার্তা তিনি সব সময় শুনতেন স্নিগ্ধ হাসি মুখে নিয়ে। কখন-সখন নিজেও কথা বলতেন, তবে বেশির ভাগই করতেন জিজ্ঞেসবাদ। যারা পুরনো আমলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বা নতুনের নিন্দায় অন্যদের অতিষ্ঠ করে তোলে তিনি সেই জাতের

বৃদ্ধ ছিলেন না। বরং উলটো, আপনাকে এটা-ওটা নানা প্রশ্ন করে আপনার নিজের জীবনের পরিস্থিতি, আপনার সাফল্য-অসাফল্য সম্পর্কে গভীর কৌতূহল ও সহানুভূতির পরিচয় দেবেন—যে ধরনের আগ্রহ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় যে-কোন দরদী বৃদ্ধের মধ্যে, যদিও তা কতকটা সেই শিশুর কৌতূহলের মতো, যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিরীক্ষণ করতে থাকে আপনার পকেট-ঘড়ির চেনের সঙ্গে লাগানো খোদাই করা সীলটা। বলা যেতে পারে তখনই তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রসন্নতায়।

যে বাড়িতে আমাদের এই বুড়ো-বুড়ি দু'জন থাকতেন তার ঘরগুলি ছিল ছোট, নীচু-নীচু যেমন সচরাচর দেখা যায় সাবেকী লোকজনের ঘরবাড়ি। প্রতিটি ঘরে ছিল ঘরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে একটা করে বিশাল চুল্লি। এই ঘরগুলি ছিল বেজায় গরম, কেননা আফানাসি ইভানভিচ ও পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না দু'জনেই উষ্ণতা দারুণ পছন্দ করতেন। সবগুলি উনুনের জ্বালানি ভরার মুখ ছিল বার-বারান্দায়, আর সে জায়গাটা প্রায় সব সময় ছাদ পর্যন্ত ভর্তি থাকত খড়ে—ইউক্রেনে জ্বালানি কাঠের বদলে যার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। খড় পোড়ার চটচট আওয়াজ আর আলোক নিঃসরণের ফলে শীতের সন্ধ্যায় বার-বারান্দা বিশেষ প্রীতিকর হয়ে ওঠে, তখন তামাটে রঙের কোন সুন্দরীর পশ্চাদনুসরণের পর উদগ্র কোন তরুণ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে হাতের তালু চাপড়াতে চাপড়াতে এক ছুটে সেখানে এসে আশ্রয় নেয়। ঘরের দেয়ালগুলি সাজানো ছিল প্রাচীন আমলের সরু ফ্রেমে বাঁধানো ছোট-বড় কয়েকটি ছবিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ির মালিকেরা নিজেরাই বহুকাল হল বিস্মৃত হয়েছেন সেগুলির বিষয়বস্তু এবং কয়েকটি ছবি যদি সরিয়েও নিয়ে যাওয়া হত তাহলে সম্ভবত তাঁদের চোখে সেটা ধরা পড়ত না। দুটি পোর্ট্রেট ছিল বড়, তেলরঙে আঁকা। একটাতে আঁকা ছিল কোন এক উচ্চপদস্থ যাজক, অন্যটাতে তৃতীয় পিটার। সরু ফ্রেমের ভেতর থেকে উঁকি মারছে কাউণ্টেস লাভালিয়েরের*) ছবি—মাছি বসার দাগে কলঙ্কিত। জানলার চারধারে এবং দরজার ওপরে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট ছবি, যেগুলিকে লোকে নেহাৎই অভ্যাসবশত দেয়ালের ওপরকার দাগ বলে মনে করত, তাই আদৌ নজরে আনত না। প্রায় সব ঘরেরই মেঝে মাটির, কিন্তু এমন নিকানো আর এত পরিপাটি যে তেমন

সম্ভবত দেখা যায় না কোন বড়লোকের বাড়িতে, যেখানে তন্দ্রাজড়িত কোন চাপরাসধারী বাবু অলস ভঙ্গিতে ঘর ঝাঁট দেয়।

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার ঘরটিতে এখানে ওখানে ছোট-বড় নানা আকারের তোরঙ্গ আর বাক্স-পেঁটরা রাখা। দেয়ালের সর্বত্র ঝুলছে ফুলের বীজ, শাকসবজি ও তরমুজের বীজে ভর্তি অসংখ্য পুঁটলি আর থলি। একেক কোনায় তোরঙ্গগুলির ভিতরে এবং দুই তোরঙ্গের মাঝখানের ফাঁকগুলিতে রাখা ছিল রঙবেরঙের পশমী সুতোর অসংখ্য গুলি আর অর্ধশতাব্দী আগে সেলাই করা প্রাচীন জামাকাপড়ের কাটা টুকরো। পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না ছিলেন সুগৃহিণী, তিনি সব কিছুই সংগ্রহ করে রাখতেন, যদিও নিজেই জানতেন না পরে কী কাজে লাগবে।

কিন্তু বাড়িতে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ছিল গুঞ্জরিত দরজা। ভোর হওয়ামাত্র সারা বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠত দরজাগুলির গুঞ্জরনে। কী কারণে যে তাদের গুঞ্জরন তা আমি বলতে পারব না: এর জন্য মরচে-ধরা কব্জা দায়ী, কিংবা যে-মিস্ত্রী এই দরজাগুলি তৈরি করেছিল সে-ই তাদের মধ্যে কোন গোপন কৌশল লাগিয়ে রাখে—জানি না; তবে লক্ষণীয় এই যে প্রতিটি দরজার বিশেষ ধরনের নিজস্ব কণ্ঠস্বর ছিল। শয়নঘরের অভিমুখী দরজাটা অতি রিনরিনে সপ্তম সুরে গান ধরত, খাবার ঘরের দরজা খাদের সুরে ভাঙা ভাঙা আওয়াজ তুলত; কিন্তু বার-বারান্দার দিকে যে দরজাটা ছিল সেটা থেকে উঠত এমন একটা অদ্ভুত ঝনঝনে আর গোঙানির স্বর যে কান পেতে শুনলে তার মধ্যে অবশেষে রীতিমতো স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যেত: 'বাপ্‌সে রে বাপ্‌, আমি জমে যাচ্ছি!' আমি জানি, অনেকেরই এই আওয়াজ মোটে পছন্দ নয়; আমার কিন্তু বেশ পছন্দ, আর এখানে যদি কখনও দরজার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনার সুযোগ আমার ঘটে তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ ঘ্রাণ পাব প্রাচীন বাতিদানে রাখা মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত নীচু একটা ঘরের, সেই পল্লীগ্রামের; টেবিলে সাজানো রয়েছে নৈশাহার; খোলা জানলা ভেদ করে বাসনপত্রে সাজানো টেবিলের ওপর বাগান থেকে উঁকি মারছে মে মাসের রাতের অন্ধকার; বাগান, বাড়ি আর দূরের নদীর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে বুলবুলের গীতলহরী; শাখাপ্রশাখার ভীরু শিহরণ ও মর্মরধ্বনি... আর হা ঈশ্বর! কত দীর্ঘ স্মৃতির মালিকাই না তখন আলোড়িত করে আমাকে!

ঘরের চেয়ারগুলি ছিল কাঠের, ভারী—পুরনো আমলে সচরাচর যেমন

হত; সবগুলি চেয়ারের পিঠ ছিল কুঁদে তৈরি, কোন রঙ ও পালিশ না থাকায় কাঠের স্বাভাবিক চেহারা ছিল অক্ষুণ্ণ; সেগুলি কোন কাপড়ের খোলেও ঢাকা ছিল না, দেখাত সেই সমস্ত চেয়ারের মতো যার ওপর আজও উপবেশন করেন প্রধান ধর্মযাজকরা। ঘরের কোনায় কোনায় তেকোনা টেবিল আর সোফা, মাছি বসার কালো কালো বিন্দুতে অলঙ্কৃত সোনার লতাপাতায় খোদাই করা সরু ফ্রেম লাগানো আয়নার সামনে চৌকোনা টেবিল, সোফার সামনে গালিচা পাতা—গালিচায় নক্সাতোলা পাখিগুলি দেখতে ফুলের মতো, ফুলগুলি পাখির মতো; বলতে গেলে এই ছিল আমার বুড়ো-বুড়ির বাসস্থান, অনাড়ম্বর বাড়ির যাবতীয় আসবাব।

চাকরানীদের ঘর ছিল ডোরাকাটা ঘাগরা পরনে যুবতী ও বিগতযৌবনা মেয়েদের ভিড়ে ঠাসা। পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না তাদের কখন-সখন এটা-ওটা টুকিটাকি সেলাই করতে দিতেন এবং ফলপাকড় পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত রাখতেন, তবে বেশির ভাগ সময়ই তারা রান্নাঘরে ছুটত আর ঘুম দিত। পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না এই মেয়েগুলিকে বাড়িতে রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তাদের নৈতিক চরিত্রের ওপর কড়া নজর রাখতেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর অপরিসীম বিস্ময় উদ্রেক করে কয়েক মাস যেতে না যেতেই দেখা যেত মেয়েদের কারও না কারও কটিদেশ সাধারণের তুলনায় বড় বেশি স্ফীত হয়ে চলেছে; আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বাড়িতে অবিবাহিত পুরুষ বলতে প্রায় কেউই ছিল না—অবশ্য যদি ধরা যায় বাড়ির ফুটফরমাস খাটা বাচ্চা চাকরটার কথা। ছেলেটা ছাইরঙা হাফ-কোট পরে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াত আর যখন না খেত তখন অবশ্যই পড়ে পড়ে ঘুমোত। পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না অপরাধিনীকে সচরাচর গালাগাল দিতেন এবং কঠোর শাস্তি দিতেন, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে। জানলার কাচগুলি ভয়াবহ রকমের অগণিত মাছির তাড়নায় ঝন্‌ঝন্‌ করত, তাদের সকলকে ছাপিয়ে উঠত ভোমরার মোটা খাদের সুর, আর সেই সঙ্গে কখন কখন সঙ্গত করত বোলতাদের পিনপিন আওয়াজ; কিন্তু যেই মুহূর্তে মোমবাতি আনা হত অমনি গোটা দঙ্গলটি নৈশ আশ্রয়ের অভিমুখে প্রস্থান করত, গোটা ছাদটা ছেয়ে যেত কালো মেঘে।

আফানাসি ইভানভিচ গৃহস্থালির কাজ তেমন একটা করতেন না, অবশ্য যদিও কখন-সখন গাড়ি চেপে ঘাস কাটা ও ফসল তোলার কাজ দেখতে যেতেন, বেশ মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাজ দেখতেন; গৃহস্থালি

চালানোর সমস্ত ভারটা এসে পড়ে পুলখেরিয়া ইভানভ্নার ওপর। পুলখেরিয়া ইভানভ্নার ঘরকন্না বলতে ছিল অবিরাম ভাণ্ডারঘর খোলা ও বন্ধ করা, অপর্যাপ্ত পরিমাণ ফলমূল ও শাকসবজি লবণ দিয়ে জারানো, শুকানো এবং মোরব্বা করা। তাঁর বাড়িটা ছিল পুরোদস্তুর রসায়ন-ল্যাবরেটরির মতো। আপেল গাছের নীচে সর্বক্ষণ আগুন জ্বলত এবং মধু, চিনি, আরও না জানি কিসের তৈরী জ্যাম, জেলি ও মোরব্বা ভর্তি কড়াই অথবা তামার হাঁড়ি লোহার তেপায়া থেকে প্রায় কখনও নামতই না। আরেকটি গাছের নীচে সইস সর্বক্ষণ একটা তামার পাতন যন্ত্রে পীচের পাতা, বার্ড-চেরির মুকুল, ন্যাপ উইড ও চেরির বীচি থেকে ভোদ্কা চোলাই করত, আর উক্ত প্রক্রিয়া যখন প্রায় সমাপ্তির দিকে তখন তার জিভ নাড়ানোর মতো কোন অবস্থা থাকত না, এমনই আবোল তাবোল বকত যে পুলখেরিয়া ইভানভ্না কিছু বুঝতে পারতেন না, লোকটা শেষকালে রান্নাঘরে চলে যেত ঘুমোতে। যেহেতু পুলখেরিয়া ইভানভ্না ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখার ওপরে সঞ্চয়ের জন্যও তৈরি করা সর্বদা পছন্দ করতেন, সেই হেতু এসমস্ত হাবিজাবি এত বেশি পরিমাণে সিরায় সেদ্ধ করে, নুনে জারিয়ে ও শুকিয়ে রাখা হত যে তাতে শেষ পর্যন্ত গোটা উঠোনটাই ডুবে যাবার কথা, যদি না সেগুলির অধিকাংশ যেত চাকরানীদের পেটে; তারা ফাঁক বুঝে ভাঁড়ারে প্রবেশ করে এমন মারাত্মক গুরুভোজন করত যে সারাদিন গোঙাত আর পেটের ব্যথার অনুযোগ করত।

চাষবাস এবং বাড়ির বাইরের অন্যান্য গৃহস্থালির ব্যাপারে নজর দেবার তেমন একটা সুযোগ পুলখেরিয়া ইভানভ্নার ঘটত না। গ্রামের মোড়লের সঙ্গে জোট বেঁধে গোমস্তা কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে দু'হাতে চুরি করত। দিব্যি নিজেদের সম্পত্তি ভেবে প্রভুর বনে প্রবেশ করা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। তারা কাঠ কেটে অসংখ্য স্লেজগাড়ি বানিয়ে কাছাকাছি জায়গার হাটে গিয়ে বিক্রি করে আসত; এ ছাড়া মোটা মোটা সবগুলি ওক গাছ তারা পাশের গাঁয়ের কসাকদের যাঁতাকলের বাড়ি তৈরির কাঠ হিশেবে বিক্রি করে দিত। কেবল একবার পুলখেরিয়া ইভানভ্নার সাধ হয়েছিল তাঁর বনভূমি পরিদর্শনের। এই উদ্দেশ্যে বিশাল বিশাল চামড়ার এপ্রনে ছেকরা গাড়ি সাজানো হল। কোচম্যান মান্ধাতার আমলের ঘোড়াগুলির লাগাম ধরে নাড়া দিতেই গাড়ি যাত্রা শুরু করল, আর তার ফলে আকাশ-বাতাস এমন অদ্ভুত শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল যেন একই সঙ্গে বাঁশি, খঞ্জনি

আর ঢাকের আওয়াজ শোনা যায়; প্রতিটি কাঁটা আর লোহার আঙটা এত দূর ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ তুলল যে সেই যাঁতাকলের ঘরের কাছে শোনা গেল ঠাকরুনের গৃহ নিষ্ক্রমণের সোরগোল—যদিও দূরত্বটা ছিল অন্তত দু ভার্স্ট। বনের নিদারুণ রিক্ততা এবং যে সমস্ত ওক গাছের বয়স তিনি তার ছোটবেলায়ও একশ বছর বলে জানতেন সেগুলির অন্তর্ধান পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার নজরে না পড়ে পারল না।

নায়েবও সেখানেই উপস্থিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বললেন:

'কী ব্যাপার বল দেখি নিচিপোর, ওকগাছ এত ফাঁকা হয়ে গেল, কী করে? দেখো, তোমার মাথার চুলও যেন ফাঁকা না হয়ে যায়!'

'কেন ফাঁকা?' নায়েব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল। 'মারা গেছে! বেবাক মরে ছারখার হয়ে গেছে: কিছু গেছে বাজ পড়ে, কিছু ঘুণ ধরে—মারা গেছে ঠাকরুন, মারা গেছে।'

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না এই জবাবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে কেবল বাগানে কালো চেরিগাছ আর শীতকালীন বড় বড় নাশপাতি গাছগুলির কাছে পাহারাদারদের সংখ্যা দ্বিগুণ করার হুকুম দিলেন।

সুযোগ্য নায়েব, গোমস্তা আর মোড়ল মিলে সমস্ত ময়দা গাড়ি বয়ে জমিদারের গোলায় নিয়ে আসা নেহাৎই অপ্রয়োজনীয় বোধ করত, কেন না অর্ধেক পরিমাণই জমিদার বাবুর পক্ষে যথেষ্ট; সেই অর্ধেকটাও শেষ পর্যন্ত তারা নিয়ে আসত ভিজে সেঁতসেঁতে অথবা ছাতা ধরা অবস্থায়, ফলে বরবাদী মাল বলে হাটে বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু নায়েব ও মোড়ল যত লুটপাটই করুক, ভাণ্ডারকর্ত্রী থেকে শুরু করে শুয়োরের পাল পর্যন্ত, যারা অপর্যাপ্ত পরিমাণ প্লাম আর আপেল ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে গাছ ঝাঁকিয়ে অঝোর ধারায় ফলের বর্ষণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে গাছের গায়ে নিজেদের মুখ দিয়ে গুঁতোও মারত, তারা, অর্থাৎ বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে যত গণ্ডেপিণ্ডেই খাক না কেন, চড়াই পাখি আর কাকেরা যত ফলই ঠুকরে নষ্ট করুক না কেন, বাড়ির ঝি-চাকররা সকলে অন্যান্য গাঁয়ে তাদের আত্মীয়-কুটুম্বদের যত উপঢৌকনই দিক না কেন, এমন কি গোলাবাড়ি থেকে যত রাজ্যের কাপড় বোনার সুতো আর পুরনো থান বার করে সবসুদ্ধ এক সর্বজনীন উৎসস্থলের, অর্থাৎ পানশালার শরণাপন্ন হোক না কেন, অতিথিরা,

আলস্যজড়িত সইস আর অনুচররা যত চুরিই করুক না কেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ভূমি সব কিছু এত বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করত আর আফানাসি ইভানভিচ ও পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার প্রয়োজন এত কম ছিল যে তাদের গৃহস্থালির মধ্যে এই ভীষণ লুটতরাজের বিন্দুমাত্র নজরে আসত না।

সাবেকী জমিদারদের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই খেতে ভালোবাসতেন। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে (তারা রোজ খুব ভোরে উঠতেন), দরজাগুলি নানা স্বরে ঐকতান শুরু করা মাত্র তারা টেবিলের ধারে বসে কফি পান করতেন। কফি পান করার পর আফানাসি ইভানভিচ বার-বারান্দায় বেরিয়ে এসে রুমাল ঝাড়া দিয়ে বলতেন: 'হুস্‌ হুস্‌! এই হাঁসেরা, দেউড়ি থেকে বেরিয়ে আয়!' আঙ্গিনায় সচরাচর দেখা হয়ে যেত নায়েবের সঙ্গে। স্বভাবতই তার সঙ্গে শুরু করে দিতেন কথাবার্তা, অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করতেন এবং তাকে এমন ভর্ৎসনা করতেন আর এমন সমস্ত নির্দেশ দিতেন যে গৃহস্থালির ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞান দেখে যে-কারও আশ্চর্য হওয়ার কথা, আর আনাড়ি কোন লোক ত এহেন তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন প্রভুর কাছ থেকে কিছু চুরি করার কথা ভাবতেও সাহস করবে না। কিন্তু তাঁর নায়েবটি ছিল একটি রামঘুঘু, সে জানত কী উত্তর দিতে হয়, আর তার চেয়েও বড় কথা, কী ভাবে কর্তৃত্ব করতে হয়।

অতঃপর আফানাসি ইভানভিচ অন্দর মহলে ফিরতেন, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার কাছে এসে বলতেন:

'কী বলেন পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না, কিছু খেয়ে নিলে হত না?'

'কী খাবেন বলুন, আফানাসি ইভানভিচ? বেকন দেওয়া ছোট রুটি, পোস্ত দেওয়া রোল্‌, নাকি নুনে জারানো ব্যাঙের ছাতা?'

'ব্যাঙের ছাতাই হোক, কিংবা রোল্‌ হলেও চলবে,' আফানাসি ইভানভিচ জবাবে বলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর চাদর বিছানো হয়ে যায়, এসে যায় রোল্‌ আর ব্যাঙের ছাতা।

দুপুরের খাবারের এক ঘণ্টা আগে আফানাসি ইভানভিচ আবার খানিকটা খেয়ে নিতেন, একটা প্রাচীন রুপোর পাত্রের এক পাত্র ভোদ্‌কা পান করতেন, আনুষঙ্গিক হিশেবে খেতেন ব্যাঙের ছাতা, নানা রকমের শুঁটকি মাছ ইত্যাদি। দুপুরের খাওয়া তাঁরা খেতে বসতেন বারোটার সময়। খাবারের থালা এবং চাটনির পাত্র ছাড়াও টেবিলের ওপর থাকত অসংখ্য

ভাঁড়; সেগ্ৰলির ঢাকনা থাকত প্ৰটিং দিয়ে বন্ধ করা, যাতে প্রাচীন র্ৰচিকর রন্ধনশালায় তৈরি ক্ষ্ৰধা উদ্রেককারী খাদ্যের কোন স্ৰগন্ধ উবে না যায়। খেতে খেতে সচরাচর আহারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ বিষয় সম্পর্কেই কথাবার্তা চলত।

'আমার মনে হয় এই জাউটা যেন খানিকটা ধরে গেছে,' আফানাসি ইভানভিচ হয়ত বললেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে না প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না?'

'না, আফানাসি ইভানভিচ, আপনি আরও বেশি করে মাখন মেশান, তাহলে আর ধরে গেছে বলে মনে হবে না, কিংবা এই নিন, ব্যাঙের ছাতার এই চাটনির খানিকটা ঢাল্ৰন ওখানে।'

'তা মন্দ নয়,' বলে আফানাসি ইভানভিচ নিজের থালাটা বাড়িয়ে দেন। 'দেখা যাক কেমন দাঁড়ায়।'

দ্ৰপ্ৰরের খাবারের পর আফানাসি ইভানভিচ ঘণ্টা খানেকের জন্য বিশ্রাম করতে যেতেন। এর পর প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না কাটা তরম্ৰজ তার সামনে এনে ধরে বলতেন:

'এই যে চেখে দেখ্ৰন, আফানাসি ইভানভিচ কী স্ৰন্দর তরম্ৰজ!'

'মাঝখানটা লাল বলেই তা ভাববেন না প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না,' আফানাসি ইভানভিচ বেশ বড়সর একটা ফালি তুলে নিয়ে বলতেন, 'ভেতরে লাল হলেও খারাপ হতে পারে।'

কিন্তু তরম্ৰজটা অবিলম্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এর পর আফানাসি ইভানভিচ আরও কয়েকটি নাশপাতি খেয়ে প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে যেতেন। বাড়ি ফিরে এসে প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না চলে যেতেন তাঁর নিজের কাজে, আর আফানাসি ইভানভিচ গিয়ে বসতেন ব্যাগানের ম্ৰখোম্ৰখি চালাটার নীচে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন ভাঁড়ারঘরের অভ্যন্তরভাগ অবিরাম প্রকাশ পাচ্ছে, আবার দরজার আড়ালে অন্তর্ধান করছে, আর চাকরানীরা একে অন্যকে ঠেলাঠেলি করে কাঠের পেটিতে, ঝাঁঝরি করা পাত্র, ছোট ছোট কুলো এবং ফল সংরক্ষণের নানা পাত্রে করে গাদা গাদা এটা-ওটা কী যেন সব কখনও ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে কখনও বা বার করে আনছে। কিছ্ৰক্ষণ বাদে তিনি প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নাকে ডেকে পাঠাতেন কিংবা নিজেই তার কাছে গিয়ে বলতেন:

'কী খাওয়া যায় বল্ৰন ত প্ৰল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না?'

'কী খাবেন আপনিই বলুন,' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বলতেন। 'গিয়ে ওদের বলব কি আপনার জন্যে বেরির পুর দেওয়া কিছু পিঠে আনতে? — আপনার জন্যে বিশেষ করে সরিয়ে রাখতে বলেছিলাম।'

'তা হলে ত দিব্যি হয়,' আফানাসি ইভানভিচ জবাব দেন।

'নাকি খানিকটা জেলি খাবেন?'

'সেটাও মন্দ নয়,' আফানাসি ইভানভিচ জবাব দেয়।

এর পর অচিরেই এসব বস্তু পরিবেশিত হয়, আর যথারীতি খাওয়াও হয়ে যায়।

নৈশভোজের আগে আফানাসি ইভানভিচ টুকটাক আরও কিছু জলখাবার খান। সাড়ে নয়টার সময় তাঁরা নৈশভোজে বসেন। নৈশভোজের পর তৎক্ষণাৎ আবার তাঁরা ঘুমোতে যান এই কর্মব্যস্ত অথচ শান্ত জায়গাটার ওপর তখন নেমে আসে সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতা। যে ঘরে আফানাসি ইভানভিচ ও পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না ঘুমোতেন সেটা এত গরম ছিল যে ক্কচিৎ কোন মানুষের পক্ষে কয়েক ঘণ্টা সেখানে তিষ্ঠানো সম্ভব হত। কিন্তু আফানাসি ইভানভিচ তদুপরি আরও গরম পাবার উদ্দেশ্যে শয়ন করতেন চুল্লির ওপরকার তক্তপোষে, যদিও প্রচণ্ড গরমের ফলে মাঝরাতে কয়েকবার তাঁকে উঠে পড়ে ঘরে পায়চারি করতে হত। কখনও কখনও ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আফানাসি ইভানভিচ কাতরাতেন।

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না তখন জিজ্ঞেস করতেন:

'আপনি কাতরাচ্ছেন কেন আফানাসি ইভানভিচ?'

'ভগবান জানেন, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না, পেটটা যেন কেমন ব্যথা ব্যথা করছে,' আফানাসি ইভানভিচ বলেন।

'আপনার বরং কিছু খেলে ভালো হত না আফানাসি ইভানভিচ?'

'জানি না তাতে ভালো হবে কিনা, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না! তা কী খাওয়া যায় বলুন ত?'

'টক দুধ, না হয় শুকনো নাশপাতি-সেদ্ধ পাতলা সরবত।'

'তা একটু খেয়ে দেখলে হত,' আফানাসি ইভানভিচ বলেন।

তন্দ্রাজড়িত চাকরানীকে পাঠানো হত তাক হাতড়ে দেখার জন্য। আফানাসি ইভানভিচ ছোটখাটো এক থালা খাওয়া শেষ করতেন; এর পর সচরাচর বলতেন:

'এখন যেন খানিকটা হাল্‌কা লাগছে।'

কখন কখন দিনটা ঝলমলে হলে এবং ঘরগুলি গরমে বেশ তেতে উঠলে আফানাসি ইভানভিচের ফুর্তি আর ধরত না, তিনি তখন পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে আর অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে ভালোবাসতেন।

'আচ্ছা পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না, আমাদের বাড়ি যদি হঠাৎ পুড়ে যেত তাহলে আমরা কোথায় যেতাম?' তিনি বলতেন।

'ভগবান না করুন!' ক্রুশ চিহ্ন এঁকে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বলতেন।

'আচ্ছা ধরুনই না কেন আমাদের বাড়ি পুড়ে গেল, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে উঠব?'

'ভগবান জানেন, আপনি কী বলছেন, আফানাসি ইভানভিচ! আমাদের ঘর পুড়ে যাবে কী বলছেন? ঈশ্বর এটা হতে দেবেন না।'

'আহা, ধরুনই না কেন যে পুড়ে গেল?'

'তাহলে আমরা উঠে আসতাম রান্নাঘরে। আপনি সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিতেন ঐ ঘরটায়, যেখানে আমাদের বাড়ির ভাণ্ডারকর্ত্রী থাকে।'

'আর রান্নাঘরও যদি পুড়ে যায়?'

'কী যে বলেন! একই সঙ্গে বাড়ি আর রান্নাঘর দুইই পুড়ে গেল, এমন দুর্দশা থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। তা-ই যদি হয় তাহলে যতক্ষণ নতুন বাড়ি তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ ভাঁড়ারঘরে ঠাঁই নিতে হবে।'

'আর ভাঁড়ারঘরও যদি পুড়ে যায়?'

'ঈশ্বর জানেন আপনি কী বলছেন! আপনার কথা আমি শুনতেও চাই না! এমন কথা মুখে আনাও পাপ, এ ধরনের কথার জন্যে ঈশ্বর শাস্তি দিয়ে থাকেন।'

কিন্তু পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নাকে নিয়ে যে একটু রঙ্গরসিকতা করা গেছে এতেই আফানাসি ইভানভিচ সন্তুষ্ট। তিনি নিজের চেয়ারে বসে বসে হাসতেন।

কিন্তু বুড়ো-বুড়ি দু'জন আমার কাছে সবচেয়ে কৌতূহলজনক মনে হত তখন, যখন তাঁদের বাড়িতে অতিথির আগমন ঘটত। সেই সময় তাঁদের বাড়ির সমস্ত কিছু অন্য রূপ ধারণ করত। বলা যেতে পারে এই সজ্জনেরা অতিথিদের জন্যই জীবন ধারণ করতেন। তাঁদের যা যা ভালো সামগ্রী থাকত সব বার করে আনা হত। তাঁদের গৃহস্থালিতে যা যা উৎপন্ন হত তার সব দিয়ে আপনাকে আপ্যায়ন করার চেষ্টায় তাঁদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে

যেত। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগত এই জন্য যে তাঁদের সমগ্র অতিথিসেবার মধ্যে কোন অতিমিষ্টতা ছিল না। এই আন্তরিকতা ও আগ্রহ তাঁদের চোখেমুখে এত নম্র ভাবে প্রকাশ পেত, তাঁদের চেহারার সঙ্গে এমন ভাবে মানাত যে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা না করে পারা যেত না। এর কারণ ছিল তাঁদের সদাশয়, অকপট চিত্তের অকৃত্রিম, সুস্পষ্ট সারল্য। রাজস্ব বিভাগের যে-সমস্ত আমলা আপনার প্রচেষ্টার ফলে জীবনে উন্নতি লাভ করেছে, যারা আপনাকে তাদের হিতৈষী বলে উল্লেখ করে আপনার পদতলে লুটিয়ে পড়ে তারা যে ভাবে আপনাকে আপ্যায়ন করে থাকে এই সমাদর আদৌ সেই শ্রেণীর নয়। অতিথিকে কোন মতেই সেই দিন ছাড়া হত না, তাকে অবশ্যই রাত্রিবাস করতে হত।

'এত বেলায় এতটা দূরের পথে কী করে ধরবেন!' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না সব সময় বলতেন (আগন্তুক সচরাচর বাস করত তাঁদের জায়গা থেকে তিন-চার ভার্স্ট দূরে)।

'অবশ্যই,' আফানাসি ইভানভিচ বলতেন, 'যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে যায়: ডাকাত-টাকাত কিংবা মন্দ লোকজন যদি আক্রমণ করে বসে!'

'ডাকাতের হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন!' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বলতেন। 'রাত বিরেতে ওসব কথা বলে কাজ নেই। ডাকাতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, অন্ধকার হয়ে এসেছে, এখন যাওয়া মোটেই ঠিক নয়। আর আপনার কোচম্যান, আপনার কোচম্যানকে আমি জানি, এত দুর্বল আর ছোটখাটো যে যে-কোন মাদী ঘোড়া ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে; তাছাড়া সে হয়ত ইতিমধ্যে বেশ টেনেছে, কোথাও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।'

ফলে অতিথিকে অবশ্যই থেকে যেতে হত; কিন্তু সে যাই হোক, ঈষদুষ্ণ নীচু ঘরে সন্ধ্যা, আন্তরিক, আমেজধরানো ও তন্দ্রা উদ্রেককারী কথাবার্তা, টেবিলের ওপর পরিবেশিত, সুপটু হাতের তৈরি, যথারীতি পুষ্টিকর রান্না থেকে ছড়িয়ে পড়া ভাপ, তার এক পরম প্রাপ্তি। আমি এখনও দেখতে পাই, আফানাসি ইভানভিচ তাঁর সদা-হাসি-মাখা মুখে ঘাড় গুঁজে চেয়ারে বসে আছেন, মন দিয়ে অতিথির কথা শুনছেন, এমন কি তার কথাগুলি উপভোগ করছেন। কথায় কথায় প্রায়ই রাজনীতির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অতিথিও তাঁদের মতোই কালেভদ্রে নিজের গাঁয়ের বাইরে যেত, কিন্তু তা হলে কী হবে, সে ঘন ঘন ভারিক্কি চালে, মুখে রহস্যময় ভাব এনে

নিজের অনুমানাদি প্রকাশ করত এবং বলত যে বোনাপার্টকে আবার রাশিয়ায় ছাড়ার ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীরা একটা চুক্তি করেছে, কিংবা সে নেহাৎই তাঁদের বলত আসন্ন যুদ্ধের কথা। আর তাতে আফানাসি ইভানভিচ যেন পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার দিকে না তাকিয়েই অনেক সময় বলতেন:

'আমি নিজেও যুদ্ধে যাবার কথা ভাবছি; যুদ্ধে যেতে আমার বাধাটা কী আছে?'

'হ্যাঁ যাবেন বললেই গেলেন আর কি!' কথার মাঝখানে বলেন পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না। 'ওঁর কথায় বিশ্বাস করবেন না,' অতিথির উদ্দেশে তিনি বলেন। 'এই বুড়ো বয়সে যুদ্ধে! প্রথম যে সৈন্য সামনে পড়বে সেই ওঁকে গুলি করে মারবে! স্রেফ ও'র দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়বে।'

'তাতে কী আছে?' আফানাসি ইভানভিচ বলেন। 'আমিও তাকে গুলি করে মারব।'

'শুনুন একবার ওঁর কথাটা!' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না তাঁর কথার খেই ধরে বলেন। 'যুদ্ধে যাবেন বললেই হল! ওর পিস্তলগুলোতে বহুকাল হল মরচে ধরে গেছে, গোলাঘরে পড়ে আছে। সেগুলো যদি দেখতেন: তাদের হাল এমনই যে গুলি ছোঁড়ার আগে বারুদ ঠাসতে ঠাসতেই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। হাত খসে যাবে, মুখ বিকৃত হয়ে যাবে, চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে থাকবেন!'

'তাতে কী আছে?' আফানাসি ইভানভিচ বলেন। 'আমি নতুন অস্ত্রশস্ত্র কিনব। আমি তলোয়ার বা কসাকের বর্শা নেব।'

'এসব হল ওঁর কথার কথা। মাথায় হঠাৎ হঠাৎ যা খেলে তাই বলে বসেন,' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না আক্ষেপ করে বলেন। 'আমি ঠিকই জানি উনি ঠাট্টা করছেন, তাহলেও শুনতে ভালো লাগে না। এমন ধারা কথা উনি সব সময় বলেন, কখনও কখনও শুনতে শুনতে ভয়ই লাগে।'

কিন্তু পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নাকে যে কিছুটা ভয় পাইয়ে দিয়েছেন এই ভেবে আফানাসি ইভানভিচ সন্তুষ্ট, তিনি নিজের চেয়ারে ঘাড় গুঁজে বসে বসে হাসেন।

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না যখন অতিথিকে পানভোজনে আপ্যায়ন করতেন তখন তাঁকে আমার সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হত।

'এটা হল উগ্রগন্ধী লতা আর শুল্‌পা শাকের আরক মেশানো ভোদ্‌কা,'

ডিক্যাণ্টারের ছিপি খুলতে খুলতে তিনি বলতেন। 'কাঁধের ফলকের কিংবা কোমরের ব্যথায় খুব কাজে দেয়। আর এটা হল ন্যাপউইডের আরকে: কান ভোঁ ভোঁ করলে আর মুখে দাদ হলে খুব কাজে দেয়। আর এটা চোলাই করা হয়েছে পীচ ফলের বীচি থেকে; এক গ্লাস নিয়ে দেখুন — কী চমৎকার গন্ধ! বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে আলমারি বা টেবিলের কোনায় ধাক্কা খেয়ে কারও মাথা যদি ফুলে যায় তাহলে দুপুরের খাওয়ার আগে ছোট গ্লাসের এক গ্লাস খেয়ে নিলেই হল — আর দেখতে হবে না, তৎক্ষণাৎ সব মিলিয়ে যাবে, মনে হবে কস্মিনকালেও ছিল না।'

এর পর অন্যান্য ডিক্যাণ্টারের অনুরূপ বর্ণনা চলত, আর তাদের প্রায় সবগুলিরই কোন না কোন আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণ থাকত। অতিথিকে এই সমস্ত ওষুধপত্র ঠেসে খাওয়ানোর পর তিনি তাকে নিয়ে আসতেন অসংখ্য প্লেটের সামনে।

'এটা হল সুগন্ধী শাক দিয়ে তৈরি ব্যাঙের ছাতা। এটা লবঙ্গ আর আখরোট দিয়ে; আমাদের এখানে তুর্কী বন্দীরা ছিল, সেই সময় এক তুর্কী মহিলা এই ভাবে নুনে জারাতে শেখায় আমাকে। এত ভালো ছিল সেই তুর্কী মহিলা যে আপনার মনেই হবে না সে ছিল তুর্ক ধর্মে বিশ্বাসী। চালচলন সব প্রায় আমাদেরই মতন; কেবল শুয়োর খেত না এই যা: বলত তাদের ধর্মের কোন্ নিয়মে নাকি বারণ। এ হল বৈঁচির পাতা আর জায়ফল দিয়ে তৈরি ব্যাঙের ছাতা! এটা আবার আরেক জাতের ব্যাঙের ছাতা: এই প্রথম ভিনিগারে জারিয়েছি; জানি না কেমন দাঁড়াল; এর রহস্যটা জেনেছি ফাদার ইভানের কাছ থেকে। একটা ছোট পিপের ভেতরে প্রথমে ওক গাছের পাতা বিছিয়ে দিতে হয়, তারপর ছড়াতে হয় লঙ্কা আর শোরা, শেষে বোঁটা ধরে উপড়ে করে ওপরে ছড়িয়ে দিতে হয় কিছু ফুল। এগুলো হল পিঠে! এটা টকছানার পিঠে! এটা হল পোস্ত বাঁটা, আর এগুলো বড় ভালোবাসেন আফানাসি ইভানভিচ — বাঁধাকপি আর বাকহুইট দিয়ে।'

'হ্যাঁ,' আফানাসি ইভানভিচ যোগ করেন, 'এগুলো আমি খুব ভালোবাসি — নরম আর সামান্য টক-টক।'

মোটের ওপর, বাড়িতে অতিথি এলে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার মেজাজ দারুণ খুলে যেত। বৃদ্ধা ভালোমানুষ! মনপ্রাণ দিয়ে অতিথি সেবা করতেন। তাঁদের কাছে যেতে আমার ভালো লাগত, যদিও মারাত্মক গুরুভোজন হত — যেমন হত তাদের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণকারী সকলের বেলায়। যদিও আমার

পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক, তবু তাঁদের কাছে যেতে পারলে আমি সব সময় খুশি হতাম। সে যাই হোক, আমার এমনও মনে হয় ইউক্রেনের খোদ জল হাওয়ার মধ্যেই কোন বিশেষ ধর্ম আছে কিনা যা খাদ্য পরিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে, কেন না এখানে যদি কেউ ঐ ভাবে অতিভোজনের মতলব করে তাহলে শয্যার বদলে নির্ঘাত তাকে টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।

কী ভালোমানুষ এই বুড়ো-বুড়ি দু'জন! কিন্তু আমার আখ্যায়িকা এগিয়ে চলেছে নিদারুণ বিষণ্ণ ঘটনার দিকে, যে ঘটনার ফলে চিরকালের জন্য এই নিভৃত শান্ত প্রদেশের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটে যায়। পরন্তু, ঘটনাটা লক্ষ করার মতো মনে হবে এই কারণে যে অতি নগণ্য একটা ব্যাপার থেকে তার সূত্রপাত। কিন্তু বস্তুপুঞ্জের অদ্ভুত গঠনব্যবস্থার কারণে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ থেকে সর্বদা বড় বড় ঘটনার উদ্ভব হয়ে থাকে, আবার তার বিপরীতটাও দেখা যায় — বড় বড় উদ্যোগের সমাপ্তি ঘটেছে তুচ্ছ ফলে। কোন বিজেতা তাঁর নিজের জাতির সমস্ত সামরিক শক্তি সংগ্রহ করে হয়ত কয়েক বছর যুদ্ধ করলেন, তাঁর সেনাপতিরা যশ অর্জন করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসবের পরিণামে অর্জিত হল এমন এক টুকরো জমি যেখানে আলু ফলানোরও জায়গা নেই; আবার কখন কখন হয় তার বিপরীত: হয়ত আজেবাজে কোন একটা ব্যাপারে দুই শহরের দুই সসেজ-ব্যাপারীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে গেল আর সেই কলহ শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল শহর দুটিতে, অতঃপর পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে, আর পরে একেবারে গোটা রাজ্য জুড়ে! কিন্তু যাক গে এসব তর্ক-বিচার — এখানে শোভা পায় না। তা ছাড়া নিছক তর্কের খাতিরে তর্ক করা আমি পছন্দ করি না।

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার ছিল একটা ছাইরঙা বেড়াল। বেড়ালটা প্রায় সব সময় কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে থাকত। পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না কখন কখন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, আঙ্গুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিতেন তার ঘাড়ে; লাই-পাওয়া বেড়ালটাও যতটা উঁচু করে পারে ঘাড় বাড়িয়ে দিত। পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না যে তাকে দারুণ ভালোবাসতেন এমন বলা যায় না, তবে নিছক একটা অনুরাগ জন্মে গিয়েছিল, সব সময় তাকে দেখতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আফানাসি ইভানভিচ কিন্তু এ ধরনের অনুরাগ নিয়ে প্রায়ই ছোটখাটো ঠাট্টা করতেন।

'জানি না পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না, বেড়ালের মধ্যে আপনি কী এমন বস্তু দেখতে পান। ওটাকে দিয়ে আপনার কী কাজ হয়? যদি কুকুর পুষতেন তা হলে একটা কথা ছিল: কুকুরকে শিকারে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু বেড়াল কোন্‌ কাজে আসে?'

'আর কথা বলবেন না, আফানাসি ইভানভিচ,' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বলতেন। 'আপনি কেবল কথা বলতে ভালোবাসেন, এর বেশি কিছু নয়। কুকুর অপরিচ্ছন্ন, কুকুর বাড়িঘর নোংরা করে, কুকুর সব জিনিস ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়, কিন্তু বেড়াল নিরীহ জীব, কারও কোন অনিষ্ট করে না।'

অবশ্য সত্যি বলতে গেলে কি, কী কুকুর, কী বেড়াল — আফানাসি ইভানভিচের কাছে সবই সমান; তাঁর এমন কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নাকে নিয়ে খানিকটা মজা করা।

বাগানের পেছনে ছিল তাঁদের বড় বন। অত্যুৎসাহী নায়েব এটাকে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে কুঠারের ঠক ঠক আওয়াজ সরাসরি পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার কানে আসতে পারে। বনটা ছিল নিবিড়, অবহেলিত, প্রাচীন গাছপালার কাণ্ডগুলি বুনো বাদাম গাছের ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গেছে, আর তাতে তাদের চেহারা হয়েছে পায়রাদের ঝোপড়া পায়ের মতো। এই বনে বাস করত বনবেড়ালেরা। যে-সমস্ত ডানপিটে বেড়াল বাড়িঘরের ছাদের ওপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, বনে বসবাসকারী বুনো বেড়ালদের তাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। রুক্ষ স্বভাবচরিত্র সত্ত্বেও শহরে বসবাস করার ফলে তারা বনের অধিবাসীদের তুলনায় অনেক বেশি সভ্য। এরা তার বিপরীত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোমড়ামুখো ও বন্য জাতের; সব সময় রোগা, হাড় জিরজিরে চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, অমার্জিত, রুক্ষ স্বরে মিউ মিউ করে। তারা অনেক সময় মাটির নীচের সুড়ঙ্গ ভেদ করে সোজা গোলাঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, শুয়োরের চর্বি চুরি করে, এমন কি রাঁধুনি ঝোপের আড়ালে কাজ সারতে গেছে লক্ষ করে খোলা জানলা দিয়ে অতর্কিতে লাফিয়ে সরাসরি রান্নাঘরেও এসে হাজির হয়। মোটের ওপর, মহৎ কোন অনুভূতির বালাই তাদের নেই; তারা দস্যুবৃত্তির সাহায্যে জীবন ধারণ করে, ছোট ছোট চড়াই ছানাদের একেবারে তাদের বাসায় নির্মূল করে। এই বিড়ালেরা গোলাঘরের নীচের গর্ত দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে

পুলখেরিয়া ইভানভ্‌নার অমায়িক বিড়ালটির সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি করে, অবশেষে তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়, যেমন বোকা কিষানীকে ফুসলে নিয়ে যায় সৈন্যদল। পুলখেরিয়া ইভানভ্‌না বিড়ালে হারানোর ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, তাকে খোঁজার জন্য লোকজন পাঠালেন, কিন্তু বিড়ালের সন্ধান পাওয়া গেল না। তিন দিন কেটে গেল; পুলখেরিয়া ইভানভ্‌নার সামান্য কষ্ট হল, অবশেষে তিনি তার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এক দিন সবজি বাগান পরিদর্শনের পর আফানাসি ইভানভিচের জন্য কতকগুলি কচি শসা ছিঁড়ে নিয়ে যখন তিনি হাতে করে বাড়ি ফিরছিলেন তখন একটা করুণ মিউ মিউ ডাক কানে যেতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তিবশতই তিনি উচ্চারণ করলেন: 'পুসি, পুসি!' — পরক্ষণেই লম্বা লম্বা আগাছার ভেতর থেকে রোগা, হাড় জিরজিরে অবস্থায় ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে এলো তাঁর ছাইরঙা বিড়ালটি; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে বেশ কয়েক দিন ধরে তার পেটে কিছু পড়ে নি। পুলখেরিয়া ইভানভ্‌না তাকে ডেকে চললেন, কিন্তু বিড়ালটা তার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, মিউ মিউ করতে লাগল, অথচ কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না; দেখা গেল এই সময়ের মধ্যে সে বেশ বন্য হয়ে গেছে। পুলখেরিয়া ইভানভ্‌না বিড়ালটাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চললেন, এবারে সে ভয়ে ভয়ে সোজা বেড়া পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু চলল। অবশেষে পূর্বপরিচিত জায়গা দেখতে পেয়ে ঘরে প্রবেশ করল। পুলখেরিয়া ইভানভ্‌না তৎক্ষণাৎ তাকে কিছু দুধ ও মাংস দিতে বললেন এবং তাঁর বেচারি প্রিয়পাত্রীটি যখন পরম আগ্রহভরে একের পর এক মাংসের টুকরো গিলতে লাগল, চুকচুক করে দুধ খেয়ে চলল তখন তার সামনে বসে তৃপ্তির সঙ্গে তা লক্ষ করতে লাগলেন। ছাইরঙা পলাতকাটি তাঁর চোখের সামনে যেন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল, শেষে খাবারের প্রতি তেমন আর লোভ দেখাল না। পুলখেরিয়া ইভানভ্‌না গায়ে হাত বুলানোর উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ালেন, কিন্তু দেখেশুনে মনে হয় অকৃতজ্ঞ বিড়ালটি ইতিমধ্যে হিংস্র বিড়ালদের সঙ্গে রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে কিংবা এই রোমান্টিক পন্থা অবলম্বন করেছে যে প্রেমে পড়লে প্রাসাদের চেয়ে দারিদ্র্য বরণীয় — আর প্রসঙ্গত, বনবিড়ালরা ছিল চূড়ান্ত রকমের নিঃস্ব — কিন্তু সে যাই হোক না কেন, বিড়ালটা জানলা দিয়ে এক লাফে বাইরে চলে গেল, বাড়ির চাকরবাকররা কেউ তাকে ধরতে পারল না।

বৃদ্ধা ভাবিত হয়ে পড়লেন। 'তার মানে, যম এসেছিল আমাকে নিতে!'

তিনি মনে মনে বললেন, কিছুতেই এই চিন্তা তাঁর মন থেকে দূরে হল না। সারা দিন তিনি বিমর্ষ হয়ে রইলেন। আফানাসি ইভানভিচ বৃথাই হাসিঠাট্টা করলেন, জানতে চাইলেন কেন তিনি হঠাৎ এমন বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন: পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না হয় কোন জবাব দিলেন না, কিংবা এমন জবাব দিলেন যা আফানাসি ইভানভিচের কাছে কোন মতেই সন্তোষজনক ঠেকল না। পর দিন তিনি চোখে পড়ার মতো রোগা হয়ে গেলেন।

'কী হয়েছে আপনার, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না? আপনার অসুখ-বিসুখ হয় নি ত?'

'না, অসুখ আমার হয় নি, আফানাসি ইভানভিচ! একটা বিশেষ ঘটনার কথা আমি আপনাকে জানাতে চাই: আমি জানি যে এই গরমকালেই আমি মারা যাব; যম ইতিমধ্যেই আমাকে নিতে এসেছিল!'

আফানাসি ইভানভিচের দুই ঠোঁটে কেমন যেন একটা যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তা সত্ত্বেও তিনি মনের ভেতরে বিষণ্ণ অনুভূতি চেপে রাখার সংকল্প করে জোর করে হেসে বললেন:

'ভগবান জানেন, আপনি কী বলছেন, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না! ওষুধ হিশেবে আপনি প্রায়ই যে কাথটা খান তার বদলে সম্ভবত পীচ-ভোদ্‌কা খেয়ে ফেলেছেন।'

'না আফানাসি ইভানভিচ, পীচ-ভোদ্‌কা আমি খাই নি,' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বললেন।

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নাকে নিয়ে যে তিনি এমন ঠাট্টা করেছেন এই ভেবে এখন আফানাসি ইভানভিচের দুঃখই হল, তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল, তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'আফানাসি ইভানভিচ, আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমার শেষ ইচ্ছে পূরণ করবেন,' পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বললেন। 'আমি মারা গেলে আমাকে গির্জের বেড়ার কাছে কবর দেবেন। আমাকে পরাবেন সাধারণ পোশাক — ঐ যে যেটার খয়েরী রঙের জমিনের ওপর ছোট ছোট ফুল। টুকটুকে লাল ডোরাকাটা সাটিনের পোশাক আমাকে পরাবেন না: মরে গেলে আর পোশাকের কোন দরকার হয় না। মড়ার কী কাজ তাতে? অথচ ওটা আপনার কাজে লাগতে পারে: ওটা কেটে নিজের জন্য শৌখিন ড্রেসিং গাউন বানিয়ে নেবেন, যাতে বাড়িতে অতিথ-বিতিথ এলে আপনি বেশ ভদ্র বেশে তাদের সামনে হাজির হতে পারেন, তাদের অভ্যর্থনা করতে পারেন।'

'ভগবানই জানেন আপনি কী বলছেন, পুল্খেরিয়া ইভানভ্না।' আফানাসি ইভানভিচ বললেন। 'মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই, কিন্তু এখন থেকেই আপনি এমন কথা বলে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন কেন?'

'না আফানাসি ইভানভিচ, আমি এখন জানি কখন আমার মরণ হবে। যাই হোক, আপনি কিন্তু আমার জন্যে শোক করবেন না: আমি এখন বুড়োমানুষ, যথেষ্ট বেঁচেছি, আর আপনিও বুড়ো, শিগগিরই পরলোকে আমাদের দেখা হবে।'

আফানাসি ইভানভিচ কিন্তু শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'কাঁদা পাপ, আফানাসি ইভানভিচ! নিজেকে পাপগ্রস্ত করবেন না, আপনার শোক দিয়ে ঈশ্বরকে রুষ্ট করবেন না। আমি মারা যাচ্ছি বলে আমার দুঃখ নেই। আমার কেবল একটাই দুঃখ এই যে...' (দীর্ঘশ্বাসের ফলে মুহূর্তের জন্য তাঁর কথায় বাধা পড়ল) 'দুঃখ এই যে জানি না কার ওপর আপনার ভার দেব; আমি মরে যাবার পর কে আপনার দেখাশোনা করবে। আপনি একটা ছোট শিশুর মতন: আপনার পরিচর্যার জন্যে এমন লোকের দরকার যে আপনাকে ভালোবাসবে।'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে প্রকাশ পেল এমন একটা গভীর, এমনই হৃদয়বিদারক, আন্তরিক করুণ ভাব যে সেই মুহূর্তে তাঁকে দেখে কেউ উদাসীন থাকতে পারত বলে আমার মনে হয় না।

ভাণ্ডারকর্ত্রীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। পুল্খেরিয়া ইভানভ্না তাকে বললেন:

'দেখ ইয়াভদোখা, আমি মারা যাবার পর কর্তাকে দেখাশোনা কোরো, তাঁকে চোখের মণির মতো, নিজের সন্তানের মতো দেখবে। দেখবে, উনি যা যা ভালোবাসেন রান্নাঘরে যেন সে সব খাবার তৈরি হয়। ওঁকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় দেবে; অতিথ-বিতিথ এলে উপযুক্ত সাজগোজ করাবে, নইলে উনি হয়ত কোন্ সময় পুরনো ড্রেসিং গাউন পরেই বেরিয়ে পড়বেন, কেন না এখনও উনি প্রায়ই ভুলে যান কবে ছুটি-পার্বণের দিন, আর কবে সাদামাঠা দিন। ওঁকে চোখের আড়াল কোরো না ইয়াভদোখা, আমি পরলোকে তোমার জন্যে প্রার্থনা করব, ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কার দেবেন। ভুলে যাবে না ইয়াভদোখা, তুমি বেশ বুড়ো হয়েছ, আর বেশি দিন তোমার আয়ু নেই, পাপের বোঝা বাড়িও না। ওঁর দেখাশোনা যদি না কর তাহলে জীবনে তুমি শান্তি পাবে না। আমি নিজে ভগবানকে বলব যাতে

তোমার শোচনীয় পরিণতি হয়। তুমি নিজে ত অসুখী হবেই, তোমার সন্তানসন্ততিও অসুখী হবে, আর বংশসুদ্ধ তোমরা কেউই ভগবানের আশীর্বাদ পাবে না।'

বেচারি বৃদ্ধা! সেই সময় তিনি অপেক্ষমাণ পরম মুহূর্তটির কথা ভাবছিলেন না, ভাবছিলেন না নিজের আত্মার কথা, নিজের পরকাল সম্পর্কেও নয়; তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তখন তাঁর হতভাগ্য জীবনসঙ্গী, যাঁর সঙ্গে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, যাঁকে তিনি রেখে যাচ্ছেন সহায়হীন, অবলম্বনহীন অবস্থায়। তিনি অসাধারণ ব্যস্ততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় এমন সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলেন যাতে আফানাসি ইভানভিচ তাঁর অভাব টের না পান। মরণ যে সন্নিকটে এ ব্যাপারে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন এবং তিনি মনেপ্রাণে মৃত্যুর হাতে নিজেকে এতদূর সমর্পণ করে দিয়েছিলেন যে কয়েক দিন বাদে তিনি সত্যি সত্যিই শয্যা নিলেন, কোন খাবারদাবার মুখে তুলতে পারলেন না। আফানাসি ইভানভিচ যত্নের কোন ত্রুটি রাখলেন না, তাঁর শয্যার পাশ থেকে উঠলেন না। 'কিছু খেলে হত না পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না?' তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কী যেন একটা কিছু বলার চেষ্টায় তিনি ঠোঁট নাড়ালেন — তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হল।

আফানাসি ইভানভিচ সম্পূর্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঘটনাটা তাঁর কাছে এত নিদারুণ মনে হল যে তিনি কাঁদতে পর্যন্ত পারলেন না। তিনি ঘোলাটে চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন শবদেহের অর্থ তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না।

শবদেহ টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হল, তিনি নিজে যে পোশাকের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন সেটাই তাঁকে পরানো হল, দু হাত ক্রুশের আকারে ভাঁজ করে হাতে মোমবাতি দেওয়া হল — আর এ সবই আফানাসি ইভানভিচ দেখলেন চেতনাহীন দৃষ্টিতে। নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোকজনের ভিড় জমে গেল আঙ্গিনায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অসংখ্য অতিথির আগমন ঘটল, আঙ্গিনা জুড়ে সাজানো হল টেবিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজে পরিবেশিত বিশেষ খাদ্য, পানীয় আর পিঠের স্তূপে টেবিল ঢাকা পড়ে গেল; অতিথিরা কথাবার্তা বলল, কাঁদল, তাকিয়ে দেখল মৃতাকে, তাঁর গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করল, আফানাসি ইভানভিচের দিকে তাকাল; কিন্তু তিনি নিজে এসবই

দেখছিলেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে। অবশেষে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হল, কাতারে কাতারে লোকজন তার অনুগমন করল। যাজকদের পরনে ছিল পুরোদস্তুর সাজ, সূর্যের আলো ঝলমল করছিল, দুধের শিশুরা তাদের মায়েদের কোলে কাঁদছিল, চাতক পাখিরা গান গাইছিল, বাচ্চারা কেবল শার্ট গায়ে দিয়ে রাস্তার ওপর মাতামাতি করছিল। অবশেষে গর্তের ওপর কফিন রাখা হল, তাঁকে এগিয়ে গিয়ে শেষ বারের মতো সহধর্মিণীকে চুম্বন করতে বলা হল; তিনি এগিয়ে গিয়ে চুম্বন করলেন, তাঁর চোখে জল দেখা গেল, কিন্তু সে জল ছিল কেমন যেন নিরাবেগ। কফিন নামিয়ে দেওয়া হল, যাজক কোদাল হাতে নিলেন, প্রথম মাটির আঁজলা ঢাললেন তিনি, একজন সহকারী যাজক আর গির্জার দুজন কর্মচারী সমবেত গম্ভীর কণ্ঠে, নির্মল, মেঘমুক্ত আকাশের নীচে টেনে টেনে গাইলেন অবিনশ্বর স্মৃতির গীত, কবর খননকারীরা কোদাল হাতে কাজে লেগে গেল, দেখতে দেখতে গর্ত বুজে গিয়ে মাটির সঙ্গে সমতল হয়ে এলো — ঠিক এই সময় তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন; সকলে সরে গিয়ে তাঁকে জায়গা করে দিল; তাঁর অভিপ্রায় জানার জন্য লোকে তখন ব্যগ্র। তিনি চোখ তুললেন, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন: 'আপনারা দেখছি ওকে একেবারেই কবর দিয়ে দিলেন! কেন?' তিনি থমকে দাঁড়ালেন, তাঁর বক্তব্য আর শেষ করতে পারলেন না।

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর ঘর শূন্য, এমন কি যে চেয়ারটাতে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না বসতেন সেটা পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তখন তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদলেন, ডুকরে কাঁদলেন; তাঁর সে কান্না ছিল সান্ত্বনাহীন, তাঁর ঘোলাটে চোখ থেকে দরদর ধারে বয়ে চলল অশ্রুর বন্যা।

এই ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটে গেল। সময়ে কোন্ শোকই না প্রশমিত হয়? সময়ের সঙ্গে অসমান যুদ্ধে কোন্ আবেগেরই বা পরিত্রাণ আছে? আমি এক ব্যক্তিকে জানতাম — তার যৌবনের শক্তির তখন সবে স্ফুরণ ঘটছিল, সে ছিল খাঁটি মহত্ত্বের এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের আধার; আমি জানতাম যে সে প্রেমে পড়েছে, আর তার সেই প্রেম ছিল কমনীয়, উদগ্র, প্রমত্ত, দুঃসাহসী, সরল। কিন্তু আমার সমক্ষে, প্রায় আমারই চোখের সামনে তার ভালোবাসার পাত্রী — দেবী প্রতিমার মতো সুন্দরী ও কোমল মেয়েটি — মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হল। যে ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার

বিক্ষোভে, যে প্রমত্ত বিষণ্ণতার দহনে, যে সর্বগ্রাসী হতাশায় এই হতভাগ্য প্রেমিকটি নিপীড়িত হচ্ছিল তেমন আমি কদাচ দেখি নি। আমি কখনও ভাবতেই পারি নি যে মানুষ নিজের জন্য কখনও এমন নরক সৃষ্টি করতে পারে যেখানে নেই কোন ছায়া, নেই কোন মূর্তি, এমন কিছুই নেই যাকে আশার চিহ্নমাত্র বলা যেতে পারে।... বাড়ির লোকেরা তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করত; যা দিয়ে সে আত্মহত্যা করতে পারে এমন সমস্ত অস্ত্রই তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়। দু সপ্তাহ বাদে সে হঠাৎ ধাতস্থ হল: হাসিঠাট্টা করতে লাগল। তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হল, আর সেই স্বাধীনতার প্রথম সুযোগেই সে যা করল তা হল পিস্তল কেনা। একদিন আচমকা গুলির আওয়াজ শুনে তার আত্মীয়স্বজন ভয়ানক আতঙ্কিত হল। তারা ছুটে ঘরে এসে দেখতে পেল মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় সে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। ভাগ্যক্রমে তখন হাতের কাছে এমন একজন ডাক্তার পাওয়া গেল যাঁর হাতযশ তখনকার দিনে জনসাধারণের মুখে মুখে চলত; তিনি তার মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখতে পেলেন, আবিষ্কার করলেন যে আঘাতটা মারাত্মক নয় এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে তিনি তাকে সারিয়ে তুললেন। তার ওপর আরও কড়া নজর রাখা হতে লাগল। এমন কি টেবিলে খেতে বসার সময় পাশে ছুরি পর্যন্ত রাখা হত না এবং যে-সমস্ত জিনিস দিয়ে সে নিজের ওপর আঘাত হানতে পারে সে সবই দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হত; কিন্তু শিগগিরই সে আরও একটা সুযোগ বার করল — চলন্ত গাড়ির চাকার তলায় ঝাঁপ দিল। তার হাত-পা ভাঙল; কিন্তু এবারেও তাকে সারিয়ে তোলা হল। এর এক বছর পরে আমি তাকে দেখতে পাই এক জনাকীর্ণ হল-ঘরে: সে টেবিলের ধারে বসে একটা তাসের ওপর চাল দিয়ে ফুর্তির সঙ্গে বলছিল: 'পেতি ওউভের', আর পেছনে, তার চেয়ারের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার তরুণী বধূটি পয়েণ্টের হিসাব রাখছিল।

পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার মৃত্যুর পর যে পাঁচ বছর কালের উল্লেখ আমরা করেছি তা অতিক্রান্ত হলে একবার আমি ঐ অঞ্চল দিয়ে যাবার সময় আফানাসি ইভানভিচের ছোট খামারবাড়িতে নামলাম। উদ্দেশ্য ছিল দেখা করে যাই আমার বৃদ্ধ প্রতিবেশীটির সঙ্গে, যাঁর সান্নিধ্যে এক কালে আমার মধুর দিন কেটেছে, যাঁর বাড়িতে সহৃদয় গৃহকর্ত্রীর হাতের ভালো ভালো তৈরি খাবার আমি সব সময় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ খেয়েছি। আমার

গাড়ি যখন আঙ্গিনার কাছাকাছি এলো তখন বাড়িটা আমার কাছে দ্বিগুণ পুরনো মনে হল, কৃষকদের কুঁড়ে ঘরগুলি পুরোপুরি একপাশে হেলে পড়েছে — নিঃসন্দেহে সেগুলির মালিকদেরই মতো; খুঁটি ও ডালপালার বেড়া একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, আমি নিজের চোখে দেখলাম রাঁধুনি উনুন জ্বালানোর জন্য সেখান থেকে কাঠি টেনে বার করছে, অথচ আর মাত্র দু পা এগোলেই গাদা-করা শুকনো ডালপালার নাগাল সে পেতে পারে। আমার গাড়ি যখন দেউড়ির দিকে এগিয়ে চলল তখন আমার মন বিষাদে ভরে গেল; ঐ একই সমস্ত দো-আঁশলা এবং অন্যান্য জাতের কুকুর চোরকাঁটায় জড়ানো তাদের ঢেউ খেলানো লেজ ওপরে তুলে ডাকতে শুরু করল — তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে অন্ধ হয়ে গেছে, কারও বা পা ভাঙা। আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। আরে এ যে উনি! আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিনতে পারলাম; কিন্তু তিনি আগের চেয়ে এখন দ্বিগুণ কুঁজো হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন এবং সেই একই পরিচিত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি তাঁর পেছন পেছন ঘরে প্রবেশ করলাম; মনে হচ্ছিল ঘরের সব কিছুই যেন ছিল আগেকার মতো; কিন্তু আমি সবের মধ্যে লক্ষ করলাম কেমন যেন একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা, কিসের যেন একটা অনুভবযোগ্য অভাব, অর্থাৎ এককালে যে ব্যক্তিকে তার জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে জানতাম, সেই রকম কোন বিপত্নীকের গৃহে প্রথম প্রবেশ করলে যে অদ্ভুত অনুভূতি আমাদের আচ্ছন্ন করে, আমি তা অনুভব করলাম। যে মানুষকে আমরা চিরকাল সুস্থ বলে জেনে এসেছি তাকে পা-কাটা অবস্থায় চোখের সামনে দেখতে পেলে যেমন হয় এই উপলব্ধি অনেকটা তার মতো। সর্বত্র লক্ষ করা যাচ্ছিল যত্নপরায়ণা পুলখেরিয়া ইভানভ্‌নার অনুপস্থিতি: টেবিলে দেওয়া হল একটা হাতল-ছাড়া ছুরি; খাবারদাবার রান্না করার মধ্যে আর তেমন একটা নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল না। গৃহস্থালি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করার কোন প্রবৃত্তিই আমার হল না, এমন কি খামার বাড়ির দিকে তাকাতেও আমার ভয় হচ্ছিল।

আমরা যখন খেতে বসলাম তখন এক চাকরানী আফানাসি ইভানভিচকে একটা ন্যাপকিন জড়িয়ে দিল — দিয়ে খুব ভালোই করেছিল, কেন না তা না হলে চাটনি পড়ে তাঁর পুরো ড্রেসিং গাউনটা মাখামাখি হয়ে যেত। আমি একটা কিছু নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলাম, নানা

রকমের খবর তাঁকে দিলাম, তিনি সেই আগের মতোই সহাস্যবদনে শুনতে লাগলেন, কিন্তু সময়ে তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অনুভূতিশূন্য, সে দৃষ্টির ভেতরে কোন ভাবনাচিন্তা আলোড়িত হচ্ছিল না, অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি প্রায়ই চামচে করে জাউ তুলছিলেন, কিন্তু মুখের কাছে নিয়ে আসতে গিয়ে চামচটা এসে ঠেকছিল নাকের কাছে; নিজের হাতের কাঁটাটা মুরগীর মাংসের টুকরোতে বেঁধাতে গিয়ে জলের পাত্রের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলছিলেন, তখন চাকরানীটি তাঁর হাত ধরে কাঁটাটা এগিয়ে দিল মুরগীর মাংসের টুকরোর দিকে। কখন কখন পরবর্তী খাদ্যবস্তুটার জন্য আমাদের কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। আফানাসি ইভানভিচ নিজেই ব্যাপারটা লক্ষ করে বলছিলেন: 'খাবার আনতে এত দেরি হচ্ছে কেন?' কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে ছোকরা চাকরটার খাবার আনার কথা সে আদৌ এ বিষয়ে ভাবছিল না, বেঞ্চের ওপর মাথা ঠেকিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছিল।

'আর এই যে এ খাবারটা...' ননী দিয়ে ছানার পুডিং পরিবেশন করা হলে বললেন আফানাসি ইভানভিচ, 'এই খাবারটা...' তিনি আবার বললেন, আর আমি লক্ষ করলাম যে তাঁর গলা কাঁপতে শুরু করেছে, তাঁর সীসার মতো চোখজোড়া থেকে অশ্রুরাশি উদ্গত হওয়ার উপক্রম করছে, কিন্তু তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে তা ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'এ খাবারটা পছন্দ করতেন প... প... পরলোক... পরলোকগতা...' বলতে বলতে তিনি ভেঙ্গে পড়লেন উচ্ছ্বসিত কান্নায়। তাঁর হাত ঠক করে এসে পড়ল থালার ওপর, থালা উলটে, ছিটকে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তাঁর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চাটনি; তিনি বসে রইলেন সংজ্ঞাহীনের মতো, সংজ্ঞাহীনের মতো ধরে রইলেন চামচ, অঝোর ধারায় উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মতো, জলধারার মতো অবিরাম বয়ে চলল অশ্রুর বন্যা পাতা ন্যাপকিনটার ওপর দিয়ে।

'হা ভগবান!' তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম, 'সর্বগ্রাসী পাঁচ বছর সময় — এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন চেতনাহীন। কোন তীব্র মানসিক যন্ত্রণা যাঁকে সম্ভবত একবারও ভুগতে হয় নি, যাঁর সারা জীবন বলতে সম্ভবত ছিল কেবল উঁচু চেয়ারে বসে থাকা, শুকানো মাছ আর নাশপাতি খাওয়া এবং ভালো ভালো গল্প বলা — তাঁর ওপর কিনা এত দীর্ঘকালীন, এত তীব্র বেদনার বোঝা! আবেগের, না অভ্যাসের — কার প্রতিক্রিয়া আমাদের ওপর বেশি? নাকি আমাদের যত তীব্র আবেগের

প্রবাহ, আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর উদগ্র কামনা-বাসনার যত ঘূর্ণিবায়ু আমাদের উপযুক্ত বয়সের পরিণাম মাত্র এবং কেবল এই কারণেই তা গভীর ও ধ্বংসাত্মক মনে হয়?' সে যাই হোক না কেন, তখন কিন্তু এই দীর্ঘ, মন্থর, প্রায় নিরাবেগ অভ্যাসের তুলনায় আমার কাছে আমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগ শিশুসুলভ মনে হয়েছিল। কয়েক বার তিনি পরলোকগতার নাম উচ্চারণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু শব্দের অর্ধপথে তাঁর শান্ত ও সাধারণ মুখের পেশী আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আর তাঁর শিশুসুলভ কান্না সোজা এসে বিঁধতে লাগল আমার মর্মে। না, এ সেই অশ্রু নয় যা ঝরানোর ব্যাপারে বৃদ্ধেরা সচরাচর অকৃপণ, যখন তাঁরা তাঁদের করুণ অবস্থা ও দুর্ভাগ্যের পরিচয় আপনার কাছে দেন; এ সেই অশ্রুও নয় যা তাঁরা এক গ্লাস পাঞ্চ পান করতে করতে ঝরান; না! এ ছিল সেই অশ্রু যা কোন জিজ্ঞেসবাদের অপেক্ষা রাখে না, যা ইতিমধ্যে জুড়িয়ে-আসা এক হৃদয়ের প্রবল জ্বালায় সঞ্চিত হয়ে আপনাআপনিই বয়ে চলে।

এর পর তিনি আর বেশি দিন বাঁচেন নি। সম্প্রতি আমি তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেলাম। অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু এই যে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার মৃত্যুর পরিস্থিতির সঙ্গে আফানাসি ইভানভিচের মৃত্যুর পরিস্থিতির কোথায় যেন একটা মিল ছিল। একদিন আফানাসি ইভানভিচ বাগানে সামান্য বেড়ানোর সংকল্প করলেন। তিনি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসবশত নিশ্চিন্ত মনে, সম্পূর্ণ ভাবনাচিন্তাশূন্য মনে ধীরে ধীরে পথের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন তাঁর পেছন থেকে কে যেন রীতিমতো স্পষ্ট গলায় বলে উঠল: 'আফানাসি ইভানভিচ!' তিনি ফিরে তাকালেন, কিন্তু কোন জনপ্রাণীকে দেখতে পেলেন না, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঝোপের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন — কোথাও কেউ নেই। দিনটা শান্ত, সূর্য আলো দিচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য তিনি ভাবিত হয়ে পড়লেন; তার চোখেমুখে খেলে গেল কেমন যেন একটা উদ্দীপনা, তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন: 'পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না আমাকে ডাকছেন!'

কোন না কোন সময় আপনার নাম ধরে কোন কণ্ঠের ডাক শুনতে পাওয়ার ঘটনা আপনাদের সকলেরই জীবনে নিঃসন্দেহে ঘটেছে। সাধারণ লোকে এই ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলে থাকে যে কোন আত্মা নাকি কোন ব্যক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লে তাকে আহ্বান করে, আর এই আহ্বানের

পর আহত ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই রহস্যজনক আহ্বান আমার কাছে চিরকালই ছিল আতঙ্কজনক। আমার মনে আছে যে ছেলেবেলায় প্রায়ই তা শুনতে পেতাম: কখন কখন স্পষ্ট শুনতে পেতাম পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। সচরাচর এই দিনটি হত একেবারে ঝলমলে, রৌদ্রোজ্জ্বল; বাগানে গাছের একটা পাতাও নড়ছে না, কবরের নিস্তব্ধতা, এমন কি ফড়িংয়ের গুঞ্জনও সেই সময় থেমে গেছে, বাগানে কোন জনপ্রাণী নেই; কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ রাতে, দুর্গম অরণ্যের মাঝখানে একা প্রবল কোন নারকীয় শক্তির কবলে পড়লেও আমি এতটা আতঙ্কিত হতাম না যেমন হয়ে পড়ি মেঘশূন্য দিনের বেলায় এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায়। আমি তখন নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাগান থেকে ছুট দিতাম, আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম একমাত্র তখনই যখন সামনে দেখতে পেতাম কোন মানুষকে — তাকে দেখে আমার মনের এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা বোধ দূর হত।

তিনি তাঁর মনের এই বিশ্বাসের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন যে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌না তাঁকে ডাকছেন; তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এক বাধ্য শিশুর মতো, দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন, কাশতে লাগলেন, গলে যেতে লাগলেন মোমবাতির মতো এবং অবশেষে যখন দুর্বল শিখাকে জ্বালিয়ে রাখার মতো কিছু আর অবশিষ্ট রইল না তখন মোমবাতির মতোই নিঃশেষিত হয়ে নিভে গেলেন। 'আমাকে পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার পাশে শুইয়ে দিও,' মৃত্যুর প্রাক্কালে কেবল এই কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করলেন।

তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা হল, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল গির্জার কাছে, পুল্‌খেরিয়া ইভানভ্‌নার কবরের পাশে। এবারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অতিথি তেমন একটা হল না, তবে সাধারণ লোকজন আর ভিখারির দল ছিল সেই রকমই অগণিত। জমিদারবাড়ি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেছে। বাদবাকি যে-সমস্ত প্রাচীন জিনিস ও অকেজো আসবাবপত্র ভাণ্ডারকর্ত্রী সরাতে পারে নি, উদ্যোগী নায়েব আর মোড়লে মিলে সেগুলি নিজেদের বাড়িতে এনে তুলল। অচিরেই, কোথা থেকে কে জানে, তালুকের উত্তরাধিকারী হয়ে এলো কোন এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। অবসরপ্রাপ্ত জনৈক লেফটান্যাণ্ট — কোন্ রেজিমেণ্টের মনে করতে পারছি না — এই লোকটি

ছিল ঘোর সংস্কারক। সে তৎক্ষণাৎ জমিদারীর ব্যবস্থাপনায় চরম অব্যবস্থা ও ত্রুটি দেখতে পেল; অবিলম্বে এ সব নির্মূল ও সংশোধন করার এবং সুব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্কল্প নিল। সে ছয়টি চমৎকার বিলিতি কাস্তে কিনল, প্রতিটি কুটিরের গায়ে পেরেক পুঁতে বিশেষ নম্বর লাগাল এবং অবশেষে এমনই সুবন্দোবস্ত করল যে ছয় মাসের মধ্যে জমিদারী চলে গেল ট্রাস্টির হাতে। কিন্তু ট্রাস্টিসম্প্রদায় (জনৈক প্রাক্তন ডেপুটি, এবং রঙ চটা উর্দি পরনে কোন এক স্টাফ ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গঠিত) অল্পকালের মধ্যে সমস্ত মুরগী আর ডিম সরিয়ে ফেললেন। মাটিতে পড়-পড় কুটিরগুলি শেষে একেবারে ধসে পড়ল; চাষীরা হন্দ মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তাদের অধিকাংশই পলায়ন করল। সম্পত্তির যিনি যথার্থ অধিকারী, তিনি নিজে কিন্তু তাঁর ট্রাস্টিদের সঙ্গে দিব্যি নির্বিবাদে বাস করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিলে পাঞ্চ পান করতেন, নিজের গাঁয়ে আসতেন কালেভদ্রে—এলেও বাস করতেন অল্পকাল। আজও ইউক্রেনের যেখানে যে মেলা হয়, সেখানে তিনি সফর করে বেড়ান, ময়দা, শণ, মধু ইত্যাদি নানা ধরনের বড় বড় পাইকারী জিনিসের দাম সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেন। অথচ কেনেন কেবল যত রাজ্যের ছোটখাটো হাবিজাবি জিনিস — এই যেমন, চকমকি পাথর, পাইপ সাফ করার কাঁটা -- মোটের ওপর এমন সমস্ত জিনিস সাকুল্যে যেগুলির দাম এক রুবলের বেশি হবে না।

তারাস বুলবা

১

'ঘুরে দাঁড়াও ত, বাছা! এ কী রকম সং সাজা হয়েছে! পুরুতদের আলখাল্লার মতো কী পরেছ এটা? আকাদমিতে*) সবাই এমনি সাজে না কি?' এই কথা বলে বৃদ্ধ বুলবা স্বাগত জানালেন তাঁর দুই ছেলেকে; তারা কিয়েভ সেমিনারিতে*) শিক্ষা শেষ করে গৃহে তাদের পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে।

ছেলেরা সবে ঘোড়া থেকে নেমেছে। বলিষ্ঠ দুটি যুবক, চোখের দৃষ্টিতে তখনও সলজ্জভাব, সম্প্রতি পাশ-করা সেমিনারির ছাত্রদের মতো। তাদের সবল সুস্থ মুখ পুরুষের প্রথম উদ্‌গত শ্মশ্রুরাজিতে আবৃত, এখনও তাতে ক্ষুর পড়ে নি। পিতার এই অভ্যর্থনায় তারা ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে গেল, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! ভালো করে তোমাদের দেখে নিতে দাও,' ছেলেদুটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বুলবা বলে চললেন, 'এ আবার কেমন লম্বা লম্বা পোশাক গায়ে চড়ানো হয়েছে! পোশাক বটে! এমন পোশাক দুনিয়ায় কেউ কখনো দেখে নি। তোমাদের একজন একটু দৌড়াও ত! দেখি একবার আলখাল্লায় জড়িয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড় কি না।'

'হেসো না বলছি, হেসো না, বাবা!' বড় ছেলেটি শেষটায় বলেই ফেলল।

'দেখ একবার, তেজ কত! হাসব না কেন, শুনি?'

'তুমি আমার বাবা হলেও যদি হাস তবে ভগবানের দিব্যি, ধরে ঠেঙ্গানি দেব!'

'কী বললি, ব্যাটা হারামজাদা, মারবি বাবাকে?...' কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তারাস বুলবা বললেন অবাক হয়ে।

'হলেই বা বাবা। অপমান করলে আমি কাউকে গ্রাহ্যি করি না।'

'কী ভাবে লড়তে চাস তুই আমার সঙ্গে? ঘুষোঘুষি?'

'যা দিয়ে খুশি, হলেই হল।'

'তাহলে ঘুষোঘুষিই হোক,' আস্তিন গুটিয়ে বললেন তারাস বুলবা। 'দেখব আমি তোর ঘুষির কত জোর হয়েছে!'

দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পর প্রীতিমিলনের পরিবর্তে পিতা-পুত্র পরস্পরকে পাঁজরে, কোমরে ও বুকে ঘুষি চালাতে লাগল, এক একবার পিছিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখে, আবার এগিয়ে এসে আক্রমণ করে।

'ওগো ভালোমানুষেরা দেখ একবার, বুড়োর বুদ্ধিলোপ হয়েছে! একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন ছেলেদের বিবর্ণা, শীর্ণা ও স্নেহময়ী মা; এখনও তিনি তাঁর প্রাণাধিক ছেলেদের আলিঙ্গন করতে পারেন নি। 'ছেলেরা বাড়ি এলো, একবছরের ওপর তাদের দেখি নি, আর হায় ভগবান, ওনার মাথায় ঢুকল কী না ঘুষোঘুষি!'

'নাঃ বেড়ে লড়ছে!' বুলবা থেমে গিয়ে বললেন, 'ভগবানের দিব্যি, খুব ভালো!' দম নিতে নিতে তিনি বলতে লাগলেন, 'এত ভালো যে লড়াইটা না বাধালেই হত। খাসা কসাক হবে বটে! এসো, বাছা আমার, স্বাস্থ্য অটুট হোক! এসো এবার আমরা চুমু খাই!' পিতা-পুত্র পরস্পরকে চুম্বন করতে লাগল। 'ঠিক করেছ, বেটা! সকলকে এই রকম ঠেঙ্গাবে, যেমন আমাকে ঠেঙ্গালে। কাউকে ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু যাই বলো তোমার পোশাকটি দেখলে হাসি পায়: এটা আবার কী ঝুলছে দড়ির মতো? আর তুই, বোকারাম, অমন হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' ছোট ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন। 'কিরে ব্যাটা, কুত্তার বাচ্চা, দুচার ঘুষি দিবি না আমাকে?'

'তোমার যত ভাবনা সব ওই!' বললেন মা। ইতিমধ্যেই তিনি ছোট ছেলেটিকে বুকে টেনে নিয়েছেন, 'কে কবে শুনেছে যে বাচ্চারা আপন বাপকে ঠেঙ্গাবে? এখন যেন আর কোন কাজ নেই। ঐ ত ছেলেমানুষ, এসেছে এত দূর থেকে, এলিয়ে পড়েছে... (ছেলেমানুষটির কিন্তু বয়স কুড়ি পার হয়ে গেছে, পাকা ছয় ফুট লম্বা।) এখন একটু জিরুবে, কিছু খাবে-দাবে, তা না উনি বলছেন ঘুষি চালাতে!'

'এঃ, এটা দেখছি একেবারে দুধের খোকা!' বুলবা বললেন। 'ওরে বেটা, মায়ের কথা শুনিস নে: ও মেয়েলোক, কিছুই জানে না। কচি ছেলে হয়ে থাকবি সারা জীবন? তোদের জীবন — খোলা মাঠ আর

তেজী ঘোড়া: এই হল তোদের জীবন! আর দেখছিস এই তরোয়াল — এই হল গে তোদের মা! যত হাবিজাবি দিয়ে তোদের মাথাটা ভরা হচ্ছে; আকাদমি, বই-পত্তর, পাঠ্য-বই, দর্শনবিদ্যা — যত সব বাজে মাল! থুথু...' এখানে বুলবা এমন একটি কথা লাগালেন যা ছাপানো যায় না। 'দেখছি তোদের পরের সপ্তাহেই পাঠাতে হবে জাপোরোজ্‌য়েতে।*) সেখানে পাবি শিক্ষার মতো শিক্ষা! সেখানেই তোদের স্কুল; সেখানেই বুদ্ধি খুলবে তোদের।'

'মাত্র এক সপ্তাহ থাকবে ওরা বাড়িতে?' বৃদ্ধা শীর্ণা মা সজলচক্ষে শোকার্তস্বরে বললেন। 'বাছারা একটু আমোদ করতে পাবে না, পাবে না নিজেদের ঘর-বাড়ি চিনে নিতে, আর আমিও যে চোখ ভরে ওদের একটু দেখব, তার সময় থাকবে না।'

'ঢের হয়েছে নাকি-কান্না, ঢের হয়েছে বুড়ি! কসাকের কাজ নয় মেয়েদের সঙ্গে থাকা। তুমি ত চাও ওদের আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে, ওদের ওপর চেপে বসে মুরগীর মতো ডিমে তা দিতে। যাও, যাও এখন, যা কিছু খাবার-দাবার আছে সাজিয়ে ফেল। তোমার ও পিঠে-পুলি মিঠাই মণ্ডা, ওসব মিষ্টান্ন আমাদের চাই না। নিয়ে এসো আস্ত ভেড়া, একটা ছাগল, আর চল্লিশ বছরের পুরনো মধু! আর নিয়ে এসো ভোদ্‌কা, যত পারো, তোমার ওই কিসমিস বা ছাইভস্ম মেশানো নয়, একদম খাঁটি ফেনিয়ে ওঠা ভোদ্‌কা, যা ঝলমল করবে, সিঁ সিঁ করবে ক্ষ্যাপার মতো।'

বুলবা তাঁর ছেলেদের নিয়ে গেলেন বাড়ির বড় ঘরটায়; গলায় নিখাদ সোনার হার পরা দুটি সুন্দরী তরুণী দাসী সেখান থেকে ঘর গোছানো ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল। হয়ত তারা ভয় পেয়েছিল এই কড়া মেজাজের ছোট কর্তাদের আগমনে, অথবা পুরুষ দেখলেই চিৎকার করে সবেগে পালানো ও তারপর লজ্জায় অনেকক্ষণ ধরে জামার আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার যে মেয়েলী প্রথা আছে তারা হয়ত সেটাই পালন করেছিল। বড় ঘরটি সাজানো সেই অতীত এক যুগের রুচিতে — গ্রাম্যজন-পরিবৃত হয়ে বান্দুরার মৃদু গুঞ্জনের তালে ইউক্রেনে একদা শ্মশ্রুধারী অন্ধ বৃদ্ধ চারণেরা যে সব গান গেয়ে শোনাত এবং যে গান আর এখন শোনা যায় না, সেই সব গান ও লোক-গাথাতেই শুধু বেঁচে আছে সেই যুগটা। ঘরটি সাজানো সেই কঠিন, সামরিক যুগের রুচিতে, যখন ইউক্রেনে শুরু হয়েছিল গির্জার ঐক্যধর্ম প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘর্ষ।*) ঘরের চারদিক তকতকে,

রঙীন মাটির প্রলেপ দেওয়া। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো আছে তরোয়াল, ঘোড়ার চাবুক, পাখি ও মাছ ধরার জাল, বন্দুক, চমৎকার পালিশ করা বারুদ রাখার শিঙ্গা, ঘোড়ার মুখের সোনার লাগাম ও রুপো-বাঁধানো বাঁধন-দাড়ি। ঘরের জানালাগুলি ছোট ছোট, তাতে গোলাকৃতি অস্পষ্ট শার্শি-কাচ লাগানো। এরকম শার্শি এখনও দেখা যায় কেবল পুরনো গির্জাঘরে, ঠেলে না তুললে তার ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা অসম্ভব। জানলা ও দরজা ঘিরে লাল রঙের বেড়। ঘরের কোণের তাকগুলিতে সাজানো সবুজ ও নীল কাচের কলসী, বোতল, জলপাত্র, রুপোর কাজ করা পানপাত্র, সোনার ঝাল দেওয়া নানা ধরনের কাজ করা ভিনিসীয়, তুর্কী, চেরকেসীয়, চুমুকের বাটি: এগুলি বুলবার ঘরে এসে পৌঁছেছে নানা বিচিত্র পথে, তিন-চার হাত ঘুরে, — সেই সাহসিকতার যুগে এটা ছিল অতি সাধারণ। ঘরের ভিতরে চারদিকে এল্মকাঠের বেঞ্চি, সামনের কোণে আইকনের নীচে প্রকাণ্ড টেবিল; প্রশস্ত চুল্লী, তার বিভিন্ন অংশ, কোনোটা বেরিয়ে আসা ও কোনোটা ভেতরে-ঢোকানো, বিচিত্র বর্ণের টালি দিয়ে ঢাকা — এ সমস্তই আমাদের দুটি তরুণের কাছে খুবই পরিচিত। তারা প্রতিবছর ছুটির সময় পায়ে হেঁটে আসত; পায়ে হেঁটে, কেননা তাদের তখনও ঘোড়া ছিল না, সেমিনারির ছাত্রদের ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি তখন ছিল না। লম্বা চুলের ঝুঁটিই ছিল তাদের বয়স হওয়ার একমাত্র প্রমাণ এবং অস্ত্রধারী যে-কোন কসাকের অধিকার ছিল তা ধরে টানার। পাশ করে বেরোবার পরেই কেবল বুলবা তাঁর ঘোড়ার পাল থেকে একজোড়া জোয়ান ঘোড়া তাদের পাঠিয়ে দেন।

যে সব স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডার আর তাঁর রেজিমেণ্টের যে সব অফিসার তখন সেখানে ছিলেন তাদের সকলকে ছেলেদের বাড়ি ফেরার উপলক্ষে বুলবা আমন্ত্রণ করলেন; তাদের মধ্যে দু'জন এবং তাঁর পুরনো বন্ধু কসাক-ক্যাপ্টেন দ্‌মিত্রো তভ্‌কাচ আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের কাছে নিজের ছেলেদুটিকে উপস্থিত করে বললেন, 'দেখুন, কী বাহাদুর ছেলে এরা! আমি শিগগিরই এদের সেচ্‌-এ পাঠাব।' অতিথিরা বুলবাকে ও যুবকদুটিকে অভিনন্দন জানালেন, বললেন যে কাজটা ঠিকই হচ্ছে, যুবকদের পক্ষে জাপোরোজ্‌য়ের সেচ্‌-এর চেয়ে ভালো শিক্ষালয় নেই।

'তাহলে অফিসার ভাই সব, আপনারা সবাই টেবিলে বসে পড়ুন, যার যেখানে খুশি। ওরে ছেলেরা, প্রথমে কিছুটা ভোদ্‌কা খাওয়া যাক।' বললেন

ব্লবা। 'ভগবান মঙ্গল কর্ন! তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য — অস্তাপ, তোমার, আর আন্দ্রি, তোমার; ভগবান কর্ন যেন তোমরা সর্বদা যুদ্ধে জয়ী হও! যত বিধর্মী, হোক তারা তুর্কী, হোক তারা তাতার, ঠেঙ্গাবে তাদের। আর পোলদেরও, যদি তারা আমাদের ধর্মে হাত দিতে শুরু করে। পাত্র এগিয়ে দাও না হে, ভোদ্‌কাটা কি ভালো নয়? বল ত, ভোদ্‌কাকে কী বলে লাতিনে? দেখলে ত, ছেলেরা, লাতিনরা কী রকম মূর্খ ছিল, তারা জানতই না যে পৃথিবীতে ভোদ্‌কা বলে বস্তু আছে। আর সেই লোকটার নাম কি, যে লাতিন কবিতা লিখত? আমার বিদ্যের দৌড় ত বেশি নয়, তাই ঠিক জানি না: হোরেস, নয় কি?'

'বাবা যেন কী!' বড় ছেলে অস্তাপ নিজের মনে ভাবল। 'বুড়ো ঘুঘু জানেন সব, আর দেখান যেন কিছুই জানেন না।'

'আর্খিমান্দ্রিত*) তোমাদের ভোদ্‌কা একটু শুঁকতেও দেয় নি বোধ হচ্ছে,' তারাস বলে চললেন। 'আর কবুল করে ফেলো ত দেখি বাছারা — তাজা চেরি আর বার্চের ছড়ি দিয়ে কী রকম পিটুনিটা দিয়েছে, কসাকের পিঠ আর গতরের যেখানে পেরেছে সেখানে? বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেলে লাঠিপেটাও করেছে আশা করি? তা শুধু কেবল শনিবারে নয়, বোধ হচ্ছে বুধ ও বৃহস্পতিবারেও?'

'আগের কথা পেড়ে কি হবে, বাবা,' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল অস্তাপ, 'যা হয়ে গেছে তা ফুরিয়ে গেছে!'

'এখন একবার লেগে দেখুক না,' আন্দ্রি বলল, 'আসুক না কেউ এখন খোঁচাতে। কোন একটা তাতারের একবার দেখা পেলে হয়, তাকে দেখিয়ে দেব কসাকের তরোয়াল কি জিনিস!'

'বেশ বলেছ, বেটা! ভগবানের দিব্যি, বলেছ বেশ! তবে তোমরা যখন যাবেই, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব! হে ঈশ্বর, আমিও যাব! কিসের জন্যে শালা আমি পড়ে থাকব এখানে? থাকব কি শুধু গমের চাষ করতে, ঘরের দেখাশোনা করতে, ভেড়া-শুয়োর চরাতে আর স্ত্রীর সঙ্গে মাগী-পনা করতে? চুলোয় যাক মাগী, আমি কসাক, ও আমার পোষাবে না। নাই বা থাকল এখন লড়াই, তবুও আমি যাব তোমাদের সঙ্গে জাপোরোজ্‌য়েতে, সেখানে ফুর্তি-সে ঘুরে বেড়াব। হে ঈশ্বর, যাবই আমি।' বৃদ্ধ বুলবা ক্রমেই একটু একটু করে উত্তেজিত হতে লাগলেন, শেষে হলেন একেবারে ক্রুদ্ধ, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ও সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকলেন।

'আমরা কালই যাব! দেরি করে লাভ কি? এখানে আমরা কোন্ শয়ুর অপেক্ষায় বসে আছি? এ বাড়িতে আমাদের কিসেব দরকার? কী হবে আমাদের এ সব নিয়ে? কিসের জন্যে এই ঘটি বাটি?' এই বলে তিনি যত ঘটি বাটি গেলাস ছিল তা চূর্ণ করে মাটিতে ছুঁড়তে লাগলেন।

হতভাগিনী বৃদ্ধা স্বামীর এই আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত। একটা বেঞ্চিতে বসে ম্লানভাবে তিনি চেয়ে দেখছিলেন। কিছু বলার সাহস তাঁর ছিল না; কিন্তু তাঁর পক্ষে ভীতিপ্রদ এই সিদ্ধান্ত যখন শুনলেন তখন চোখের জল তিনি রাখতে পারলেন না; চেয়ে রইলেন নিজের ছেলেদুটির দিকে, এদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ অবধারিত; কে বর্ণনা করতে পারে তাঁর দুঃখের নিঃশব্দ আবেগ, যা কম্পিত হচ্ছিল বুঝি তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, তাঁর দৃঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটের আক্ষেপণে।

বুলবা ছিলেন ভীষণ একরোখা। তিনি ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক যাদের দেখা গিয়েছিল শুধু কঠোর পনের শতকে, ইউরোপের অর্ধ-যাযাবর এক কোণে, যখন সমস্ত আদিম দক্ষিণ রাশিয়া তার নৃপতিবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে মঙ্গোলীয় লুণ্ঠনকারীদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে বিধ্বস্ত ও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল;*) যখন ঘর-বাড়ি হারিয়ে লোকে সাহসী হয়ে ওঠে; যখন তারা এই ভস্মের ওপর বসে, চারদিকের ভীতিপ্রদ প্রতিবেশী ও চিরন্তন বিপদে পরিবৃত হয়ে, সোজাসুজি তাদের সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত হয়, পৃথিবীতে ভয় বলে যে কিছু আছে তা ভুলে যায়; যখন চির-প্রশান্ত প্রকৃতি স্লাভীয় তেজ সামরিক শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে সূচিত করে রুশ চরিত্রের এক উন্মুক্ত উদ্দাম বিকাশ — কসাকত্ব; যখন সব নদীতীর, পারঘাট, ঢালুভূমি ও বাসোপযোগী স্থান ভরে ওঠে কসাকে। তাদের সংখ্যা কত কেউ জানত না। এক সুলতান তাদের সংখ্যা জানতে চাইলে তাদের সাহসী সাথীরা ঠিকই উত্তর দিয়েছিল, 'কে জানে কত! আমরা সারা স্তেপে ছড়িয়ে আছি; যেখানেই ঢিপি, সেখানেই কসাক।' বাস্তবিকই এটা ছিল রুশ শক্তির এক অসাধারণ প্রকাশ: দুঃখের আগুনে পোড়া লোকের অন্তর থেকে এর উদ্ভব। পূর্বতন ছোট ছোট রাজ্য ও ছোট ছোট শহর, যা ছিল শিকারী ও কুকুর-পালকের দলে ভরা, তাদের বদলে, প্রাক্তন ছোট ছোট রাজা, যারা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা ও ব্যবসা করত নিজেদের শহর নিয়ে, তাদের বদলে উদ্ভূত হল পরাক্রান্ত বসতি এবং পরিবৃত কুরেনসমূহ*), — এরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল একই বিপদের ভয়ে, অ-খ্রীষ্টীয় আক্রমণকারীদের

বিরূদ্ধে একই ঘৃণায়। ইতিহাস থেকে সকলেরই জানা আছে কেমন করে এদের অবিরাম সংগ্রাম ও নির্ভীক জীবন ইউরোপকে সেই অদম্য উপদ্রবের ধারা থেকে বাঁচায়, যা তখন ইউরোপের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিল। ছোট ছোট নৃপতিদের বদলে পোল রাজারা তখন এই বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি, যদিও তাঁরা দূর্বল ও দূরস্থ। তাঁরা বূঝতেন কসাকদের মূল্য, তাদের এই সামরিক ও সতর্ক জীবনযাত্রায় কত সূবিধা। তাঁরা এদের উৎসাহ দিতেন, এই ব্যবস্থার গূণগান করতেন। তাঁদের সূদূর শাসনের অধীনে কসাকদেরই ভিতর থেকে নির্বাচিত কম্যাণ্ডাণ্টরা এই সকল বসতি ও কুরেনকে রেজিমেণ্টে ও সামরিক বিভাগে রূপান্তরিত করে ফেলে। এটা কোন নিয়মিত স্থায়ী বাহিনী নয়; সেরকম বাহিনীর কোন চিহ্নই কোথাও ছিল না। কিন্তু যূদ্ধ বাধলে মাত্র আট দিনের মধ্যেই প্রত্যেক কসাক ঘোড়ায় চড়ে দস্তুরমতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেখা দিত, রাজার কাছ থেকে মাত্র একটি স্বর্ণমূদ্রার বিনিময়ে লড়াই করতে রাজী থাকত; আর দূই সপ্তাহের মধ্যে এমন সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হত যা কোন রাজকীয় আদেশের জোরে কখনও একত্রিত করা যেত না। অভিযান শেষ হলেই যোদ্ধারা ফিরে যেত তাদের চাষের খেতে ও চারণভূমিতে, নীপার নদীর পারঘাটে। তারা মাছ ধরত, বেচা-কেনা করত, বীয়ার বানাত ও ফের হয়ে যেত স্বাধীন কসাক। তাদের অসাধারণ কর্মকুশলতায় সমসাময়িক বিদেশীয়রা সঙ্গত কারণেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে। এমন হাতের কাজ ছিল না যা কসাকের অজানা: মদ বানানো, টানাগাড়ি তৈরি, বারূদ গূঁড়ানো, কামার-লোহারের কাজ, সবই তারা করত এবং সেই সঙ্গে জানত কেমন করে উদ্দাম আনন্দ উপভোগ করতে হয়, মাতাল হয়ে এমন মাতামাতি করতে হয় যা কেবল রূশীরাই জানে। সবকিছূই তাদের হাতের মূঠোয়। নিয়মিত সৈন্যদলের তালিকায় নাম-লেখানো কসাক যূদ্ধের সময় যূদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু এদের ছাড়াও সব সময়েই গূরূতর প্রয়োজনে পাওয়া যেত অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকের দল। কসাক-ক্যাপ্টেনরা একবার গ্রামের বাজারে ও ময়দানে গিয়ে টানাগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে বললেই হল:

'ওহে, সব বিয়ার বানানো মদ-চোলাইয়ের দল! থামাও তোমাদের বিয়ার চোলানো, চুল্লীর ধারে শূয়ে শূয়ে মোটা গতর দিয়ে মাছিদের ভোজ খাইয়ে আর কাজ নেই! চলে এসো সব, চলে এসো, বীরের খ্যাতি ও সম্মান অর্জন

কর! আর ওহে তোমরা হালঠেলা, গমবোনা, ভেড়ার রাখাল, মেয়ে-পাগলার দল! শেষ কর তোমাদের লাঙ্গলের পিছু পিছু চলা, মাটিতে কাদায় তোমাদের হলদে জুতো ভরিয়ে তোলা; শেষ কর তোমাদের মেয়েদের পিছনে পিছনে ছুটে বীরের শক্তি নষ্ট করা! সময় এসেছে এখন কসাকের গৌরব অর্জনের!'

কথাগুলি হয়ে উঠত যেন শুকানো কাঠের গাদায় আগুনের ফুলকি। চাষী ভেঙে ফেলত তার লাঙ্গল, বিয়ার ও মদ-চোলাইয়ের দল ফেলে দিত ভাটিখানা, গুঁড়িয়ে ফেলত মদের পিপে, কারিগর ও দোকানদারেরা তাদের কলকব্জা ও মালপত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র চুরমার করত। সকলেই চড়ে বসত যে যার ঘোড়ায়। এক কথায়, রুশ চরিত্র এখানেই পেত তার সবচেয়ে শক্তিময় প্রবল প্রকাশ।

তারাস ছিলেন আদত প্রাচীন কর্নেলদের একজন: এক উদগ্র সামরিক আবেগ ছিল তাঁর জন্মগত। তাঁর বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল তাঁর রুক্ষ ও সোজাসুজি ব্যবহার। সেই কালে রুশ অভিজাত শ্রেণীর উপর পোলীয় প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। অনেকেই পোলীয় ধরণ-ধারণ গ্রহণ করছিল, চালু করছিল তাদের বিলাসিতা, দাসদাসীর জাঁকজমক, বাজপাখি, শিকারীর দল পোষা, ভোজনোৎসব, আর দরবার। তারাসের এটা মনঃপুত ছিল না। তিনি ভালোবাসতেন কসাকের সাদাসিধা জীবন, যারা ওয়ারশ'র দিকে ঝুঁকত সেইসব বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধত; তিনি তাদের বলতেন পোলীয় প্রভুদের ভৃত্য। সর্বদাই তিনি অক্লান্ত, আর নিজেকে ভাবতেন সনাতন খ্রীষ্টীয় ধর্মের ন্যায়সম্মত রক্ষাকর্তা। যেখানে ইজারাদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অথবা কোন নতুন চিমনি-ট্যাক্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যেত সেই সব গ্রামে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি নিজেই তাঁর কসাকদের সহায়তায় বিচার নির্বাহ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনটি ব্যাপারে তরোয়াল সর্বদা ব্যবহার করা চলে; যথা: যদি পোলীয় কর্মচারীরা কসাক মণ্ডলদের উপযুক্ত সম্মান না দেখায় এবং তাঁদের সামনে মাথার টুপি না খোলে; যদি কেউ সনাতন খ্রীষ্টীয় ধর্মকে পরিহাস করে, পিতৃপুরুষের আচারবিধি না মানে; আর সর্বশেষে, যদি শত্রুপক্ষ হয় মুসলমান কিংবা তুর্কী, যাদের বিরুদ্ধে, তাঁর মতে, খ্রীষ্টান জগতের গৌরবের জন্য যে-কোন অবস্থায় অস্ত্র ব্যবহার করা ন্যায়সম্মত।

এখন আগে থেকে তিনি এই ভেবে পুলকিত হলেন, দুই ছেলেকে নিয়ে সেচ্-এ হাজির হয়ে কী ভাবে তিনি বলবেন, 'দেখ তোমরা, কেমন

দুটি খাসা জোয়ান তোমাদের জন্য এনেছি!' কী ভাবে তিনি যুদ্ধে পোড় খাওয়া প্রবীণ বন্ধুদের সঙ্গে তাদের পরিচিত করে দেবেন; কী ভাবে যুদ্ধবিদ্যায় ও পানোন্মাদে তাদের প্রথম সাফল্য তিনি নিজে দেখবেন। পানোন্মাদকেও তিনি ধরতেন বীরের মর্যাদার অন্যতম। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন তাদের একলাই পাঠাবেন। কিন্তু তাদের তারুণ্য, তাদের দীর্ঘ আকৃতি, তাদের সবল পুরুষালি সৌন্দর্য দেখে তাঁর যুদ্ধপ্রিয় অন্তর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, তিনি নিজে পরের দিনই তাদের সঙ্গে যাবার সংকল্প করলেন, যদিও এ সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর একরোখা খেয়াল ছাড়া আর কোন প্রয়োজনই ছিল না। তিনি তখনই কাজে লেগে গেলেন, হুকুমজারি করতে লাগলেন, তাঁর তরুণ ছেলেদের জন্য ঘোড়া ও সাজসজ্জা ঠিক করতে লাগলেন, আস্তাবলে ও ভাণ্ডারে যাতায়াত শুরু হল এবং যারা পরের দিন তাঁদের সঙ্গে যাবে সেই সব ভৃত্য বাছাই করতে ল্যাগলেন। ক্যাপ্টেন তভ্‌কাচকে তিনি তাঁর কর্তৃত্ব দিয়ে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়া আদেশ দিয়ে রাখলেন যে, তিনি সেচ্‌ থেকে যদি কোন সংবাদ পাঠান তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন সমস্ত রেজিমেণ্টকে নিয়ে সেচের দিকে যাত্রা করা হয়। কোনকিছুই তিনি ভুললেন না যদিও তাঁর অবস্থা তখন টলটলায়মান, মাথায় ভোদ্‌কার বাষ্প ঘুরছে। তিনি এমন কি এ হুকুমও দিলেন যে, ঘোড়াগুলিকে জল দিতে হবে এবং তাদের ডাবা যেন ভালো বড়-দানা গমে ভরা থাকে। এই সব কাজ শেষ করে যখন ফিরলেন তখন তিনি বেশ ক্লান্ত।

'তাহলে, ছেলেরা, এখন ঘুমানো দরকার, কাল করা যাবে ভগবান যা চান। বিছানার ঝঞ্ঝাট করে কোন কাজ নেই গো! আমাদের বিছানার কোনই দরকার নেই। আমরা উঠোনেই শোবে।'

রাত্রি সবেমাত্র আকাশকে আলিঙ্গন করেছে, কিন্তু সকাল-সকাল শুয়ে পড়াই বুলবার অভ্যাস। একটা গালিচার ওপর তিনি গা এলিয়ে দিলেন, গায়ের উপর টেনে নিলেন মেষচর্মের আলখাল্লা, কেননা রাতের বাতাস ছিল বেশ তাজা, আর বাড়িতে থাকলে বুলবা গরম কিছু দিয়ে গা ঢাকতে ভালোবাসতেন। অচিরেই তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল, পরে সারা উঠানে ঘটল তাঁর অনুকরণ; নানা কোণ থেকে যে যেখানে শুয়েছিল, তাদের নাক ডাকার সুর উঠতে লাগল। সকলের আগে ঘুমাল পাহারাদার, কারণ ছোট কর্তাদের বাড়িফেরার উৎসবে সেই পান করেছিল সবচেয়ে বেশি।

ঘুম এলো না কেবল হতভাগিনী মায়ের; তাঁর আদরের দুটি ছেলে

পাশোপাশি শুয়ে আছে, তাদের শিয়রে এসে বসে তিনি চিরুণী দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন তাদের অযত্নে জট-পড়া নবীন কোঁকড়া চুল, চোখের জলে তাদের ভেজালেন। তিনি তাদের দেখতে লাগলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, সকল অনুভূতি দিয়ে, তাঁর সমস্ত সত্তা যেন পরিণত হয়েছে কেবল চোখের দৃষ্টিতে, তবুও যেন দেখে আশ মেটে না। নিজের স্তন্য দিয়ে তিনি তাদের খাইয়েছেন, লালন করেছেন, মানুষ করেছেন, — আর এখন এ দেখা কেবল ক্ষণেকের তরে। 'বাছারা আমার, সোনার চাঁদেরা, কী হবে তোদের? কী আছে তোদের কপালে?' — বলতে বলতে চোখের জল জমে উঠল তাঁর বলিরেখায়, যে বলিরেখা তাঁর এককালের সুশ্রী মুখকে বদলে দিয়েছে। সত্যিই তাঁর অবস্থা করুণ, সেই বেপরোয়া যুগের আর সব নারীর মতোই। শুধু ক্ষণকাল তিনি জীবনে পেয়েছিলেন প্রেম, প্রণয়ের প্রথম উদগ্র আবেগে, যৌবনের প্রথম উদগ্র প্রারম্ভে। তার পরই তাঁর কঠিন প্রণয়ী তাঁকে ছেড়ে গেলেন তরবারির জন্য, সাথীদের জন্য, পানোন্মত্ততার জন্য। বছরে দু-তিন দিন হয়ত স্বামীর সঙ্গে দেখা হত, তার পরে কয়েক বছর আর তাঁর কোন সাড়া পাওয়া যেত না। কিন্তু যখন দেখা হত স্বামীর সঙ্গে, যখন থাকতেন একত্রে, তখনই বা কী জীবন ছিল তাঁর! অপমান, এমন কি প্রহারও সহ্য করতে হত তাঁকে, মাঝে মধ্যে যদি বা কিছু আদর পেতেন, তার মধ্যে পাওয়া যেত কেবল করুণার দান। অমিতচারী জাপোরোজ্‌য়ের রুক্ষ আবহাওয়ায় চরিত্র গড়ে ওঠা এই নারীবর্জিত বীরদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত জীব। তাঁর নিরানন্দ যৌবন এক নিমেষে ঝরে গেল, তাঁর সদা-লাবণ্যময় গাল আর বুক বিবর্ণ হল বিনা চুম্বনে, আবৃত হল অকাল-বলিরেখায়। তাঁর সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত অনুভূতি, নারীর প্রকৃতিতে যা কিছু কোমল ও সাবেগ, সব তাঁর মধ্যে পরিণত হল একমাত্র মাতৃত্বের অনুভূতিতে। স্তেপ অঞ্চলের গাংচিলের মতো আবেগে আর যন্ত্রণায় তিনি ডানা মেলে রইলেন তাঁর ছেলেদের উপর। তাঁর বাছাদের, সোনার চাঁদ ছেলেদের তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, বুঝি আর কখনও দেখা হবে না! কে বলতে পারে, হয়ত প্রথম সংঘর্ষেই তাতারেরা তাদের মাথা কেটে ফেলবে, তিনি জানতেই পাবেন না কোথায় পড়ে থাকবে তাদের প্রক্ষিপ্ত দেহ, পথের ধারের শকুনে হয়ত তাদের ছিঁড়ে খাবে; অথচ তাদের রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য তিনি তাঁর সর্বস্ব দিতে রাজি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে তিনি তাদের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, সর্বজয়ী নিদ্রায় সে

চোখ মুদে আসছিল; মনে ভাবলেন: 'হয়ত, বুলবা জেগে উঠে এদের চলে যাওয়া আরও দু-এক দিন পিছিয়ে দেবেন; হয়ত তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভেবেছেন শুধু বেশি মদ খেয়ে।'

ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে চাঁদ অনেক আগেই আলোকিত করেছে সমস্ত প্রাঙ্গণকে, প্রাঙ্গণ-ভর্তি ঘুমন্ত লোকের দল, ঘনবদ্ধ উইলো গাছ আর প্রাঙ্গণের চতুর্দিকের উঁচু আগাছা-ঢাকা বেড়া। তিনি তখনও বসে আছেন তাঁর আদরের ছেলেদের মাথার কাছে, এক লহমাও চোখ ফেরাচ্ছেন না; ঘুমের কথা তাঁর মনে নেই। ইতিমধ্যেই ঘোড়ারা ঊষার আগমন টের পেয়ে ঘাস চিবানো বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে; উইলো গাছের মাথায় শুরু হয়েছে পাতার ফিসফিস, একটু একটু করে তা সেখান থেকে একেবারে নীচে নেমে এলো। রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত তিনি বসে রইলেন, একটুও ক্লান্তি নেই, মনের ইচ্ছে, রাতের যেন অবসান না হয়। স্তেপ থেকে বাচ্চা ঘোড়ার হ্রেষা শোনা গেল; আকাশে গাঢ় লাল আলোকের রেখা উঠল ঝলসে।

বুলবা হঠাৎ জেগে লাফিয়ে উঠলেন। গত সন্ধ্যায় যে সব আদেশ দিয়েছেন তা তাঁর বেশ মনে ছিল।

'ওহে ছোকরারা, ঢের ঘুম হয়েছে, সময় নেই, আর সময় নেই; ঘোড়াগুলোকে জল দে। আর বুড়ি গেল কোথায়? (নিজের স্ত্রীকে তিনি সাধারণত এই বলে ডাকতেন।) হাত চালাও, বুড়ি, যা হয় কিছু খেতে দাও, সামনে লম্বা পাড়ি।'

হতভাগিনী বৃদ্ধার শেষ আশা নিভে গেল, হতাশ হয়ে তিনি স্খলিত পদে ভিতরে গেলেন। চোখের জলে তিনি প্রাতরাশের আয়োজন করতে লাগলেন, আর বুলবা করতে লাগলেন হুকুমজারি, আস্তাবলে ছোটাছুটি, নিজেই বাছলেন ছেলেদের জন্য সবচেয়ে ভালো সাজ। সেমিনারির ছাত্রদের ভোল হঠাৎ পালটে গেল: আগেকার কর্দমাক্ত উঁচু বুটের বদলে তারা পরল লাল মরক্কো চামড়ার জুতো, গোড়ালিতে রুপোর নাল লাগানো; ঢিলে সালোয়ার কৃষ্ণসাগরের মতো প্রশস্ত; তাতে অজস্র ভাঁজ, সোনার বেষ্টনী দিয়ে আটকানো; বেষ্টনী থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা চামড়ার ফালি, গোছা ও থোপা ইত্যাদি দিয়ে তা সাজানো পাইপের জন্য। তাদের ঝলমলে বনাতের কসাকী কুর্তার রঙ উজ্জ্বল লাল যেন আগুনের মতো, নানা রকমের নক্সায় চিত্রিত কোমরবন্ধ দিয়ে তা বাঁধা, তাতে গোঁজা খোদাই কাজ-করা তুর্কী পিস্তল; গোড়ালির কাছে ঝন্ঝন্ করছে তলোয়ার। ছেলেদের মুখ

তখনও বিশেষ রোদ-পোড়া হয়ে ওঠে নি, মনে হল যেন সে মুখ আরও সুন্দর আরও গৌর হয়ে উঠেছে; যৌবনের কালো গোঁফের রেখা উজ্জ্বল করে তুলেছে তাদের বর্ণের শুভ্রতা, তারুণ্যের স্বাস্থ্য ও দৃঢ়তায় তা দীপ্ত। কালো ভেড়ার লোমের স্বর্ণশীর্ষ টুপিতে তাদের দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর। হতভাগিনী মা! তাদের দেখে তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না, তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।

অবশেষে বুলবা বললেন, 'শোনো ছেলেরা, সব ত তৈরি, আর দেরি নয়! এখন, আমাদের খ্রীষ্টিয়ান রীতি অনুসারে পথে যাত্রা করার আগে আমাদের সকলকে বসতে হবে।'

সকলে বসল, এমন কি ভৃত্যেরাও, তারা সসম্মানে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

বুলবা বললেন, 'গিন্নি, এখন তোমার ছেলেদের আশীর্বাদ কর! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করে, সর্বদা বীরের সম্মান বজায় রাখে, খ্রীষ্টের ধর্মকে রক্ষা করে। আর তা যদি না করে — তবে যেন তাদের নিধন হয়, যেন তাদের আত্মার কোন চিহ্ন না থাকে এই পৃথিবীতে! তোমাদের মায়ের কাছে যাও, ছেলেরা, মায়ের প্রার্থনা জলেস্থলে সর্বত্র রক্ষা করে।'

মা সকল মায়ের মতোই দুর্বল। তাদের আলিঙ্গন করলেন ও দুটি ছোট বিগ্রহ বার করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

'তোমাদের রক্ষা করুন... মেরী-মাতা... ভুলো না, বাছারা, তোমাদের মাকে... অন্তত তোমাদের খবর দিও...' তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

বুলবা বললেন, 'চল হে, আমরা এখন যাই!'

জিন-বাঁধা অশ্বেরা দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিল। বুলবা এক লাফে তাঁর শয়তানের উপর চেপে বসলেন। পিঠে আরোহীর জগদ্দল চাপে ঘোড়াটা পাগলের মতো টলে উঠল, কারণ বুলবা ছিলেন অসম্ভব ভারী ও মোটা।

ছেলেরাও ঘোড়ায় চড়ে বসেছে দেখে মা ছুটে গেলেন ছোটটির দিকে, এ ছেলেটির মুখে ছিল কেমন একটা কোমলতর ভাব; তিনি তার রেকাব ধরে লাগামে ঝুলে পড়লেন, নিজের হাত থেকে ছেলেটিকে ছাড়তে চাইলেন না, চোখে তাঁর হতাশার দৃষ্টি। দুজন জোয়ান কসাক সযত্নে তাঁকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু যেই তিনি দেখলেন যে তারা প্রাঙ্গণ পার হয়েছে,

অমনি বয়স সত্ত্বেও বন্য ছাগীর মতো ক্ষিপ্রবেগে তিনি আবার তাদের দিকে দৌড়ে গেলেন, অবিশ্বাস্য শক্তিতে ঘোড়া থামিয়ে উন্মত্ত অদম্য আবেগে তাঁর একটি ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে আবার ফেরানো হল।

তরুণ কসাকেরা অগ্রসর হল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, চোখের জল চেপে রাখল পিতার ভয়ে। বুলবা নিজেও কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন যদিও তা প্রকাশ না করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। দিনটি ছিল ধূসর; ঘাসের সবুজে উজ্জ্বল কঠিনতা; পাখির গানগুলিও যেন বেসুরো। তারা চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকাল: তাদের গ্রাম যেন মাটিতে ঢুকে গেছে; মাটির উপরে কিছুই দেখা যায় না, কেবল দেখা যায় তাদের বাড়ির উপরকার দুটি চিমনির চূড়া আর গাছগুলির মাথা। এই গাছের ডালে তারা এককালে চড়ত কাঠবিড়ালের মতো। পরে তাও দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়ে দেখা গেল কেবল দূর তৃণভূমি — সেই তৃণভূমি যা দেখে তাদের মনে পড়ল তাদের জীবনের সমস্ত কথা, সেই যখন তারা শিশির-ভেজা ঘাসের উপর গড়াত, তখন থেকে সেই দিনটি পর্যন্ত যখন তারা এখানেই অপেক্ষা করত, কখন এক কালো-ভুরু কসাক বালিকা দূর থেকে সভয়ে ছুটে পার হয়ে আসবে ক্ষিপ্র লঘু পদক্ষেপে। এখন দেখা যাচ্ছে কেবল কুয়োর লাঠিটা, তার মাথায় লাগানো গাড়ির চাকা আকাশের পটভূমিতে আঁকা; তার পর দূরে থেকে পাহাড়ের মতো দেখতে যে সমতলভূমি তারা পেরিয়ে এলো তাই যেন সবকিছুকে চোখের আড়াল করে দিল।

বিদায় শৈশব, বিদায় খেলাধুলো, সবকিছু, সব!

২

তিনজন অশ্বারোহীই চলতে লাগল নীরবে। বৃদ্ধ বুলবা ভাবছিলেন অতীতের কথা: তাঁর চোখের উপর ভাসছিল তাঁর যৌবনের দিনগুলি, অতিক্রান্ত সেইসব বছর যার জন্য কসাকেরা সর্বদা কাঁদে, ইচ্ছা করে যেন তাদের সারা জীবনটাই যৌবন হয়ে থাকে। তিনি ভাবছিলেন পুরনো কালের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কার কার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে সেচ্-এ। হিসাব করলেন কাদের মৃত্যু হয়েছে, কারা এখনও জীবিত। তাঁর চোখের মণিতে অশ্রুবিন্দু জমে উঠল, পলিত মস্তক নত হয়ে পড়ল বিষাদে।

ছেলেরা ভাবছিল অন্য কথা। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। বারো বছর বয়সে তাদের পাঠানো হয় কিয়েভ আকাদমিতে, কেননা সেইসময়কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা মনে করতেন তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য — যদিও শিক্ষা পরে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। সেমিনারিতে ভর্তি-হওয়া অন্যান্য ছাত্রদের মতো তারাও তখন ছিল বন্য, স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত, সেখানে থাকতে থাকতে তারা কিছুটা কেতাদুরস্ত হয়ে উঠল। সব ছাত্রের মধ্যেই এই কেতাদুরস্ত ভাব থাকায় তাদের সকলকেই দেখাত প্রায় এক রকম। বড় ছেলে অস্তাপ তার শিক্ষাজীবন শুরু করল প্রথম বছরেই পালিয়ে গিয়ে। তাকে ধরে এনে নির্দয় প্রহার দেওয়া হল ও পড়তে বসানো হল। চারবার সে তার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক মাটিতে পুঁতে ফেলল, চারবারই অমানুষিক প্রহারের পর তাকে নতুন পাঠ্যপুস্তক কিনে দেওয়া হল। নিঃসন্দেহ, পঞ্চমবারও সে এই একই কাজ করত, কিন্তু তার পিতা সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন তিনি তাকে পুরো বিশ বছর মঠে শিক্ষানবিশ করে রাখবেন, এবং জানিয়ে দিলেন যে যদি সে আকাদমিতে শেখানো সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত না করে তাহলে কোন কালেই জাপোরোজ্যে দেখতে পাবে না। কৌতূহলের বিষয়, এই কথা বলেছিলেন সেই একই তারাস বুলবা যিনি সকল শিক্ষার নিন্দা করতেন, এবং আমরা আগেই দেখেছি, তাঁর ছেলেদের উপদেশ দিয়েছিলেন এই শিক্ষাকে একেবারে গ্রাহ্য না করতে। সেই সময় থেকে অস্তাপ অসাধারণ আগ্রহে তার নীরস বইগুলি পড়তে বসল, অচিরেই শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সারিতে স্থান পেল। সেকালের শিক্ষাধারার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার কোন সম্বন্ধ ছিল না। ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মবিচার, এই সবের কোনই যোগ ছিল না সমসাময়িক কালের সঙ্গে, কোনদিনই এগুলির প্রয়োগ করা বা অভ্যাস করা যেত না জীবনে। ছাত্রেরা তাদের শিক্ষার সামান্যতম পণ্ডিতী জ্ঞানকেও কোন কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারত না। তখনকার শিক্ষকেরা নিজেরাও ছিলেন অন্যদের চেয়ে বেশি অজ্ঞ, কেননা তাঁরা ছিলেন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অধিকন্তু, আকাদমির সাধারণতান্ত্রিক সংগঠন, সুস্থ ও সবল যুবকদের ভীতিপ্রদ সংখ্যাধিক্য — এ সবই সেমিনারির ছাত্রসম্প্রদায়কে তাদের পাঠ্যাবলীর একান্ত বাইরের কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত না করে পারত না। মাঝে মাঝে কষ্টকর জীবনযাত্রা, প্রায়শ শাস্তিস্বরূপ উপবাস এবং তাজা সুস্থ সবল যৌবনের নানা প্রবৃত্তির চাপ — এই সমস্ত মিলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি

করত সেই অভিযানের স্পৃহা, যা পরে বিকশিত হত জাপোরোজ্‌য়েতে। কিয়েভের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুধার্ত ছাত্রেরা ছিল সকলের পক্ষে ভয়ের কারণ। কোন ছাত্রকে আসতে দেখলে বাজারের পসারিনীরা, তাদের মিঠাই, চাকা-বিস্কুট, কুমড়োর বীচি সর্বদা হাত দিয়ে ঢেকে ফেলত যেন মা-ঈগল তার শাবকদের রক্ষা করছে। যে বয়স্কতর ছাত্র — কনসালের কর্তব্য ছিল তার সঙ্গীছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখা, তারই সালোয়ারের পকেট ছিল এত ভীষণ বড় যে সে তাতে অনায়াসে অসতর্ক পসারিনীর বিপণী থেকে তার সমস্ত পণ্য পুরে ফেলতে পারত। সেমিনারির ছাত্রদের জগৎ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রুশী ও পোলীয় অভিজাতদের সর্বোচ্চ মণ্ডলে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। আকাদমির পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং শাসনকর্তা আদাম কিসেল*) তাদের সমাজে প্রবেশ করতে দিতেন না এবং নির্দেশ দেন তাদের যেন কড়া শাসনে রাখা হয়। যা হোক, এই নির্দেশের কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেননা সেমিনারির অধ্যক্ষ এবং সন্ন্যাসী-অধ্যাপকেরা ডাণ্ডা বেত ব্যবহারের কোন সুযোগ ছাড়তেন না, এবং প্রায়ই কনসালের সহকারী ছাত্র — লিকটাররা তাঁদের আদেশে তাদের কনসালকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করত যে তাকে কয়েক সপ্তাহ ধরে সালোয়ার চুলকাতে হত। তাদের অনেকেই এ সবকে গ্রাহ্য করত না, এ সব ছিল যেন লঙ্কা-মেশানো ভালো ভোদ্‌কার চেয়ে শুধু একটু বেশি কড়া। বাকিরা ক্রমাগত এই পুলটিসের প্রয়োগে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অবশেষে পলায়ন করত জাপোরোজ্‌য়েতে, যদি তারা পথ খুঁজে পেত অথবা পথে ধরা না পড়ত। অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে ন্যায়শাস্ত্র এমন কি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে শুরু করলেও অস্তাপ বুলবাও এই অমোঘ দণ্ড থেকে রক্ষা পায় নি। স্বভাবতই এতে তার চরিত্র দৃঢ় হয়ে এমন কাঠিন্য অর্জন করল যা ছিল কসাকদের চিরকালের লক্ষণ। অস্তাপ সর্বদা একজন শ্রেষ্ঠ সাথী বলে গণ্য হত। অন্যের বাগানে বা বাগিচায় লুঠ করবার মতো অভিযানে সে তার সঙ্গীদের নেতৃত্ব করত কদাচিৎ, কিন্তু কোন দুঃসাহসিক ছাত্র ডাক দিলে তার পতাকাতলে যারা সর্বাগ্রে সমবেত হত সে ছিল তাদের অন্যতম, এবং কখনও কোন অবস্থাতেই সঙ্গীদের বিশ্বাসভঙ্গ করত না। চাবুক বা বেত দিয়েও তা করানো যেত না। মারামারি ও উচ্ছৃঙ্খল পানোন্মাদনা ছাড়া অন্য সব রকম প্রলোভনের বিরুদ্ধে সে ছিল কঠিন, অন্ততপক্ষে, প্রায় কখনই সে অন্য কিছুতে মন দেয় নি। তার সমান-সমানদের সঙ্গে তার আচরণ ছিল

সাদাসিধে। তার প্রকৃতির লোকের পক্ষে সেই যুগে যতটা সম্ভব সে রকম সদাশয়তাও তার ছিল। হতভাগিনী মায়ের অশ্রুতে তার অন্তর সত্যিই অভিভূত হয়েছিল। কেবল এই জন্যই সে এখন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল, তার মাথা নুইয়ে পড়েছিল ভাবনায়।

তার ছোট ভাই, আন্দ্রির চিন্তার ধারা ছিল কিছুটা বেশি সজীব ও বেশি পরিণত। লেখাপড়ায় তার মন ছিল বেশি, স্থূল ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির পক্ষে সাধারণত যেমন জোর করে শেখার প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজন তার ছিল না। ভাইয়ের চেয়ে তার উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল বেশি; যথেষ্ট বিপজ্জনক কাজে সে নেতৃত্ব করত বেশি ঘন-ঘন; কখনও কখনও সে শাস্তিও এড়িয়ে যেত তার উপস্থিতবুদ্ধির সহায়তায়; তার ভাই অস্তাপ কিন্তু নিজের জন্য কারও কোন তত্ত্বাবধানের ধার ধারত না, গায়ের জামা খুলে ফেলে মেঝেতে শুয়ে পড়ত, ক্ষমা চাওয়ার কথা একবারও ভাবত না। বীরত্ব প্রদর্শনের উত্তপ্ত তৃষ্ণাও আন্দ্রির ছিল, কিন্তু অন্য অনুভূতিরও স্থান তার অন্তরে ছিল। আঠারো বছর বয়স পার হলে তার অন্তরে জ্বলে উঠল প্রেমের প্রাণবন্ত তাগিদ। আবেগপূর্ণ স্বপ্নে তার নারীর আবির্ভাব ঘটতে লাগল ঘনঘন। দার্শনিক বিতর্ক শুনতে শুনতেও সে প্রতিমুহূর্তে দেখতে পেত তাকে — সজীব, কালো-চোখ, কোমল। তার সামনে অবিরাম ঝলক দিত সে নারীর ঝকঝকে টানটান দুটি স্তন, তার সুন্দর কোমল অনাবৃত বাহু; এমন কি তার কুমারীসুলভ অথচ সবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেপটে থাকত যে পোশাক, সেই পোশাকের দৃশ্য পর্যন্ত আন্দ্রির স্বপ্নে তাকে অবর্ণনীয় কামোন্মাদনায় ভরে তুলত। সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখত তার তরুণ প্রাণের এই আবেগের আন্দোলন, কেননা সে যুগে কোন কসাকের পক্ষে যুদ্ধে যাওয়ার আগে নারী ও প্রেমের কথা ভাবা ছিল লজ্জা ও অসম্মানের কথা। আকাদমির শেষ বছরগুলিতে সে দুঃসাহসিক দলের নেতৃত্ব খুব কমই করেছে, বরং বেশি ঘন-ঘন সে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে কিয়েভের দূর নির্জন ছোট ছোট অলিগলিতে, যেখানে চেরী-বাগানে ঢাকা নীচু নীচু ঘরগুলি পথের দিকে উঁকি দিয়ে লোভ জাগায়। মাঝে মাঝে সে এসে পড়ত অভিজাত পল্লীর রাস্তায়ও—যাকে এখন বলা হয় পুরাতন কিয়েভ— এখানে থাকতেন ইউক্রেনীয় ও পোলীয় অভিজাতেরা, বাড়িগুলির গঠনে ছিল নানা বৈশিষ্ট্য। একদিন, সে যখন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন এক পোলীয় অভিজাতের প্রকান্ড গাড়ি প্রায় তার ঘাড়ে এসে পড়ল। কোচবক্সে

আসীন ভীষণ গোঁফওয়ালা কোচম্যান অভ্রান্তভাবে তার পিঠে চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল। তরুণ সেমিনারির ছাত্র রাগে জ্বলে উঠল; নির্বোধ সাহসে সে গাড়ির চাকা টেনে ধরে সবল হাতে গাড়ি থামিয়ে দিল। কিন্তু প্রতিশোধের ভয়ে কোচম্যান ঘোড়াগুলিকে চাবুক মারতে থাকায় গাড়ি সবেগে ছুটে গেল — আর আন্দ্রি সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে হাত সরাতে পারলেও হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল, কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে। আর ওপরে বেজে উঠল তীব্র খিলখিল সুরে সুমধুর হাসি। মুখ তুলে আন্দ্রি দেখল জানলায় দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী। এমন সৌন্দর্য সে আগে দেখে নাই — কালো-চোখ, প্রভাতসূর্যের প্রথম গোলাপী আভা-লাগা তুষার-শুভ্র গায়ের রঙ। তরুণী হাসছিল তার সমস্ত প্রাণ ঢেলে, তার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা যেন এই হাসিতে আরও ঝলমলে হয়ে উঠল। আন্দ্রি বিমূঢ় হয়ে গেল। মেয়েটির দিকে সে তাকিয়ে রইল সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে, অন্যমনস্ক-ভাবে মুখ থেকে কাদা সরাতে গিয়ে তার মুখখানাকে আরও কদর্য করে তুলল সে। কে এই সুন্দরী? বাড়ির চাকরবাকরদের কাছ থেকে জানার উদ্যোগ করল সে। জমকালো পোশাকে ভিড় করে তারা তখন ফটকের কাছে এক তরুণ বান্দুরা-বাদককে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আন্দ্রির কাদামাখা মুখ দেখে কিন্তু তারা হেসে উঠল, অগ্রাহ্য করে উত্তর দিল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে তরুণীটি কোভনোর শাসনকর্তার কন্যা, অল্পদিনের জন্য তাঁরা এখানে এসেছেন। পরের রাতেই সেমিনারির ছাত্রদের পক্ষেই যা স্বাভাবিক সেই দুঃসাহসিকতায় আন্দ্রি বাগানের বেড়া দিয়ে গুড়ি মেরে ঢুকে, চড়ে বসল এমন একটি গাছে যার ডালপালা বিস্তৃত হয়ে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত পৌঁছেছে। গাছ থেকে সে ছাদে এলো এবং চিমনির নল বয়ে একেবারে হাজির হল সুন্দরীর শয়নকক্ষে। মেয়েটি সেই সময়ে বাতির আলোয় বসে কান থেকে বহুমূল্য দুল খুলে ফেলছিল। হঠাৎ নিজের সামনে এক অপরিচিত পুরুষকে দেখে পোলীয় সুন্দরী এত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল যে তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না; কিন্তু যখন সে দেখল যে ছাত্রটি দাঁড়িয়ে আছে চোখ নীচু করে লজ্জায় জড়সড় হয়ে, যখন সে চিনতে পারল যে এ সেই ছেলেটি যে তার চোখের সামনে পথে আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তখন তাকে আবার হাসিতে পেয়ে বসল। অধিকন্তু, আন্দ্রির চেহারায় ভীতিপ্রদ কিছু ছিল না: সে দেখতে খুবই সুন্দর। মেয়েটি মন খুলে হাসতে লাগল এবং অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে মজা করল। সব

পোলীয় রমণীর মতোই সুন্দরীটি ছিল লঘুচিত্ত, কিন্তু তার চোখ থেকে, তার আশ্চর্য, তীক্ষ্ন ও স্বচ্ছ চোখ থেকে যে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তা যেন স্থিরানুরাগের মতোই আয়ত। শাসনকর্তার কন্যা যখন সাহসভরে তার দিকে এগিয়ে এসে তার মাথায় বসিয়ে দিল উজ্জ্বল মুকুট, তার ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল দুলদুটি, তাকে পরিয়ে দিল সোনার সুতোর পাড়-বসানো স্বচ্ছ মসলিনের খাটো শেমিজ, তখন ছাত্রটি হাত নাড়াতে পারল না, এমন নিশ্চল হয়ে গেল যেন কেউ তাকে বস্তায় পুরে বেঁধে রেখেছে। তাকে সাজিয়ে দিয়ে মেয়েটি তাকে নিয়ে হাজার রকমের তামাসা করতে লাগল, লঘুচিত্ত পোলীয় রমণীদের যা বিশেষ লক্ষণ সেইরকম এক বেপরোয়া ছেলেমানুষীর সঙ্গে; এতে ছাত্রটি আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মেয়েটির ঝলসানো চোখের দিকে নিশ্চলভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সে নিজেকে একান্ত হাস্যকর করে তুলল। এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে মেয়েটি চমকে উঠল। ছেলেটিকে সে বলল খাটের তলায় লুকোতে এবং শঙ্কার কারণ চলে যেতেই সে ডাকল তার খাস চাকরানীকে — একজন তাতার বন্দিনী দাসীকে, আদেশ দিল ছেলেটিকে সাবধানে বাগানে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বেড়া পার করে দিতে। কিন্তু এই বারে বেড়া টপকাতে গিয়ে ছেলেটি আগের মতো জুত করতে পারল না; চৌকিদার জেগে উঠে তার পায়ে জোর আঘাত করল এবং দ্রুতপায়ে নিরাপদ স্থানে পালাতে না পারা পর্যন্ত ভৃত্যেরা ছুটে এসে তাকে বহুক্ষণ পথে পিটাল। এর পরে এ বাড়ির কাছে আসা তার পক্ষে হয়ে উঠল অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ শাসনকর্তার ভৃত্যেরা সংখ্যায় অনেক। মেয়েটিকে সে আর একবার দেখেছিল পোলীয় রোমান ক্যাথলিক গির্জায়; মেয়েটি তাকে লক্ষ্য করে দীর্ঘকালের পরিচিতের মতো অতি মিষ্ট হাসি হাসে। তারপর আর একবার ছেলেটি মেয়েটিকে দেখে ক্ষণিকের জন্য; কিন্তু এর পর অচিরেই কোভনোর শাসনকর্তা ফিরে গেলেন এবং কালো-চোখ পোলীয় সুন্দরীর বদলে জানলায় দেখা দিল এক বিশ্রী মোটা মুখ। মাথা নীচু করে, ঘোড়ার কেশরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আন্দ্রি এতক্ষণ এই সব কথাই ভাবছিল।

ইতিমধ্যে স্তেপ তাদের সকলকে গ্রহণ করেছে তার সবুজ আলিঙ্গনে; খাড়াই ঘাস চারদিকে উঁচু হয়ে উঠে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল, তাদের কালো কসাক টুপির ঝলকানি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

'আরে ছেলেরা, তোদের হল কী, একেবারে চুপচাপ?' — তাঁর নিজের

চিন্তাস্রোত থেকে সংবিতে ফিরে এসে অবশেষে বললেন বুলবা। 'যেন একেবারে মঠের সন্ন্যাসী! আরে, ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দে। মুখে পাইপ লাগা, তামাক খাওয়া যাক। ঘোড়াদের খুঁচিয়ে বেশ একখান দৌড় দেওয়া যাক, পাখিও যেন আমাদের ধরতে না পারে!'

কসাকেরা ঘোড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে ঘাসের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের কালো টুপিও আর দেখা গেল না। পদদলিত তৃণের একটি রেখা কেবল পড়ে রইল তাদের দ্রুতগতির নিদর্শন হয়ে।

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে সূর্য অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। তার তপ্ত সজীব আলোয় সমস্ত স্তেপ ভরে গেল। কসাকদের অন্তরে যা কিছু ছিল অস্পষ্ট ও স্বপ্নালু, তা এক মুহূর্তে উড়ে গেল; তাদের হৃদয় স্পন্দিত হতে লাগল পাখির মতো।

স্তেপ যত প্রসারিত হতে থাকল ততই সুন্দর হয়ে উঠল দেখতে। সেকালে সমস্ত দক্ষিণ অংশ, একেবারে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমস্ত যে অঞ্চলকে এখন বলা হয় নভরস্‌সিয়া, তা ছিল এক অক্ষত রিক্ত সবুজ প্রান্তর। তার তরঙ্গায়িত সীমাহীন বন্য বিস্তৃতিতে কোন লাঙল এসে প্রবেশ করে নি। অরণ্যের মতো লম্বা তৃণদলের মধ্যে ঘোড়াগুলি কেবল অদৃশ্য হয়ে তাদের পদদলিত করে চলত। এর চেয়ে সুন্দর প্রকৃতিতে আর কিছু হতে পারে না। ভূমির সমস্ত উপরিতল যেন সোনালী-সবুজ এক সমুদ্র, তাতে ছড়ানো লক্ষ লক্ষ বিচিত্র ফুল। তৃণদলের দীর্ঘ লঘুভার বৃন্তের ভিতর দিয়ে উঁকি দেয় গাঢ়-নীল, নীল ও নীল-রক্তিমাভ রঙের ঝুমকো ফুল, হলদে রঙের ফুলের গুল্ম তার পিরামিডাকৃতি মাথা উঁচু করে তোলে, সাদা ক্লোভারের ছাতার মতো টুপি ভূপৃষ্ঠকে বিচিত্র করে; একটি গমের শীষ — কে জানে কোথা থেকে এসে তৃণের ঝোপের মধ্যে বাড়ছিল। সূক্ষ্ম তৃণগুল্মের মধ্যে তিতির পাখি ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোকরাচ্ছিল। হাজারো রকমের পাখির বিভিন্ন সুরে বাতাস ভরা। আকাশে ডানা ছড়িয়ে স্থির হয়ে ঝুলছিল বাজপাখি, নীচের তৃণদলে তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। একদিকে উড়ন্ত একদল বনহংসের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হল, কে জানে কোন সুদূর হ্রদে। শঙ্খচিল ডানার নিয়মিত আন্দোলনে ভূমি থেকে উঠে বাতাসের নীল তরঙ্গে স্নানের বিলাস উপভোগ করতে লাগল। এই ত, এখন সে ঊর্ধ্ব আকাশের মধ্যে হারিয়ে গেল, চিকচিক করছে কেবল একটি কালো বিন্দু; ঐ যে সে আবার তার পাখসাট দিয়ে সূর্যালোকে চক্‌চক করছে। আহা মরি মরি, কী সুন্দর তুমি, স্তেপ!

আমাদের পথযাত্রীরা কয়েক মিনিট মাত্র থামল মধ্যাহ্নভোজনের জন্য; তাদের অনুচর দশজন কসাক ঘোড়া থেকে নেমে খুলল ভোদ্‌কার কাঠের পিপে, আর লাউয়ের খোল, যা দিয়ে পানপাত্রের কাজ চলে। তারা খেল শুধু চর্বি-দেওয়া রুটি কিংবা গমের শক্ত চাপাটি, প্রত্যেকে পান করল মাত্র এক এক পাত্র মদ শক্তিবৃদ্ধির জন্য, কারণ তারাস বুলবা কাকেও পথে মাতাল হতে দিতেন না। আবার পথ চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় সমস্ত স্তেপ সম্পূর্ণ বদলে যেত। তার বিচিত্রবর্ণ বিস্তার অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণে দীপ্ত হয়ে উঠত, ধীরে ধীরে নামত অন্ধকার, দেখা যেত ছায়া কী ভাবে এগিয়ে আসছে, তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে ঘনসবুজে; বাষ্প ঘনতর হত, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি তৃণ ছড়াত সুগন্ধ, সমস্ত স্তেপ সুরভিতে ছেয়ে যেত। নীল কৃষ্ণ আকাশে যেন মোটা তুলির আঁচড়ে আঁকা হত সোনালী-গোলাপীর সুপ্রসর রেখা, এখানে ওখানে দেখা যেত লঘু স্বচ্ছ মেঘের সাদা সাদা টুকরো; সবচেয়ে তাজা ও মনকাড়া হালকা বাতাস সাগরের ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো ঘাসের ডগায় অল্প দোলা দিয়ে যেত, কোমল স্পর্শ দিত কপোলে। সারা দিনের মুখর সঙ্গীত শান্ত হয়ে এসে রূপান্তরিত হত অন্য এক সঙ্গীতে। দাগ-কাটা পাহাড়ী ইঁদুরেরা আপন গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সারা স্তেপ ভরে তুলত তাদের শিসের ধ্বনিতে। ফড়িঙের গুঞ্জন উচ্চতর হত। মাঝে মাঝে শোনা যেত যেন কোন নিভৃত হ্রদ থেকে রাজহাঁসের কলধ্বনি, বাতাসে বাজত যেন রুপোর নিক্কণের মতো। পথচারীরা খোলা মাঠে থেমে রাত্রিবাসের স্থান বেছে নিত। তার পর আগুন জ্বালিয়ে, তাতে কড়া চাপিয়ে রান্না করত চর্বিযুক্ত প্যাতলা জাউ, তা থেকে ভাপ উঠে বাতাসে দেখাত যেন ধোঁয়ার হেলানো রেখা। নৈশভোজনের পর কসাকেরা ঘোড়াগুলির পায়ে দড়ি বেঁধে, ঘাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ত আপন আপন আলখাল্লা বিছিয়ে। রাতের তারাদল সোজা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের কানে বাজত ঘাসের ভেতর থেকে পতঙ্গ-জগতের সংখ্যাতীত ধ্বনি — কোনটা কর্কশ, কোনটা শিসের মতো, কোনটা বা গুঞ্জন: রাতের নিস্তব্ধতায় ও তাজা বাতাসে পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর হয়ে এইসব ধ্বনি দোলা দিয়ে যেত তাদের নিদ্রালু কর্ণকুহরে। তাদের কেউ কখনও জেগে উঠে দাঁড়ালে দেখতে পেত সারা স্তেপ যেন জোনাকির উজ্জ্বল আভায় খচিত। আবার কখনও দেখা যেত রাতের আকাশে এখানে-ওখানে দূরের মাঠে বা নদীতীরে শুকনো নলখাগড়া পোড়ানোর

জ্বলন্ত আভা, তখন উত্তর দিকে উড়ে যাওয়া হাঁসের কালো সারিকে হঠাৎ দেখা যেত রূপালী-গোলাপী আলোয়, মনে হত যেন অন্ধকার আকাশে উড়ছে লাল রুমালের সারি।

কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছাড়াই পথযাত্রীরা অগ্রসর হল। কোথাও কোন গাছপালা নেই, সর্বত্র মুক্ত অন্তহীন অপূর্ব সুন্দর স্তেপ। কদাচিৎ চোখে পড়ে নীপার নদীতীরের দূর বনানীর নীল শীর্ষ। কেবল একবার তারাস তার ছেলেদের ডেকে দেখিয়েছিলেন দূরে স্তেপে একটি ছোট কালো বিন্দুর দিকে। বলেছিলেন, 'দ্যাখ রে ছেলেরা, একজন তাতার চলেছে ঘোড়ায়।' গুম্ফ-যুক্ত ছোট মাথাটা তাদের দিকে দূর থেকে তাকিয়ে দেখল তার সংকীর্ণ চোখ দিয়ে, শিকারী কুকুরের মতো বাতাস আঘ্রাণ করল এবং কসাকেরা গুণতিতে তেরো জন আছে দেখে হরিণের মতো দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'কি হে, ছেলেরা! তাতারটাকে ধরার চেষ্টা করবে নাকি? না করাই ভালো, ওকে ধরা যাবে না: ওর ঘোড়া আমার শয়তানের চেয়ে জোরে ছোটে।' তা সত্ত্বেও বুলবা গুপ্ত ঘাঁটির বিপদের সম্ভাবনা থেকে সাবধান হলেন। তারা ঘোড়া ছুটাল তাতারকা নামে একটা ছোট নদীর দিকে। নদীটা গিয়ে পড়েছে নীপার নদীতে, ঘোড়াসমেত তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাঁতার দিয়ে অনেক দূর গিয়ে তাদের পদচিহ্ন ঢেকে দিল; তার পর তীরে উঠে আবার তাদের পথ ধরল।

তিনদিন পরে তারা এসে পড়ল গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি। বাতাস হঠাৎ শীতল হয়ে এলো, বোঝা গেল নীপার দূরে নয়। দূরে তার আভাস দেখা যাচ্ছিল, কালো এক প্রশস্ত রেখার মতো দিগন্ত থেকে তা পৃথক হয়ে আছে। বাতাস ভরে উঠল তার শীতল ঝলকে, বিস্তার ক্রমশ নিকটতর হল, শেষ পর্যন্ত ভূমিতলের অর্ধাংশ অধিকার করে বসল। এই জায়গায় নীপার চড়া পড়ে অবরুদ্ধ হওয়ার পর, নিজের পথ কেটে নিয়ে সমুদ্রের মতো গর্জন করে আপন ইচ্ছামতো ছড়িয়ে চলেছে; এখানে, মাঝখানে দ্বীপ জেগে উঠে তার দুই তীর আরও বিস্তীর্ণ করে তুলেছে। পাহাড় বা খাড়াইয়ের কোন বাধা না পেয়ে ভূমিতলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে তার তরঙ্গদল। কসাকেরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, পারানি-নৌকায় চড়ে তিন ঘণ্টা পরে হোর্‌তিৎসা দ্বীপের তীরে পৌঁছল;*) সেচ্‌ ঘন-ঘন তার স্থান পরিবর্তন করে — তখন তা ছিল সেইখানেই।

তীরে একদল লোক পারানি-মাঝির সঙ্গে কলহ করছিল। কসাকেরা

ঘোড়া সাজাল। তারাস সম্ভ্রান্ত ভাব ধারণ করে কোমরবন্ধ কষে আঁটলেন এবং গোঁফে তা দিতে লাগলেন গর্বিতভাবে। অজ্ঞাত আশঙ্কা ও অনির্দিষ্ট আনন্দের মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে তার তরুণ পুত্রেরাও নিজেদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল। পরে তারা সকলে একত্রে সেচ্ থেকে আধ ভার্স্ট দূরের এক শহরতলীতে প্রবেশ করল। প্রবেশ করতেই তাদের কানে তালা লেগে গেল পঞ্চাশজন কামারের হাতুড়ীর শব্দে, তারা কাজ করছিল মাটিতে খোঁড়া, ঘাসের চাব্‌ড়া দিয়ে ঢাকা পঁচিশটি কামারশালায়। সবল-দেহ চর্মকারেরা পথের ওপরে চালার তলে বসে জোরালো হাতে বৃষ-চর্ম মলছিল। ব্যবসায়ীরা বসে ছিল তাদের তাঁবুতে, তাদের সামনে চকমকি-পাথর, লোহা ও বারুদের স্তূপ। দামী দামী রুমাল ঝুলিয়ে রেখেছে একজন আর্মানী; একজন তাতার ময়দার কাই দিয়ে জড়িয়ে লোহার শিকের ওপর ভেড়ার মাংস ঝলসাচ্ছে; এক ইহুদী ঝুঁকে পড়ে পিপে থেকে ধীরে ধীরে ভোদ্‌কা ঢালছে। কিন্তু যে লোকের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা হল সে একজন নীপার-কসাক, পথের ঠিক মাঝখানে ঘুমিয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। তাকে দেখে তারাস বুলবা না থেমে আর তার তারিফ না করে পারলেন না।

'আঃ, কি চমৎকার দৃশ্য! দ্যাখ তোরা, চেহারায় কী তেজ!' বললেন ঘোড়া থামিয়ে।

সত্যিই, এ এক দুর্দান্ত সাহসের ছবি: নীপার-কসাক পথের ওপর শুয়ে আছে সিংহের মতো দেহ এলিয়ে। তার ঝুঁটি এক ফুট জুড়ে পড়ে আছে সগর্বে। তার দামী লাল বনাতের চওড়া সালোয়ার আলকাতরা-মাখানো, কসাক যেন দেখাতে চায় দামী কাপড়ের প্রতি তার পরিপূর্ণ অবজ্ঞা।

কিছুক্ষণ তারিফ করার পর বুলবা এগিয়ে চললেন সরু রাস্তা ধরে। যারা এখানেই কাজ করে সেইসব কারিগর ও নানা জাতির ব্যবসায়ীদের ভিড় এখানে। তাদের পণ্যদ্রব্যে সেচের এই শহরতলী দেখতে হয়েছে মেলার মতো; এখান থেকেই সেচের খাদ্যবস্তের সংস্থান হয়, কেননা সেচের অধিবাসীরা জানত কেবল বন্দুক চালাতে আর মদ্যপান করতে।

শেষ পর্যন্ত তারা শহরতলী পার হয়ে দেখতে পেল ছড়ানো কতকগুলি কুরেন, ঘাসের চাব্‌ড়া দিয়ে অথবা তাতারীয় ধরনে পশমী কাপড়ে ঢাকা। কতকগুলির চারধারে কামান পাতা। শহরতলীর মতো এখানে কোথাও কোন বেড়া বা ছোট ছোট কাঠের থামে শামিয়ানা টাঙানো নীচু-ছাতওয়ালা বাড়ি নেই। কাটা গাছের স্তূপ ও নীচু প্রাকার সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। তাতে

বোঝা যাচ্ছিল, এরা সাবধানতার কোন ধারই ধারে না। কয়েকজন জোয়ান কসাক পাইপ মুখে সেই রাস্তায় শুয়ে ছিল। তাদের দিকে ওরা তাকাল রীতিমতো উদাসীনভাবে, কিন্তু যেখানে ছিল সেখান থেকে নড়ল না। 'নমস্কার মশাইরা!' বলতে বলতে তাদের ভিতর দিয়ে তারাস সাবধানে ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। 'নমস্কার!' জবাব দিল নীপার-কসাকরা। চারদিকে সারা মাঠ ভরে ছবির মতো সাজানো লোক। তাদের রোদে-পোড়া মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে যুদ্ধের আগুনে তারা পোক্ত, সব রকম কষ্টই তাদের সহ্য হয়ে গেছে। তাহলে, এই-ই সেচ্! এই কন্দর থেকে নির্গত হয় মানুষের দল, সিংহের মতো সদর্প ও শক্তিমান! এখান থেকেই সারা ইউক্রেনে ছড়িয়ে পড়েছে স্বাধীনতা ও কসাকত্ব!

অশ্বারোহী পথযাত্রীরা এসে পৌঁছল প্রশস্ত চত্বরে, এখানেই সাধারণত নীপার কসাকদের জাপোরোজীয় বাহিনীর সামরিক সভার অধিবেশন হয়। একটা প্রকাণ্ড ওল্টানো পিপের উপরে একজন কসাক বিনা কামিজে বসে ছিল; কামিজের ছিদ্রগুলি সেলাই করছিল সে ধীরে ধীরে। আবার তাদের পথরোধ করল একদল বাদক, তাদের মধ্যে নাচছিল একজন তরুণ কসাক, তার বাহু বিস্তারিত, টুপি মাথায় বেপরোয়াভাবে। সে কেবলই চিৎকার করছিল, 'আরও জোরে বাজাও! আর ফোমা, এই খ্রীষ্টিয়ানদের ভোদ্কা দিতে কমতি করো না!' ফোমার চোখে আঘাতের কালো দাগ। প্রকাণ্ড একটা গোল পাত্র ভরে যারাই এগিয়ে এলো তাদের প্রত্যেককে সে বেহিসাবী মদ মেপে দিল। তরুণ কসাকটিকে ঘিরে বেশ লঘুগতিতে নাচছিল চার জন বৃদ্ধ, কখনও তারা একদিকে ছোটে ঝড়ের মতো, একেবারে বাদকদের প্রায় মাথায় এসে পড়ে, তারপর হঠাৎ শুরু করে হাঁটু মুড়ে নাচ, সজোরে ও ক্ষিপ্রগতিতে ঘোরা-ফেরা করে, রুপোর নাল-বাঁধানো জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘন-ঘন তাল ঠোকে মাটিতে। তাদের নৃত্যে চারদিকে মাটি থেকে চাপা শব্দ উঠতে থাকে, বাঁধানো জুতোর গোপাক ও ত্রেপাক নৃত্যের ছন্দে বাতাস অনেকদূর পর্যন্ত স্পন্দিত। এদের মধ্যে একজনের চিৎকারে জোর সবচেয়ে বেশি, তার নৃত্যের গতিও অন্যদের চেয়ে দ্রুত। তার মাথায় চুলের ঝুঁটি হাওয়ায় এলোমেলো, পেশল বুক একেবারে খোলা; পরনে শীতের গরম মেষ-চর্মের কোট, আর দেহ বয়ে ঘাম ঝরছিল দরদর ধারে। 'আরে গায়ের জামাটা খুলে ফেল হে!' তারাস শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন। 'দেখছ না, ঘাম ছুটছে!' — 'খোলা যাবে না!' কসাকটি চেঁচাল। 'কেন?' 'খোলা যাবে না; এই

আমার স্বভাব: যা খুলে ফেলি তাতে মদ কিনি!' এই তরুণ কসাকের না ছিল টুপি, কাফতানে না ছিল কোমরবন্ধ, না কোন সূচিকর্ম-বসানো রুমাল: সবই গেছে যে পথে যাবার। ভিড় বাড়তে লাগল; আরও অনেকে যোগ দিল নৃত্যে, কোন দর্শকের পক্ষে বিনা অভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্যে অসম্ভব ছিল এই উত্তেজক উন্মত্ত নৃত্য দেখা। পৃথিবীর অন্য কোথাও সে নৃত্য দেখা যায় না, তার বলশালী উদ্ভাবকদের নামানুসারে একেই বলা হয় কসাক নৃত্য।

'আঃ, ঘোড়াটা যদি না থাকত!' তারাস চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ইচ্ছে করছে নিজেই নেমে পড়ে যোগ দিই নাচে!'

ইতিমধ্যে ভিড়ের মধ্যে দেখা যেতে লাগল বৃদ্ধ শান্ত কসাকদের, অতীত কৃতিত্বের জন্য এঁরা সারা সেচে সম্মানিত; তাঁদের ঝুঁটি সাদা, অনেকবার তাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন মণ্ডল। তারাস শিগগিরই অনেক চেনা মুখ দেখতে পেলেন। অস্তাপ ও আন্দ্রি ক্রমাগত শুনতে লাগল অভিবাদন, 'আরে তুমি, পেচেরিৎসা! আছ কেমন, কোজোলুপ!'—'ঈশ্বর তোমায় কোথা থেকে আনলেন, তারাস?'—'তুমি এলে কোথা থেকে, দোলোতো?'—'ভালো ত, কির্দিয়াগা! ভালো ত, গুস্তি! তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে কখনও ভাবি নি, রেমেন।' সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে চুমা খেতে লাগলেন সেই সব বীরেরা, পূর্ব-রাশিয়ার বন্য প্রান্তর থেকে যাঁরা এখানে জমা হয়েছেন। তারপর চলতে লাগল প্রশ্ন, 'কাস্যান-এর কি হল? বোরোদাদ্‌কা কোথায়? আর কোলোপের? পিদ্‌সিশোক আছে কেমন?' তারাস উত্তরে কেবল শুনতে লাগলেন যে বোরোদাভ্‌কার ফাঁসি হয়েছে তোলোপানে, কিজিকির্মেনে কোলোপেরের গায়ের চামড়া জীবন্ত অবস্থায় টেনে ছেঁড়া হয়েছে, পিদ্‌সিশোকের মাথা কেটে নুন মাখিয়ে একটা পিপেয় ভরে পাঠানো হয়েছে কন্‌স্তান্তিনোপলে। বৃদ্ধ তারাস মাথা নত করলেন, চিন্তান্বিত মৃদু স্বরে বললেন, 'কী ভালো কসাকই না ছিল এরা!'

৩

তারাস বুলবা ও তাঁর ছেলেদের ইতিমধ্যেই সপ্তাহখানেক সেচে কাটল। অস্তাপ ও আন্দ্রি সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করল কমই। সামরিক অনুশীলনে কষ্ট করে সময় নষ্ট করা সেচ্ পছন্দ করত না; এর যুবকেরা শিক্ষিত ও

গঠিত হত একমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই, যুদ্ধের উত্তাপে, সেইজন্য যুদ্ধের প্রায় কখনও বিরতি ছিল না। অন্তর্বর্তীকালে কোনরকম শিক্ষায় নিযুক্ত হওয়া কসাকদের মনে হত বিরক্তিকর; ব্যতিক্রম ছিল হয়ত বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করা, মাঝে মাঝে ঘোড়দৌড় ও স্তেপে বা নিম্নভূমিতে বন্য পশুশিকার; বাকি সময় কাটত স্ফূর্তিতে—তাদের অপার প্রাণোচ্ছ্বাসের এ এক নিদর্শন। সমস্ত সেচ্ ভরে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ যেন এক অবিচ্ছিন্ন পানোৎসব ও নৃত্যোৎসব, ধুমধামের সঙ্গে শুরু হয়ে আর যেন শেষ হতে চায় না। কিছু কিছু লোক কারিগরী করত, অন্যেরা দোকান খুলত ও কেনা-বেচা করত; কিন্তু বেশির ভাগই স্ফূর্তি করত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, যতক্ষণ তাদের পকেটে শোনা যেত টাকার আওয়াজ, যতক্ষণ না তাদের লুঠের অর্জন দোকানদার ও শুঁড়ির হাতে চলে যেত ততক্ষণ। এই সর্বব্যাপী উৎসবের যেন কেমন এক জাদু ছিল। যারা দুঃখে মদ্যপান করে তেমন মদ্যপায়ীর সমাবেশ এটা নয়; এ কেবল স্ফূর্তির এক উদ্দাম অভিব্যক্তি। যে লোকই এখানে আসত, আসত তার সকল কষ্ট ভুলে গিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। অতীতের গায়ে থুতু দিয়ে নির্বিচারে উন্মুক্ত জীবনযাপনে ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই সাথীদের সঙ্গে, তারই মতো যাদের না ছিল আপনজন, না ঘরবাড়ি, পরিবার, ছিল কেবল উন্মুক্ত আকাশ ও তাদের অন্তরের চিরন্তন উৎসব। এ থেকেই উৎপত্তি সেই উন্মত্ত মাতামাতির, অন্য কোন উৎস থেকে যা উদ্ভূত হতে পারত না। ভূমিতলে অলসভাবে বিশ্রামকারী লোকগুলির ভিতরে যে সব গল্পগুজব চলত সেগুলি এতই আমোদজনক ও সজীব যে তা শুনে মুখের বাহ্য শান্তভাবে অবিকৃত রাখতে হলে, এমন কি গোঁফটি পর্যন্ত না নাড়তে হলে, প্রয়োজন হত শুধু নীপার-কসাকগণের পক্ষেই যা সম্ভব তেমন এক নির্বিকার আকৃতির, যে বিশেষ লক্ষণ আজ পর্যন্ত দক্ষিণ রাশিয়ার অধিবাসীদের পৃথক করে রেখেছে তাদের অন্যান্য ভাইদের কাছ থেকে। পানোন্মত্ত হট্টগোলে ভরা স্ফূর্তি এটা বটে, তথাপি সেই ধরনের অন্ধকার শুঁড়িখানা নয় যেখানে কুৎসিত মেকি স্ফূর্তিতে মানুষ নিজেকে ভুলতে চায়; এ ছিল স্কুলের ছাত্রদের একটি দৃঢ়সংবদ্ধ সাথীর দল। একমাত্র পার্থক্য এই যে স্কুলের বেঞ্চে বসে শিক্ষকদের বোর্ডের লেখা দেখা ও মামুলি পড়াশোনার বদলে তারা আয়োজন করত পাঁচহাজার ঘোড়ায় চড়ে অভিযানের; বল খেলার মাঠের বদলে তাদের ছিল বেপরোয়া অরক্ষিত সীমান্ত, সেখানে দেখা দিয়ে যেত দ্রুতগতি তাতারের মাথা আর কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকত সবুজ পাগড়ি মাথায় তুর্কী। পার্থক্য এই যে, স্কুলে তারা একত্রিত হত অন্যের ইচ্ছাশক্তির তাড়নে, আর এখানে তারা নিজেরাই পালিয়ে আসত স্বেচ্ছায় বাপ-মা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে; এখানে ছিল এমন অনেকে যাদের গলায় একদা ফাঁসির দড়ি জড়িয়ে এসেছিল আর সেই বিবর্ণ মৃত্যুর পরিবর্তে তারা পেয়েছে জীবন, পূর্ণ উদ্দামতার জীবন; এখানে ছিল অনেকে যাদের আভিজাত্যই হল পকেটে একটি কোপেকও রাখতে না পারা; ছিল অনেকে যাদের কাছে একটা স্বর্ণমুদ্রাও সম্পদ-স্বরূপ, যাদের পকেট ইহুদী ভাড়াটেদের কৃপায় এমনই শূন্য যে উলটে দিলেও তা থেকে কিছু গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই; ছিল এমন সব ছাত্র যারা শিক্ষালয়ের বেত সহ্য করতে পারে নি এবং সেখান থেকে এসেছে একটি অক্ষরও না শিখে; কিন্তু তাদেরই সঙ্গে ছিল এমন অনেকে যারা জানত হোরেস, সিসেরো ও রোমক সাধারণতন্ত্রের কথা। এখানে ছিলেন এমন অনেক অফিসার যাঁরা পরে পোল্যাণ্ডের রাজার অধীনে যুদ্ধ করে যশ অর্জন করেন, আর ছিল অনেক অভিজ্ঞ গেরিলা যাদের মহৎ বিশ্বাস ছিল এই যে কোথায় যুদ্ধ করছে তাতে কিছু আসে যায় না, যুদ্ধ করতে পারলেই হল, যুদ্ধ ছাড়া বেঁচে থাকা মানী ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। আরও অনেকে ছিল যারা এখানে এসেছিল কেবল ভবিষ্যতে এই কথা বলার জন্যে যে তারা সেচে ছিল এবং ইতিমধ্যেই বীরত্বে পরিপক্ক হয়েছে। কিন্তু এখানে না ছিল কে? এই অদ্ভুত সাধারণতন্ত্রটি ছিল ঐ যুগোপযোগী এক সৃষ্টি। যারা ভালোবাসে সামরিক জীবন, সোনার পানপাত্র, দামী ব্রোকেড, সুবর্ণ মুদ্রা, এখানে তাদের কখনও কাজের অভাব হয় না। এখানে স্থান ছিল না কেবল তাদের নারী যাদের আরাধ্য, কারণ সেচের প্রান্তভাগেও দেখা দেওয়া কোন নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অস্তাপ ও আন্দ্রির কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকল যে তারা থাকতে থাকতেই সেচে বৃহৎ একটি জনতা প্রবেশ করেছিল, কিন্তু কেউই তাদের প্রশ্ন করল না তারা কোথা থেকে আসছে, তারা কারা, কীই বা তাদের নাম। তারা এমনভাবে এখানে এলো যেন কেবল ঘণ্টাখানেক বাইরে থেকে এখন নিজেদের ঘরে ফিরছে। নবাগতেরা দেখা করত কেবল ক্যাম্প-সর্দারের*) সঙ্গে। তিনি সাধারণত বলতেন:

'নমস্কার! খৃীষ্টে বিশ্বাস কর ত?'

'বিশ্বাস করি!' উত্তর করত নবাগত।

'আর ঈশ্বরের ত্রিসত্তায় বিশ্বাস কর ত?'

'হ্যাঁ, করি!'

'গির্জায় যাও ত?'

'যাই।'

'এখন একবার ক্রুশ-চিহ্ন কর!'

নবাগত ক্রুশ-চিহ্ন করত।

'আচ্ছা,' ক্যাম্প-সর্দার উত্তর করতেন। 'এখন যাও, পছন্দমতো একটা কুরেন বেছে নাও।'

এইভাবে অনুষ্ঠান শেষ হত। সমস্ত সেচ্ প্রার্থনা করত একটি গির্জায়, একে রক্ষা করতে তারা প্রস্তুত ছিল তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে, যদিও উপবাস বা মিতাচারের কথায় তারা কান দিত না। প্রচন্ড অর্থলোভী ইহুদী, আর্মানী ও তাতাররাই কেবল সাহস করে শহরপ্রান্তে বাস করে এদের সঙ্গে বেচা-কেনা করত, কেননা নীপারে-কসাকরা দর কষাকষি করতে একদম ভালোবাসত না, পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু উঠত তাই দিয়ে দিত। কিন্তু এই অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের ভাগ্যও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের অবস্থা ছিল ভিসুভিয়াসের পাদদেশস্থ অধিবাসীদের মতো, কেননা নীপার-কসাকদের অর্থের অভাব ঘটলেই এই দোকানপাট ভেঙে দিয়ে যা খুশি বিনামূল্যে নিয়ে যেত এই বেপরোয়ারা। সেচে ছিল ষাটটিরও ওপর কুরেন, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন সাধারণতন্ত্রের মতো, শিক্ষালয় আর সেমিনারির সঙ্গে এর মিল ছিল আরও বেশি। আলাদা গৃহস্থালী বা অধিকৃত সম্পত্তি কারও ছিল না। সমস্ত কিছুই ছিল কুরেনের সর্দারের হাতে, এই জন্য তাঁকে বলা হত বাবা। তাঁরই হাতে থাকত টাকাকড়ি, কাপড়-চোপড়, জাউ, মন্ড, এমন কি জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত; নিজেদের টাকাও তাঁর কাছে জমা রাখা হত। যখন-তখন বিতর্ক বাধত কুরেনে কুরেনে। মুহূর্তে তা কথা কাটাকাটি থেকে পরিণত হত হাতাহাতিতে। চত্বর ছেয়ে যেত কুরেনে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শক্তিতে অন্যের উপর টেক্কা মেরে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলত পরস্পর ঘুষোঘুষি আর তার পরই শুরু হত পানোৎসব। এই হল সেই সেচ্, যার প্রতি তরুণদের ছিল অত আকর্ষণ।

অস্তাপ ও আন্দ্রি তাদের যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে এই উদ্দাম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পৈতৃক বাড়ি, সেমিনারি এবং যা কিছুতে এতদিন তাদের চিত্ত ভরে ছিল একমুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে নিজেদের ভাসিয়ে দিল নতুন জীবনে। সবকিছুতেই তাদের আগ্রহ: সেচের উদ্দাম আচরণ, তার সাদাসিধে

শাসন-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন সব। মাঝে মাঝে তাদের মনে হত এ আইন এমন মুক্ত সাধারণতন্ত্রের পক্ষে অতিমাত্রায় কঠোর। যত সামান্যই হোক না কেন, কোন কসাকের চুরি ধরা পড়লে তা সমগ্র কসাকত্বের কলঙ্ক বলে গণ্য হত। এই অসৎ লোকটিকে বেঁধে ফেলা হত 'কলঙ্কের থামে', তার পাশে রাখা হত একটি লগুড়, প্রত্যেক পথচারীর কর্তব্য ছিল তাকে আঘাত করা, যতক্ষণ না এইভাবে মৃত্যু হত তার। কোন কসাক ধার শোধ না করলে তাকে কামানের গায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, এইভাবে তাকে থাকতে হত যতক্ষণ না তার বন্ধুদের কেউ এসে তার খালাসের টাকা দিত, তার হয়ে ধার শোধ করত। কিন্তু হত্যাকারীর জন্য যে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল সেটাই আন্দ্রির মনে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করল। তার চোখের সামনেই খোঁড়া হত গর্ত, হত্যাকারীকে জীবিত অবস্থায় তাতে নিক্ষেপ করা হত, তার উপর চাপানো হত শবাধার, যে-ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে তার দেহ থাকত সেই শবাধারে, মাটি ঢেলে গোর দেওয়া হত দু'জনকেই। শাস্তির এই ভীষণ অনুষ্ঠান, জ্যান্ত মানুষকে ঐ ভয়ঙ্কর শবাধারের সঙ্গে একত্রে গোর দেওয়া আন্দ্রি বহুদিন ভুলতে পারে নি।

অচিরেই এই দুই কসাক যুবক কসাকদের মধ্যে সুখ্যাত হয়ে উঠল। তারা প্রায়ই স্তেপে বেরিয়ে যেত তাদের কুরেনের সঙ্গীদের সঙ্গে, মাঝে মাঝে এমন কি সারা কুরেনের গোটা দল ও প্রতিবেশী কুরেনও সঙ্গে থাকত, স্তেপে সব রকমের পাখি শিকার করত অগণিত সংখ্যায়, শিকার করত ছাগল ও হরিণ; কিংবা তারা যেত হ্রদে, নদীতে, শাখানদীতে, কোন্ কুরেন কোথায় যাবে ভাগ্যের দান ফেলে ভাগ করে দেওয়া হত। সেখানে জাল ফেলে অজস্র মাছ ধরে সমস্ত কুরেনের খাদ্যের সংস্থান করত। যদিও এ সব কাজে এমন কিছু ছিল না যাতে তাদের কসাক হিসাবে পরীক্ষা হয়, তবু সব বিষয়ে তাদের সাহস ও সাফল্যের জন্য তারা দেখতে দেখতে অন্য যুবকদের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে পড়ল। লক্ষ্যভেদে তারা ছিল দুর্জয় ও অমোঘ; তারা নীপার নদী পারাপার হতে পারত স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার দিয়ে—এই কাজের জন্য নতুন ব্রতীকে সাড়ম্বরে গ্রহণ করা হত কসাক মহলে।

কিন্তু বৃদ্ধ তারাস তাদের জন্য অন্য রকম কাজের আয়োজন করতে লাগলেন। তাদের এই স্ফূর্তির জীবন তাঁর মনঃপূত ছিল না—তিনি চাইতেন কাজের কাজ। তিনি ভাবতে লাগলেন কী ভাবে সেচ্‌কে প্রবৃত্ত করা যায় এমন দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে যাতেপ্রয়োজন হবে প্রকৃত বীরত্বের।

শেষে একদিন তিনি ক্যাম্প-সর্দারের কাছে গিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন:

'কী বল, সর্দার, নীপার-কসাকদের বেরিয়ে পড়ার কি সময় হয় নি?'

মুখ থেকে ছোট পাইপ নামিয়ে নিয়ে এবং পাশের দিকে থুথু ফেলে সর্দার উত্তর দিলেন, 'যাবার জায়গা নেই।'

'জায়গা নেই বল কী! তাতার বা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যেতে পারি।'

শান্তভাবে পাইপটি আবার মুখে লাগিয়ে সর্দার উত্তর দিলেন, 'না, তাতার বা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না।'

'কেন চলবে না?'

'সুলতানের কাছে আমরা শান্তির প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'কিন্তু সে ত বিধর্মী: ভগবানের ও পবিত্র গ্রন্থের আদেশ আছে বিধর্মীদের বিনাশ করার।'

'আমাদের অধিকার নেই। আমরা যদি আমাদের ধর্মের নামে শপথ না করতাম তাহলে হয়ত সম্ভব ছিল; কিন্তু এখন হয় না, সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়? এ তুমি কী বলছ যে আমাদের অধিকার নেই? এই ত রয়েছে আমার দুই ছেলে, দু'জনেরই বয়স কম। তাদের দু'জনের একজনও এখনও যুদ্ধে যায় নি; আর তুমি বলছ যে নীপার-কসাকদের যুদ্ধে যাবার দরকার নেই।'

'হাঁ, এখন আর তেমন দরকার নেই।'

'তাহলে বলতে চাও যে কসাকের শক্তি অযথা নষ্ট হবে, লোকে মরবে কুকুরের মতো, কোন যোগ্য কাজ না করে, স্বদেশের বা খ্রীষ্ট ধর্মের কোন উপকারে না লেগে? তাহলে কিসের জন্য আমরা বেঁচে আছি, বল কোন্ কম্মে ছাই আমরা বেঁচে আছি? বুঝিয়ে দাও তুমি আমাকে এটা। তুমি ত বুদ্ধিমান লোক, অকারণে তোমাকে সর্দার করা হয় নি, বুঝিয়ে দাও তুমি আমাকে, কেন আমরা বেঁচে আছি?'

এই প্রশ্নের কোন উত্তর সর্দার দিলেন না। তিনি এক জেদী কসাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন:

'যাই হোক, যুদ্ধ হবে না।'

'তাহলে যুদ্ধ হবে না?' তারাস আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'এ কথা ভেবে দেখারও দরকার নেই?'

'হাঁ, ভাবারও দরকার নেই।'

তারাস মনে মনে বললেন, 'দাঁড়াও তুমি, শয়তানের বাচ্চা! তুমি আমাকে এখনও চেনো না!' তখনই তিনি সংকল্প করলেন সর্দারের উপর শোধ নিতে হবে।

এর ওর সঙ্গে কথাবার্তার পর তিনি সকলকে প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়ালেন। এই মত্ত কসাকেরা সোজা গেল চত্বরে, যেখানে খুঁটিতে বাঁধা থাকত ঢাক। এই ঢাক বাজিয়ে সাধারণত সেনা পরিষদের জমায়েতে ডাকা হয়। ঢাকের কাঠি ঢাকী সব সময় নিজের কাছে রাখত — তাই বাজানোর কাঠি না পেয়ে তারা প্রত্যেকে কাষ্ঠখন্ড যোগাড় করল আর তা দিয়ে ঢাক পেটাতে লাগল। এতে সকলের আগে দৌড়ে এলো ঢাকী নিজেই, লোকটি ঢ্যাঙা, একটিমাত্র চোখ, সে চোখও মনে হত যেন ঘুমে ঢুলু-ঢুলু।

সে হাঁক পাড়ল, 'কার এত সাহস যে ঢাক বাজায়?'

'কথা না বলে ঢাকের কাঠিটি নিয়ে বাজাও ত দেখি, আমাদের হুকুম,' উত্তর দিল মাতাল মোড়লরা।

ঢাকী তৎক্ষণাৎ তার পকেট থেকে কাঠি বার করল, সে ভালোমতোই জানত এই ধরনের ঘটনার শেষ কোথায়। ঢাক গর্জে উঠল, দেখতে দেখতে চত্বরে ঝাঁকে ঝাঁকে কালো ভ্রমরের মতো জমা হল নীপার-কসাকরা।

গোল হয়ে সকলে সমবেত হল, শেষে, তৃতীয় ডাকের পর, দেখা গেল মোড়লদের: ক্যাম্প-সর্দার এলেন তাঁর পদমর্যাদার চিহ্ন গদা হাতে নিয়ে, বিচারক এলেন তাঁর সামরিক সীলমোহর নিয়ে, মুহুরী এলেন তাঁর দোয়াত হাতে, আর কসাক-ক্যাপ্টেনের হাতে তাঁর দণ্ড।

ক্যাম্প-সর্দার ও মোড়লরা মাথার টুপি খুলে ফেলে মাথা নুইয়ে চারদিকে অভিবাদন জানালেন কসাকদের, তারা দাঁড়িয়ে ছিল দৃপ্তভাবে, কোমরে হাত দিয়ে।

'এই সমাবেশের কি উদ্দেশ্য? কী চান আপনারা?' ক্যাম্প-সর্দার প্রশ্ন করলেন। গালাগালি ও চিৎকার করে তাঁকে থামানো হল।

'তোমার গদা ছাড়! এক্ষুনি ছাড় তোমার গদা, শয়তানের বাচ্চা! আমরা আর চাই না তোমাকে!' জনতা থেকে কসাকেরা চিৎকার করে উঠল।

মনে হল কয়েকটি অপ্রমত্ত কুরেন প্রতিবাদ করতে চায়; কিন্তু পানোন্মত্ত

কুরেন ও অপ্রমত্ত কুরেন, উভয় দলে শুরু হয়ে গেল মুষ্টি-যুদ্ধ। চিৎকার ও হট্টগোল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

ক্যাম্প-সর্দারের ইচ্ছা ছিল কিছু বলার। কিন্তু তিনি জানতেন যে ক্ষিপ্ত, স্বেচ্ছাচারী জনতা তা হলে তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে, অনুরূপ অবস্থায় এটা প্রায় হামেশাই ঘটে থাকে। তিনি মাথা খুব নীচু করে গদা রেখে দিয়ে জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'আদেশ করুন, মশাইরা, আমরাও কি আমাদের পদের নিদর্শনগুলো ছেড়ে দেব?' তাঁদের দোয়াত, সামরিক সীলমোহর ও দন্ড ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করলেন বিচারক, মুহুরী ও ক্যাপ্টেন।

'না, আপনারা থাকুন!' চিৎকার উঠল জনতা থেকে। 'আমরা তাড়াতে চাই কেবল ক্যাম্প-সর্দারকে, ওটা একটা মাগী, আমরা চাই মরদ ক্যাম্প-সর্দার।'

'কাকে ক্যাম্প-সর্দার করছেন আপনারা?' মোড়লরা জিজ্ঞেস করলেন।

'কুকুবেন্‌কোকে করা হোক!' এক দল চিৎকার করে উঠল।

'আমরা চাই না কুকুবেন্‌কোকে!' চেঁচাল অন্যেরা। 'সে ছেলেমানুষ, তার ঠোঁটে গায়ের দুধ এখনও শুকায় নি!'

কেউ কেউ চেঁচাল, 'শিলো ক্যাম্প-সর্দার হোক! শিলোকে ক্যাম্প-সর্দার করা হোক!'

'চুলোয় যাক শিলো!' জনতা চিৎকার করে উঠল। 'কী রকমের কসাক সে, কুত্তার বাচ্চা একটা, তাতারের মতো চুরি করে। মাতালটাকে ছালায় পুরে চুলোয় পাঠাও।'

'বোরোদাতি, বোরোদাতিকে করা হোক ক্যাম্প-সর্দার!'

'চাই না আমরা বোরোদাতিকে! জাহান্নমে যাক বোরোদাতি!'

'কির্দিয়াগার নামে চেঁচাও!'—তারাস বুলবা কয়েকজনকে চুপি চুপি বললেন।

'কির্দিয়াগা! কির্দিয়াগা!' জনতা চিৎকার করল। 'বোরোদাতি, বোরোদাতি! কির্দিয়াগা, কির্দিয়াগা! শিলো! শিলো চুলোয় যাক! কির্দিয়াগা!'

প্রার্থীরা সকলেই তাদের নাম শোনামাত্র জনতা থেকে বেরিয়ে গেল যাতে কেউ না ভাবতে পারে যে তারা নির্বাচনে নিজেদের জন্য চেষ্টা করছে।

'কির্দিয়াগা! কির্দিয়াগা!' আরও জোরে শোনা যেতে লাগল। 'বোরোদাতি!'

ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল ঘুষোঘুষিতে এবং জয় হল কির্দিয়াগার।

'কির্দিয়াগাকে সামনে আন!' চিৎকার করল সকলে।

জনদশেক কসাক জনতা থেকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে এলো; তাদের কয়েকজনের পা টলছিল, ভোদ্‌কার পরিমাণ খুবই বেশি হয়ে গিয়েছিল; তারা সোজা কির্দিয়াগার কাছে গেল তাঁকে নির্বাচনের সংবাদ দিতে।

কির্দিয়াগার বয়স হলেও তিনি বুদ্ধিমান কসাক, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কুরেনে বসেছিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না কী ঘটছে।

'আপনারা কী চান, মশাইরা?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'চলে এসো, তোমাকে ক্যাম্প-সর্দার করা হয়েছে!..'

'মাফ করবেন, মশাইরা!' কির্দিয়াগা বললেন। 'এ সম্মানের কোথায় আমার যোগ্যতা! কী দিয়ে আমি ক্যাম্প-সর্দার হব! এ দায়িত্বের উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধিও আমার নেই। সারা সেনাবাহিনীতে কি এর চেয়ে ভালো লোক পাওয়া গেল না?'

'চলে এসো, বলছি তোমাকে!' নীপার-কসাকদের চিৎকার উঠল। দু'জনে ধরল তাঁর দুই হাত। তিনি নিজে যতই পা ছোঁড়াছুঁড়ি করুন না কেন, তাঁকে টানতে টানতে চত্বরে নিয়ে যাওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে চলল গালিবর্ষণ, ঘুষি, লাথি ও হুকুম, 'পিছিয়ে যাস্ নে, শয়তানের বাচ্চা! যে সম্মান পাচ্ছিস, কুত্তা, তা নিয়ে নে!'

এই ভাবে কসাকদের মণ্ডলীতে আনা হল কির্দিয়াগাকে।

'তাহলে মশাইরা?' তাঁর সঙ্গীরা জনতাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল। 'এই কসাককে আমাদের ক্যাম্প-সর্দার করায় আপনারা কি রাজী?'

'সবাই রাজী!' গর্জন করে উঠল জনতা, ও সেই চিৎকারে বহুক্ষণ গমগম করতে লাগল গোটা ময়দান।

মণ্ডলদের মধ্যে একজন গদাটি নিয়ে এই নব-নির্বাচিত ক্যাম্প-সর্দারকে অর্পণ করতে এলেন। প্রথা অনুসারে কির্দিয়াগা তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করলেন। মোড়ল দ্বিতীয় বার অর্পণ করতে এলেন। কির্দিয়াগা দ্বিতীয় বারও অস্বীকার করলেন, শুধু তৃতীয় বার অর্পণ করলে কেবল তখনই তিনি গদাটি গ্রহণ করলেন। সমস্ত জনতা থেকে সমর্থনসূচক চিৎকারধ্বনি উঠল, ও কসাকদের এই চিৎকারে সারা ময়দান আবার বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত

হল। তখন জনগণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন চার জন প্রবীণতম কসাক, সাদা গোঁফ, মাথার ঝুঁটিও সাদা (সেচে অতিবৃদ্ধ লোক পাওয়া যেত না, কারণ নীপার-কসাকদের কেউই স্বাভাবিক অবস্থায় মরত না)। এঁরা প্রত্যেকে হাতে তখনকার বৃষ্টিতে কাদা হয়ে যাওয়া মাটি তুলে নিয়ে কির্দিয়াগার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। ভিজে মাটি তাঁর মাথা থেকে গড়িয়ে এলো গালে ও গোঁফে, সমস্ত মুখ কর্দমাক্ত হয়ে গেল। কিন্তু কির্দিয়াগা দাঁড়িয়ে রইলেন অকম্পিতভাবে, কসাকেরা তাঁকে যে সম্মান দেখাল তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এইভাবে সমাপ্ত হল এই কোলাহলপূর্ণ নির্বাচন; জানা নেই, এটার ফলে বুলবার যত আনন্দ হয়েছিল তত আর কারও হয়েছিল কি না। এতে তিনি আগেকার ক্যাম্প-সর্দারের উপর প্রতিশোধ নেন। অধিকন্তু, কির্দিয়াগা ছিলেন তাঁর পুরনো বন্ধু, জলে-স্থলে অনেক অভিযানে তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন, সামরিক জীবনের সব দুঃখকষ্ট একসঙ্গে ভোগ করেছেন। জনতা তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ল নির্বাচনের উৎসব পালন করতে, শুরু হল এমন হাঙ্গামা যা অস্তাপ ও আন্দ্রি আগে কখনও দেখে নি। সমস্ত মদের দোকান চুরমার হল—মধু, ভোদ্‌কা ও বীয়ার লুঠ হয়ে গেল; দোকানীরা অক্ষতদেহে পালাতে পারলেই খুশি। সারা রাত ধরে চলল চিৎকার ও বীরত্বের গৌরব-গান। উদীয়মান চাঁদ বহুক্ষণ ধরে দেখল গাইয়ে-বাজিয়েরা পথে পথে ঘুরছে, তাদের সঙ্গে আছে বান্দুরা, তুর্বান ও গোল বালালাইকা*), ভ্রমণ করছে গির্জার গানের দল, যাদের সেচে রাখা হত গির্জার গান করার জন্য এবং নীপার-কসাকদের গুণ কীর্তনের জন্য। অবশেষে, খোয়ারি ও ক্লান্তি এই কঠিন মাথাগুলিকেও অভিভূত করল। দেখা যেতে লাগল, কেউ বা এখানে, কেউ বা ওখানে, মাটিতে শুয়ে পড়ছে কসাকেরা। কোথাও হয়ত এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ল, এমন কি কেঁদে ফেলল, এবং দুজনেই একত্রে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কোথাও বা একদল পড়ে রইল স্তূপীকৃত হয়ে; আবার কোথাও কেউ যেন ঘুমানোর জুতসই জায়গা পেয়ে সোজা শুয়ে পড়ল কাঠের জলপাত্রে। কসাকদের ভিতর যে সবচেয়ে শক্ত সে তখনও কী যেন বকছিল অসংলগ্নভাবে; সর্বশেষে, সেও খোয়ারিতে শক্তি হারিয়ে ধপ করে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সমগ্র সেচ্ ঘুমিয়ে পড়ল।

৪

পরের দিনই তারাস বুলবা নতুন ক্যাম্প-সর্দারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন কী ভাবে নীপার-কসাকদের কোন রকম কাজে প্রযুক্ত করা যায়। ক্যাম্প-সর্দার বুদ্ধিমান ও চতুর কসাক, নীপার-কসাকদের হাড়-হদ্দ তিনি জানতেন। এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন, 'আমরা শপথ ভাঙতে পারি না, কোন মতেই না।' পরে, একটু থেমে, তিনি বললেন, 'কিন্তু উপায় আছে; শপথ আমরা ভাঙব না, অন্য কিছু একটা ভাবা যাবে। লোকেরা সব জমায়েত হোক, আমার হুকুমমতো নয়, নিজেদের ইচ্ছামতো। কী ভাবে এটা করতে হবে তা তোমরা বেশ জান। মোড়লরা আর আমি চত্বরে দৌড়ে আসব যেন আমরা কিছুই জানি না।'

এই কথাবার্তার পর এক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবার ঢাক বেজে উঠল। একত্রিত কসাকদের মধ্যে তখনও অনেকে মত্ত ও অর্ধ-চেতন। লক্ষ লক্ষ কসাক-টুপিতে অকস্মাৎ চত্বর ছেয়ে গেল। গুঞ্জন উঠল, 'কে?.. কেন?.. কিসের জন্যে এই জমায়েত?' কেউই উত্তর দিল না। অবশেষে, এ-কোণ থেকে, ও-কোণ থেকে শোনা যেতে লাগল: 'আমাদের কসাক-শক্তি অযথা নষ্ট হচ্ছে: কোন যুদ্ধ নেই!.. আমাদের মোড়লরা কুঁড়ে হয়ে গেছে; তাদের চোখে চর্বি জমে ঝুলে পড়েছে!.. দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার নেই!' বাকি কসাকেরা প্রথমে শুধু শুনছিল, পরে তারাও বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা, পৃথিবীতে কোনরকম ন্যায়বিচার নেই!' এ কথা শুনে মোড়লরা এমন ভাব করলেন যেন তাঁরা বিস্মিত। অবশেষে ক্যাম্প-সর্দার এগিয়ে এসে বললেন:

'নীপার-কসাক মশাইরা, অনুমতি দিন, আমি কিছু বলব!'

'বলে ফেল!'

'আমার বক্তব্যের মূল কথা, মাননীয় মহাশয়রা... কিন্তু হয়ত আপনারা এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভালোই জানেন... যে নীপার-কসাকদের অনেকেই এত ধার করেছেন ইহুদী শুঁড়িদের কাছে আর নিজেদের ভাইদের কাছে, যে কোন শয়তানই এখন তাঁদের আর ধার দেবে না। আমার আরও একটা বক্তব্য এই যে এমন অনেক নওজোয়ান আছে আমাদের মধ্যে যারা এখনও চোখেই দেখে নি যুদ্ধ কাকে বলে, আর আপনারা জানেন মহাশয়রা, নওজোয়ানদের

পক্ষে যুদ্ধ ছাড়া বাঁচাই চলে না। কি রকমের নীপার-কসাক সে, যে একবারও কোন বিধর্মীকে ঠেঙ্গায় নি?'

বুলবা মনে মনে বললেন, 'বেশ বলে।'

'ভাববেন না, মহাশয়রা, যে আমি এ সব কথা বলছি শান্তি ভঙ্গ করার জন্যে: ভগবান রক্ষা করুন! আমি শুধু যা সত্যি তাই বলছি। তাছাড়া আমাদের ধর্মমন্দিরটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন — মুখে আনাই পাপ — কী হাল! ভগবানের করুণায় সেচ্ এখানে রয়েছে বছরের পর বছর, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের গির্জার বাইরের চেহারার কথা বাদ দিচ্ছি, এমন কি ভিতরের আইকনগুলোতেও কোন সাজসজ্জার বালাই নেই। তাঁদের জন্যে অন্ততপক্ষে রুপোর সাজ বানিয়ে দেবার কথাও কেউ কখনও ভাবে নি! জনকয়েক কসাক মৃত্যুকালে দানপত্রে তাঁদের যা দিয়ে গেছেন তাঁরা পেয়েছেন কেবল তাই। ওঁরা দিয়েছেন বটে, তবে এই সব দান খুবই সামান্য, কেননা যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা জীবিতকালেই তাঁদের প্রায় সব অর্থ পান করেই থুয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যের মর্ম এই নয় যে বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমরা সুলতানের কাছে শান্তির শপথ করেছি, আমাদের তাহলে মহা পাপ হবে, কেননা আমরা শপথ করেছি আমাদের ধর্মানুসারে।'

'এমন গুলিয়ে ফেলছে কেন?' বুলবা নিজের মনে বললেন।

'তাহলে দেখুন, মহাশয়রা, যুদ্ধ আমরা শুরু করতে পারি না। আমাদের বীরত্বের মর্যাদাজ্ঞানে এটা বারণ। কিন্তু আমার অল্পবুদ্ধি দিয়ে আমি একটা কথা ভাবছি: শুধু নওজোয়ানদের দল নৌকায় চড়ে আনাতোলিয়ার*) তীরে গিয়ে একটু-আধটু হানা দিয়ে বেড়াক। কী মনে হয় আপনাদের?'

'পাঠাও, সবাইকে পাঠাও!' জনতার সব দিক থেকে চিৎকার উঠল। 'ধর্মের জন্য আমরা সবাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত!'

ক্যাম্প-সর্দার সন্ত্রস্ত হলেন; সারা জাপোরোজ্যেকে উত্তেজিত করার কথা তিনি একবারও ভাবেন নি: এই উপলক্ষে শান্তি ভঙ্গ করা তাঁর মতে অন্যায় হবে।

'অনুমতি করুন, মহাশয়রা, আমার আরও একটি বক্তব্য আছে।'

'ঢের হয়েছে!' নীপার-কসাকরা চিৎকার করল, 'যা বলেছ তার চেয়ে ভালো আর হয় না।'

'তা-ই যদি চান, তবে তা-ই হোক! আমি ত আপনাদের ইচ্ছার দাস।

আপনারা সবাই ত জানেন আর পবিত্র গ্রন্থেও লেখা আছে যে জনতার স্বর — দেবতার স্বর। সবাই মিলে যা ঠিক করা হয়, তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কেবল একটা কথা: আপনারা, মহাশয়রা, জানেন যে আমাদের নওজোয়ানদের এই অল্পস্বল্প ফুর্তির ব্যাপারটাকে সুলতান শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। সুতরাং ইতিমধ্যে আমরা প্রস্তুত হতে পারি, আমাদের শক্তি হবে তাজা, কাউকেই আমাদের ভয় পেতে হবে না। তাছাড়া আমরা বেরিয়ে গেলে তাতাররাও আসতে পারে: বাড়ির কর্তা বাড়ি থাকলে এই তুর্কী কুত্তারা আসতে সাহস পায় না, তারা আমাদের পায়ে কামড়ায় পিছন থেকে, তবু কামড়ায় বেশ জোরে। সত্যি কথা যদি আপনাদের বলতে হয় তাহলে অবস্থা এই যে আমাদের এত নৌকো জমা নেই, আর এত পরিমাণে বারুদও গুঁড়ানো হয় নি যে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়তে পারি। হলে ত আমি খুশিই হতাম: আমি আপনাদের ইচ্ছার দাস।'

চতুর কসাক নেতা থেমে গেলেন। নানা দলে আলোচনা শুরু হল, কুরেন-সেনাপতিরা পরামর্শ করতে লাগলেন; সৌভাগ্যবশত মাতালদের সংখ্যা ছিল কম, তাই সুবুদ্ধির উপদেশ শোনাই স্থির হল।

তখনই কয়েকজন লোককে পাঠানো হল নীপার নদীর অপর পারে বাহিনীর কোষাগারে, যেখানে বাহিনীর ধনভাণ্ডার এবং শত্রুর কাছ থেকে লুঠ-করা কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হত জলের তলে ও নলখাগড়ার মধ্যে। অন্য সকলে নৌকাগুলির তদারক করে সেগুলিকে অভিযানের জন্য তৈরি করে তোলার জন্য দৌড়ে গেল। চোখের নিমেষে সমস্ত নদীতীর লোকে ছেয়ে গেল। দেখা দিল কুঠার-হাতে ছুতোরের দল। রোদে-পোড়া, চওড়া-কাঁধ, শক্ত-পা বৃদ্ধ নীপার-কসাকরা, কারও গোঁফ কালো, কারও গোঁফে পাক ধরেছে। সালোয়ার গুটিয়ে, হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে তারা মোটা দড়িতে টান দিয়ে নৌকাগুলিকে জলে নামাতে লাগল। অন্যেরা শুকনো কাঠ ও যত রাজ্যের কাটা-গাছ বয়ে আনল। কোথাও নৌকায় কাঠের পাটাতন লাগানো হচ্ছে; কোথাও তাকে একদম উলটে দিয়ে তলার ছিদ্রগুলিকে আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করা হচ্ছে; কোথাও কসাক রীতি অনুসারে নৌকার ধারে ধারে লম্বা নলখাগড়ার গোছা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, যাতে সমুদ্রের ঢেউ তাদের ডুবিয়ে না দেয়; দূরে, সারা নদীতীর জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে, তামার কড়ায় আলকাতরা ফুটানো হচ্ছে নৌকোতে লাগানোর জন্য। অভিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধরা তরুণদের শিখাতে লাগলেন। গোলমাল ও কাজের চিৎকার শোনা গেল

চারদিকে: সারা নদীতীর যেন জীবিত হয়ে আন্দোলিত ও গতিশীল হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে একটা বড় পারানী-নৌকো তীরের দিকে আসছিল। তার উপর দাঁড়িয়ে একদল লোক ইতিমধ্যেই দূরে থেকে হাত নাড়াতে শুরু করেছিল। তারা কসাক, তাদের গায়ের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন। শোচনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ — একটা শার্ট ও মুখে ছোট পাইপ ছাড়া অনেকের কিছুই ছিল না। দেখে মনে হয়, হয় তারা কোন রকম বিপদ থেকে খুব সম্প্রতি উদ্ধার পেয়েছে, কিংবা স্ফূর্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের সর্বস্ব — অঙ্গবস্ত্র পর্যন্ত। তাদের ভিতর থেকে এগিয়ে এলো একজন বেঁটে-খাটো, চওড়া-কাঁধ কসাক, বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। তার চিৎকার ও হাত-নাড়া অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেল, কিন্তু কর্মব্যস্ত লোকেদের চিৎকারে ও শব্দে তার একটি কথাও শোনা গেল না।

নৌকো তীরে লাগলে ক্যাম্প-সর্দার প্রশ্ন করলেন, 'কী খবর এনেছ তোমরা?'

কর্মব্যস্ত লোকেরা সকলেই তাদের কাজ থামিয়ে কুঠার ও বাটালি উঁচু করে প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল।

পারানী-নৌকো থেকে বেঁটে-খাটো লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'খারাপ খবর!'

'কিসের খারাপ?'

'আমাকে অনুমতি দেবেন, নীপার-কসাক মহাশয়রা, একটা বক্তৃতা করতে?'

'বল!'

'নাকি সেনা পরিষদের সভা ডাকবেন?'

'বলে ফেল, আমরা সবাই এখানে।'

একত্রে জমা হয়ে গেল সব লোক।

'আপনারা কি কিছুই শোনেন নি কী সব চলছে কম্যান্ডান্টের অধীন এলাকা নিয়ে?'*)

'কী চলছে সেখানে?' জিজ্ঞেস করলেন কুরেন-সেনাপতিদের একজন।

'বাঃ! কী চলছে? দেখা যাচ্ছে, তাতাররা আপনাদের কানে তুলো গুঁজে দিয়েছে, তাই আপনারা কিছুই শোনেন নি।'

'বলই না, কী চলছে সেখানে?'

'চলছে এমন ব্যাপার যা কোন খ্রীষ্টান জন্মে কখনও দেখে নি।'

'বল্‌ না কুত্তার বাচ্চা, কী চলছে?' ভিড়ের ভিতর থেকে একজন ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'এমন দিন আসছে যখন আমাদের পবিত্র গির্জাগুলোও আর আমাদের থাকবে না।'

'আমাদের থাকবে না?'

'তাদের ইজেরা দেওয়া হয়েছে ইহুদীদের কাছে। ইহুদীকে আগাম টাকা না দিলে কোন উপাসনা হতে পারবে না।'

'কী বলতে চাস কী?'

'আর ইহুদী কুকুর যদি তার নোংরা হাত দিয়ে আমাদের পবিত্র ঈস্টার-রুটির ওপর ছাপ না দেয়, তাহলে তা উৎসর্গ করা যাবে না।'

'মিথ্যে বলছে, ভাইসব, আমাদের পবিত্র ঈস্টার-রুটিতে নোংরা ইহুদী ছাপ দেবে — এ হতেই পারে না!'

'শুনুন, শুনুন!... আরও আছে: ক্যাথলিক পুরুতেরা গাড়ি চড়ে সারা ইউক্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে সেটা বিপদের কথা নয়; বিপদের কথা এই যে তারা গাড়িতে ঘোড়া জুতছে না, জুতছে খাঁটি খ্রীষ্টানদের। শুনুন, এখনও শেষ হয় নি। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে ইহুদী মাগীরা আমাদের পুরুতদের পোশাক দিয়ে তাদের স্কার্ট বানাচ্ছে। ইউক্রেনে এই সব কাণ্ডকারখানা চলছে, মহাশয়রা! আর আপনারা এখানে জাপোরোজ্‌য়েতে স্ফূর্তি চালাচ্ছেন, মনে হয় যেন তাতাররা আপনাদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে যে আপনাদের কোন কিছুর দিকে না আছে চোখ, না আছে কান, কিছুই নেই — আপনারা কিছুই জানেন না কী সব চলছে পৃথিবীতে।'

'থাম! থাম!' বাধা দিলেন ক্যাম্প-সর্দার; গুরুতর কোন পরিস্থিতিতে কখনও প্রথম ঝোঁকেই কিছু একটা করে না বসে যারা চুপ করে থাকে এবং ইতিমধ্যে স্থিরভাবে ক্রোধের প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করে সেই রকম এক নীপার-কসাকের মতো তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন মাটির দিকে চোখ নামিয়ে। 'থাম! তোমাদের আমিও বলি একটা কথা! কী করছিলে তোমরা — নিকুচি করি তোমাদের বাপের! — কী করছিলে তোমরা নিজেরা? তোমাদের হাতে কি তলোয়ার ছিল না? এ রকম বে-আইনি কাজ তোমরা হতে দিলে কেমন করে?'

'দিলাম কেমন করে! কেমন করে থামাবেন আপনারা পঞ্চাশ হাজার

পোলকে, আর তাছাড়া — নিজেদের পাপ গোপন করে লাভ নেই — আমাদের ভিতরেও এমন সব কুকুর ছিল যারা ইতিমধ্যে ওদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।'

'তোমাদের কম্যান্ডাণ্ট আর কর্নেলেরা — তারা কী করছিলেন?'

'কর্নেলদের দশা থেকে ভগবান আমাদের যেন রক্ষা করেন।'

'সে আবার কী?'

'আমাদের কম্যান্ডাণ্টকে তামার ষাঁড়ে করে আগুনে ঝলসে রেখেছে*) এখন ওয়ারশতে; কর্নেলদের মাথা ও হাত টুকরো করে হাটে হাটে সব লোককে দেখানো হচ্ছে। এই হল কর্নেলদের দশা।'

সমস্ত জনতা দুলে উঠল। ভীষণ ঝড়ের আগে যেমন হয় তেমনি প্রথমে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সারা নদীতীর, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে শোনা গেল কণ্ঠস্বর, সমস্ত নদীতীর মুখর হয়ে উঠল।

'কী কাণ্ড! ইহুদীরা ইজেরা নিয়েছে খ্রীষ্টানদের গির্জা? ক্যাথলিক পুরুতরা গাড়িতে জুতছে খাঁটি খ্রীষ্টানদের? কী কাণ্ড! রুশ জমিতে হতচ্ছাড়া পাষণ্ডদের হাতে এই সব যন্ত্রণা? আমাদের কর্নেলদের ওপর, আমাদের কম্যান্ডাণ্টের ওপর এই অত্যাচার? না, এ হতে পারে না, এ চলতে পারে না!'

এই রকম যত কথা যেন উড়ে যেতে লাগল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। নীপার-কসাকরা গর্জে উঠল, অনুভব করল তাদের শক্তি। এটা আর চপলমতি লোকেদের উত্তেজনা নয়: এ উত্তেজনা — দৃঢ় ও কঠিন চরিত্রের লোকেদের, যারা সহজে জ্বলে ওঠে না, কিন্তু একবার জ্বললে যাদের অন্তরের আগুন দীর্ঘকাল সমান তেজে জ্বলে!

'ফাঁসিতে ঝোলাও সব ইহুদীদের!' জনতা থেকে চিৎকার উঠল। 'পুরুতের পোশাক থেকে ইহুদী মাগীর স্কার্ট করা চলবে না! আমাদের পবিত্র ঈস্টার-রুটিতে তাদের চিহ্ন দেওয়া চলবে না! নীপারের জলে ডুবিয়ে মার এই ইতরদের সবগুলোকে।'

জনতা থেকে কোন একজনের কণ্ঠে উচ্চারিত এই কথাগুলি বিদ্যুৎগতিতে সকলের মাথায় খেলে গেল, জনতা ছুটে চলল শহরপ্রান্তে সব ইহুদীকে কেটে ফেলার উদ্দেশ্যে। ইস্রায়েলের হতভাগ্য সন্তানেরা, তাদের যেটুকু সাহস বাকি ছিল তাও হারিয়ে লুকিয়ে পড়ল ভোদ্‌কার খালি পিপেতে, চুল্লীর মধ্যে, এমন কি মেয়েদের স্কার্টের ভিতরে, কিন্তু যেখানেই লুকোক, কসাকরা তাদের খুঁজে বার করল।

'মহামান্য কর্তারা!' তার সঙ্গীদের দলের ভিতর থেকে করুণ সন্ত্রস্ত মুখে চিৎকার করে উঠল একজন ইহুদী — লোকটা রোগা ও লম্বা, যেন প্যাঁকাটি। 'মহামান্য কর্তারা! একটা কথা বলতে দিন, মাত্র একটি কথা! আমরা এমন কথা বলব যা এর আগে আপনাদের কেউ কখনও শোনেন নি, খুব গুরুত্বপূর্ণ, এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা বলা যায় না!'

'আচ্ছা, ওদের বলতে দাও,' বললেন বুলবা, অভিযুক্তের কী বলার আছে তা শুনতে তিনি সর্বদা ইচ্ছুক।

'দয়ালু কর্তামশাইরা!' ইহুদী বলতে লাগল। 'আপনাদের মতো এমন মহাশয় লোক আগে কখনও দেখা যায় নি। ঈশ্বরের দিব্যি, কখনও না। এমন উদার, সৎ ও সাহসী লোক পৃথিবীতে আগে কখনও ছিল না!..' ভয়ে তার কণ্ঠ স্তিমিত ও কম্পিত হতে লাগল। 'নীপার-কসাকদের মন্দ হোক, একথা আমরা কী করে ভাবতে পারি? ওরা আমাদের কেউ নয়, ইউক্রেনের ঐ ইজারাদাররা! ঈশ্বরের দিব্যি, আমাদের কেউ নয়! ওরা মোটে ইহুদী নয়, ওরা যে কী তা কেবল শয়তানই জানে। ওরা এমন যে, ওদের মুখে থুতু দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এরা সবাই বলবে একথা। সত্যি নয় কি, শ্লেমা? তুমি কি বলো, শ্মুল?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, সত্যি!' ভিড়ের ভিতর থেকে উত্তর দিল শ্লেমা ও শ্মুল। দু'জনেরই মাথার টুপি ছিন্নভিন্ন, দু'জনেই বিবর্ণ যেন চীনেমাটি।

'আপনাদের শত্রুদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আমাদের কখনও নেই,' বলতে লাগল ঢ্যাঙা ইহুদী। 'আর ক্যাথলিকদের ত আমরা জানতেই চাই না — শয়তান ওদের চোখের ঘুম কেড়ে নিক! আমরা আর নীপার-কসাকরা হলাম সহোদর ভাইয়ের মতো...'

'কী বললি? নীপার-কসাকরা হল তোদের ভাই?' একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ওরে পাপী ইহুদী! এ হতেই পারে না! ফেলে দাও ওদের নীপারের জলে, মশাইরা! ডুবিয়ে মারো এই ইতরগুলোকে!'

এই কথাগুলি হল যেন সংকেত। ইহুদীদের ধরে ধরে জলে ফেলা হতে লাগল। চারদিকে শোনা গেল করুণ চিৎকার, কিন্তু ইহুদীদের জুতামোজা পরা পা শূন্যে উঠে দাপাদাপি করছে দেখে কঠোর নীপার-কসাকেরা শুধু হাসতে লাগল। হতভাগ্য যে বক্তৃতাকারীটি নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে, সে লাফিয়ে এলো তার গায়ের কামিজ ফেলে, এই কামিজ ধরে তাকে টানাটানি করা হচ্ছিল। তার গায়ে রইল কেবল রঙীন

আঁট-সাঁট ফতুয়া। সে ছুটে এসে বুলবার পা জড়িয়ে ধরে করুণ স্বরে বলতে লাগল:

'বড় কর্তা, মহামান্য কর্তামশাই! আপনার ভাই, পরলোকগত দোরোশকে আমি জানতাম! সমস্ত বীরদের মধ্যে তিনি ছিলেন রত্ন বিশেষ। তুর্কীদের গোলামী থেকে মুক্তির জন্যে আমি তাঁকে আট শ' সেকুইন দিয়েছিলাম।'

'তুই জানতিস আমার ভাইকে?' প্রশ্ন করলেন তারাস।

'ঈশ্বরের দিব্যি, জানতাম! তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ ব্যক্তি।'

'কি নাম তোর?'

'ইয়ান্‌কেল।'

তারাস বললেন, 'আচ্ছা বেশ,' তারপর কিছুক্ষণ ভেবে তিনি কসাকদের দিকে ফিরে বললেন: 'ইহুদীটাকে যখন খুশি ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে, আপাতত ও আমার কাছে থাক।' এই বলে তারাস তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের শকটের সারির কাছে, সেখানে তাঁর বাহিনীর কতকগুলি কসাক দাঁড়িয়ে ছিল। 'যা, গাড়ির তলায় ঢুকে পড়, শুয়ে পড়, আর নড়াচড়া করিস নে; আর তোমরা ভাইসব, দেখো, ইহুদীটাকে ছেড়ো না।'

এই বলে তিনি চত্বরের দিকে গেলেন, কেননা সেখানে অনেক আগেই জনতার সমাগম হতে শুরু করেছে। সকলেই নিমেষের মধ্যে নদীতীর ও নৌকো সাজানো ছেড়ে এসেছে, কারণ এখনকার কাজ আর সামুদ্রিক অভিযান নয়, স্থলপথে আক্রমণ। এখন প্রয়োজন বড় নৌকো বা ডিঙি নৌকোর নয়, গাড়ির ও ঘোড়ার। যুবক ও বৃদ্ধ, এখন সকলেই চাইল আক্রমণে যোগ দিতে; তাদের মোড়লদের, কুরেন-সেনাপতি ও ক্যাম্প-সর্দারের উপদেশে ও সমগ্র জাপোরোজীয় সৈন্যবাহিনীর ইচ্ছায়, সকলের সংকল্প হল সোজাসুজি পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করতে হবে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের ও কসাক গৌরবের যে অপমান ও ক্ষতি হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে হবে, শহর লুঠ করে, গ্রামে ও ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে, স্তেপ অঞ্চলের বহুদূর পর্যন্ত নিজেদের গৌরব প্রসারিত করতে হবে। সকলেই তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে সশস্ত্র হল। ক্যাম্প-সর্দারের মাথা যেন উঁচুতে ছাড়িয়ে গেল সকলকে। এখন আর তিনি উচ্ছৃংখল জনতার খামখেয়ালী ইচ্ছার বিনম্র বাহক নন; এখন তিনি তাদের অবিসংবাদী নেতা। এখন তিনি স্বৈরতন্ত্রী শাসনকর্তা, কেবল আদেশ করাই যাঁর কাজ। স্বেচ্ছাচারী, স্ফূর্তিপরায়ণ সমস্ত বীরেরাই সুশৃংখল সারি বেঁধে দাঁড়াল সসম্মানে মাথা নত করে; ক্যাম্প-সর্দার

যখন আদেশ দেন তখন তাদের সাহস হয় না চোখ তোলার; তিনি আদেশ দিতে লাগলেন ধীর স্বরে, চিৎকার না করে বা অধীর না হয়ে; বৃদ্ধ ও বহুদর্শী যে কসাক নেতা বহুবার সুচতুর সুচিন্তিত অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন তার মতো প্রতিটি কথা বলতে লাগলেন যেন ওজন করে।

'ভালো করে দেখ, ভালো করে নিজেরা সবকিছুই দেখে নাও!' তিনি বলতে লাগলেন। 'মালগাড়িগুলো আর আলকাতরার বালতিগুলো মেরামত করে নাও; অস্ত্রগুলো পরীক্ষা কর। জামাকাপড় সঙ্গে বেশি নিও না, একটা শার্ট আর দু'জোড়া সালোয়ার প্রত্যেকের জন্য, আর ময়দার মণ্ড ও গুঁড়ানো জোয়ারের এক-একটি পাত্র — এর চেয়ে বেশি যেন কেউ না নেয়! মালগাড়িতে দরকারী সবকিছুরই ভাণ্ডার থাকবে। প্রত্যেক কসাকের এক জোড়া ঘোড়া থাকা চাই। আর আমাদের দরকার দু'শ জোড়া বলদ, নদী পারাপারের সময় আর জলা জায়গায় তাদের দরকার হবে। সবচেয়ে বেশি দরকার, মশাইরা, শৃংখলা রক্ষা করা। আমি জানি এমন কেউ কেউ আছে তোমাদের মধ্যে যারা ভগবানের দয়ায় যদি লুঠের সুযোগ পায় তাহলে তখনই ছুটবে চীনা কাপড় আর দামী মখমল দিয়ে পায়ের পট্টি বানাতে। এই শয়তানি প্রবৃত্তি চলবে না, স্কার্ট-টার্ট ছাড়, নেবে কেবল অস্ত্রশস্ত্র যদি সেগুলো ভালো হয়, আর নেবে মোহর কিংবা রুপো, কারণ এসবের বাজারদর আছে, সর্বত্র কাজে লাগবেই। আর তোমাদের সবাইকে আগেই বলে রাখছি, পথে কেউ যদি মাতাল হয়, তার আর কোন বিচার নেই। তাকে কুকুরের মতো গলায় দড়ি দিয়ে মালগাড়িতে বেঁধে দেওয়া হবে, তা সে যেই হোক না কেন, এমন কি সারা বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সেরা কসাক হলেও। তাকে সেইখানেই কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলা হবে, তার দেহের কোন সৎকার হবে না, শকুনিরা তাকে ছিঁড়ে খাবে, কেননা, যুদ্ধযাত্রায় যে মাতাল হয় তার পক্ষে খ্রীষ্টিয়ান সৎকার হতে পারে না। আর নওজোয়ানরা, তোমাদের শুনতে হবে সব বিষয়ে মোড়লদের আদেশ। যদি গুলি লাগে কিংবা তরোয়ালের খোঁচা, মাথায় লাগুক কি যেখানেই লাগুক, সে দিকে বেশি নজর দিও না। এক পাত্র ভোদ্‌কায় একমাত্রা বারুদ মিশিয়ে একচুমুকে খেয়ে ফেলো, সব ঠিক হয়ে যাবে — জ্বরটর কিছুই হবে না; আর ঘা হলে, যদি সেটা খুব বড় না হয়, তাহলে হাতের তেলোয় মাটি নিয়ে থুতু দিয়ে মিশিয়ে তার ওপর লেপে দিও, তাহলেই

ঘা শ্ুকিয়ে যাবে। তাহলে এখন সব কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও ছোকরারা, তাড়াহুড়োর দরকার নেই, ভালো করে কর সব কাজ!'

এইভাবে বক্তৃতা করলেন ক্যাম্প-সর্দার। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতে না হতে সমস্ত কসাক তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল। সারা সেচ্ সংযত হয়ে গেল, কোথাও একজনকে দেখা গেল না যে পানোন্মত্ত — যেন কসাকদের মধ্যে কস্মিন্‌কালে ছিল না।...

কেউ লাগল গাড়ির চাকা মেরামত করতে আর ধুরা বদলাতে; কেউ শকটে বয়ে আনল বস্তা বস্তা খাদ্যদ্রব্য, আরও একদল আনল অস্ত্রশস্ত্র, আবার কেউ বা তাড়িয়ে আনল ঘোড়া ও বলদ। চারদিক থেকে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, বন্দুকের গুলি পরীক্ষার শব্দ, তরোয়ালের ঝন্‌ঝনা, বলদের হাম্বা, গাড়ির চাকা ঘোরার কর্কশ আওয়াজ, কসাকদের কণ্ঠস্বর ও তীব্র চিৎকার, শকট-চালকদের তাড়না। দেখতে দেখতে বহুদূর পর্যন্ত সারা প্রান্তর জুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ল কসাকদের শিবির। তার মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত কেউ দৌড়াতে চাইলে তাকে অনেকদূর দৌড়াতে হত। কাঠের ছোট গির্জাঘরে বিদায়কালীন উপাসনা করলেন পুরোহিত, পবিত্র জল সকলের গায়ে ছড়িয়ে দিলেন; সকলে চুম্বন করল ক্রুশ। সমস্ত শিবির যাত্রা করে সেচ্ থেকে বেরিয়ে গেলে, নীপার-কসাকরা সবাই মাথা ফেরাল পিছন দিকে।

'বিদায়, মা!' সকলে বলে উঠল যেন সমস্বরে। 'সকল দুর্ভাগ্য থেকে ভগবান যেন তোমাকে রক্ষা করেন।'

শহরতলী দিয়ে যেতে যেতে তারাস বুলবা দেখলেন যে তাঁর হতভাগ্য ইহুদী, ইয়ান্‌কেল ইতিমধ্যেই কোনরকমে ছাউনি-সহ এক দোকান খাড়া করেছে, তাতে বিক্রি করছে চকমকি-পাথর, স্ক্রু, বারুদ এবং পথে সৈন্যদের যা যা দরকার হতে পারে সব, এমন কি নানা রকমের রুটিও। 'কী শয়তান এই ইহুদীটা!' তারাস নিজের মনে ভাবলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন:

'মূর্খ, এখানে বসে আছিস কেন? তুই কি চাস যে তোকে চড়াই পাখির মতো গুলি করা হোক?'

উত্তরে ইয়ান্‌কেল তাঁর কাছে এগিয়ে এলো, দুই হাতে এমন ইঙ্গিত করল যেন কোন গোপন কথা বলতে চায়; বলল:

'আপনি কর্তা চুপ করে থাকুন, কাউকে কিছু বলবেন না: কসাকদের

মালগাড়ির ভেতরে আমারও একটা গাড়ি আছে; কসাকদের যা কিছু দরকার হতে পারে সব আমি নিয়ে যাচ্ছি, আর পথে আমি তা বেচব এত শস্তায় যা কোন ইহুদী কখনও বেচে নি। ভগবানের দিব্যি, সে আমি করব; ভগবানের দিব্যি!'

কাঁধ ঝাঁকোলেন তারাস বুলবা, ইহুদীদের হিসাবী স্বভাবে বিস্মিত হয়ে শিবিরের দিকে চললেন।

৫

অল্পদিনের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল জনরব, 'নীপার-কসাক! নীপার-কসাকরা আসছে!' যারা পালাতে পারল, সকলে পালাল। সকলেই উঠে-পড়ে চারদিকে ছুটল সেই বিশৃংখল অসতর্ক যুগের ধরনে, যখন দুর্গ বা গড় নির্মিত হত না, লোকেরা কোনরকমে খড়ের কুটিরে থাকত। তারা ভাবত, 'ভালো বাড়ির জন্য অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে কী লাভ হবে, তাতার আক্রমণে তো সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!' সকলেই পালাতে ব্যস্ত হল: কেউ তার লাঙল বলদের বদলে ঘোড়া ও বন্দুক সংগ্রহ করে সৈন্যবাহিনীর দিকে চলল; কেউ বা তার বলদ-গোরুকে তাড়িয়ে নিয়ে এবং যা কিছু সরানো যায় তা সরিয়ে আত্মগোপন করল। কেউ কেউ আগন্তুকদের মোকাবিলার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হল, কিন্তু বেশির ভাগই আগে থেকে পালিয়ে গেল। সকলেই জানত, নীপার-কসাক সেনাদল নামে খ্যাত প্রচণ্ড সামরিক জনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করা অতি কঠিন ব্যাপার; এদের আপাত স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃংখলতার আড়ালে গোপনে থাকত এমন একটি শৃংখলা যা যুদ্ধের সময়ের জন্য খুবই উপযুক্ত। অশ্বারোহী কসাকেরা তাদের ঘোড়ার উপর বেশি ভার চাপাত না বা তাদের উত্তেজিত করত না; পদাতিকেরা ধীরভাবে চলত শকটগুলির পিছনে; সমগ্র বাহিনী অগ্রসর হত কেবল রাতে, দিন কাটত বিশ্রামে, জনশূন্য মাঠে ও অরণ্যে, এরকম মাঠ ও অরণ্য তখন চারদিকে প্রচুর পাওয়া যেত। গুপ্তচর ও তদন্তকারীর দল আগেই পাঠিয়ে জানা হত শত্রুরা কেমন, কোথায়, কী করছে। প্রায়ই নীপার-কসাকরা হঠাৎ এমন সব জায়গায় দেখা দিত যেখানে তাদের কেউ প্রত্যাশা করে

নি, — সেখানে তখন কেবলই চলত মৃত্যুর তাণ্ডব। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিত তারা; বলদ ও ঘোড়ার দলকে সৈন্যেরা হয় তাড়িয়ে নিয়ে যেত, নয়ত সেখানেই হত্যা করত। মনে হত, এ যেন এক রক্তাক্ত ভোজনোৎসব, সমরাভিযান নয়। নীপার-কসাকরা যেখানেই পদার্পণ করত সেখানেই যে নিষ্ঠুর আচরণ তারা করত — সেই অর্ধ-সভ্য যুগে তা ছিল সাধারণ — তার ভয়ংকর দৃশ্য দেখলে এখন আমাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। শিশুদের হত্যা, নারীর স্তন কেটে নেওয়া, যেসব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হত তাদের হাঁটু পর্যন্ত পায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া — এক কথায়, কসাকেরা তাদের আগেকার ধার পুরোমাত্রায় শোধ দিয়ে ছাড়ত। একটি মঠের অধ্যক্ষ তাদের আগমনের কথা শুনে দু'জন মঠবাসীকে দিয়ে কসাকদের বলে পাঠান যে তাদের আচরণ অন্যায় হচ্ছে; নীপার-কসাকদের ও সরকারের মধ্যে সদ্ভাব রয়েছে, তারা রাজার প্রতি তাদের কর্তব্য অস্বীকার করছে, আর সেইসঙ্গে তারা যাবতীয় সাধারণ আইনকানুন ভঙ্গ করছে।

'আমার পক্ষ থেকে ও নীপার-কসাকদের সকলের পক্ষ থেকে বিশপকে বলো,' ক্যাম্প-সর্দার বলেছিলেন, 'তাঁর ভয়ের কিছু নেই, এখন শুধু পাইপ ধরাবার মতো একটু আগুন করছে কসাকরা।'

এবং অনতিবিলম্বেই এই প্রকাণ্ড মঠ ধ্বংসকারী অগ্নিশিখায় বেষ্টিত হল, তার বিশাল গথিক গবাক্ষগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অগ্নিতরঙ্গের ভিতর থেকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পলায়নরত জনতা — মঠবাসী, ইহুদী, নারী — এরা সবাই গিয়ে ভরে ফেলল সেই সব শহর যেখানে সৈন্যবাহিনীর বা অস্ত্রধারী শহরবাসীর সহায়তা লাভের কোন না কোন আশা ছিল। শাসকবর্গ মাঝে মাঝে দেরিতে কিছু কিছু সৈন্য পাঠিয়ে সহায়তা করতেন; কিন্তু তারা হয় নীপার-কসাকদের খুঁজে পেত না, অথবা প্রথম সংঘর্ষেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের দ্রুতগতি ঘোড়া ছুটিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। রাজার অধিনায়কদের মধ্যে যাঁরা অনেকে আগে যুদ্ধে যশ অর্জন করেছিলেন, তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের শক্তি একত্র করে তাঁরা নীপার-কসাকদের দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করবেন। এতদিনে আমাদের তরুণ কসাকদের সত্যি সত্যি শক্তি পরীক্ষার সময় এলো — লুটতরাজ, অপহরণ ও দুর্বল শত্রুর প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না, তারা প্রবীণদের কাছে নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য একান্ত অধীর; তারা একক যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় সেইসব চটপটে

ও দেমাকী পোলদের সঙ্গে, দৃপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে বাতাসে-ওড়া জামার ঢিলে আস্তিনে যাদের দেখাত সুন্দর। তরুণ কসাকদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা ছিল যেন একটা খেলা। ইতিমধ্যেই তারা ঘোড়ার সাজ, দামী তলোয়ার ও বন্দুক বহু লুঠ করেছে। একমাসেই এই পাখির ছানাদের ডানা শক্ত হয়ে উঠেছে, তারা উড়তে শিখেছে, তারা মরদ হয়ে উঠেছে। তাদের মুখের চেহারায় এতদিন পর্যন্ত ছিল তারুণ্যের কোমলতা, এখন তা ভীষণ ও কঠিন হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ তারাসের খুবই আনন্দ যে তাঁর দুই পুত্রই অগ্রণীদের অন্তর্ভুক্ত। অস্তাপ যে যুদ্ধের পথে ছুটবে, যুদ্ধবিদ্যার কঠিন দীক্ষায় সে যে উত্তীর্ণ হবে, তা যেন তার জন্ম থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কোন অবস্থাতেই কখনও সে ইতস্তত করে না বা বিচলিত হয়ে পড়ে না; বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে প্রায় অস্বাভাবিক স্থিরতার সঙ্গে সে কোন্ সংকটের কী বিপদ তা আন্দাজ করতে পারে মুহূর্তে এবং তা থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসে, যাতে পরিশেষে তারই জয় হয় সুনিশ্চিত। তার প্রত্যেকটি আচরণ এখন যেন অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মবিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত, তাতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পূর্বাভাস চোখে না পড়ে পারে না। তার শরীর থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত হত; তার বীরোচিত গুণাবলী এখন সিংহের বিশাল শক্তি অর্জন করল।

'আঃ, কালে এ হবে ভালো কর্নেল!' বৃদ্ধ তারাস বলতেন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছাড়িয়ে যাবে নিজের বাপকেও!'

আন্দ্রির কাছে বন্দুক ও তরবারির সঙ্গীত যেন মোহ বিস্তার করত। নিজের বা প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি আগে থেকে বিচার করা, হিসাব করা, পরিমাপ করা — এদিকে তার মন ছিল না। সে যুদ্ধকে দেখত উন্মত্ত উপভোগের প্রচণ্ড আনন্দে; মানুষের মাথায় যখন আগুন জ্বলে, চোখের সামনে সবকিছু বিঘূর্ণিত হয়, মিশে যায়, মুণ্ডু উড়তে থাকে, সশব্দে ঘোড়াগুলি মাটিতে পড়ে, আর সে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতালের মতো গুলির তীব্র শিস ও অসির ঝলকানির মধ্যে, চারদিকে আঘাত চালায়, নিজের শরীরে কোন আঘাতকেই গ্রাহ্য করে না — এই সব মুহূর্ত তার কাছে ছিল এক উৎসবের মতো। তার পিতা অনেকবারই দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে আন্দ্রি কেবলমাত্র সহজ উত্তেজনার প্রচণ্ড আকর্ষণেই এমন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে যা কোন স্থিরচিত্ত ও বুদ্ধিমান লোকে সাহস করবে না, আপন উন্মত্ত আক্রমণের দুঃসাহসিকতায় এমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়ে চলছে যে

বহুদর্শী যোদ্ধারাও স্তম্ভিত না হয়ে পারতেন না। বৃদ্ধ তারাস সবিস্ময়ে বলতেন:

'এ-ও চমৎকার যোদ্ধা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যেন বেঁচে-বর্তে থাকে — অস্তাপের মতো নয়, তবুও চমৎকার, চমৎকার যোদ্ধা!'

স্থির হল যে সমগ্র বাহিনী সোজা অগ্রসর হবে দুবনো শহরের অভিমুখে। শোনা গেল, সেখানে প্রচুর ধনভান্ডার ও সমৃদ্ধ নাগরিকেরা আছে। দেড় দিনের মধ্যে পথ যাত্রার সমাপ্তি ঘটল এবং নীপার-কসাকরা দেখা দিল শহরের সামনে। অধিবাসীরা সংকল্প করল শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করবে, এবং শত্রুদের বাড়িতে প্রবেশ করতে না দিয়ে বরং শহরের ময়দানে, পথে পথে আর নিজেদের বাড়িঘরের দুয়ারে প্রাণ দেবে। মাটির উঁচু প্রাকার দিয়ে শহর ঘেরা ছিল; যেখানে প্রাকার অপেক্ষাকৃত নীচু সেখানে ছিল পাথরের দেয়াল কিংবা উপদুর্গের মতো ব্যবহৃত কোন বাড়ি, অথবা অন্ততপক্ষে ওক গাছের বেড়া। সৈন্যদল ছিল শক্তিশালী, তারা তাদের কর্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। নীপার-কসাকরা প্রবল বিক্রমে প্রাকার আক্রমণ করতে গেল, কিন্তু তাদের সম্মুখীন হতে হল ক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের। মধ্যবিত্তরা এবং অন্যান্য অধীবাসীরা স্পষ্টতই অলস হয়ে থাকতে চায় নি, তারা প্রাকারে দলবদ্ধ হল। তাদের চোখের দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল চরম প্রতিরোধে তারা দৃঢ়সংকল্প; নারীরাও অংশগ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; নীপার-কসাকদের মাথায় বর্ষিত হতে লাগল পাথর, পিপে, ভাঁড়, গরম পিচ ও বস্তাভরা বালি, এতে তাদের চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। নীপার-কসাকরা দুর্গ নিয়ে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করত না, অবরোধ করায় তাদের প্রবণতা ছিল না। ক্যাম্প-সর্দার আদেশ দিলেন পিছু হঠতে। বললেন:

'ভাইসব, পিছু হঠায় ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি আমরা এদের একজনকেও শহর ছেড়ে বের হতে দিই তবে আমি খ্রীষ্টান নামের উপযুক্ত নই — বিধর্মী তাতার বলো আমাকে! না খেয়ে মরুক এই কুকুরগুলো!'

সৈন্যদল পিছিয়ে এসে শহর ঘিরে রইল এবং অন্য কিছু করার না থাকায় আশেপাশের এলাকা ছারখার করায় নিযুক্ত হল। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে এবং ক্ষেতে গাদা-করা গমের স্তূপে আগুন লাগাল, ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দিল ফসলের মাঠে, সেখানে তখনও কাস্তের আঘাত পড়ে নি, সেখানে, যেন ইচ্ছে করেই দুলছিল কৃষিকর্মের অসাধারণ শ্রমফল-স্বরূপ গুরুভার শস্যের শীষ — এ বছরে প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে মুক্তহস্ত পুরস্কার।

শহরবাসীরা দেখে আঁতকে উঠল যে তাদের জীবনধারণের উপায় বিনষ্ট হতে চলেছে। ইতিমধ্যে নীপার-কসাকরা তাদের গাড়িগুলিকে দুই সারি বেঁধে শহরের চারদিকে সাজিয়ে, যেমন সেচে বিভিন্ন কুরেনে ছাউনি ফেলে থাকত তেমনি ছাউনি ফেলে, পাইপ টানতে লাগল, যুদ্ধে লব্ধ অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময় করতে লাগল, খেলতে লাগল ব্যাং-লাফানি ও জোড়-বিজোড়, আর নির্দয় নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল শহরের দিকে। রাতে জ্বালানো হত ধুনি। প্রত্যেক কুরেনে প্রকাণ্ড তামার কড়ায় ফোটানো হত জাউ। বিনিদ্র প্রহরীরা চৌকি দিত এই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে। আগুন জ্বলত সারারাত। কিন্তু অচিরেই নীপার-কসাকরা কিছুটা ক্লান্ত হতে লাগল এই কর্মহীনতায়, যুদ্ধের কোন উন্মাদনা না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘায়িত এই মিতাচারে। ক্যাম্প-সর্দার এমন কি মদের বরাদ্দ দ্বিগুণ করে দিলেন, যখন কোন শক্ত কাজ বা অভিযান হাতে না থাকে তখন সেনাবাহিনীতে মাঝে মাঝে এরকম করা হয়। এরকম জীবন তরুণদের পক্ষে রুচিকর ছিল না, বিশেষত তারাস বুলবার ছেলেদের পক্ষে। আন্দ্রি স্পষ্টত বিরক্ত হল।

'মাথায় বুদ্ধির অভাব আছে,' তারাস তাকে বললেন, 'সহ্য করতে শেখ রে কসাক, তবেই না সর্দার হতে পারবি! ভীষণ সংঘর্ষে সাহস না হারালেই ভালো যোদ্ধা বলে না, বলে তাকেই, যে বিনা-কাজের সময়েও ঠিক থাকে, যে সব সহ্য করে, যা কিছু ঘটুক না কেন নিজের সংকল্পে স্থির থাকে।'

কিন্তু উত্তপ্ত যৌবন ও বৃদ্ধ বয়স একমত হতে পারে না। দুজনের প্রকৃতি বিভিন্ন, একই জিনিসকে দুজনে দেখে ভিন্ন চোখে।

ইতিমধ্যে তভ্কাচের নেতৃত্বে তারাসের রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছল; তার সঙ্গে ছিল আরও দুজন ক্যাপ্টেন, মুহুরী এবং অন্যান্য রেজিমেণ্টীয় অফিসার; সকলে মিলে কসাকের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। কী ঘটছে তা শোনা মাত্র যারা বিনা আহ্বানে স্বেচ্ছায় এসে যোগ দিয়েছে এমন অশ্বারোহীর সংখ্যা তাদের মধ্যে কম ছিল না। বুলবার ছেলেদুটির জন্য ক্যাপ্টেনরা এনেছে তাদের বৃদ্ধা মা'র আশীর্বাদ ও কিয়েভের মেজিগরস্ক মঠ থেকে সাইপ্রেস কাঠে আঁকা বিগ্রহ। দুই ভাই-ই বিগ্রহ দুটি নিজেদের গলায় পরল এবং অজান্তে বৃদ্ধা মায়ের কথা স্মরণ করে ভাবাকুল হয়ে পড়ল। এই আশীর্বাদ কী বলছে, কী সূচনা করছে? এ আশীর্বাদে কি তাদের শত্রুদের হারিয়ে বিজয়গর্বে সানন্দে স্বদেশে ফিরে যাওয়া যাবে, সঙ্গে থাকবে যুদ্ধের লুঠ, আর বান্দুরা বাজিয়েরা চিরকাল তাদের গৌরবে গান করে

শোনাবে, নাকি?.. কিন্তু ভবিষ্যৎ ত অজানা, মানুষের সামনে যেন জলাভূমি থেকে উত্থিত শরতের কুয়াশা। পাখিরা এর মধ্যে উন্মাদের মতো ডানা ঝাপটে উপরে নীচে ওড়ে, একে অন্যকে দেখতে পায় না, পায়রা দেখতে পায় না বাজপাখিকে, বাজপাখিও পায়রাকে দেখে না — কেউই জানতে পারে না মৃত্যু থেকে তারা কে কত দূরে উড়ছে...

অস্তাপ আগেই তার কাজে নিযুক্ত হয়েছে এবং কুরেনে ফিরে গেছে। আন্দ্রি অন্তরে কিসের যেন চাপ অনুভব করতে লাগল, সে নিজেই জানে না কেন। কসাকরা ইতিমধ্যে নৈশভোজ শেষ করেছে; সন্ধ্যা অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে। জুলাই মাসের আশ্চর্য রাত আকাশ-বাতাসকে আলিঙ্গন করে আছে; আন্দ্রি কিন্তু তখনও কুরেনে ফিরল না, ঘুমোতে গেল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সামনে প্রসারিত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশে অসংখ্য তারা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম কিরণে ঝিকমিক করছে। ভূতলে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাদের মালগাড়ি, আলকাতরা-মাখা বালতি ঝুলছে সেগুলির গায়ে, শত্রুদের কাছ থেকে কেড়ে আনা নানা খাদ্যে ও দ্রব্য সম্ভারে গাড়িগুলি বোঝাই। তাদের পাশে, নীচে ও অল্প দূরে — সর্বত্র দেখা যায় নীপার-কসাকরা ঘাসের উপর নিজেদের এলিয়ে দিয়েছে। সকলে নিদ্রা যাচ্ছে ছবির মতো: কেউ মাথা রেখেছে ছালার উপর, কেউ টুপির উপর, কেউ বা সোজাসুজি কোন সঙ্গীর গায়ে। তলোয়ার, বন্দুক, পিতল-বাঁধানো ছোট মাপের পাইপ, লোহার শলা ও চকমকি-পাথর — কোন কসাকই এ সব ছেড়ে থাকতে পারে না। দেহের তলে পা গুটিয়ে ভারী ভারী বলদেরা শুয়ে ছিল, যেন সাদাটে স্তূপ, দূর থেকে দেখায় মাঠের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধূসর শৈলখণ্ডের মতো। চারদিকে ঘাসের উপর থেকে ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছিল ঘুমন্ত সৈন্যদলের গম্ভীর নাসিকাধ্বনি, পা বাঁধা থাকায় অসন্তুষ্ট তেজী ঘোড়াগুলি সুতীব্র হ্রেষাধ্বনি করে মাঠ থেকে যেন তারই জবাব দিচ্ছে। ইতিমধ্যে জুলাই মাসের রাতের সৌন্দর্যে মিশে গেছে যেন এক ভীতিপ্রদ বিশালতা। দূরের প্রতিবেশী অঞ্চলে যে গ্রামগুলি এখনও নিঃশেষে জ্বলছে, তারই দীপ্ত আভা। কোথাও অগ্নিশিখা ধীর রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে বিস্তৃত হচ্ছে; অন্য কোথাও দহনযোগ্য কিছু পেয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে তা সগর্জনে লাফিয়ে উঠছে প্রায় তারাদের কাছাকাছি, তার বিভক্ত লেলিহান জিহ্বা স্তিমিত হয়ে আসছে সুদূর

আকাশের প্রান্তদেশে। একদিকে দগ্ধ কালো মঠ দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক কঠোরব্রতী কার্থ্জীয়* সন্ন্যাসী, অগ্নিশিখার প্রত্যেক নতুন দীপনে তার বিষণ্ণ মহিমা আত্মপ্রকাশ করছে। অন্যদিকে জ্বলছে মঠের বাগান। গাছগুলি যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে জড়িয়ে পড়ছে তখন মনে হচ্ছে যেন কান পাতলেই তাদের হিস হিস শব্দ শোনা যাবে। তারপর আগুন যখন লাফিয়ে উঠছে, তখন অকস্মাৎ পাকা জামের গোছাগুলি ফস্‌ফরাসীয় ফিকে নীল রক্তিমাভ আগুনের রঙে আলোকিত হয়ে উঠছে, অথবা এখানে-ওখানে হলুদ রঙের নাশপাতিগুলি পাকা সোনার রঙ ধারণ করছে; এবং এই সবের মধ্যেই দেখা যায়, হয়ত কোন বাড়ির দেয়ালের গায়ে কিংবা কোন গাছের ডালে ঝুলছে কোন হতভাগ্য ইহুদী কিংবা সন্ন্যাসীর কালো মূর্তি, বাড়িটির সঙ্গে মূর্তিটিও পুড়ছে আগুনে। অগ্নিশিখার অনেক উপরে উড়ছে পাখিরা, যেন অগ্নিময় প্রান্তরের উপর এক ঝাঁক ছোট ছোট কালো ক্রুশ। অবরুদ্ধ শহর যেন নিদ্রিত। তার গির্জার চূড়ায়, ছাতে, দুর্গপ্রাকারে ও দেওয়ালে দূরের অগ্নিকাণ্ডের দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে নিঃশব্দে। আন্দ্রি কসাকদের সারিগুলির পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। ধুনি যে কোন সময় নিভে যেতে পারে, রীতিমত কসাকী ক্ষুধায় পেট ভরে ময়দার মণ্ড ও পুলি খাওয়ার পর প্রহরীরা নিজেরাই নিদ্রিত। এই অসাবধানতায় কিছুটা বিস্মিত হয়ে সে ভাবতে লাগল, 'ভাগ্য ভালো যে কাছেই কোন প্রবল প্রতিপক্ষ নেই বা কাকেও ভয় করার নেই।' অবশেষে সে একটা মালগাড়িতে চেপে চিৎ হয়ে মাথার তলায় হাত জড়িয়ে রেখে শুয়ে পড়ল; কিন্তু ঘুমাতে পারল না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। তার সামনে সবই উন্মুক্ত, বাতাস বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ। যে তারকাপুঞ্জ ছায়াপথ হয়ে সমস্ত আকাশকে ঘিরে আছে মেখলার মতো, তারা আলোয় ভরা। মাঝে মাঝে আন্দ্রির ঢুলুনি আসছিল, ঘুমের হালকা কুয়াশায় মাঝে মাঝে যেন কিছুক্ষণের জন্য আকাশ আচ্ছন্ন হচ্ছিল, একটু পরেই তা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আবার আকাশ দেখা যাচ্ছিল।

এক সময় তার মনে হল তার সামনে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে এক অদ্ভুত চেহারার মানুষের মুখ। এটা ঘুমের মায়া, এখনই মিলিয়ে যাবে, এই ভেবে সে বড় করে চোখ মেলতেই দেখল যে সত্যিই তার উপর ঝুঁকে আছে এক

---

* একাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের কার্থুজিয়া উপত্যকায় গঠিত এক বিশেষ সন্ন্যাসীসম্প্রদায়। — সম্পাঃ

শুষ্ক শীর্ণ মুখ, তাকিয়ে আছে সোজা তার চোখের দিকে। তার মাথায় কালো ঘোমটা, ঘোমটার নীচে কয়লার মতো কালো লম্বা চুল বিস্রস্ত, অসংবদ্ধ হয়ে ঝুলছে। দৃষ্টির অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ও রুক্ষ গড়নের মুখে মৃতবৎ কালিমা দেখে প্রথমেই মনে হয় নিশ্চয় প্রেতমূর্তি। ভেবেই আন্দ্রি বন্দুকের জন্য হাত বাড়াল ও প্রায় খিঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল:

'কে তুমি? যদি ভূতপ্রেত হও তবে দূর হও; যদি জীবন্ত মানুষ হও, তাহলেও এ তোমার ঠাট্টার সময় নয় — এক গুলিতেই মেরে ফেলব।'

এর উত্তরে মনে হল ছায়ামূর্তি ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে চুপ করার জন্য মিনতি করছে। হাত নামিয়ে আন্দ্রি তাকে আরও মন দিয়ে দেখতে লাগল। দীর্ঘ কেশ, কণ্ঠ ও অর্ধ-আবৃত বক্ষ দেখে অনুমান করল, নারীমূর্তি। কিন্তু এই নারী এ অঞ্চলের অধিবাসী নয়। তার রোগশীর্ণ মুখ কালো; গালের চওড়া হাড় স্পষ্ট জেগে উঠে আছে বসা গালের উপর; সংকীর্ণ ধনুকের মতো চোখ উপরের দিকে বেঁকে গেছে। সে যত তার মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ততই তার মনে হল যেন পরিচিত। অবশেষে সে অধীরভাবে জিজ্ঞেস না করে পারল না:

'বল, কে তুমি? মনে হচ্ছে, তোমাকে যেন জানি কিংবা কোথাও দেখছি।'

'দু' বছর আগে কিয়েভে।'

'দু' বছর আগে... কিয়েভে...' আকাদেমিতে তার পূর্বতন জীবনের যা কিছু স্মৃতিতে ছিল তা পুনরায় স্মরণ করতে করতে আন্দ্রি পুনরাবৃত্তি করল কথাগুলি। এক দৃষ্টিতে সে তাকে আর একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ সজোরে চিৎকার করে উঠল:

'তুমি সেই তাতারনী! সেই মহিলার দাসী, শাসনকর্তার মেয়ের!..'

'শ্-শ্-শ্!' বলে তাতারনী মিনতির ভঙ্গিতে হাত জোড় করল; তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল, মুখ ঘুরিয়ে সে দেখল আন্দ্রির তীব্র চিৎকারে কারও ঘুম ভেঙেছে কি না।

'বল, বল, কী জন্য তুমি এখানে?' প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে, নীচু স্বরে, অন্তরের উত্তেজনায় ক্ষণে ক্ষণে থেমে থেমে বলল আন্দ্রি, 'তিনি কোথায়? এখনও বেঁচে আছেন ত?'

'তিনি এখানে, এই শহরে।'

'শহরে?' আবার প্রায় চিৎকার করে উঠল আন্দ্রি; সে অনুভব করল যেন সব রক্ত হঠাৎ তার বুকে এসে জমেছে। 'তিনি শহরে কেন?'

'কারণ আমাদের বুড়ো কর্তাও শহরে। গত দেড় বছর ধরে তিনি হয়েছেন দুব্নোর শাসনকর্তা।'

'তাঁর কি বিয়ে হয়ে গেছে? কথা বলছ না কেন, কী অদ্ভুত তুমি! কেমন আছেন তিনি?..'

'দু'দিন তাঁর খাওয়া হয় নি।'

'সে কী!..'

'অনেক দিন থেকে শহরের কারোই এক টুকরো রুটি নেই, মাটি ছাড়া কারোরই খাবার মতো কিছু নেই।'

আন্দ্রি হতভম্ব হয়ে গেল।

'দিদি ঠাকরুন তোমাকে অন্যান্য নীপার-কসাকদের মধ্যে শহরের দেয়াল থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'যা ত, সেই বীরকে বল গিয়ে আমার কাছে আসতে, যদি আমাকে তার মনে থাকে। যদি না থেকে থাকে ত বলিস আমার বুড়ি মায়ের জন্যে এক টুকরো রুটি দিতে; চোখের সামনে আমার মায়ের মরণ আমি আর দেখতে পারছি না। তার চেয়ে বরং আমি মরব আগেই। মিনতি করিস, তার হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরিস। তারও ত বুড়ো মা আছেন — তাঁর কথা ভেবে যেন আমাদের রুটি দেয়!'

কসাকের তরুণ অন্তরে অনেক বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত ও উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

'কিন্তু তুমি এখানে? এলে কী করে?'

'সুড়ঙ্গ-পথে।'

'সুড়ঙ্গ-পথ আছে না কি?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে না, বল?'

'পবিত্র ক্রুশের দিব্যি!'

'খাতের তলের ছোট নদীটা পার হলে, যেখানে নলখাগড়া জমে আছে সেইখানে।'

'একেবারে শহরে যাওয়া যায়?'

'একেবারে শহরের মঠের কাছে।'

'চল এখনই যাই!'

'কিন্তু তার আগে, যীশু আর মেরী-মাতার দোহাই, একটুকরো রুটি!'

'ঠিক বলেছ, নিচ্ছি। দাঁড়াও এখানে, মালগাড়িটার পাশে, না, তার চেয়ে শুয়ে পড় এর তলায়: কেউ তোমায় দেখতে পাবে না, সবাই ঘুমাচ্ছে; আমি এখনি ফিরব।'

আন্দ্রি চলল সেই শকটের দিকে যেটায় তাদের কুরেনের খাদ্যভাণ্ডার জমা আছে। তার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। বিগত দিনের সব কথা, যা বর্তমানে কসাকদের শিবিরে কঠোর সামরিক জীবনের কঠোরতায় চাপা পড়ে গিয়েছিল — সবই আবার বর্তমানকে ডুবিয়ে দিয়ে একসঙ্গে উৎসারিত হয়ে উঠল। আবার তার সামনে — যেন সমুদ্রের অতল অন্ধকার হতে ফুটে উঠল সেই দৃপ্ত নারী। তার স্মৃতিতে আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সুন্দর বাহু, চোখ, সহাস্য অধর, গুচ্ছে গুচ্ছে বুকের উপর ছড়িয়ে পড়া গাঢ় বাদামী রঙের ঘন কেশরাশি, তার কুমারী বয়সের এক অপরূপ সুষমায় গড়া টানটান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। না, এগুলি ম্লান হয় নি, কখনও অন্তর্হিত হয় নি তার হৃদয় থেকে; কেবল কিছুকালের জন্য অন্য প্রবল ভাবাবেগগুলিকে স্থান দিয়ে সরে গিয়েছিল; কিন্তু কতবার, কতবারই না এই তরুণ কসাকের গভীর নিদ্রায় আলোড়ন তুলেছে। কতবার জেগে উঠে সে বিনিদ্র বিভ্রমে শুয়ে থেকেছে, বুঝতে পারে নি এর কী কারণ।

চলতে লাগল আন্দ্রি, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল, তার তরুণ জানু কাঁপতে লাগল কেবল এই চিন্তায় যে সে আবার তাকে দেখতে পাবে। মালগাড়ির ধারে এসে সে মনেই করতে পারল না কেন এসেছে: হাত কপালে তুলে অনেকক্ষণ ঘষল, স্মরণ করতে চেষ্টা করল কী তাকে করতে হবে। অবশেষে সারা দেহ শিউরে উঠল আতঙ্কে: হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তরুণী অনাহারে মরতে বসেছে। সে ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে অনেকগুলি বড় বড় কালো রুটি হাতে তুলে নিল। তখনই কিন্তু মনে পড়ল যে এই খাদ্য অল্পতুষ্ট জোয়ান নীপার-কসাকদের উপযোগী হলেও, তরুণীর কোমল গড়নের পক্ষে হবে কর্কশ ও অনুপযোগী। তার মনে পড়ল যে ক্যাম্প-সর্দার আগের দিন পাচকদের খুব বকেছিলেন এই বলে যে যাতে তিনবার চলতে পারত তেমন ভালো ময়দা তারা সমস্তটা একটি নৈশভোজেই রান্নাতে লাগিয়ে দিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে কড়াইয়ে প্রচুর রান্না করা খাবার পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে তার বাবার পাত্রটা টেনে নিয়ে চলল তার কুরেনের পাচকের কাছে। পাচক ঘুমাচ্ছিল দুটো দশ-বালতি কড়াইয়ের পাশে, তার তলায় তখনও ছাই গরম। কড়াইয়ের ভিতরে তাকিয়ে সে অবাক

হয়ে গেল। দেখল যে দুটিই খালি। সমস্তটা খেয়ে শেষ করা এক অমানুষিক কাণ্ড, তায় আবার তাদের কুরেনে অন্যগুলির চেয়ে লোকসংখ্যা ছিল কম। অন্যান্য কুরেনের কড়াইয়ের ভিতরেও সে খুঁজে দেখল—কোথাও কিছু নেই। সেই প্রবচনটি সে মনে না করে পারল না: 'নীপার-কসাকেরা যেন ছোট শিশু: খাদ্য কম হলেও চলে যায়, বেশি হলেও কিছু পড়ে থাকে না।' কী করা যায়? কিন্তু তার বাবার রেজিমেণ্টের মালগাড়িগুলির কোথাও না কোথাও যেন এক বস্তা সাদা রুটি আছেই, মঠের রুটি-মহল লুঠ করার সময় এই বস্তাটি পাওয়া গিয়েছিল। সে সোজা চলল তার বাবার মালগাড়ির দিকে, কিন্তু সেখানে বস্তাটা নেই। অস্তাপ সেটা টেনে এনে মাথার তলে রেখে মাটিতে শুয়ে আছে, তার নাকের ডাকে সারা মাঠ ভরে গেছে। আন্দ্রি একহাতে বস্তা ধরে একপাশে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে অস্তাপের মাথা মাটিতে ঠুকে গেল। সে ঘুমের ঘোরে লাফিয়ে উঠল এবং বন্ধ চোখে বসে সমস্ত গলার জোর দিয়ে চেঁচাল, 'ধর, ধর পোলীয় শয়তানকে, ধর তার ঘোড়া, ঘোড়া ধর!' — 'চুপ না করলে মেরে ফেলব,' আন্দ্রি ভয়ে তার দিকে বস্তা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু অস্তাপ এমনিতেই আর চেঁচাল না, চুপ করে শুয়ে পড়ল, এমন নাক ডাকাতে লাগল যে তার নিশ্বাসে চারপাশের ঘাস নড়তে লাগল। আন্দ্রি সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, অস্তাপের ঘুমন্ত প্রলাপে কোন কসাকের ঘুম ভেঙেছে কি না। একটা ঝুঁটিদার মাথা কাছের কুরেনে উঁচু হয়ে উঠেছিল, চারদিকে তাকিয়ে আবার শিগগিরই সে মাটিতে শুয়ে পড়ল। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর আন্দ্রি চলল বোঝা নিয়ে। তাতারনী শুয়ে ছিল প্রায় দম বন্ধ করে।

'উঠে পড়, যাওয়া যাক! ভয় পেও না, সবাই ঘুমোচ্ছে। তুমি এর থেকে অন্তত একখানা রুটি বইতে পারবে ত, যদি আমার হাতে সবগুলো না ধরে?'

এই বলে সে ছালাগুলি নিজের পিঠে ঝুলিয়ে দিল। জোয়ারে ভরা আর একটা ছালা সে পথের একটা মালগাড়ি থেকে টেনে নিল। যে রুটিগুলি তাতারনীকে বইতে দিতে চেয়েছিল তাও নিজের হাতে বইতে লাগল, এবং এই সবের ভারে কিছুটা কুঁজো হয়ে ঘুমন্ত নীপার-কসাকদের সারির ভিতর দিয়ে চলতে লাগল বেপরোয়ার মতো।

বুলবার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ ডেকে উঠলেন, 'আন্দ্রি!'

তার হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হল। থমকে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক কাঁপতে কাঁপতে ক্ষীণ স্বরে সে বলল, 'কী বলছেন?'

'তোর সঙ্গে মেয়েলোক! অ্যাঁ, উঠি যদি, তোর ছাল ছিঁড়ে ফেলব! মেয়েলোকেই তোর সর্বনাশ হবে!' এই বলে তিনি কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুললেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাতারনীর অবগুণ্ঠিত দেহের দিকে।

আন্দ্রি দাঁড়িয়ে রইল জীবন্মৃত অবস্থায়, বাবার মুখের দিকে তাকানোর সাহস তার নেই। পরে, যখন সে মাথা তুলে তাকাল, দেখল বৃদ্ধ বুলবা করতলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ক্রুশ-চিহ্ন করল আন্দ্রি। তার হৃদয়ে ভয় যত বেগে এসেছিল তার চেয়েও বেশি বেগে দূর হল। ঘাড় ফিরিয়ে সে যখন তাতারনীর দিকে তাকাল, দেখল সে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এক ঘন অবগুণ্ঠনে ঢাকা, যেন কালো গ্রানিট পাথরের মূর্তি, দূরের অগ্নিকাণ্ডের আভায় দেখা যাচ্ছে কেবল তার চোখ—নিষ্প্রভ যেন মৃতদেহের চোখ। আন্দ্রি জামার আস্তিন ধরে টান দিল, দু'জনে চলতে লাগল। ঢালু পথে একটা গভীর খাতে নেমে না আসা পর্যন্ত প্রতি পদে পিছন ফিরে দেখতে হচ্ছিল তাদের। খাতটার তলে ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে একটি জলের ধারা, নলখাগড়ায় ভরাট তৃণগুল্মে ছড়ানো। এই খাতে এসে পেঁছিলে তারা নীপার-কসাকদের শিবিরে দৃষ্টিপথের একেবারে বাইরে এসে পড়ল। অন্তত্তপক্ষে আন্দ্রি ফিরে দেখল তার পিছনে মানুষের খাড়াইয়ের চেয়ে উঁচু দেয়াল ঢালু হয়ে গেছে। তার মাথায় দুলছে কয়েক গোছা মেঠো ঘাসের ডাঁটা, তার উপরে আকাশে উঠছে চাঁদ, উজ্জ্বল খাঁটি সোনার বাঁকানো কাস্তের মতো। স্তেপ থেকে ভেসে আসা হালকা হাওয়া জানান দিয়ে যাচ্ছিল যে সূর্যোদয়ের আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু দূরে কোথাও কোন মোরগের ডাক শোনা গেল না, কারণ বহু দিন ধরে শহরে বা পাশাপাশি উপদ্রুত অঞ্চলে একটি মোরগও অবশিষ্ট ছিল না। একটা ছোট কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে তারা জলের ধারা পার হয়ে গেল। অন্য পাড়, মনে হল, বেশি উঁচু ও অতি খাড়া। বোধ হল, শহরের দুর্গ রক্ষার এটাই সরল ও স্বাভাবিক ভাবে সুরক্ষিত কেন্দ্রস্থল; অন্ততপক্ষে এখানে মাটিতে গড়া দুর্গপ্রাকার অপেক্ষাকৃত নীচু, এর পিছনে সেনাবাহিনীর কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল না। অথচ কিছু দূরে একটি মঠের বিশাল প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। খাড়াই তীরভূমিতে নানা আগাছার জঙ্গল,

তীরভূমি ও জলধারার মাঝের সংকীর্ণ কন্দরে নলখাগড়ার বন, প্রায় মানুষের মাথার সমান উঁচু। খাড়াইয়ের চূড়ায় দেখা যায় সরু সরু গাছের ডালের বেড়া, এক কালে তা ঘিরে ছিল অতীতের কোন ফলোদ্যানকে। সামনে ভাঁটুইগাছের চওড়া পাতা; পিছনে দেখা যায় নানা ধরনের বুনো কাঁটাগাছ, তাদের মধ্যে সকলের উপরে মাথা তুলে আছে সূর্যমুখীর ফুল। এইখানে এসে তাতারনী তার জুতো খুলে ফেলে খালি পায়ে চলতে লাগল, তার ঘাগরা গুটিয়ে নিল সাবধানে, কারণ, এই জায়গাটা জলাভূমি। নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে পথ করে তারা এসে থামল এক গাদা শুকনো ডালপালার সামনে। ডালগুলি সরিয়ে তারা দেখল মাটির খিলানের মতো একটি ফাঁক, সে ফাঁকটি রুটি সেঁকার উনুনের মুখের চেয়ে বেশি বড় নয়। তাতারনী মাথা নুইয়ে প্রবেশ করল প্রথমে; তার পিছনে গেল আন্দ্রি, বস্তাগুলি পার করার জন্য যথাসম্ভব নীচু হতে হল তাকে। অনতিবিলম্বে দু'জনেই অন্তর্হিত হয়ে গেল পরিপূর্ণ অন্ধকারে।

৬

রুটির বস্তা ঘাড়ে করে সেই সংকীর্ণ অন্ধকার মাটির সুড়ঙ্গ বয়ে আন্দ্রি ধীরে ধীরে অগ্রসর হল তাতারনীকে অনুসরণ করে।

পথপ্রদর্শিকা বলল, 'শিগগিরই আমরা পথ দেখতে পাব, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমি একটা প্রদীপ রেখে গেছি।'

সত্যিসত্যই, অন্ধকার মাটির দেয়ালে ক্ষীণালোকের আভাস দেখা গেল। তারা এসে পড়ল ছোট একটা খোলা জায়গায়, সেখানে বোধ হয় কোন ভজনালয় ছিল; অন্ততপক্ষে, দেয়ালের গায়ে লাগানো ছিল বেদীর মতো ছোট একটা টেবিল; তার উপরে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য, মুছে-যাওয়া, ক্যাথলিকদের মেরী-মাতার মূর্তি। সামনে ঝুলন্ত ছোট একটা রুপোর পূজা-প্রদীপ তাকে অতি সামান্য আলোকিত করছে। তাতারনী নীচু হয়ে মাটিতে বসানো তামার প্রদীপ তুলে নিল; সরু উঁচু তার দাঁড়, আলো কমানো বাড়ানো বা নিভানোর জন্য নানা কাঁটা তাতে ঝুলছে। সেটাকে তুলে নিয়ে তাতারনী পূজা-প্রদীপের শিখায় জ্বালিয়ে নিল। আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা চলতে লাগল একজন আগে একজন পিছনে। একেক বার

শিখার আলো পড়ে তাদের উপর, একেক বার তারা ঢাকা পড়ে যায় কয়লার মতো কালো অন্ধকারে, জেরার্দো della notte-র*) আঁকা ছবির মতো। কসাক-বীরের সুন্দর তাজা মুখ স্বাস্থ্যে ও তারুণ্যে প্রোজ্জ্বল, তার পথের সঙ্গিনীর অবসন্ন ও বিবর্ণ মুখের একান্ত বিপরীত। পথ খানিকটা প্রশস্ত হয়ে আসছিল, তাই আন্দ্রি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল। কৌতূহলের সঙ্গে সে মাটির দেয়ালগুলি দেখতে লাগল, তার মনে পড়ল কিয়েভের ভূগর্ভস্থ গুহার*)কথা। সেখানের মতো এখানেও দেয়ালের কুলুঙ্গিতে কোনোটায় শবাধার; কোনোটায় কেবল মৃতদেহের অস্থি, আর্দ্রতায় নরম হয়ে ময়দার মতো ঝুর ঝুর করে পড়ে যাচ্ছে। স্পষ্টতই এখানেও ধর্মাত্মারা পৃথিবীর ঝড়ঝঞ্ঝা, দুঃখবেদনা ও প্রলোভনের মায়া এড়ানোর জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে আর্দ্রতা খুবই বেশি, পায়ের তলায় কোথাও কোথাও একেবারে জল। সঙ্গিনীকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য আন্দ্রিকে প্রায়ই থামতে হচ্ছিল; তাতারনী অনবরত ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। ছোট একটা রুটির টুকরো সে গিলে খাওয়ার ফলে তার খাদ্যে অনভ্যস্ত পেটে এমন যন্ত্রণা হতে থাকে যে তাকে বারে বারে নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল।

অবশেষে তাদের সামনে দেখা গেল লোহার ছোট দরজা। 'যাক, ঈশ্বরের জয় হোক, আমরা এসে পড়েছি,' ক্ষীণ স্বরে এই কথা বলে, তাতারনী হাত দিয়ে দরজায় আঘাত করতে গেল, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। তার বদলে আন্দ্রি দরজায় সজোরে আঘাত করল; শোনা গেল গুম গুম আওয়াজ, মনে হল দরজার পিছনে আছে প্রশস্ত প্রান্তর। আওয়াজের সুর বদলে গিয়ে যেন কোন উঁচু খিলানে প্রতিধ্বনি তুলল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই শোনা গেল চাবির ঝিনঝিন, কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে। অবশেষে দরজা খুলে গেল; দেখা গেল একজন মঠবাসী সরু সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে চাবির গোছা ও বাতি। ক্যাথলিক মঠবাসীকে দেখে আন্দ্রি অনিচ্ছা সত্ত্বেও থেমে গেল; এদের দেখলে কসাকদের মনে এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঞ্চার হত যে তারা এদের সঙ্গে ইহুদীদের চেয়েও বেশি অমানুষিক ব্যবহার করত। মঠবাসীও কয়েক পা পিছিয়ে গেল জাপোরোজীয় কসাককে দেখে, কিন্তু তাতারনীর চাপা ফিসফিসে সে নিশ্চিন্ত হল। পিছনে দরজা বন্ধ করে সে তাদের আলো দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল, তারা এসে পড়ল এক মঠের গির্জার উঁচু অন্ধকার খিলানের তলে। একটি বেদীতে

উঁচু বাতিদানে বাতি জেবলে নতজান্ হয়ে ম্দ্ স্বরে প্রার্থনা করছিল এক ধর্মযাজক। তার কাছে দ্ই পাশে নতজান্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দ্টি তর্ণ সেবক, পরিধানে বেগনী রঙের জামা ও সাদা লেসের আংরাখা, তাদের হাতে ধ্পদানি। প্রার্থনা হচ্ছিল অলৌকিক কর্ণার জন্য: শহর যাতে রক্ষা পায়, দ্র্বল অন্তর যাতে শক্তি পায়, ধৈর্য যাতে আসে, লোকের ব্কে ভয় জাগিয়ে ঐহিক দ্র্ভাগ্যে তাদের বিচলিত করে তুলছে যে প্ররোচক সে যেন দ্র হয়। কয়েকজন নারী নতজান্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছায়াম্র্তির মতো; অসহ্য ক্লান্তিতে তারা সামনের চেয়ারগ্লির পিঠে ও কালো কাঠের বেঞ্চিতে ভর দিয়ে এমন কি মাথাগ্লিকেও ন্ইয়ে দিয়ে কোন রকমে নিজেদের খাড়া রেখেছিল; কয়েকজন প্র্ষও নতজান্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শোকাকুলভাবে, যে ছোট-বড় স্তম্ভগ্লি পাশের খিলানের ভর সহ্য করছিল তাতে ঠেস দিয়ে। বেদীর উপরের একটি রঙীন কাচের জানলার শার্শিতে প্রভাতের গোলাপী আলো পড়ছিল, তা থেকে মেঝের উপর এসে পড়ছিল নীল, হল্দ ও নানা রঙের আলোর ছোপ, তাতে অন্ধকার গির্জাঘর আলোকিত হয়ে উঠছিল। পেছনের গভীর কুল্ঙ্গিস্দ্ধ সমগ্র বেদী হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠল; ধ্পদানির ধোঁয়া দেখতে হল যেন আকাশে রামধন্-আলোকিত মেঘ। নিজের অন্ধকার কোণে থেকে আন্দ্রি আলোর এই বিচিত্র বিস্ময় দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারল না। ঠিক এই সময় সমস্ত গির্জাঘর ভরে গেল অর্গানের মহনীয় আরাবে। সে ধ্বনি ক্রমেই গম্ভীর, ক্রমে আরও উদাত্ত হয়ে বজ্রের গ্র্ গর্জনে গিয়ে পেঁছল; তারপর হঠাৎ পরিণত হল এক স্বর্গীয় সঙ্গীতে, তার স্রধ্বনি খিলানের মাথায় মাথায় অন্রণিত হতে লাগল কুমারী তর্ণীর কোমল কণ্ঠস্বরের মতো; পরে সে সঙ্গীত আবার বজ্রের গ্র্ গর্জন করে থেমে গেল। কিন্তু এই বজ্রগর্জন বহ্ক্ষণ ধরে অন্রণিত হতে লাগল খিলানের খাঁজে খাঁজে; অর্ধ-বিস্ফারিত ম্খে আন্দ্রি বিস্মিত হয়ে রইল এই মহনীয় সঙ্গীতে।

এই সময় তার বোধ হল কে যেন তার কামিজের প্রান্ত ধরে টানছে। তাতারনী বলল, 'আর দেরি নয়!' সকলের অগোচরে তারা গির্জার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এসে পড়ল বাইরের চত্বরে। ঊষার রক্তিমা অনেক আগেই আকাশকে লাল করে দিয়েছে: স্র্যোদয়ের প্র্বাভাস সর্বত্র। চত্বরটি আকারে চারকোণা, সম্প্র্ণ জনশ্ন্য; তার মাঝখানে তখনও কয়েকটি কাঠের ছোট টেবিল পড়ে আছে; তাতে বোঝা যায় যে হয়ত সপ্তাহখানেক

আগেই এখানে খাদ্যদ্রব্যের বাজার ছিল। পথ তখনকার দিনের সব পথের মতোই পাথরে বাঁধানো নয়, শুকনো কাদার স্তূপে ভরা। চত্বরের চারদিকে ছোট ছোট একতলা পাথরের বা কাদার বাড়ি, সেগুলির দেয়ালে উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত কাঠের খুঁটি ও থামের নিদর্শন সুস্পষ্ট, খুঁটি আর থামের উপর আড়াআড়ি কাঠের কড়ি বরখা লাগানো। এ ধরনের বাড়ি সেকালের শহরগুলিতে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের কোন কোন জায়গায় দেখা যায়। সব বাড়িতেই অস্বাভাবিক উঁচু ছাত, তাতে বহু সংখ্যায় গবাক্ষ ও বায়ুপথ। গির্জার প্রায় পাশাপাশি, একদিকে অন্যান্য বাড়িগুলি থেকে উঁচু, বিশিষ্ট একটি দালান, হয়ত পৌর শাসনসংস্থা বা কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দোতলা দালান, তার চূড়ায় দুটি খিলানে বসানো নাটমণ্ডপ, তাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী; প্রকাণ্ড একটি ঘড়ির মুখ ছাতের সঙ্গে গাঁথা। চত্বরটি যেন মৃত, তবু আন্দ্রির মনে হল সে যেন ক্ষীণ কাতর ধ্বনি শুনতে পেল। চারদিকে নিরীক্ষণ করে সে লক্ষ্য করল, চত্বরটার অন্য প্রান্তে দু তিন জন মানুষ প্রায় নিঃসাড়ে মাটিতে শুয়ে আছে। মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে দেখছিল এরা নিদ্রিত না মৃত; এমন সময় পায়ের কাছে কী একটার উপর সে প্রায় হোঁচট খেল। এটা ছিল এক নারীর মৃতদেহ, দেখলে মনে হয়, ইহুদী নারী। বোধ হয় সে যুবতী, যদিও তার বিকৃত ও বিশীর্ণ অঙ্গাবয়বে যৌবনের কোন চিহ্ন ছিল না। তার মাথায় লাল রেশমের রুমাল; কর্ণাভরণে দুই সারি মুক্তো অথবা পুঁতি সাজানো; তার তলে দু তিনটি দীর্ঘ অলকগুচ্ছ কুঞ্চিত হয়ে নেমে এসেছে বিশুষ্ক কঠিন শিরায় আবৃত কণ্ঠদেশে। তার পাশে শুয়ে ছিল এক শিশু; সে হাত দিয়ে মায়ের বিশীর্ণ স্তন ধরে টানাটানি করছিল, এবং একটুও দুধ না পেয়ে বৃথা আক্রোশে সেখানে আঙুল বসাচ্ছিল। কান্না বা চিৎকার সে আর করছিল না, কেবল তার পেটের মৃদু ওঠা-পড়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে তখনও মরে নাই। মোড় ফিরে তারা একটি পথে প্রবেশ করল। হঠাৎ তাদের থামিয়ে এক পাগল আন্দ্রির বহুমূল্য বোঝা দেখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতো, তাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করতে লাগল, 'রুটি! রুটি!' কিন্তু তার উন্মত্ততা যতটা, শক্তি ততটা ছিল না। আন্দ্রি তাকে ঠেলে দিতেই সে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল। অনুকম্পা অনুভব করে আন্দ্রি তাকে ছুঁড়ে দিল একখানি রুটি। ক্ষেপা কুকুরের মতো সে লাফিয়ে এসে রুটিটা কামড়ে ছিঁড়তে লাগল; তারপর তখনই সেই

পথের উপরেই, দীর্ঘকাল খাদ্য গ্রহণে অনভ্যাসবশত, প্রচণ্ড খিঁচুনি তুলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বলি দেখে প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই তারা চমকে উঠল। মনে হল যেন অনেকে ঘরের মধ্যে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইচ্ছে করে পথে ছুটে এসেছে এই আশায় যে খোলা হাওয়া হয়ত তাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে। একটি বাড়ির ফটকের সামনে বসে আছে এক বৃদ্ধা নারী; বলা কঠিন সে নিদ্রিত, না মৃত, না মূর্চ্ছাগত; অন্ততপক্ষে দেখার বা শোনার ক্ষমতা তার আর নেই; বুকের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে একই অবস্থায় সে বসে আছে নিশ্চলভাবে। অন্য একটি বাড়ির ছাদ থেকে ঝুলছে গলায় দড়ি বাঁধা এক শক্ত শুষ্ক শব। ক্ষুধার যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে বেচারি আত্মহত্যা করে জীবনের অন্তিম অবস্থাকে ত্বরান্বিত করেছে।

ক্ষুধার মর্মন্তুদ নিদর্শন দেখে আন্দ্রি তাতারনীকে জিজ্ঞেস না করে পারল না:

'এ কি সম্ভব যে জীবনধারণের জন্য এরা কিছুই খুঁজে পায় নি? চরম দুর্দশায় মানুষ বাছবিচার করে না, এতদিন যা ছোঁয় নি তাও খায়। যে প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, তাও তখন খেয়ে বাঁচতে পারে—সবকিছুই তখন খাদ্য বলে গণ্য হয়।'

'সব শেষ হয়ে গেছে,' উত্তর দিল তাতারনী, 'সব রকমের প্রাণী। একটা ঘোড়া বা কুকুর, এমন কি একটা ইঁদুরও নেই শহরে। এই শহরে কখনও খাদ্য জমা রাখা হত না, সবই আসত গ্রামাঞ্চল থেকে।'

'তাহলে, এই ভীষণ মৃত্যুর ভিতরে থেকে কী করে তোমরা শহর রক্ষার কথা ভাবতে পার?'

'তা বটে, শাসনকর্তা হয়ত হার মানতেন, কিন্তু গতকাল সকালে কর্নেল, তিনি বুদ্‌জাকিতে আছেন, সেই কর্নেল শহরে একটা বাজপাখি পাঠিয়েছেন এই চিঠি দিয়ে যেন শহর ছেড়ে দেওয়া না হয়; তিনি আসছেন আমাদের উদ্ধার করতে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে; তিনি কেবল অপেক্ষা করছেন অন্য একজন কর্নেলের জন্যে, যাতে তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে আসতে পারেন। সকলে এখন প্রতি মুহূর্তে তাঁদের প্রতীক্ষা করছে। এই যে আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।'

দূর থেকেই এই বাড়ি আন্দ্রির চোখে পড়ছিল, অন্যান্য বাড়ি থেকে এটা স্বতন্ত্র, মনে হয় যেন কোন ইতালীয় স্থপতির তৈরি। সুন্দর পাতলা ইট দিয়ে গড়া দোতলা। নীচের তলার জানলাগুলি গ্রানিটের উঁচু কার্নিশ দিয়ে

ঘেরা; উপরের তলায় কেবল ছোট ছোট খিলানের সারি, গ্যালারির মতো সাজানো: মাঝে মাঝে জাফ্‌রি-কাটা, তাতে আঁটা কৌলিক প্রতীক। বাড়ির নানা কোণেও এই ধরনের অলঙ্করণ। বাইরের রঙীন ইটের প্রশস্ত সিঁড়ি চত্বর পর্যন্ত নেমে এসেছে। সিঁড়ির তলে দুধারে সুসমঞ্জস ভঙ্গিতে বসে ছিল চিত্রার্পিত একজন করে প্রহরী, তাদের এক হাতে পাশে খাড়া করা টাঙ্গী, অন্য হাতে ঠেক দিয়ে রেখেছে ঝুলে-পড়া মাথা; জীবিত প্রাণীর চেয়ে ভাস্কর্য-মূর্তির চেয়ে তাদের মিল বেশি। তারা নিদ্রিত নয়, ঢুলছেও না, কিন্তু মনে হল, কোনকিছুতেই তাদের সাড়া নেই; সিঁড়ি দিয়ে কারা উপরে গেল তা তারা তাকিয়েও দেখল না। সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল একজন সুবেশধারী যোদ্ধা, আপাদমস্তক পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তার হাতে একখানি প্রার্থনা-পুস্তক। ক্লান্ত চোখ তুললে তাতারনী তাকে কী একটা কথা বলল, সে আবার তার চোখ নামাল প্রার্থনা-পুস্তকের খোলা পাতাটার উপর। প্রথম ঘরে তারা প্রবেশ করল, ঘরটি বেশ বড়, অভ্যর্থনা-কক্ষ হিসাবে অথবা সোজাসুজি বাইরের ঘর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সে ঘর ভরে দেয়ালের ধারে ধারে নানা ভাবে বসে আছে লোকলস্কর, সিপাহী, শিকারী, মদ্য পরিবেশক ও অন্যান্য পরিচারক— সামরিক এবং সেইসঙ্গে ভূমিপতি শ্রেণীর পোলীয় অভিজাতের আভিজাত্য প্রদর্শনের পক্ষে এরা অপরিহার্য। নিভানো মোমবাতির ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। ঘরের মাঝখানে প্রায় মানুষের মাথার সমান উঁচু দুটি বাতিদানে দুটি বাতি তখনও জ্বলছিল, যদিও অনেক আগেই চওড়া জাফ্‌রি-কাটা জানলার ভিতর দিয়ে ভোরের আলো ঘরে এসে পড়েছে। আন্দ্রি সোজা ওক কাঠের চওড়া দরজার দিকে যাচ্ছিল, কৌলিক প্রতীক এবং অন্যান্য খচিত অলঙ্করণে সেটা সাজানো, কিন্তু তার জামার আস্তিনে টান দিয়ে তাতারনী পাশের দেয়ালে ছোট একটি দরজা দেখিয়ে দিল। এই দরজা দিয়ে তারা এলো বারান্দায়, পরে একটি ঘরে, আন্দ্রি মনোযোগ দিয়ে ঘরটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়েছে এখানে ওখানে: গাঢ় লাল রঙের পর্দায়, সোনা মোড়া কার্নিশে, দেয়ালে আঁকা ছবিতে। তাতারনী আন্দ্রিকে এখানে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে অন্য একটি ঘরের দরজা খুলল। সেখান থেকে আগুনের আভা দেখা গেল। ফিসফিস কথা ও কোমল একটি স্বর শুনে আন্দ্রির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। অল্প খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সুগঠিত নারী-দেহ, দীর্ঘ সুপুষ্ট বেণী

উদ্যত এক বাহুর উপর এসে পড়েছে। তাতারনী ফিরে এসে তাকে ঘরে প্রবেশ করতে বলল। আন্দ্রির কিছু মনে নেই কেমন করে সে প্রবেশ করল এবং কখন তার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে জ্বলছিল দুটি বাতি; আইকনের সামনে একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলো কাঁপছিল; নীচে উঁচু একটি টেবিল, তাতে ক্যাথলিকদের প্রথামতো, প্রার্থনার সময় জানু পাতার জন্য কয়েকটি ধাপ। কিন্তু এ সব দিকে তার চোখ ছিল না। অন্যদিকে ফিরে সে তাকিয়ে দেখল এক নারী, যেন একটা ক্ষিপ্র অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্যে সে নারী জমে পাথর হয়ে গেছে। মনে হল যেন নারীর সমগ্র দেহ তার দিকে ঝাঁপিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। আন্দ্রিও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল তার সামনে। তাকে এমনটি দেখবে সে ভাবে নি: এ যেন সে নয়, সেই মেয়ে নয় যাকে সে আগে জানত; তার সঙ্গে এর এখন আর কিছুই মিল নেই; তবু আগের চেয়ে সে এখন দ্বিগুণ সুন্দরী ও মোহময়ী। তখন তার ছিল কেমন একটা অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ ভাব; এখন সে যেন এক শিল্পকীর্তি, শিল্পী যাতে তাঁর তুলির শেষ আঁচড়টিকেও সমাপ্ত করেছেন। তখন সে ছিল এক মনোহর লঘুচিত্ত বালিকা; এখন সে সুন্দরী রমণী, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত। তার তুলে ধরা চোখের দৃষ্টিতে এখন পরিণত আবেগ, তা কেবল আভাস নয়, পরিপূর্ণ আবেগ। সে চোখে জল তখনও শুকায় নি, সে উজ্জ্বল আর্দ্রতা একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। তার বুক, ঘাড়, কাঁধ পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্যের সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। মাথার চুল আগে হালকা অলকগুচ্ছে তার মুখের ধারে ধারে খেলে বেড়াত, এখন তা পরিণত হয়েছে ঘন সমৃদ্ধ কেশদামে, তার কিছুটা কবরীবদ্ধ হয়ে মাথায় আটকানো, বাকিটা তার দীর্ঘ বাহু বয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত শিথিল সুন্দর গোছায় বুকের উপর দিয়ে নেমে এসেছে। মনে হল, তার চেহারার প্রতিটি রেখায়ই ঘটেছে রূপান্তর। আন্দ্রির স্মৃতিতে যে মূর্তি ধরা ছিল তার এতটুকু কোন সাদৃশ্য আন্দ্রি কোথাও খুঁজে পেল না; একটুকুও না। মেয়েটি কি অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেছে এখন, তবু তার সৌন্দর্যের বিস্ময় তাতে এতটুকু ম্লান হয় নি; বরং যেন পেয়েছে এক অদম্য অপ্রতিরোধ্য বিজয়িনীর গরিমা। এক সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের অনুভূতিতে আন্দ্রির অন্তর ভরে গেল, সে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ হয়ে। রমণীও যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল কসাকের চেহারায়, এ কসাক তার সামনে উপস্থিত যৌবনদৃপ্ত পৌরুষের সমস্ত সৌন্দর্য ও শক্তি নিয়ে, তার বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল থাকলেও সেগুলির

মধ্যে ফুটে উঠছিল এক ক্ষিপ্র ও স্বচ্ছন্দ আন্দোলনের আভাস; দীপ্ত দৃঢ়তা তার চোখের দৃষ্টিতে, মখমলের মতো মসৃণ ভ্রূ উদ্যত ধনুকের মতো বাঁকা, যৌবনের পরিপূর্ণ শিখায় ঝলমল করছে রোদে-পোড়া গাল, তারুণ্যের কালো গোঁফের রেখা রেশমের মতো উজ্জ্বল।

রমণী বলল, 'হে উদার বীর, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর শক্তি আমার নেই,' তার কণ্ঠের রুপালী ধ্বনি কাঁপছিল। 'তোমার যোগ্য পুরস্কার দিতে পারেন কেবল ঈশ্বর; আর আমি ত দুর্বল নারী...'

রমণী দৃষ্টি নামাল; অর্ধবৃত্তাকারে নেমে এলো তার সুন্দর তুষার-শুভ্র চোখের পাতা, তরা প্রান্তে তীরের মতো দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি। তার আশ্চর্য-সুন্দর মুখ সামনে নত হয়ে সূক্ষ্ম গোলাপী আভায় রাঙিয়ে উঠল। আন্দ্রির শক্তি নেই একটি কথা বলে। তার প্রবল আগ্রহ আপনাকে প্রকাশ করা—যা কিছু তার অন্তরে আছে তাকে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে প্রকাশ করা—কিন্তু পারল না। সে অনুভব করল, কিসে যেন তার কণ্ঠরোধ করছে; কথা বলছে সে, কিন্তু তাতে শব্দ নেই; অনুভব করল, সেমিনারিতে ও সামরিক যাযাবর কসাক জীবনে যেটুকু শিক্ষা সে পেয়েছে তাতে এমন রমণীর এই অপূর্ব কথাগুলির উত্তর দেওয়া যায় না; আর তাই নিজের কসাক চরিত্রের উপর সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল তাতারনী। বীরের আনা রুটিকে সে ইতিমধ্যেই টুকরো করে সোনার থালায় এনে তার কর্ত্রীর সামনে রেখে দিল। সুন্দরী তাকাল তার দিকে, রুটির দিকে, তারপর চোখ তুলল আন্দ্রির মুখের দিকে—সে চোখে রাজ্যের ভাবাবেগ, সেই মুখর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল রমণীর যত যন্ত্রণা, ফুটে উঠল তার ভাবাবেগ ব্যক্ত করার অক্ষমতা—এ দৃষ্টি আন্দ্রির কাছে হল ভাষার চেয়ে বেশি বোধগম্য। হঠাৎ তার হৃদয় হালকা হয়ে গেল; তার অন্তর হল যেন বন্ধনমুক্ত। তার হৃদয়ের সব আবেগ ও অনুভূতি কে যেন এতক্ষণ শক্ত বল্গা দিয়ে টেনে রেখেছিল, এখন যেন তা ছাড়া পেয়ে কথার অদম্য প্রপাতে প্রবাহিত হওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠল। হঠাৎ তাতারনীর দিকে ফিরে উদ্বেগের স্বরে সুন্দরী প্রশ্ন করল:

'আর আমার মা, তাকে দিয়েছিস?'

'তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

'আর বাবাকে?'

'দিয়েছি। বললেন যে তিনি নিজেই আসবেন বীরকে ধন্যবাদ দিতে।'

তরুণী তখন এক টুকরো রুটি তুলে মুখে দিতে গেল। তার সুগৌর আঙুল দিয়ে রুটি ভেঙে খাওয়া আন্দ্রি দেখতে লাগল অপরূপ আনন্দে; কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই লোকটির কথা, ক্ষুধায় পাগল হয়ে যে রুটির টুকরো গিলতে গিয়ে তার চোখের সামনে মারা গেছে। আন্দ্রির মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, তরুণীর হাত চেপে ধরে সে চিৎকার করে উঠল:

'আর নয়! আর খেয়ো না! এতদিন কিছু খাও নি তাই এ রুটি এখন তোমার কাছে বিষ।'

তরুণী তখনই হাত নামিয়ে নিল, রুটি থালায় রেখে দিল, এবং তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল বাধ্য শিশুর মতো। কথা দিয়ে যদি প্রকাশ করা যেত... কিন্তু না, শিল্পীর বাটালি বা তুলিতে, কিংবা সবচেয়ে প্রবল ও মহনীয় ভাষা দিয়েও প্রকাশ করা যায় না কী ফুটে উঠল তরুণীর চোখে, অথবা তরুণীর চোখের দিকে যে তাকিয়ে আছে কী আবেগ জাগছে তার অন্তরে।

'ওগো রানী!' বলে উঠল আন্দ্রি, তার মন-প্রাণ ও সমগ্র সত্তা ভাবাবেগে পূর্ণ হয়ে উপছে পড়ছে। 'কী তোমার প্রয়োজন? কী চাও তুমি? আদেশ কর! পৃথিবীতে যা সবচেয়ে অসম্ভব কাজ, সেই কাজ দাও আমাকে—আমি তা করব, করতে গিয়ে প্রাণ দেব। হ্যাঁ, প্রাণ দেব! পবিত্র ক্রুশের দিব্যি, তোমার জন্যে মরতে পারাও আমার পক্ষে মধুর... বলতে পারি না কত মধুর! আমার আছে তিনটি গ্রাম, আমার বাবার ঘোড়ার পালের অর্ধেক—আমার মা তাঁর বাপের বাড়ি থেকে যা কিছু এনেছেন, এমন কি যা কিছু তিনি আমার বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন—এ সমস্তই আমার! আমার যা আছে কোনো কসাকের তেমন অস্ত্র নেই: আমার তলোয়ারের কেবল হাতলটার বদলেই আমি পেতে পারি সবচেয়ে ভালো ঘোড়ার পাল ও তিন হাজার ভেড়া। এ সমস্ত আমি ছেড়ে দেব, ছুঁড়ে ফেলব, পুড়িয়ে দেব, ডুবিয়ে দেব, শুধু তোমার একটি কথায়, তোমার চিকণ কালো ভুরুর ইঙ্গিতে! আমি জানি যে হয়ত আমার কথাগুলো নির্বোধ, বেমানান আর অনুপযোগী শোনাচ্ছে, কিন্তু সেমিনারিতে ও জাপোরোজ্য়েতে জীবনযাপনের পর যেমনভাবে এখানে সাধারণত কথা বলা হয় তেমনভাবে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় যেভাবে কথা বলেন রাজারা, যুবরাজেরা, বীরসমাজের অগ্রগণ্যেরা। তুমি ভগবানের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি, মোটেই

আমাদের মতো নও, তোমার তুলনায় অভিজাত-শ্রেণীর অন্য সব মেয়ে-বৌরাও অনেক খাটো। আমরা তোমার ক্রীতদাস হবারও যোগ্য নই; স্বর্গের দেবদূতেরাই কেবল তোমার সেবা করার উপযুক্ত।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময় নিয়ে, যেন সমস্ত কান দিয়ে, একটি কথাও বাদ না দিয়ে, কুমারী শুনতে লাগল এই ভাবাবেগে-ভরা ভাষণ, মুকুরের মতো তাতে প্রতিফলিত হয়ে উঠছিল এক সবল তরুণ প্রাণ। অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত এক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে এই ভাষণের প্রত্যেকটি সহজ শব্দ ধ্বনিত হল সবলে। অপূর্ব-সুন্দর মুখ তার দিকে তুলে তরুণী অবাধ্য চুলের গোছা পিছনে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিল, তার ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেল। সে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘকাল। তারপর কিছু যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নিজেকে সংযত করল সে। তার মনে পড়ল যে এই বীর অন্য ধাতের লোক, তার পিছনে আছে তার পিতা, ভ্রাতা, তার দেশ, কঠোর প্রতিহিংসা-পরায়ণ তারা। ভয়ংকর এই নীপার-কসাকরাই অবরোধ করে আছে এই শহর; এ শহরের সকলে আছে এক নির্দয় মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। অকস্মাৎ তার চোখদুটি জলে ভরে গেল; দ্রুতবেগে সে একখানা রেশমী রুমাল নিয়ে মুখে চেপে ধরল, এক মিনিটে তা পুরো ভিজে গেল; অনেকক্ষণ ধরে সে বসে রইল তার অপূর্ব-সুন্দর মাথাটি পিছনে হেলিয়ে, তার তুষারশুভ্র দাঁতে চেপে রইল তার অপূর্ব-সুন্দর ওষ্ঠাধর—যেন কোন বিষধর সর্প হঠাৎ তাকে দংশন করেছে, আন্দ্রি যাতে তার বুক-ভাঙা দুঃখ-বেদনা দেখতে না পায় সেজন্য মুখ থেকে রুমাল সে সরাল না।

'শুধু একটি কথা বল আমাকে,' বলে আন্দ্রি তরুণীর মসৃণ হাতখানি তুলে নিল। এই স্পর্শে আন্দ্রির শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত বয়ে গেল, তার হাতের মধ্যে অসাড়ে পড়ে-থাকা হাতখানির উপর চাপ দিল সে।

তরুণী নির্বাক, মুখ থেকে রুমাল না সরিয়ে নিঃস্পন্দ হয়ে রইল।

'কিসে তোমার এত দুঃখ? বল আমাকে, কিসে তোমার এত দুঃখ?'

তরুণী তার রুমাল ফেলে দিল, সরিয়ে দিল তার চোখের উপরে এসে পড়া দীর্ঘ কেশদাম, তারপর মৃদু শান্ত স্বরে শুরু করল তার বিষণ্ণ বিবরণ। ঠিক এমনি করেই আশ্চর্য সুন্দর এক সন্ধ্যায় হঠাৎ জলের ধারে ঘন শরবনের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় সমীরণ: মৃদু ম্লান শব্দের মর্মর গুঞ্জন ওঠে, পথচারী আকৃষ্ট হয়ে থেমে যায় অনির্বচনীয় বিষাদে, ম্রিয়মাণ সন্ধ্যার

দিকে তার দৃষ্টি যায় না, তার কানে আসে না ক্ষেতের কাজ ও ফসল কাটার পর গৃহাভিমুখী কৃষকদের ফুর্তির গান, কিংবা দূর থেকে ভেসে আসা গাড়ি চালানোর ঘর্ঘর ধ্বনি।

'আমি কি চিরন্তন করুণার পাত্রী নই? যে মায়ের গর্ভে আমার জন্ম, তিনি কি হতভাগিনী নন? আমার অদৃষ্ট কি তিক্ত নয়? ওগো আমার ভীষণ নিয়তি, তুমিই যে আমার নির্দয় পীড়নকারী! তুমি আমার পদতলে এনে দিয়েছ সকলকেই: সেরা অভিজাতবর্গ, ধনীশ্রেষ্ঠ পোলীয় জমিদারদের, কাউন্টদের, বিদেশী ব্যারনদের, আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের, তাদের সবাই আমাকে ভালোবাসতে চেয়েছে! সকলেই আমার ভালোবাসা পেলে ভাগ্য বলে মানত। আমার হাতের একটি ইঙ্গিতে এদের মধ্যে—রূপে ও বংশগৌরবে যে সবার ওপরে—সেই আমার জীবনের সাথী হতে পারত। কিন্তু হে আমার ভীষণ নিয়তি, এদের কাউকে দিয়ে তুমি আমার হৃদয়কে মুগ্ধ করাতে পারলে না; তুমি মুগ্ধ করালে, দেশের শ্রেষ্ঠ বীরদের ছাড়িয়ে গিয়ে, এক বিদেশীকে দিয়ে, আমাদের শত্রুকে দিয়ে। কিসের জন্যে, হে পবিত্র মেরী-মাতা, কোন্ পাপে, কোন্ গুরুতর অপরাধে তুমি এমন নিষ্ঠুর, নির্দয় ভাবে আমাকে যাতনা দিচ্ছ? আমার দিন কেটেছে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে : সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে মিষ্টি পানীয় আমি পেয়েছি। কিন্তু কী হল তাতে? কী তাদের পরিণাম? পরিণাম কি এই যাতে অবশেষে আমার এমন নির্দয় মৃত্যু হয় যা এ রাজ্যে নিঃস্বতম ভিখারীরও হয় না? এই ভয়ংকর ভাগ্যেও যথেষ্ট হল না, যাদের রক্ষার জন্যে আমি বিশ বার নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত, সেই মা-বাবার অসহ্য যন্ত্রণার মৃত্যু দেখতে হবে আমাকে আমার মৃত্যুর আগে। এতেও তৃপ্তি হল না তোমার — এর ওপর আমার মৃত্যুর আগে এলো প্রেম, শুনতে হল ভাষা, যা আমি কল্পনাও করি নি। সে ভাষায় আমার হৃদয় চূর্ণ হয়ে যাবে, আমার তিক্ত ভাগ্য হবে তিক্ততর, আমার তরুণ জীবন হবে আরও করুণ, আমার মরণ হবে আরও ভয়ংকর। আর মরণকালে, আমি তোমাকে তিরস্কার করব, হে আমার ভীষণ নিয়তি, আর তোমাকেও—আমার অপরাধ নিও না—হে পবিত্র মেরী-মাতা!'

সে যখন থামল তার মুখে প্রতিফলিত হল হতাশার ও চরম রিক্ততার অনুভূতি; তার প্রত্যেকটি রেখায় ফুটে উঠল অন্তর্ভেদী যন্ত্রণা; বিষাদে আনত তার ললাট, তার আনত চোখজোড়া, তার ঈষৎ জ্বলজ্বলে গালের

ওপর শুকিয়ে আসা জমাট অশ্রু—সবই যেন বলছে, 'কোন সুখ নেই এর মনে!'

আন্দ্রি বলে উঠল, 'কে কবে শুনেছে এ কথা, এ হতেই পারে না, রমণীকুলের রত্ন ও সেরা সুন্দরীর এই দারুণ দুর্ভাগ্য ঘটবে তা কিছুতে হতে পারে না; সে নারীর জন্মই এই জন্যে যে পৃথিবীতে যা কিছু সবচেয়ে ভালো তাই যেন তার কাছে নত হবে, নত হবে যেন এক পবিত্র দেবীর কাছে। না, তুমি মরবে না! মরণ তোমার জন্যে নয়! আমার জন্মের নামে, পৃথিবীতে যা কিছু আমার প্রিয়, তাদের নামে আমি শপথ করছি যে তুমি মরবে না! আর এই যদি হয় যে কোন কিছুই—শক্তি, প্রার্থনা, সাহস—কোন কিছুই এই ভীষণ নিয়তিকে ঠেকাতে না পারে, তাহলে আমরা মরব একসঙ্গে, কিন্তু আমি মরব আগে, মরব তোমার সামনে, তোমার অপূর্ব সুন্দর পদতলে, একমাত্র মৃত্যুই আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে!'

'বঞ্চনা করো না, হে বীর, বঞ্চনা করো না নিজেকে ও আমাকে,' তরুণী বলল অপূর্ব-সুন্দর মাথা দুলিয়ে, 'আমি জানি, আমার দুঃখ এই যে আমি ভালো করেই জানি, আমাকে ভালোবাসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমি জানি তোমার কর্তব্য, তোমার ধর্মাদেশ: তোমাকে ডাকছে তোমার বাবা, তোমার সাথীরা, তোমার দেশ। আমরা যে তোমার শত্রু।'

'কিসের বাবা, কিসের সাথী, কিসের দেশ?' মাথার দ্রুত ঝাঁকানি দিয়ে নদীতীরের পপ্‌লার-গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে উঠে আন্দ্রি বলল, 'যদি সে কথাই ওঠে তাহলে বলি, আমার কেউ নেই! না, কেউ নেই!' যেমন করে এক পেশলদেহ কসাক অন্যের পক্ষে অসম্ভব অভূতপূর্ব কিছু একটা করার সংকল্প ঘোষণা করে, তেমনি ভঙ্গিতে, তেমনি স্বরে বলে চলল আন্দ্রি, 'কে বলে ইউক্রেন আমার দেশ? কে আমাকে দিল এ দেশ? সে-ই আমার দেশ যাকে চায় আমার অন্তর, যা আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়। আমার দেশ—তুমি! হ্যাঁ, তুমিই আমার দেশ! এই দেশকে আমি অন্তরে বহন করব, বহন করব যতদিন দেহে প্রাণ থাকে; কোন কসাক তাকে সেখান থেকে ছিঁড়ে নিতে এলে আমি মানব না! এই দেশের জন্যে আমি বেচতে পারি, দান করতে পারি, ধ্বংস করতে পারি আমার যা কিছু আছে সব!'

কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গিয়ে অপূর্ব-সুন্দর এক ভাস্কর্যের মতো তরুণী তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে

উঠল। নারীসুলভ বিস্ময়কর উদ্দামতায়,—যে উদ্দামতা সম্ভব কেবল সেই বেহিসাবী উদার-হৃদয় নারীর পক্ষে, অন্তরের অপূর্ব-সুন্দর আবেগ প্রকাশের জন্য যার সৃষ্টি,—সেই উদ্দামতায় তরুণী তার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তুষারশুভ্র আশ্চর্য বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সজোরে ফুঁপিয়ে উঠল। এই সময় শোনা গেল পথে অস্পষ্ট চিৎকার, রামশিঙ্গা ও জয়ঢাকের আওয়াজ। কিন্তু কোন কিছুই আন্দ্রি শুনল না। সে শুধু টের পেল তরুণীর আশ্চর্য ঠোঁটজোড়া তপ্ত সুরভিত নিশ্বাসে তাকে অভিভূত করছে, তরুণীর অশ্রুধারা তার গালের ওপর এসে অঝোরে ঝরে পড়ছে তরুণীর সুগন্ধি কেশরাশি মাথা থেকে মুক্ত হয়ে নেমে এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছে উজ্জ্বল কালো রেশমের মতো।

ঠিক এই সময় আনন্দে চিৎকার করতে করতে সবেগে ঘরে প্রবেশ করল তাতারনী।

'বেঁচে গেছি!' আত্মহারা হয়ে সে চিৎকার করতে লাগল। 'আমাদের সৈন্যেরা শহরে ঢুকেছে, সঙ্গে এনেছে রুটি জোয়ার, ময়দা আর জাপোরোজীয় বন্দী।'

কিন্তু দু'জনের কেউই শুনল না কোন্ 'আমাদের' সৈন্য শহরে প্রবেশ করেছে, কী তারা সঙ্গে এনেছে, কারা এই জাপোরোজীয় বন্দী। আন্দ্রির গালের উপর নেমে এসেছে এক সুমধুর অধর। অপার্থিব এক অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে সে অধর চুম্বন করল আন্দ্রি। সে অধর থেকে সাড়া আসতেও দেরি হল না। বিনিময় হল আদরের। আর সেই পারস্পরিক চুম্বন থেকে দু'জনেই এমন একটা কিছু অনুভব করল, যা জীবনে আসে শুধু একবার।

মরল কসাক! চ্যুত হল সে সমগ্র কসাক-বীরত্ব থেকে! আর সে দেখতে পাবে না জাপোরোজ্য়ে, তার পৈতৃক গ্রামগুলি, দেবতার ধর্মমন্দির! সন্তানদের মধ্যে যে সাহসীতম ইউক্রেন রক্ষার ভার নিয়েছিল তাকে ইউক্রেনও আর দেখতে পাবে না। বৃদ্ধ তারাস তার চুলের ঝুঁটি থেকে পক্ক কেশ টেনে ছিঁড়ে অভিশাপ দেবেন সেই দিনক্ষণকে যখন এমন কুলাঙ্গার সন্তানের তিনি জন্ম দিয়েছিলেন।

৭

হট্টগোল ও চাঞ্চল্যে ভরে গেল জাপোরোজীয় শিবির। প্রথমে কেউই ঠিকমতো বুঝাতে পারল না, কী করে সৈন্যেরা শহরে প্রবেশ করল। পরে

আবিষ্কার করা গেল যে, শহরের পাশের দিকের দ্বারে অবস্থিত সারা পেরেয়াস্লাভ কুরেন বেহুঁশ মাতাল হয়ে ছিল। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, কী ঘটছে তা বোঝার আগেই কসাকদের অর্ধেক মারা পড়বে এবং বাকি অর্ধেককে বন্দী করা হবে। কাছাকাছি কুরেনগুলি হট্টগোলে জেগে উঠে যখন অস্ত্রশস্ত্রে সাজল, তার আগেই সৈন্যদল শহরদ্বার পার হয়ে গেছে, নিদ্রাতুর ও অর্ধ-সচেতন যেসব নীপার-কসাক বিশৃংখলভাবে অগ্রসর হয়েছিল শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ থেকে গুলি করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্প-সর্দার সকলকে জমায়েত হতে আদেশ দিলেন; সকলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে নিস্তব্ধ হলে তিনি বললেন:

'দেখতে পাচ্ছ, ভাই সব, আজ রাতে কী ঘটেছে। দেখতে পাচ্ছ মাতাল হলে কী হয়! দেখতে পাচ্ছ, দুশ্‌মনেরা আজ কী লজ্জা দিয়েছে আমাদের! তোমাদের ত এই ব্যাপার—যদি মদের মাত্রা দ্বিগুণ করা হল ত অমনি তোমরা এমনি টানতে শুরু করলে যে খ্রীষ্টীয় যোদ্ধাদের শত্রুরা এসে তোমাদের সালোয়ার কেড়ে নেওয়া ত ভালো, তোমাদের মুখের ওপর হেঁচে দিলেও তোমরা তা টের পাও না।'

কসাকরা সকলে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে, তাদের দোষ বুঝতে পেরে। নেজামাই-কুরেনের সেনাপতি কুকুবেন্‌কো কেবল উত্তর দিলেন:

'একটু দাঁড়াও, বাবা!' তিনি বললেন। 'ক্যাম্প-সর্দার যখন গোটা সৈন্যবাহিনীর সামনে কিছু বলেন তখন প্রতিবাদ করা যদিও বিধিসঙ্গত নয়, তবুও ব্যাপারটা অন্য রকম, তাই বলতে হচ্ছে। সমস্ত খ্রীষ্টীয় যোদ্ধাদের তুমি যে দোষ দিলে তা সম্পূর্ণ ন্যায্য নয়। কসাকদের দোষ হত, তারা মরণের যোগ্য হত যদি তারা মাতাল হত অভিযান করার সময়, লড়াই করার সময়, কিংবা কোন কঠিন কষ্টসাধ্য কাজ করার সময়। কিন্তু আমরা ত বসেছিলাম বিনা কাজে, শহরের চারপাশে পায়চারী করে ফিরছিলাম। উপোস বা অন্য কোন খ্রীষ্টীয় সংযম কিছুই করা হয় নি: কেমন করে এটা হতে পারে যে মানুষ নিষ্কর্মা হয়েও মাতাল হবে না? এতে কোন পাপ নেই। আমরা বরং এখন তাদের দেখিয়ে দেব নির্দোষ লোকেদের আক্রমণ করার কী ফল। এর আগে ওদের বেশ ঠেঙিয়েছি, এখনও ওদের এমন ঠেঙাব যে ওদের মধ্যে কেউ ঘরে ফিরবে না।'

কুরেন সেনাপতির এই বক্তৃতায় কসাকরা খুশি হল। তাদের মাথা এতক্ষণ একেবারে নীচু হয়ে গিয়েছিল, এখন তারা মাথা তুলল; অনেকে

সমর্থনসূচকভাবে মাথা নেড়ে বলল: 'কুকুবেন্‌কো বেশ বলেছেন!' আর তারাস বুলবা ক্যাম্প-সর্দারের অদূরে দাঁড়িয়ে বললেন:

'কী হে, ক্যাম্প-সর্দার, কুকুবেন্‌কো ঠিক কথাই বলেছে তাই না? কী তোমার বলার আছে এর উত্তরে?'

'কী বলার আছে? বলছি: এমন ছেলের বাপের ভাগ্য ভালো! খোঁচা দিয়ে কথা বলতে খুব বেশি জ্ঞানবুদ্ধি লাগে না, জ্ঞানবুদ্ধি লাগে এমন কথা বলতে যাতে দুরবস্থায় পড়া মানুষকে লজ্জা দেয় না, তাকে উৎসাহ দেয়, সাহস দেয়, জল-খেয়ে-তাজা ঘোড়াকে যেমন সাহস দেয় জুতোর কাঁটা। আমি নিজেই তোমাদের বলতে যাচ্ছিলাম সান্ত্বনার কথা, কুকুবেন্‌কো তা আগেই বলে ফেলল।'

'ক্যাম্প-সর্দারও বেশ বলেছেন!' নীপার-কসাকদের লাইন থেকে উঠল ধ্বনি। 'ভালো কথা!' যোগ দিল অন্যেরা। এমন কি, পক্ককেশ প্রাচীনেরাও ধূসর পায়রাদের মতো দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে আর সাদা গোঁফ কাঁপিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'বেশ বলেছেন কথাগুলো!'

'শোনো তবে, মশাইরা!' ক্যাম্প-সর্দার বলতে লাগলেন। 'শালার এই কেল্লা দখল করা — ভিনদেশী জার্মান ধুরন্ধররা যেমন করে, তেমনি করে এর পাঁচিল টপকাতে যাওয়া কি দেয়াল ধসিয়ে দেওয়া — এসব কসাকের পোষাবে না। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, শত্রুরা শহরে খুব একটা বেশি পরিমাণ খাদ্যভান্ডার নিতে পারে নি, তাদের সঙ্গে বেশি গাড়ি ছিল না। শহরের অধিবাসীরা ক্ষুধার্ত; পাওয়া মাত্রই সব শেষ করবে; আর তাদের ঘোড়ার খাদ্য... জানি না তাদের কোন ঋষি যদি আকাশ থেকে কিছু পাঠিয়ে না দেন ত কী করবে তারা... কিন্তু এক ঈশ্বরই কেবল তা বলতে পারেন, আর তাদের পুরুতরা ত কেবল মুখসর্বস্ব। যাই হোক, ওরা বেরিয়ে আসবে শহর থেকে। তোমরা তিন দলে ভাগ হয়ে, তিনটি শহরদ্বারের সামনে তিনটি পথে জমা হয়ে যাও। বড় দরজার সামনে পাঁচটি কুরেন, অন্য দুটিতে তিনটি করে। দ্যাদ্‌কিভ্‌ ও করসুন কুরেন থাকবে গুপ্তস্থানে। কর্নেল তারাসও তাঁর রেজিমেণ্ট নিয়ে থাকবেন গুপ্তস্থানে। তিতারেভ্‌কা ও তিমোশেভ্‌কা কুরেন থাকবে মজুদ হিসাবে, মালগাড়িগুলোর ডান দিকে! শ্চের্বিনোভ্‌ আর পাহাড়ী স্তেবলিকিভ্‌ কুরেন থাকবে বাঁ দিকে! আর ছোকরা লড়িয়েদের মধ্যে যাদের কথার কামড়ানি সবচেয়ে বেশি তারা একত্র হয়ে দুশমনদের গাল পাড়ুক। পোলদের স্বভাবতই মাথায় কিছু নেই:

গালাগালি সহ্য হবে না; হয়ত তারা সকলেই আজই বেরিয়ে আসবে দরজা দিয়ে। কুরেন সেনাপতিরা, নিজের নিজের কুরেন পরীক্ষা কর; যার কমতি আছে, ভরিয়ে নাও পেরেয়াস্লাভ্ কুরেনের বাকি লোক দিয়ে। নতুন করে সব পরীক্ষা কর! প্রত্যেককে দাও একখানা করে রুটি আর মাথা সাফ্ করার জন্যে এক এক পেয়ালা ভোদ্‌কা। নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের পেট ভরে আছে কালকের খাবারে, কারণ সত্যি বলতে কি, সকলে তোমরা এমন ঠেসেছ যে আমি অবাক হচ্ছি কাল রাতে তোমাদের কারও পেট ফাটে নি কেন। হাঁ, আর একটা নির্দেশ: যদি কোন ইহুদী শুঁড়ি কোন কসাককে এক পাত্র মদও বিক্রী করে, আমি শুয়োরের কান কেটে সেই কুত্তার কপালে লাগিয়ে দেব, আর পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেব মাথা নামিয়ে! কাজে লেগে যাও ভাই সব, কাজে লেগে যাও!'

এই নির্দেশ দিলেন ক্যাম্প-সর্দার, সকলে কোমর পর্যন্ত নত হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাল, মাথায় টুপি দিল না, চলল তাদের শিবির ও শকটগুলির দিকে; অনেক দূরে যাওয়ার পর তবে তাদের মাথায় টুপি দিল। সকলেই প্রস্তুত হতে লাগল: পরীক্ষা করল তাদের অসি কৃপাণ, বস্তা থেকে বারুদ-পাত্রে বারুদ ঢালল, মালগাড়ি সাজাল ও ঘোড়া বেছে রাখল।

নিজের রেজিমেণ্টের দিকে যেতে যেতে তারাস ভেবে স্থির করতে পারলেন না আন্দ্রির কী হয়েছে: অন্যদের সঙ্গে সেও কি ঘুমন্ত অবস্থায় বাঁধা পড়ে বন্দী হয়েছে? না, আন্দ্রি তেমন ছেলে নয় যাকে বেঁচে থাকতে বন্দী করা যায়। কিন্তু নিহত কসাকদের ভিতরেও তাকে পাওয়া যায় নি। এমন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তারাস রেজিমেণ্টের সামনে সামনে চলছিলেন যে অনেকক্ষণ ধরে শুনতেই পান নি কে তাঁর নাম ধরে ডাকছে।

অবশেষে সচেতন হয়ে তিনি বললেন, 'কার দরকার আমাকে?'

তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ইহুদী ইয়ান্‌কেল।

'সেনাপতি মশাই, সেনাপতি মশাই!' ইহুদী বলতে লাগল তড়বড় করে ও ভাঙা গলায়, যেন সে এমন কিছু বিষয়ে বলতে চায় যার গুরুত্ব কম নয়। 'আমি শহরে গিয়েছিলাম, সেনাপতি মশাই!'

তারাস বিস্মিত হয়ে ইহুদীকে নিরীক্ষণ করলেন, ইতিমধ্যেই সে কী করে শহরে যাতায়াত করতে পারল।

'কোন্ শয়তানের সাহায্যে গেলি সেখানে?'

'বলছি এখনই,' বলল ইয়ান্‌কেল। 'যেই আমি হট্টগোল শুনলাম

সকালবেলায়, যেই কসাকরা গুলি চালাতে শুরু করল তখনই আমি আমার কামিজটা তুলে নিয়ে না পরেই চোঁ চা দৌড়ে গেলাম; পথে সেটা গায়ে চড়ালাম, কেননা, কিসের জন্যে এই হট্টগোল, কসাকরা এত সকালে গুলি চালাচ্ছে কেন তা জানার জন্যে সবুর সইছিল না আমার। দৌড় দিয়ে চলে গেলাম শহরের ফটক পর্যন্ত, ঠিক সেই সময়ে শেষ সৈন্যদলটি শহরে ঢুকছে। দেখতে পেলাম — সৈন্যদলের সামনে আছেন অধিনায়ক গাল্যান্দোভিচ। এঁকে আমি চিনি, তিন বছর আগে তিনি আমার কাছে একশ' মোহর ধার নেন। আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর পিছনে যেন ধার আদায় করতে চলেছি, আর এই করে শহরে ঢুকে গেলাম তাদের সঙ্গে।

বুলবা বললেন, 'কী বললি, শহরে ঢুকে গেলি, তা আবার ধার আদায় করতে? আর কুকুরের মতো তোকে ফাঁসিতে ঝোলাবার হুকুম দিল না সে?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, ঝোলাতে চেয়েছিলেন বৈ কি!' উত্তর দিল ইহুদী, 'তাঁর চাকর-বাকরেরা আমাকে পাকড়াও করে গলায় প্রায় দড়ির ফাঁস পরিয়েছিল, কিন্তু আমি মিনতি করলাম কর্তাকে, বললাম তাঁকে যে যতদিন তিনি চান ততদিন আমি ধার শোধের জন্যে অপেক্ষা করব; কথা দিলাম যে তাঁকে আরও ধার দেব, যদি তিনি অন্য নাইটদের কাছ থেকে ধার আদায় করতে আমায় সাহায্য করেন; কারণ এই অধিনায়ক মশাইটির পকেটে — আমি আপনাকে খুলেই বলছি — একটি মোহরও নেই। যদিও এঁর গ্রাম আর তালুক অনেক, চারটে দুর্গ, আর স্তেপ-জমি প্রায় শ্‌ক্লোভ্‌ পর্যন্ত, কিন্তু তাঁর অবস্থা কসাকদেরই মতো, হাতে একটি পয়সাও নেই। এখনও, যদি ব্রেস্‌লাউয়ের ইহুদীরা তাঁকে টাকা না যোগাত, তাহলে যুদ্ধে আসার মতো সম্বলই তাঁর হত না। এই জন্যেই তিনি আইন সভায়ই যেতে পারেন নি...'

'শহরে তাহলে তুই কী করলি? দেখলি আমাদের কাউকে?'

'নিশ্চয়! আমাদের অনেক লোক সেখানে: আইসাক, রাহুম, সামুয়েল, হাইভালোহ্‌, ইহুদী পাট্টাদার...'

'চুলোয় যাক, কুত্তার দল!' তারাস চেঁচিয়ে উঠলেন ক্রুদ্ধ হয়ে। 'তোর ওই ইহুদী গোষ্ঠীর খবরে আমার কী দরকার! আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি আমাদের নীপার-কসাকদের কথা।'

'আমাদের নীপার-কসাকদের কাউকে দেখি নি। দেখেছি কেবল আন্দ্রি কর্তাকে।'

'আন্দ্রিকে দেখেছিস?' চিৎকার করে উঠলেন বুলবা। 'কী বলছিস তুই, কোথায় দেখেছিস তাকে?.. পাতালঘরে?.. গর্তের মধ্যে?.. নিশ্চয়ই অপমানের একশেষ?.. বন্দী?..'

'কার এত সাহস যে আন্দ্রি কর্তাকে বন্দী করে? তিনি ত এখন মস্ত বীরপুরুষ... ঈশ্বরের দিব্যি, আমি তাঁকে চিনতেই পারি নি! তাঁর কাঁধে, হাতে, বুকে, মাথায়, কোমরে — সব সোনার সামরিক পোশাক, সবখানে, সব সোনার। সোনায় তিনি ঝলমল করছেন যেন বসন্ত কালের সূর্য, আর চারদিকে বাগানে পাখিরা সব গেয়ে উঠছে কলকল করে, ঘাসের গন্ধ উঠছে মিঠে। শাসনকর্তা তাঁকে দিয়েছেন তাঁর সবচেয়ে ভালো যুদ্ধের ঘোড়া: এই ঘোড়াটার দামই হবে দুশ' মোহর।'

বুলবা স্তম্ভিত: 'এই বিদেশী যুদ্ধ-সাজে সে সেজেছে কেন?'

'সেজেছেন কেননা এ সাজ আরও সুন্দর... তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান, অন্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে; তিনি তাদের শেখান, তারাও তাঁকে শেখায়। ঠিক একেবারে খুব বড়লোক পোলীয় কর্তাব্যক্তির মতো!'

'কে তাকে দিয়ে করাল এ সব?'

'আমি ত বলি নি যে কেউ তাঁকে দিয়ে করাচ্ছে এই সব। মশাই কি জানেন না যে তিনি তাদের দলে গেছেন নিজের ইচ্ছায়?'

'কে গেছে?'

'আন্দ্রি কর্তা।'

'কোথায় গেছে?'

'গেছেন ওদের দলে; তিনি ত এখন একেবারে ওদের।'

'মিথ্যে কথা, শুয়োরের কান কোথাকার!'

'মিথ্যে বলব তাই হয় কখনও? আমি কি নির্বোধ যে মিথ্যে বলব? মিথ্যে বলে মাথা খোয়াব? আমি কি জানি না যে মশাইয়ের সামনে মিথ্যে বললে ইহুদীর ফাঁসি হয় কুকুরের মতো?'

'তুই তাহলে বলতে চাস যে, সে বিকিয়ে দিয়েছে তার দেশ আর ধর্মকে?'

'আমি ত বলি নি তিনি কিছু বিকিয়ে দিয়েছেন; আমি শুধু বলেছি যে তিনি ওদের দলে চলে গেছেন।'

'মিথ্যে কথা, ইহুদী শয়তান! খ্রীষ্টান জগতে এ হতেই পারে না! তুই মিথ্যে বলছিস, কুত্তা!'

'আমার বাড়ির চৌকাঠে যেন দুকোঘ গজায় যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি! লোকে যেন থুতু দেয় আমার বাবার, আমার মা'র, আমার শ্বশুরের, আমার বাবার বাবার, আমার মা'র বাবার কবরে, যদি আমি মিথ্যে বলে থাকি। প্রভু যদি চান ত আমি একথাও বলতে পারি কেন গেছেন তিনি ওদের দলে।'

'কেন?'

'শাসনকর্তার আছে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। ভগবানের দিব্যি, কী আশ্চর্য সুন্দরী!'

এই বলে ইহুদী তার সাধ্যমতো চেষ্টা করল তার ভাবভঙ্গি দিয়ে এই সৌন্দর্য প্রকাশ করতে; হাত ছড়িয়ে দিল, চোখ মিটমিট করল, মুখ বাঁকাল, ভাব করল যেন এক পরম সুস্বাদ কিছুর আস্বাদ সে নিচ্ছে।

'কিন্তু তাতে হল কী?'

'তার জন্যেই তিনি সবকিছু করেছেন, চলে গেছেন। মানুষ প্রেমে পড়লে হয়ে যায় যেন জুতোর তলা — জলে ভিজিয়ে যেদিকে দোমড়াও, সেইদিকেই দোমড়াবে।'

বুলবা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁর মনে পড়ল দুর্বল নারীর শক্তি বড় ভয়ানক। অনেক শক্তিমান পুরুষকে তা ধ্বংস করেছে, আর আন্দ্রির স্বভাবে আছে এই দিকে প্রবণতা; বহুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়, যেন মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে।

'শুনুন কর্তা, কর্তাকে আমি সবই বলছি,' ইহুদী বলতে লাগল। 'আমি যেই হট্টগোল শুনলাম আর দেখলাম শহরের ফটকে সৈন্যরা ঢুকছে, অমনি কাজে লাগতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি সঙ্গে নিলাম একছড়া মুক্তা, কারণ সুন্দরী ও অভিজাত মহিলারা আছেন শহরে, আর যেখানেই সুন্দরী ও অভিজাত মহিলারা আছেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, সেখানেই মুক্তা কেনা হবে, পেটে খাবার কিছু না জুটলেও। অধিনায়কের চাকর-বাকররা আমাকে ছেড়ে দিতে না দিতেই আমি দৌড় দিলাম শাসনকর্তার প্রাঙ্গণে মুক্তা বিক্রির উদ্দেশ্যে। সব খোঁজ করলাম এক তাতারনী দাসীর কাছে। 'শিগগিরই বিয়ে হবে, নীপার-কসাকদের তাড়িয়ে দেবার পরই। আন্দ্রি কর্তা প্রতিজ্ঞা করেছেন নীপার-কসাকদের তাড়িয়ে দেবেন।'

'আর তুই সেখানেই মেরে ফেলতে পারলি না তাকে, সেই কুত্তার বাচ্চাকে?' চেঁচিয়ে উঠলেন বুলবা।

'কেন মারব? তিনি চলে গেছেন স্বেচ্ছায়। কী অন্যায়টা করেছেন? তাঁর পক্ষে সেখানটা ভালো, তাই তিনি গেছেন।'

'তুই তাকে দেখেছিস মুখোমুখি?'

'ঈশ্বরের দিব্যি, দেখেছি! কী জাঁক তার! সকলের চেয়ে জমকাল। ভগবান তাঁর ভালো করুন তিনি দেখেই আমায় চিনতে পারলেন; আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন...'

'কী বললে সে?'

'তিনি বললেন, — না, প্রথমে আঙুল নেড়ে ডাকলেন, পরে বললেন, 'ইয়ান্‌কেল!' আমি বললাম, 'আন্দ্রি কর্তা!' 'ইয়ান্‌কেল, গিয়ে বলো বাবাকে, বলো ভাইকে, বলো সব কসাকদের, সব নীপার-কসাকদের, সকলকে বলো যে বাবা — আর আমার বাবা নয়; ভাই — ভাই নয়; সাথী — সাথী নয়; বলো আমি লড়ব তাদের সকলের সঙ্গে; সকলের সঙ্গে লড়ব!'

'মিথ্যে কথা, শয়তান জুডাস!' রাগে আত্মবিস্মৃত হয়ে গর্জে উঠলেন তারাস। 'মিথ্যে বলছিস, তুই কুত্তা; তুই খ্রীষ্টকেও ক্রুশবিদ্ধ করেছিলি, ভগবানের অভিশপ্ত শয়তান কোথাকার! তোকে আমি খুন করব, শয়তান! চলে যা এখান থেকে, নয়ত — এখানে থাকলে তোর মৃত্যু!' এই বলে তারাস তাঁর তলোয়ার টেনে বার করলেন।

সন্ত্রস্ত ইহুদী তখনই দৌড় দিল, যত জোরে তার শুকনো সরু ঠ্যাং তাকে টানতে পারে তত জোরে। বহুক্ষণ সে দৌড়াল, পিছনে না ফিরে, কসাক-শিবিরের ভিতর দিয়ে, উন্মুক্ত প্রান্তরের বহু দূর পর্যন্ত, যদিও তারাস একদম তাকে তাড়া করেন নি, হাতের কাছে যাকে পাওয়া গেল তারই উপর ক্রোধ প্রকাশের নির্বুদ্ধিতা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তাঁর মনে পড়ল যে আগের রাতে তিনি আন্দ্রিকে শিবিরের ভিতর দিয়ে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেতে দেখেছেন; তাঁর সাদা মস্তক নুয়ে পড়ল, তবুও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এমন লজ্জাকর ঘটনা ঘটতে পারে, তাঁর নিজের সন্তান তার ধর্ম ও আত্মা বিক্রয় করে বসবে।

অবশেষে তিনি তাঁর রেজিমেণ্টকে ওত পাতার কাজে পরিচালনা করলেন, তাদের সঙ্গে গা ঢাকা দিলেন সেই একটিমাত্র বনের অন্তরালে যেটিকে কসাকরা তখনও পোড়ায় নি। এদিকে নীপার-কসাকরা, পদাতিক ও অশ্বারোহী, তিনটি পথে অগ্রসর হল তিনটি ফটকের দিকে। একের পরে এক চলল কুরেনরা: উমান্‌, পোপোভিচ্‌, কানেভ্‌, স্তেবলিকিভ্‌,

নেজামাই, গুরগুজ, তিতারেভ্‌কা, তিমোশেভ্‌কা। ছিল না একমাত্র পেরেয়াস্লাভ্‌ কুরেন। এই কুরেনের কসাকেরা ভোদ্‌কা পান করেছিল অতিমাত্রায় এবং তাতেই ডুবিয়ে দিয়েছে তাদের ভাগ্য। কেউ কেউ জাগল শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে, কেউ কেউ মোটে জাগল না, ঘুমন্ত অবস্থাতেই ভিজে মাটির তলে চলে গেল; সেনাপতি খ্লিব্‌ স্বয়ং দেখলেন সালোয়ার ও আংরাখাবিহীন অবস্থায় পোলীয় শিবিরে তিনি নিজে বন্দী।

কসাকদের গতিবিধির খবর শহরেও শোনা গেল। সকলে ভিড় করে এসে জুটল দুর্গপ্রাকারে; কসাকরা দেখল এক জীবন্ত চিত্র: প্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে পোলীয় বীরেরা। সৌন্দর্যে এক যেন আর এককে ছাড়িয়ে গেছে। রাজহাঁসের মতো সাদা পালকে সাজানো পিতলের শিরস্ত্রাণ ঝলসাতে লাগল সূর্যের মতো। অনেকের মাথায় গোলাপী অথবা নীল রঙের ছোট হালকা টুপি, টুপির চূড়া একপাশে হেলানো; পরনে কামিজ, পিঠের দিকে ঝোলানো তাদের আস্তিন, তাতে সোনার সেলাইয়ের অথবা কেবলই জড়ানো ফিতের কাজ, কয়েকজনের তলোয়ার ও বন্দুকের হাতলে মূল্যবান শিল্পের সাজ, অনেক দাম দিয়ে কেনা। অন্যান্য নানা ধরনের বিলাস-সজ্জার এখানে প্রাচুর্য। সকলের সামনে দর্পিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন বুদ্‌জাকির কর্নেল, মাথায় তাঁর লাল টুপি, তাতে সোনালী সাজ। কর্নেল আকারে বৃহৎ, সকলের চেয়ে স্থূলকায় ও দীর্ঘাকৃতি, তাঁর দামী প্রশস্ত কামিজেও তাঁকে প্রায় কুলাচ্ছিল না। অন্যদিকে, পাশের ফটকের প্রায় কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্য একজন কর্নেল — ছোটখাটো শীর্ণকায় একটি মানুষ, বিস্তৃত ঘন ভ্রূর তল থেকে ছোট ছোট তীক্ষ্ন চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। ক্ষিপ্রগতিতে তিনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের আদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর শুষ্ক শীর্ণ হাতের নির্দেশে; স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেহের ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও সমরবিজ্ঞানে তিনি খুবই অভিজ্ঞ। তাঁর অনতিদূরে দাঁড়িয়ে ছিল এক অধিনায়ক, খুব ঢ্যাঙা, ঘন গোঁফ, তার মুখে রঙের ঘটা দেখলেই বোঝা যায় সে ভালোবাসে কড়া মাধ্বী আর উৎকৃষ্ট ভোজ। তার পিছনে অনেক অভিজাত, তারা সকলেই সুসজ্জিত, কেউ নিজের অর্থে, কেউ রাজভাণ্ডার থেকে, কেউ কেউ ইহুদীদের অর্থে তাদের পৈতৃক বাসভবনে যা কিছু ছিল তা বন্ধক রেখে। দাম্ভিক সেনেটারদের আশ্রিত অন্নভোজীর সংখ্যাও কম ছিল না, ভোজসভায় এদের ডাকা হত অধিকতর জাঁকজমক দেখানোর জন্য; সেখানে টেবিল বা তাক থেকে এরা চুরি করত রুপার পানপাত্র, দিনের

আড়ম্বর শেষ হলে অভিজাতবর্গের গাড়ি চালাত চালকের আসনে বসে। অনেক রকমের লোকেই ছিল এখানে। অনেকে ছিল যাদের হাতে একমাত্র মদের দামও ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের জন্য সকলেই সুসজ্জিত।

কসাক বাহিনী নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল শহরের প্রাকারের সামনে। তাদের সাজসজ্জায় সোনার চিহ্ন নেই, নিতান্ত কোন তলোয়ার বা বন্দুকের হাতলে ছাড়া। যুদ্ধের সময় সাজের ধনাধিক্য কসাকরা পছন্দ করত না; তাদের লৌহবর্ম ও দেহাবরণ ছিল সাদাসিধে; তাদের কালো টুপি মেষচর্মের, তার লাল চূড়া বহু দূর পর্যন্ত লাল-কালো রঙে বিস্তৃত হয়ে গেছে।

কসাক সৈন্যদল থেকে অগ্রসর হয়ে গেল দু'জন অশ্বারোহী — অখ্‌রিম নাশ্‌ ও মিকিতা গোলোকোপিতেন্‌কো; একজন খুবই তরুণ, অপরটি বয়স্কতর; দু'জনেরই কথায় খুব ধার, কাজেও তারা কম জোরালো কসাক নয়। তাদের ঠিক পিছনে চলল মোটাসোটা কসাক দেমিদ পোপোভিচ্‌, অনেকদিন ধরে সে সেচের অধিবাসী, আদ্রিয়ানোপলের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে: প্রায় তাকে পুড়িয়েই মেরে ফেলা হচ্ছিল, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল সেচে, পোড়া কালো মাথা ও ঝলসানো গোঁফ নিয়ে। কিন্তু পোপোভিচের দেহ আবার মাংসল হয়েছে, মাথার চুল আবার ঝুলে পড়েছে কানের পাশে, আবার গোঁফ হয়েছে পিচের মতো কালো। পোপোভিচের প্রতিটি কথাও কামড়ে ভরা।

'বাঃ, গোটা ফৌজই ত বেশ লাল পোশাকের, কিন্তু জানতে চাই, ভেতরে তাদের লাল রক্ত আছে ত?'

'দেখাচ্ছি দাঁড়া!' উপর থেকে হাঁকলেন মোটা কর্নেল। 'দড়ি দিয়ে বাঁধব তোদের সকলকে! ওরে গোলামের দল, দিয়ে দে তোদের বন্দুক আর ঘোড়া। দেখিস নি, কেমন করে বেঁধেছি তোদের সাথীদের? নিয়ে আয় ত নীপার-কসাকগুলোকে এখানে, ওরা দেখুক।'

দড়ি দিয়ে বাঁধা নীপার-কসাকদের আনা হল। তাদের অগ্রভাগে কুরেন সেনাপতি খিব্রব্‌, পরনে সালোয়ার, আংরাখা কিছুই নেই — ঠিক এই অবস্থায় তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল মত্ত ঘুমের ঘোরে। তাঁর নিজের কসাকদের সামনে নগ্নদেহ দেখাতে হল এবং নিদ্রার মধ্যে কুকুরের মতো বন্দী হতে হয়েছে বলে সেনাপতির মাথা মাটিতে নুয়ে পড়ল। একরাতে তাঁর চুল সাদা হয়ে গেছে।

'দুঃখ করো না, খিব্রব্! আমরা তোমাকে ফিরিয়ে আনব!' নীচে থেকে চিৎকার করল কসাকরা।

'দুঃখ করো না, বন্ধু!' ডেকে বললেন কুরেন সেনাপতি বোরোদাতি, 'তোমাকে ন্যাংটা অবস্থায় ধরেছে এটা তোমার দোষ নয়। দুর্ভাগ্য ত যে কোন লোকেরই হতে পারে; কিন্তু লজ্জা পাওয়া উচিত তাদের, যারা তোমাকে লজ্জা দেবার জন্য সকলের সামনে হাজির করেছে এই অবস্থায় — ন্যাংটা শরীর ঢেকে দেবার মতো ভদ্রতার বালাই যাদের নেই।'

'ঘুমন্ত লোকের সঙ্গে লড়াইয়ে তোমাদের বাহাদুরি ত চমৎকার!' প্রাকারের দিকে তাকিয়ে বলল গোলোকোপিতেন্‌কো।

'দাঁড়া না একটু, সব ঝুঁটি কেটে নেব তোদের!' উপর থেকে চিৎকার এলো।

'দেখতে চাই কেমন করে ঝুঁটি কাট!' পোপোভিচ্ বলল ঘোড়া ঘুরিয়ে। তারপর কসাকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হতেও পারে; হয়ত পোল ঠিক কথাই বলছে। ঐ ভুঁড়ো-পেট যদি তোদের চালায়, তাহলে ওদের সকলেরই চমৎকার আত্মরক্ষার সুযোগ হবে।'

কসাকরা বুঝল ইতিমধ্যে পোপোভিচ্ নিশ্চয়ই কিছু ঠাট্টা শানিয়ে রেখেছে, তাই প্রশ্ন করল, 'কিসে তুমি ভাবলে যে তারা সকলেই বেশ রক্ষা পাবে?'

'কেন না, ওর পেছনে লুকোতে পারে গোটা সৈন্যদলটা। সব অস্ত্রই ওর ভুঁড়িতে আটকে যাবে, আর কারও গায়ে লাগবে না!'

কসাকরা সবাই হেসে উঠল। অনেকে অনেকক্ষণ ধরে মাথা দোলাল, বলল, 'খাসা, পোপোভিচ্, খাসা! ওর যা কথা তাতে...' 'তাতে' যে কী, তা কসাকরা আর বলার সময় পেল না।

'চলে এসো, চলে এসো দেয়াল থেকে!' ক্যাম্প-সর্দার চেঁচিয়ে উঠলেন। কারণ, মনে হল পোলরা কথার কামড় সহ্য করতে পারছে না, কর্নেল তাঁর হাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কসাকরা পিছাতে না পিছাতে প্রাকার থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হল। প্রাকারে চাঞ্চল্য দেখা গেল, পক্ককেশ শাসনকর্তা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ফটক খুলে গেল, বেরিয়ে এলো সৈন্যদল। পুরোভাগে চলল সুন্দর পোশাকে হুসারেরা, একই রকমের ঘোড়ায় সার বেঁধে। তাদের পিছনে লৌহবর্মাবৃত সৈন্যদল; তার পরে বর্শাধারী বর্মাবৃত অশ্বারোহিদল;

তার পরে পিতলের শিরস্ত্রাণ পরা একটি দল; সকলের পিছনে পৃথক পৃথক ভাবে বিশিষ্ট অভিজাতেরা চললেন অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যেকে নিজের রুচিমতো সাজে সেজে। অহংকারী এই অভিজাতেরা সৈন্যদলের সঙ্গে একত্রে যাচ্ছিলেন না। যাদের অধীনে সৈন্যদল ছিল না তারা আলাদা চলল নিজের পরিচারকবর্গ নিয়ে। তাদের পরে আবার সৈন্যের দল; তাদের পিছনে অধিনায়ক; তার পিছনে আবার সৈন্যদল, ও অশ্বপৃষ্ঠে স্থূলকায় কর্নেল; সকলের পিছনে ক্ষুদ্রকায় কর্নেলটি।

'সার বাঁধতে দিও না ওদের, দিও না!' চেঁচিয়ে বললেন ক্যাম্প-সর্দার। 'সব কুরেন একসঙ্গে আক্রমণ কর ওদের! অন্য ফটক সব ছেড়ে এসো। তিতারেভ্‌কা কুরেন, চড়াও হও এক পাশটায়! দ্যাদ্‌কিভ্‌ কুরেন, চড়াও হও অন্য পাশে! কুকুবেন্‌কো ও পালিভোদা, হামলা কর ওদের পিছনদিকে। ভেঙে দাও, ভেঙে দাও ওদের সার, তছনছ করে দাও!'

চতুর্দিকে আক্রমণ করল কসাকরা। সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করে বিশৃংখল করে দিল, নিজেরাও তাদের মধ্যে প্রবেশ করল। শত্রুকে তারা গুলিবর্ষণের অবকাশ দিল না। যুদ্ধ চলল অসি ও বর্শায়। সকলেই হয়ে উঠল যূথবদ্ধ, প্রত্যেকেই সুযোগ পেল নিজেকে জাহির করার। দেমিদ্‌ পোপোভিচ্‌ তিনটি সাধারণ সৈনিককে বর্শাবিদ্ধ করল, দু'জন বিশিষ্ট অভিজাতকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল; বলল, 'কী চমৎকার ঘোড়া! আমি অনেককাল থেকে খুঁজছি এমন ঘোড়া!' — এই বলে সে ঘোড়াদুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল দূরে মাঠের মধ্যে, সেখানে যে কসাকরা দাঁড়িয়ে ছিল চিৎকার করে তাদের বলল, 'এদের চৌকি দাও।' আবার সে ফিরে এলো তার দলে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতলে পতিত অভিজাতদের উপর, একজনকে হত্যা করল, অন্য জনের গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঘোড়ার জিনে বেঁধে, টেনে নিয়ে গেল সারা মাঠ, কেড়ে নিল তার দামী হাতলের তলোয়ার ও কোমরবন্ধে ঝোলানো মোহর-ভরা থলি। তরুণ ও জবরদস্ত কসাক কোবিতাও যুদ্ধে লেগে গেল পোলীয় যোদ্ধাদের মধ্যে সাহসিকতম একজনের সঙ্গে, বহুক্ষণ ধরে চলল তাদের সংগ্রাম। ক্রমে তা হাতাহাতিতে এসে পৌঁছল। শেষ পর্যন্ত কসাক তার শত্রুকে হারিয়ে দিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিল ধারাল তুর্কী ছুরি; কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা করতে পারল না। ঠিক তখনই তার রগে এসে বিঁধল উত্তপ্ত গুলি। তাকে বধ করল এক উঁচু শ্রেণীর পোলীয় অভিজাত, পোলীয় বীরদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন, প্রাচীন রাজবংশের এক সন্তান। পপলার

গাছের মতো সুগঠিত এই লোকটি তার ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিল। রাজবংশের উপযুক্ত অনেক বীরত্বের নিদর্শন সে ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে: দু'জন নীপার-কসাককে কেটে দু'খণ্ড করেছে; জবরদস্ত কসাক ফিওদর কোর্জকে তার ঘোড়াসমেত ভূপাতিত করে, ঘোড়াকে গুলিবিদ্ধ করেছে এবং ঘোড়ার তলে বর্শাবিদ্ধ করেছে কসাককে; অনেক কসাকের মাথা ও হাত সে কেটেছে; এখন কোবিতা কসাককে হত্যা করল রগে গুলি চালিয়ে দিয়ে।

'এই লোকটার সঙ্গেই আমি লড়তে চাই!' গর্জে উঠলেন নেজামাই-কুরেনের সেনাপতি কুকুবেন্‌কো। ঘোড়াকে খোঁচা দিয়ে তিনি পিছন থেকে ক্ষিপ্ত বেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এমন প্রবল ও অমানুষিক গর্জন করে উঠলেন যে চারপাশের সৈন্যরা চমকে উঠল। পোলীয় যোদ্ধা তার ঘোড়া ঘুরিয়ে আক্রমণকারীর মুখোমুখি হতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ঘোড়া বশ মানল না: বীভৎস চিৎকারে চমকে গিয়ে একপাশে লাফিয়ে গেল, কুকুবেন্‌কোর বন্দুকের গুলি গিয়ে আঘাত করল যোদ্ধাকে। গুলি গিয়ে লাগল স্কন্ধাস্থিতে, ঘোড়া থেকে পড়ে গেল সে। কিন্তু তবু হার মানল না, শত্রুকে আঘাত করতে তখনও সে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তরবারির ভারে দুর্বল হাত তার নুয়ে পড়ল। আর কুকুবেন্‌কো তাঁর ভারী তরবারি দুই হাতে তুলে একেবারে তার বিবর্ণ মুখের ভিতর চালিয়ে দিলেন। কুকুবেন্‌কোর সে তরবারি দুইটি চিনির ডেলার মতো সাদা দাঁত উপড়ে দিয়ে, জিভ দু'ভাগ করে, কণ্ঠনালী ছিন্ন করে, মাটির মধ্যে ঢুকে গেল অনেকখানি। এইভাবে শীতল ভূমিতলে সে চিরকালের মতো বিদ্ধ হল। নদীতীরে লালিত বন্য গোলাপের মতো লাল তার রাজবংশীয় রক্ত ঝরনার মতো ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে রাঙিয়ে দিল তার সোনালী কারুকাজ করা হলুদ রঙের কামিজ। কুকুবেন্‌কো ইতিমধ্যে তাকে ছেড়ে নিজের অনুচরদের নিয়ে পথ কেটে গিয়ে পড়েছেন অন্য এক দঙ্গলে।

'আরে আরে, এমন দামী সাজগোজ পড়ে রইল যে!' বলে উমান্‌ কুরেনের সেনাপতি বোরোদাতি নিজের দল ছেড়ে চলে এলেন যেখানে পড়ে ছিল কুকুবেন্‌কোর হাতে নিহত পোলীয় বীর। 'আমি নিজের হাতে সাতজন অভিজাতকে মেরেছি, কিন্তু এমন সাজগোজ তাদের কারও গায়ে ছিল না।'

লোভ বোরোদাতিকে পেয়ে বসল: নত হয়ে তিনি এই মূল্যবান সমর-সজ্জা খুলতে লাগলেন, টেনে বার করলেন তুর্কী ছুরি, নানারঙের উজ্জ্বল

মণিমাণিক্যে তা সুসজ্জিত, কোমরবন্ধ থেকে খুলে নিলেন টাকার থলি, বুকের কাছ থেকে বার করলেন থলি, তাতে ছিল সূক্ষ্ম সাদা বস্ত্রখণ্ড, দামী রূপার জিনিস আর সযত্নে রক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন — কুমারীর অলকগুচ্ছ। কিন্তু পিছন থেকে তাঁর দিকে যে ছুটে আসছে সেই লাল-নাক অধিনায়কটি তা তাঁর খেয়াল হল না; এই লোকটিকেই তিনি এর আগে ঘোড়া থেকে এমন আঘাত করে ফেলে দিয়েছিলেন যা সহজে ভোলার নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে তরবারি দুলিয়ে অধিনায়ক তাঁর ঝুঁকে পড়া কাঁধের উপর আঘাত করল। কসাকের লোভ তাঁর সর্বনাশ করল: তাঁর পরাক্রান্ত মাথা ছিটকে পড়ল, মাটিতে পড়ে গেল মুণ্ডহীন দেহ, বহুদূর পর্যন্ত রক্তে ভরে গেল চারদিক। সবল শরীর এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে হল বলে বিস্মিত সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ আর বিষণ্ণ এক কঠোর কসাক-আত্মা উড়ে গেল ঊর্ধ্বপথে। কসাক-সেনাপতির মাথা ঘোড়ার জীনে বাঁধার উদ্দেশ্যে অধিনায়ক তাঁর ঝুঁটি ধরার আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হল এক কঠোর দণ্ডদাতা।

যেমন আকাশে বাজপাখি তার সবল ডানা ঝাপটে বিশাল চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় বাতাসে স্থির হয়ে থাকে, তার পর তীরবেগে আক্রমণ করে পথের ধারে শব্দায়মান কোন এক ভারুই পাখিকে, তেমন করে বুলবার পুত্র অস্তাপ অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল অধিনায়কের উপর, ছুঁড়ে দিল তার গলায় দড়ির ফাঁস। নির্দয় ফাঁস যতই কণ্ঠে কঠিন হয়ে বসতে লাগল ততই অধিনায়কের রক্তিম মুখ আরও রক্তিম হয়ে উঠল; পিস্তল টেনে বার করল সে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত স্নায়ুর জন্য হাতের লক্ষ্য ঠিক হল না, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তার জিন থেকে অস্তাপ তখনই খুলে নিল রেশমী দড়ি, যেটা অধিনায়কের সঙ্গে থাকত বন্দীদের বাঁধার জন্য, তারই দড়ি দিয়ে তার হাতপা বেঁধে অস্তাপ দড়ির মুখ ঘোড়ার জিনে লাগিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল রণক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে, এবং উমান্‌-কুরেনের সব কসাককে চিৎকার করে ডাকতে লাগল তাদের সেনাপতিকে শেষ সম্মান দেখানোর জন্য।

উমান্‌-কসাকরা যখনই শুনল যে তাদের সেনাপতি বোরোদাতি আর জীবিত নেই, অমনি তারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে ছুটে গেল তাঁর দেহ উদ্ধারের চেষ্টায়, এবং সেই মুহূর্তেই আলোচনা করতে লাগল কাকে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করতে হবে। পরিশেষে তারা বলল:

'কী দরকার আলোচনায়? বুলবার ছেলে অস্তাপের চেয়ে ভালো

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল। শিল্পী ফিওদর মলের-এর আঁকা প্রতিকৃতি।

সরোচিন্‌ৎসি জনপদের এই বাড়িতে ১৮০৯ সালের ২০ মার্চ নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল জন্মগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকচিত্র।
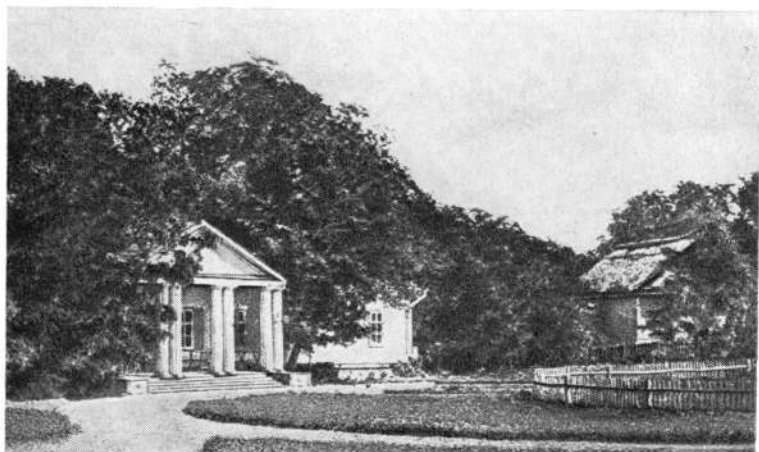
নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগলের পৈতৃক তালুক ভাসিলিয়েভ্‌কা। এখানে লেখকের শৈশব অতিবাহিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকচিত্র।

'আজও প্রায়ই ছেলেবেলার কথা আমার মনে পড়ে...' নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল। ১৮৩৩ সালের ২ অক্টোবর তারিখে মা'র কাছে লেখা চিঠি থেকে।

লেখকের পিতৃদেব ভাসিলি আফানাসিয়েভিচ গোগল। অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। ক্যানভাস, তেলরঙ।

লেখকের মাতৃদেবী মারিয়া ইভানভ্‌না গোগল। অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। ক্যানভাস, তেলরঙ।

জিমনাসিয়ামের ছাত্র নিকোলাই গোগল। অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা ছবির ভিত্তিতে খোদাইকাজ। ১৮২৭ সাল।

'...সেই সময়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা যখন আমার শুরু হয়... লেখক হওয়ার চিন্তা আমার কখনই মাথায় আসে নি, যদিও আমার সব সময়ই মনে হত যে আমি একজন বিখ্যাত লোক হব।' নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল: 'লেখকের স্বীকারোক্তি'।

নেজিন্‌স্ক্ উচ্চ বিজ্ঞান-জিমনাসিয়াম। জলরঙ। শিল্পী ভিজেল. উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক।

ВЕЧЕРА
НА ХУТОРѢ
БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.
ПОВѢСТИ,
Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1831.
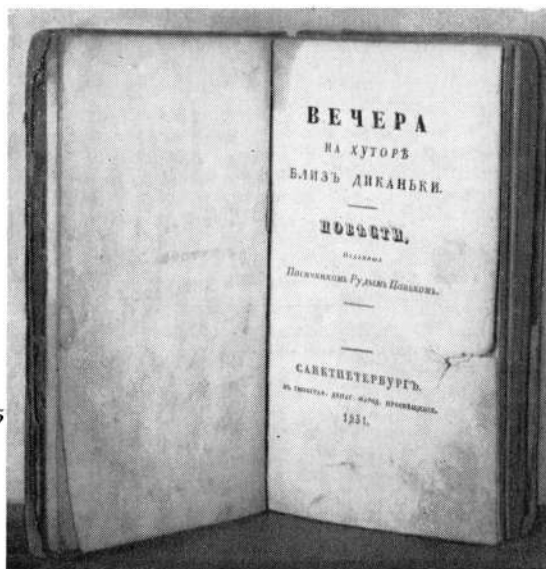
নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল: 'দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা'। প্রথম সংস্করণ। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৩১ সাল।

''দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা' এখন পড়ে শেষ করলাম। আমাকে বিস্মিত করেছে। একেই বলে যথার্থ আনন্দোচ্ছ্বাস — আন্তরিক, অকপট, কোন ভান নেই, চাল নেই। আর জায়গায় জায়গায় কী কাব্যরস!' আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল: 'তারাস বুলবা'। অঙ্গসজ্জা ইয়েভ্গেনি কিব্রিক। অটোলিথোগ্রাফ, ১৯৪৫ সাল।
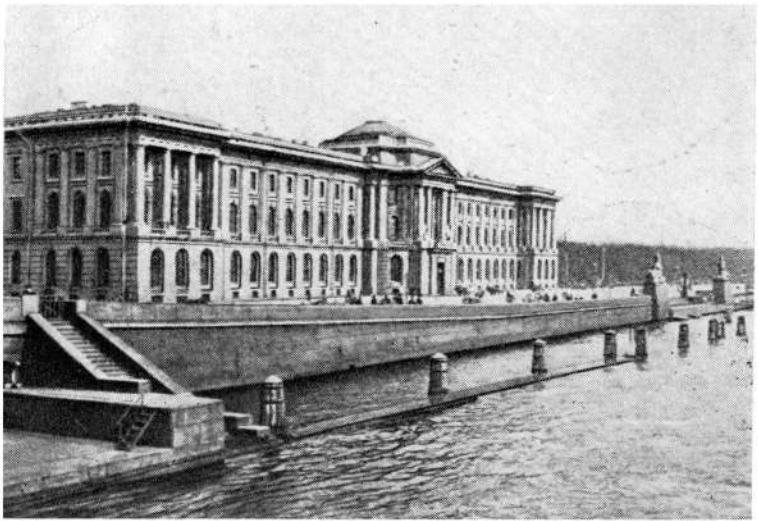
চারুকলা একাডেমী, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর লিথোগ্রাফ।
'...পাঁচটার সময় চারুকলা একাডেমীতে ক্লাস করতে যাই। সেখানে আমি চিত্রকলা চর্চা করি। এ কাজ কোন মতেই আমি ছাড়তে পারছি না।' নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল, মা'র কাছে লেখা চিঠি। ১৮৩০ সালের ৪ জুন।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গের আলেক্সান্দ্রিন্স্কি থিয়েটার। গোগল এখানে অভিনেতা হিশেবে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর লিথোগ্রাফ।

'ইউক্রেনের মেলা'। স্টারবার্গের জলরঙ অনুসরণে ভাসিলি তিম্‌মে কৃত লিথোগ্রাফ। ১৮৩৬ সাল।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গ। জেলা দপ্তর। ১৮৩০-১৮৩১ সালে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল এখানে চাকুরী করেন। ১৮৩৪ সালের খোদাইকাজ।
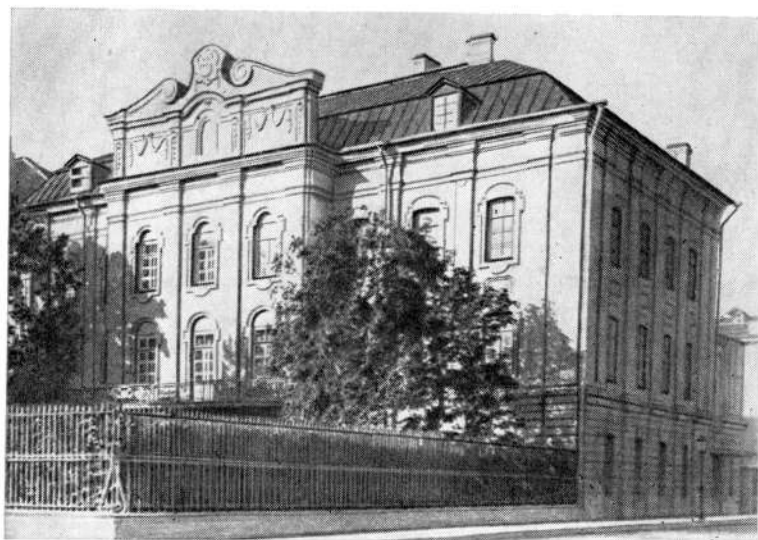
সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৩৪ সালের শরৎকাল থেকে ১৮৩৫ সালের শেষ পর্যন্ত গোগল এখানে সাধারণ ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলোকচিত্র।

গোগলের সারা জীবনের সুহৃদ, তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু আলেক্সান্দর দানিলেভ্স্কি। গোগলের প্রথম জীবনীগ্রন্থকার ভ্যাদিমির শেন্রকের তালিকাভুক্ত স্মৃতিচিত্রের লেখক।

সেন্ট পিটার্সবুর্গের সাধারণ গ্রন্থাগার। লিথোগ্রাফ, ঊনবিংশ শতাব্দী।

আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন। পিওতর সকলোভের আঁকা প্রতিকৃতি। জলরঙ।

'ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল' প্রহসনের নগরপাল। অজ্ঞাতনামা শিল্পীর আঁকা। ১৮৩৫ সালে আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন এই ছবিটি নিকোলাই গোগলকে উপহার দেন।

মস্কোর মালি থিয়েটার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের আলোকচিত্র।
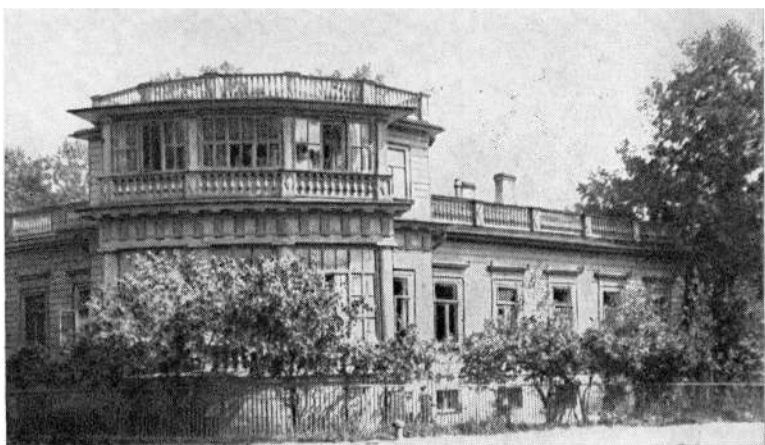
ত্‌সারস্কোয়ে সেলো-তে কিতায়েভার গ্রীষ্মাবাস। ১৮৩১ সালের গ্রীষ্মকালে পুশ্‌কিন এখানে বাস করেন। আলোকচিত্র।

'পুরো গ্রীষ্মকালটা পাভ্‌লোভ্‌স্কে ও ত্‌সারস্কোয়ে সেলো-তে কাটালাম... প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমরা সকলে — আমি, জুকোভ্‌স্কি ও পুশ্‌কিন এক সঙ্গে মিলতাম। ওঃ, তুমি যদি জানতে এই লোকগুলোর কলম থেকে কত চমৎকার চমৎকার জিনিস বেরোয়!' নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল। আলেক্সান্দর দানিলেভ্‌স্কির কাছে লেখা। ১৮৩১ সালের ২ নভেম্বর।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল। আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের আঁকা ছবি, ১৮৩৩ সাল।

আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন। নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগলের আঁকা ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক।

ত্‌সারস্কোয়ে সেলো-র কামেরোনভ গ্যালারী। আলোকচিত্র।

মিখাইল লেরমন্তভ। শিল্পী পিওতর জাবলোৎস্কির আঁকা প্রতিকৃতি। ক্যানভাস, তেলরঙ। পুশ্‌কিনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'কবির মৃত্যু' (১৮৩৭) কবিতার রচয়িতা লেরমন্তভের সঙ্গে গোগলের সাক্ষাৎকার ঘটে ১৮৪০ সালের ৯ মে, মস্কোয়।

কবি ভাসিলি জ্বকোভ্স্কি। পিওতর সকলোভের আঁকা প্রতিকৃতি। জলরঙ।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল। প্রতিকৃতি। শিল্পী আলেক্সেই ভেনেৎসিয়ানভ। লিথোগ্রাফ, ১৮৩৪ সাল।

প্যারিসের ইতালীয় বুলভার।

১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে পুশকিনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ পেলেন গোগল।

'তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটল আমার জীবনের, আমার পরম আনন্দের... আমি যখন রচনাকর্মে রত থাকতাম তখন আমার চোখের সামনে থাকতেন কেবল পুশকিন... আমার মধ্যে ভালো যা কিছু আছে সে সবেরই জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।' নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল, মিখাইল পগোদিনকে লেখা। মার্চ, ১৮৩৭ সাল।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল: 'পোর্ট্রেট'। অঙ্গসজ্জা কন্‌স্তান্‌তিন সোমভ।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল: 'পোট্রেট'। অঙ্গসজ্জা ভিক্তর ভাস্‌নেৎসভ।
কাগজ, ভুষোকালি।

রুশ চিত্রশিল্পীদের একটি দলে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল।
রোম। ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক, আলোকচিত্র।

'মৃত আত্মা' (প্রথম খণ্ড): দ্বিতীয় সংস্করণের মলাট। নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগলের আঁকা ছবির ভিত্তিতে তৈরি।

নিকোলাই গোগল। শেষ প্রতিকৃতি। শিল্পী দ্‌মিত্রিয়েভ-মামোনভের আঁকা ছবির ভিত্তিতে তৈরি লিথোগ্রাফ, ১৮৫২ সাল।

'পুশ্‌কিন ... তাঁর নিজের প্লট আমাকে দিয়ে দেন। এই প্লট থেকে কাব্যধরনের কিছু একটা লেখার বাসনা তাঁর ছিল। তাঁর নিজের কথায়, অন্য কাউকে তিনি এটা দিতেন না। এটা ছিল 'মৃত আত্মা'র প্লট।' নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল: 'লেখকের স্বীকারোক্তি'।

লেখক সের্গেই আক্সাকভ। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের আলোকচিত্র।

মস্কোর উপকণ্ঠবর্তী আব্রাম্‌ৎসেভোর জমিদারীতে আক্সাকভদের বাড়ি। নিকোলাই গোগল প্রায়ই এখানে আতিথ্য স্বীকার করতেন।

নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগলের শেষ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলেক্সান্দ্রা স্মির্নভা-রসেত্তি। শিল্পী আলেক্সেয়েভ অঙ্কিত প্রতিকৃতি। জলরঙ।

কালুগার এই বাড়িতে গোগল বাস করতেন। আলোকচিত্র।

মস্কোর স্ভোরভ্স্কি ব্ল্ভারের ৭ নং বাড়ি। জীবনের শেষ কয়েক বছর নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল এখানে বাস করেন, এখানেই ১৮৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। আলোকচিত্র।

গোগলের স্মৃতিমূর্তি। ভাস্কর: নিকোলাই আন্দ্রেয়েভ।
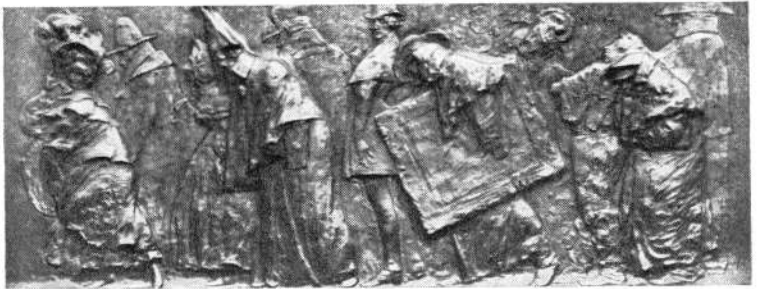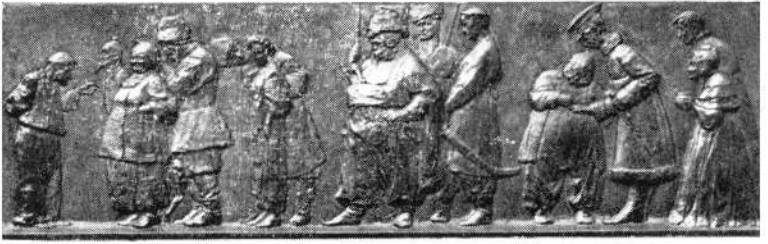
নিকোলাই আন্দ্রেয়েভের তৈরী বেদিস্তম্ভে বাস-রিলিফের কাজ। এতে লেখকের 'তারাস বুলবা', 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ উপাখ্যান', 'ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল' ও 'মৃত আত্মা' রচনার (উপর থেকে নীচে) বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে।
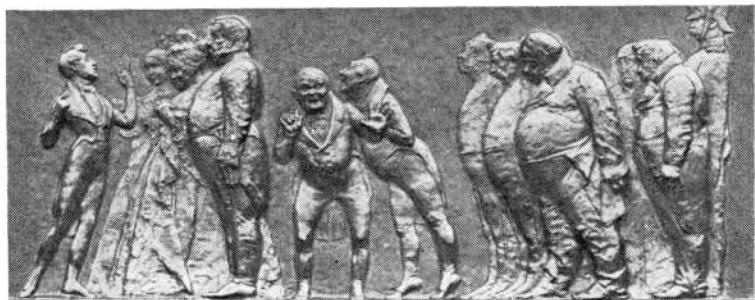
মস্কোয় নভোদেভিচি সমাধিক্ষেত্রে গোগলের সমাধি। গোগলের আবক্ষমূর্তিটির রচয়িতা ভাস্কর নিকোলাই তোম্স্কি।
'আমার চিন্তা, আমার নাম, আমার রচনা রাশিয়ার অধিকারভুক্ত।'
নিকোলাই গোগল।

সেনাপতি কেউ হতে পারে না। এ কথা ঠিক, সে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু বিচারবুদ্ধি তার প্রবীণ লোকের মতো।'

অস্তাপ তার মাথার টুপি খুলে কসাক-বন্ধুদের সকলকে ধন্যবাদ জানাল এই সম্মানের জন্য, তার তরুণ বয়স বা তরুণ বুদ্ধির কারণে আপত্তি জানাল না — সে ভালো করে জানত যুদ্ধের সময়ে এ সবের স্থান নেই; সে তৎক্ষণাৎ তাদের চালিয়ে নিয়ে গেল আক্রমণের মধ্যে, সকলকে দেখিয়ে দিল যে তারা অকারণে তাকে সেনাপতি নির্বাচন করে নি। পোলরা দেখল যে যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের পক্ষে অতীব আশংকাজনক হয়ে উঠছে, অন্য প্রান্তে গিয়ে আবার সজ্জিত হওয়ার জন্য তারা রণক্ষেত্র দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। ক্ষুদ্রকায় কর্নেল হাতের ইঙ্গিতে আদেশ দিল চারটি তাজা স্কোয়াড্রনকে, এদের মোতায়েন রাখা হয়েছিল একেবারে ফটকের কাছে, অন্য সকলের কাছ থেকে পৃথক করে, সেখান থেকে গুলিবর্ষণ হতে লাগল কসাক সৈন্যদের উপর। কিন্তু তাতে বেশি কিছু সুবিধা হল না, গুলি লাগল গিয়ে কসাকদের ষাঁড়গুলির উপর, তারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিল। সন্ত্রস্ত ষাঁড়গুলি সগর্জনে কসাক শিবিরের দিকে ছুটতে লাগল, ভেঙে দিল মালগাড়ি, অনেককে পায়ের তলায় পিষে ফেলল। কিন্তু এই সময়ে তারাস গুপ্তস্থান থেকে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে চিৎকার করে ছুটে এসে তাদের পথ আটকালেন। উন্মত্ত ষাঁড়ের চিৎকারে ভয় পেয়ে পিছনে ঘুরে তাড়া করল পোলীয় সৈন্যদের দিকে, অশ্বারোহীদের ভূপাতিত করে ও সকলকে ধাক্কা দিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দিল।

'ধন্যবাদ, হে ষাঁড়ের দল!' চিৎকার করে উঠল নীপার-কসাকেরা। 'পথে অভিযান করার সময় তোমরা সহায়তা করেছিলে, আবার এখন যুদ্ধের সময়ও সহায়তা করলে!' নতুন শক্তিতে তারা আবার আক্রমণ করল শত্রুকে।

শত্রুদের অনেকে নিহত হল। অনেক কসাক নিজের কৃতিত্ব দেখাল: মেতেলিৎস্যা, শিলো, পিসারেন্‌কো দুই ভাই, ভোভ্‌তুজেন্‌কো এবং আরও অনেকে। পোলরা দেখল যে যুদ্ধের গতি তাদের বিরুদ্ধে, তারা পতাকা উঠিয়ে চিৎকার করতে লাগল ফটক খুলে দেওয়ার জন্য। লোহার দরজা সশব্দে খুলে গেল, ক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত অশ্বারোহিদল ভিড় করে খোঁয়াড়ে-ফেরা ভেড়ার পালের মতো প্রবেশ করতে লাগল। নীপার-কসাকদের মধ্যে অনেকে তাদের পিছনে তাড়া করতে যাচ্ছিল, কিন্তু অস্তাপ তার উমান্‌-কুরেনকে থামিয়ে দিল চিৎকার করে, 'যেও না, দেয়ালের কাছে যেও না, ভাই সব!

ওদের কাছাকাছি যাওয়া ভালো নয়।' ঠিকই বলেছিল সে, কারণ শত্রুরা দেয়াল থেকে গুলিবর্ষণ করতে লাগল, হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তাই ছুঁড়তে লাগল, আক্রমণকারীদের অনেকে আহত হল। তখন ক্যাম্প-সর্দার সেখানে এসে অস্তাপের এই বলে প্রশংসা করলেন, 'নতুন এই সেনাপতি, কিন্তু তার কুরেনকে চালাচ্ছে প্রবীণের মতো।' বৃদ্ধ বুলবা ঘুরে দাঁড়ালেন কে এই নতুন সেনাপতি তা দেখার জন্য, এবং দেখলেন যে উমান্-কুরেনের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন অস্তাপ, তার টুপি একপাশে হেলানো, সেনাপতির গদা তার হাতে। তার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এই ত চাই!' — আনন্দ করে বৃদ্ধ উমান্-কসাকদের ধন্যবাদ দিলেন তাঁর পুত্রকে সম্মানিত করার জন্য।

কসাকরা তাদের শিবিরে ফেরার জন্য পিছিয়ে আসছিল, তখন আবার শহরের প্রাকারে দেখা গেল পোলদের। তাদের সাজ-পোশাক এখন ছিন্নভিন্ন; দামী দামী কামিজে রক্তের দাগ, সুন্দর পিতলের টুপি ধুলায় মলিন।

'কী, আমাদের বাঁধার কি হল হে?' নীচ থেকে চেঁচাল নীপার-কসাকরা।

'দেখাচ্ছি তোদের!' হাতে একটা দড়ি ঘুরিয়ে, উপর থেকে মোটা কর্নেল চেঁচাতে লাগলেন।

ক্লান্ত, ধুলিধূসরিত যোদ্ধারা এইভাবে পরস্পরকে ভয় দেখাতে লাগল, দুই পক্ষের মধ্যে যাদের মাথা বেশি গরম তারা চালাতে লাগল কথার যুদ্ধ।

অবশেষে ফিরে গেল সকলে। কেউ কেউ যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল বিশ্রাম করতে; অন্যেরা তাদের ক্ষতস্থানে মাটি ছড়িয়ে দিল, নিহত শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া দামী রুমাল ও পোশাক ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল। আর যারা সবচেয়ে কম ক্লান্ত তারা মৃতদেহ সংগ্রহ করে তাদের শেষ সম্মান দেখাল। তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে খোঁড়া হল কবর; টুপি ও পোশাকের প্রান্ত দিয়ে আনা হল মাটি; কসাকদের শব সসম্মানে রাখা হল। কাকেরা ও নির্মম ঈগলেরা যাতে চোখে না ঠোকরাতে পারে সেজন্য ঢাকা হল তাজা মাটি দিয়ে। কিন্তু পোলদের শব দশবারোটি একসঙ্গে করে নির্দয়ভাবে বাঁধা হল বন্য ঘোড়ার লেজে, তার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল উন্মুক্ত প্রান্তরে, বহুক্ষণ ধরে তাদের তাড়া করে চাবুক লাগানো হল তাদের পিঠে। ঘোড়াগুলি পাগল হয়ে দৌড়াতে লাগল টিলায় আর গুহায়, নালায় ও ঝরনায়, টেনে বেড়াতে লাগল পোলীয় যোদ্ধাদের রক্তাক্ত, ধুলিময় মৃতদেহ।

তার পর কুরেনগন্লি নানা দলে নৈশাহারে বসল, অনেক রাত পর্যন্ত চলল যন্দ্ধের আলোচনা, কে কী বীরত্ব দেখানোর সন্যোগ পেয়েছিল, কী কী বিষয় ভবিষ্যতে অনন্তকাল গীত হবে। বহন্ক্ষণ জেগে রইল তারা। আরও বহন্ক্ষণ ধরে জেগে বসে রইলেন বৃদ্ধ তারাস, ভাবছিলেন শত্রন্র যোদ্ধাদের মধ্যে আন্দ্রিকে দেখা গেল না কেন। বিশ্বাসঘাতক জন্ডাস কি তার আপন জনের সামনে আসতে লজ্জা পেল, না ইহন্দী মিথ্যা কথা বলেছে, আন্দ্রি বন্দী হয়েছে? কিন্তু তখনই তাঁর মনে পড়ল যে আন্দ্রির অন্তর সহজেই নারীর কথায় ঝন্কে পড়ে; যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে তিনি প্রতিহিংসার শপথ নিলেন সেই পোলীয় তরন্ণীর বিরন্দ্ধে, যে তাঁর পন্ত্রকে মন্ত্রমন্ধ করেছে। তিনি তাঁর শপথ রক্ষা করতে পারতেন; তার রন্পের দিকে দৃকপাত না করে, তার ঘন চুলের বেণী ধরে তাকে সমস্ত রণক্ষেত্রে টেনে বেড়াতেন সব কসাকদের চোখের সামনে। গিরিশিখরে অবস্থিত যে তুষার কোনদিন বিগলিত হয় না সেই তুষারের মতো শন্ভ্র ও উজ্জন্ল তার স্তন আর কাঁধ রক্তাক্ত ও ধন্লিম্লান হয়ে আছাড় খেত মাটিতে; তার অপন্র্ব-সন্দর লাবণ্যময় দেহকে তিনি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করতেন। কিন্তু বন্লবা জানতেন না, ভগবান মানন্ষের জন্য পরের দিন কী ঠিক করে রেখেছেন। নিদ্রাতুর হয়ে তিনি অবশেষে ঘন্মিয়ে পড়লেন।

কসাকরা তখনও নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগল। সারা রাত ধরে আগন্নের ধারে ধারে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পাহারা দিতে লাগল অপ্রমত্ত ও অতন্দ্র প্রহরীরা।

৮

সন্র্য তখনও আকাশের মাঝপথে ওঠে নি, নীপার-কসাকরা সমবেত হল মন্ত্রণার জন্য। সেচ্ থেকে সংবাদ এসেছে যে কসাকদের অনন্পস্থিতিতে তাতাররা সেচ্ লন্ণ্ঠন করেছে, খন্ড়ে বার করেছে তাদের ভূগর্ভস্থ গন্প্তভাণ্ডার, যারা সেখানে অবশিষ্ট ছিল সকলকে হত্যা বা বন্দী করেছে, এবং যত ঘোড়া ও গোরন্র পাল ছিল তাদের নিয়ে সোজা পেরেকোপের পথে চলে গেছে।(*) মাত্র একজন কসাক, মাক্সিম গোলোদন্খা, পথে পলায়ন করেছে তাতারদের হাত থেকে; সে মির্জাকে হত্যা করে, তার কোমরবন্ধ থেকে সেকুইনের থলি খন্লে নিয়ে, তাতার পোশাকে, তাতার ঘোড়ায় চড়ে তার

অনুসরণকারীদের পিছনে ফেলে দেড়দিন ও দু'রাত ছুটিয়েছে; দৌড়ের বেগে ঘোড়া মারা পড়েছে, পথে দ্বিতীয় ঘোড়ায় উঠে বসেছে, হাঁকানোর চোটে সেটাকেও মেরেছে, তারপর তৃতীয়টিতে এসে পেঁৗছেছে নীপার-কসাকদের শিবিরে; পথে সে শুনেছিল যে নীপার-কসাকরা আছে দুব্‌নোর কাছে। এই দুর্ঘটনার সংবাদ দেওয়ার পর অতিরিক্ত শক্তি তার ছিল না; সে বলতে পারল না কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটল, অবশিষ্ট নীপার-কসাকরা কসাক-ধরনে অত্যধিক মদ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় বন্দী হয়েছে কি না, কিংবা কেমন করে তাতাররা সন্ধান পেল সেই গুপ্তস্থানের যেখানে তাদের অস্ত্রভাণ্ডার রক্ষিত থাকত। একান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে, তার সমস্ত শরীর স্ফীত হয়ে উঠেছিল, রোদে ও বাতাসে তার মুখ জ্বলেপুড়ে গেছে; সে তখনই শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।

অনুরূপ অবস্থায় নীপার-কসাকেরা পথে ধরে ফেলার জন্য তৎক্ষণাৎ অপহারকদের পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে; নইলে বন্দীদের হয়ত পাঠিয়ে দেওয়া হবে দাস-বিক্রয়ের বাজারে এশিয়া মাইনরে, স্মির্নায়, ক্রিটদ্বীপে; কোন্ দেশে যে নীপার-কসাকদের মাথার ঝুঁটি দেখা দেবে তা ভগবানই জানেন। এই কারণেই নীপার-কসাকরা এখন সমবেত হল। শেষ মানুষটি পর্যন্ত, সকলেই দাঁড়িয়ে ছিল মাথায় টুপি দিয়ে, কারণ তারা সর্দারের আদেশ গ্রহণ করতে আসে নি, এসেছে পরস্পরের সঙ্গে সমানভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে।

জনতা থেকে কেউ কেউ বলল, 'প্রথমে মোড়লরা উপদেশ দিন!'

'ক্যাম্প-সর্দার উপদেশ দিন!' চিৎকার করল অন্যেরা।

ক্যাম্প-সর্দার মাথার টুপি খুললেন, তিনি বললেন প্রধান হিসাবে নয়, বন্ধু হিসাবে, কসাকদের ধন্যবাদ দিলেন এই সম্মানের জন্য এবং বললেন:

'আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অনেক প্রবীণ এবং পরামর্শের ব্যাপারে বেশ বিজ্ঞ, কিন্তু আপনারা আমাকেই সম্মানিত করেছেন তাই আমার পরামর্শ দিচ্ছি: বন্ধুরা, নষ্ট করার সময় নেই, তাতারদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন, কী ভীষণ লোক এই তাতাররা। তারা আমাদের আসার অপেক্ষায় থাকবে না, তাদের লুঠের সম্পত্তি তারা চোখের পলকে উড়িয়ে দেবে, কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে এই: চল সব। এখানে এক হাত আমরা দেখিয়েছি। পোলেরা বুঝেছে, কসাকরা কি বস্তু; আমাদের সাধ্যমত আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি

আমাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্যে; অন্যদিকে এই ক্ষুধার্ত শহর থেকে বেশি কিছু লাভ হবে না। তাই আমার উপদেশ—চল সব।'

'চল সব!' জাপোরোজীয় কুরেনগুলি সমস্বরে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু এই ধরনের কথা তারাস বুলবার মনঃপূত হল না, তার চোখের উপর আরও নীচু হয়ে নেমে এলো তাঁর ঘন সাদা-কালো ভুরু; ঠিক যেন পর্বতশিখরের ঘন কালো এক ঝোপের উপরে পড়েছে উত্তরদেশের সূচ্যাকার তুষারকণা।

'না, তোমার উপদেশ ঠিক নয়, ক্যাম্প-সর্দার!' তিনি বললেন। 'ঠিক বলছ না তুমি। মনে হচ্ছে, তুমি ভুলে গেছ যে আমাদের লোকেরা বন্দী হয়ে আছে পোলদের হাতে? দেখা যাচ্ছে, তুমি চাও যে, আমরা বন্ধুত্বের প্রথম ও পবিত্র নিয়মকে না মানি: ফেলে রেখে যাই আমাদের কসাক-ভাইদের আর তাদের গা থেকে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছিঁড়ে নেওয়া হোক, তাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে গাড়িতে তুলে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়ানো হোক, যেমন করেছে কম্যান্ডান্টের বেলায় আর ইউক্রেনের সেরা সেরা রুশ যোদ্ধাদের বেলায়। এ ছাড়াও যা কিছুকে আমরা মনে করি পবিত্র, তার অপমান কি এরা কম করেছে? আমরা কী রকম মানুষ? আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সকলকে। সে কেমন কসাক, যে তার সঙ্গীকে ফেলে যায় বিপদে, ফেলে যায় তাকে বিদেশে কুকুরের মতো মরতে? হাল-চাল যদি এমনই হয়ে থাকে যে কসাকদের কাছে কোন মূল্য নেই তাদের আত্মসম্মানের, তাদের সাদা গোঁফে থুতু দিলে বা গালি দিলে তাদের কিছু এসে যায় না, তাহলে তোমরা কেউ আমাকে বকো না। আমি একাই থাকব এখানে!'

দণ্ডায়মান নীপার-কসাকদের সকলের মধ্যে ইতস্তত ভাব দেখা দিল।

ক্যাম্প-সর্দার বললেন, 'কিন্তু তুমি কি ভুলে যাচ্ছ না, বীর সেনাপতি, যে তাতারদের হাতেও আছে আমাদের অনেক বন্ধু, আমরা যদি এখন তাদের উদ্ধার না করি তাহলে তাদের বেচে দেওয়া হবে বিধর্মীদের কাছে আজীবন ক্রীতদাস করে, আর তা নির্দয় মরণের চেয়ে ভয়ংকর? তুমি কি ভুলে গেলে যে তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে আমাদের সব ধনসম্পত্তি, যা খ্রীষ্টানের রক্ত দিয়ে পাওয়া?'

কসাকরা সকলেই চিন্তান্বিত, কেউ জানে না কী বলতে হবে। কারও ইচ্ছা নেই অখ্যাতি অর্জন করার। তখন সামনে এগিয়ে এলেন কাসান

বোভ্‌দ্যুগ, জাপোরোজীয় সৈনিকদের মধ্যে তিনি বয়সে সকলের চেয়ে বৃদ্ধ। তাঁকে সম্মান করে সকল কসাক; তিনি ক্যাম্প-সর্দার নির্বাচিত হয়েছিলেন দু'বার, যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেরা কসাক; কিন্তু অনেকদিন হল তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, কোন অভিযানে যান নি; কাকেও উপদেশ দিতে ভালোবাসতেন না এই বৃদ্ধ যোদ্ধা, তিনি কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন কসাকদের চক্রের পাশে ও শুনতেন তাদের সমরাভিযানের নানা ঘটনা ও বীরত্বের কাহিনী। তাদের কথায় তিনি কখনও যোগ দিতেন না, কেবল শুনে যেতেন, আর আঙুল দিয়ে ছাই টিপতে থাকতেন তাঁর ছোট পাইপটিতে, এ পাইপ কখনও তাঁর মুখ থেকে নামত না; অর্ধ-মুদ্রিত চোখে বহুক্ষণ থাকতেন এইভাবে; কসাকরা বুঝতেই পারত না তিনি নিদ্রিত, না কি সবকিছু শুনছেন। অন্যান্য অভিযানে তিনি বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু এবারে তিনিও না এসে পারলেন না। কসাক-ধরনে হাত দুলিয়ে তিনি বললেন:

'যা হবার হোক! আমিও যাব; হয়ত কসাকজাতির কোন কাজে লেগেও বা যেতে পারি।'

সমাবেশের সামনে তিনি এগিয়ে আসায় কসাকরা সকলে নিস্তব্ধ হল, বহুকাল তারা তাঁকে কোন কথা বলতে শোনে নি। সকলেই জানতে উদ্‌গ্রীব কী বলেন বোভ্‌দ্যুগ।

'ভাই মহাশয়রা, দেখছি এখন আমার পক্ষে কথা বলার সময় হয়েছে!' তিনি শুরু করলেন। 'শোনো, বাচ্চারা, এই বুড়োর কথা। বিজ্ঞের মতো বলেছেন ক্যাম্প-সর্দার, কসাক বাহিনীর নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য একে বাঁচানো এবং এর সম্পদ রক্ষা করা, তাই এর চেয়ে বিজ্ঞতর কথা আর হতে পারে না। এ ঠিক! এই হচ্ছে আমার প্রথম কথা! এখন শোন সবাই আমার দ্বিতীয় কথা। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই: কর্নেল তারাস যা বলেছেন তাতেও গভীর সত্য আছে — ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবন দিন ও ইউক্রেনকে দিন তাঁর মতো অনেক কর্নেল! কসাকের প্রথম কর্তব্য ও প্রথম সম্মান হচ্ছে সৌহার্দ বজায় রাখা। আমার জীবনে, ভাই মহাশয়রা, আমি কখনও শুনি নি যে, কসাক তার সঙ্গীকে ত্যাগ করেছে বা তার বিশ্বাস ভেঙেছে। এখানকার ও ওখানকার সব কসাকই আমাদের বন্ধু: সংখ্যায় বেশি কি কম — তাতে কিছু এসে যায় না, সবাই বন্ধু, সবাই আমাদের প্রিয়জন। তাহলে আমার কথাটি হচ্ছে এই: যাদের কাছে তাতারদের বন্দীরা বেশি প্রিয় তারা যাক তাতারদের পিছনে; আর যাদের কাছে প্রিয় পোলদের বন্দীরা এবং

যারা চায় না ন্যায়পক্ষকে পরিত্যাগ করতে, তারা থাকুক। ক্যাম্প-সর্দার তাঁর কর্তব্য অনুসারে নিয়ে যান অর্ধেক বাহিনী তাতারদের পিছনে, অন্য অর্ধেক নির্বাচন করুক তাদের ভারপ্রাপ্ত নেতা। আর তোমরা যদি সাদা মাথার কথা শুনতে চাও, তাহলে বলি, তারাস বুলবার চেয়ে ভারপ্রাপ্ত নেতা হবার যোগ্যতর কেউ নেই। আমাদের মধ্যে একজনও নেই যিনি সাহসিকতায় তাঁর তুল্য।'

এই বলে বোভ্দ্যুগ থামলেন; কসাকরা সকলেই উল্লসিত হল এই প্রবীণ কসাকের এমন সুবুদ্ধিপূর্ণ উপদেশে। সকলে শূন্যে টুপি ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল:

'তোমায় ধন্যবাদ, বাবা! বহুকাল তুমি চুপচাপ ছিলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার মুখ খুলেছ! মিথ্যা বল নি তুমি, যখন এই অভিযানে যোগ দেবার সময় তুমি বলেছিলে যে হয়ত কসাকদের কাজে লাগবে, তা-ই হল।'

'তাহলে, তোমাদের সকলের সম্মতি আছে?' প্রশ্ন করলেন ক্যাম্প-সর্দার।

'আছে, আছে!' চিৎকার করল কসাকরা।

'তাহলে, সভা শেষ হল?'

'হাঁ, হল!' চিৎকার করল কসাকরা।

'তাহলে শোন এখন, জোয়ানরা, লড়াইয়ের হুকুম!' সামনে এগিয়ে এসে এবং মাথায় টুপি পরে ক্যাম্প-সর্দার বললেন; অন্য নীপার-কসাকরা প্রত্যেকে নিজের টুপি সরিয়ে খোলা মাথায় মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, কোন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উপদেশ দেওয়ার সময় এটাই তাদের প্রথা।

'এখন আলাদা হও, ভাই মহাশয়রা! যে যেতে চায়, সে যাক ডাইনে; যে থাকতে চায়, সে বাঁয়ে! যে দিকে যাবে তাঁর কুরেনের বেশির ভাগ, সেনাপতি যাবেন সেই দিকে; কমের অংশ যদি থাকে, তারা যোগ দিক অন্য কুরেনে।'

শুরু হল পৃথক হওয়া, কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে। কোন কুরেনের বেশির ভাগ গেল যে দিকে, সে দিকে গেলেন সেনাপতি; কমের অংশ যোগ দিল অন্য কুরেনে। দেখা গেল কোন দিকেই কমবেশি প্রায় হল না। থাকতে চাইল: নেজামাই-কুরেনের প্রায় সকলে, পোপোভিচ্-কুরেনের বেশির ভাগ, উমান্-কুরেনের সকলে, কানেভ্-কুরেনের সকলে, স্তেব্লিকিভ্-কুরেনের বেশির ভাগ, তিমোশেভ্কা-কুরেনের বেশির ভাগ। অন্যান্য সব কুরেন তাতারদের পিছনে তাড়া করতে চাইল। দুই দিকেই ছিল অনেক সাহসী

বোভ্‌দ্যুগ, জাপোরোজীয় সৈনিকদের মধ্যে তিনি বয়সে সকলের চেয়ে বৃদ্ধ। তাঁকে সম্মান করে সকল কসাক; তিনি ক্যাম্প-সর্দার নির্বাচিত হয়েছিলেন দু'বার, যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেরা কসাক; কিন্তু অনেকদিন হল তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, কোন অভিযানে যান নি; কাকেও উপদেশ দিতে ভালোবাসতেন না এই বৃদ্ধ যোদ্ধা, তিনি কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন কসাকদের চক্রের পাশে ও শুনতেন তাদের সমরাভিযানের নানা ঘটনা ও বীরত্বের কাহিনী। তাদের কথায় তিনি কখনও যোগ দিতেন না, কেবল শুনে যেতেন, আর আঙুল দিয়ে ছাই টিপতে থাকতেন তাঁর ছোট পাইপটিতে, এ পাইপ কখনও তাঁর মুখ থেকে নামত না; অর্ধ-মুদ্রিত চোখে বহুক্ষণ থাকতেন এইভাবে; কসাকরা বুঝতেই পারত না তিনি নিদ্রিত, না কি সবকিছু শুনছেন। অন্যান্য অভিযানে তিনি বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু এবারে তিনিও না এসে পারলেন না। কসাক-ধরনে হাত দুলিয়ে তিনি বললেন:

'যা হবার হোক! আমিও যাব; হয়ত কসাকজাতির কোন কাজে লেগেও বা যেতে পারি।'

সমাবেশের সামনে তিনি এগিয়ে আসায় কসাকরা সকলে নিস্তব্ধ হল, বহুকাল তারা তাঁকে কোন কথা বলতে শোনে নি। সকলেই জানতে উদ্‌গ্রীব কী বলেন বোভ্‌দ্যুগ।

'ভাই মহাশয়রা, দেখছি এখন আমার পক্ষে কথা বলার সময় হয়েছে!' তিনি শুরু করলেন। 'শোনো, বাচ্চারা, এই বুড়োর কথা। বিজ্ঞের মতো বলেছেন ক্যাম্প-সর্দার, কসাক বাহিনীর নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য একে বাঁচানো এবং এর সম্পদ রক্ষা করা, তাই এর চেয়ে বিজ্ঞতর কথা আর হতে পারে না। এ ঠিক! এই হচ্ছে আমার প্রথম কথা! এখন শোন সবাই আমার দ্বিতীয় কথা। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই: কর্নেল তারাস যা বলেছেন তাতেও গভীর সত্য আছে—ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবন দিন ও ইউক্রেনকে দিন তাঁর মতো অনেক কর্নেল! কসাকের প্রথম কর্তব্য ও প্রথম সম্মান হচ্ছে সৌহার্দ বজায় রাখা। আমার জীবনে, ভাই মহাশয়রা, আমি কখনও শুনি নি যে, কসাক তার সঙ্গীকে ত্যাগ করেছে বা তার বিশ্বাস ভেঙেছে। এখানকার ও ওখানকার সব কসাকই আমাদের বন্ধু: সংখ্যায় বেশি কি কম—তাতে কিছু এসে যায় না, সবাই বন্ধু, সবাই আমাদের প্রিয়জন। তাহলে আমার কথাটি হচ্ছে এই: যাদের কাছে তাতারদের বন্দীরা বেশি প্রিয় তারা যাক তাতারদের পিছনে; আর যাদের কাছে প্রিয় পোলদের বন্দীরা এবং

যারা চায় না ন্যায়পক্ষকে পরিত্যাগ করতে, তারা থাকুক। ক্যাম্প-সর্দার তাঁর কর্তব্য অনুসারে নিয়ে যান অর্ধেক বাহিনী তাতারদের পিছনে, অন্য অর্ধেক নির্বাচন করুক তাদের ভারপ্রাপ্ত নেতা। আর তোমরা যদি সাদা মাথার কথা শুনতে চাও, তাহলে বলি, তারাস বুলবার চেয়ে ভারপ্রাপ্ত নেতা হবার যোগ্যতর কেউ নেই। আমাদের মধ্যে একজনও নেই যিনি সাহসিকতায় তাঁর তুল্য।'

এই বলে বোভ্দ্যুগ থামলেন; কসাকেরা সকলেই উল্লসিত হল এই প্রবীণ কস্যাকের এমন সুবুদ্ধিপূর্ণ উপদেশে। সকলে শূন্যে টুপি ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল:

'তোমায় ধন্যবাদ, বাবা! বহুকাল তুমি চুপচাপ ছিলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার মুখ খুলেছ! মিথ্যা বল নি তুমি, যখন এই অভিযানে যোগ দেবার সময় তুমি বলেছিলে যে হয়ত কসাকদের কাজে লাগবে, তা-ই হল।'

'তাহলে, তোমাদের সকলের সম্মতি আছে?' প্রশ্ন করলেন ক্যাম্প-সর্দার।

'আছে, আছে!' চিৎকার করল কস্যাকরা।

'তাহলে, সভা শেষ হল?'

'হাঁ, হল!' চিৎকার করল কসাকরা।

'তাহলে শোন এখন, জোয়ানরা, লড়াইয়ের হুকুম!' সামনে এগিয়ে এসে এবং মাথায় টুপি পরে ক্যাম্প-সর্দার বললেন; অন্য নীপার-কসাকরা প্রত্যেকে নিজের টুপি সরিয়ে খোলা মাথায় মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, কোন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উপদেশ দেওয়ার সময় এটাই তাদের প্রথা।

'এখন আলাদা হও, ভাই মহাশয়রা! যে যেতে চায়, সে যাক ডাইনে; যে থাকতে চায়, সে বাঁয়ে! যে দিকে যাবে তাঁর কুরেনের বেশির ভাগ, সেনাপতি যাবেন সেই দিকে; কমের অংশ যদি থাকে, তারা যোগ দিক অন্য কুরেনে।'

শুরু হল পৃথক হওয়া, কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে। কোন কুরেনের বেশির ভাগ গেল যে দিকে, সে দিকে গেলেন সেনাপতি; কমের অংশ যোগ দিল অন্য কুরেনে। দেখা গেল কোন দিকেই কমবেশি প্রায় হল না। থাকতে চাইল: নেজামাই-কুরেনের প্রায় সকলে, পোপোভিচ্-কুরেনের বেশির ভাগ, উমান্-কুরেনের সকলে, কানেভ্-কুরেনের সকলে, স্তেব্লিকিভ্-কুরেনের বেশির ভাগ, তিমোশেভ্কা-কুরেনের বেশির ভাগ। অন্যান্য সব কুরেন তাতারদের পিছনে তাড়া করতে চাইল। দুই দিকেই ছিল অনেক সাহসী

ও শক্তিমান কসাক। তাতারদের পিছনে যারা যেতে চাইল তাদের মধ্যে ছিল চেরেভাতি, প্রবীণ জবরদস্ত কসাক, পোকোতিপোলে, লেমিশ্, খোমা প্রোকোপোভিচ্; দেমিদ্ পোপোভিচ্ও যোগ দিল তাদের সঙ্গে, তার প্রকৃতি ছিল অশান্ত—কোনখানেই সে বেশি দিন থাকতে পারত না; সে লড়ে দেখেছে পোলদের সঙ্গে, এখন সে লড়ে দেখতে চায় তাতারদের সঙ্গে। অনেক কুরেন-সেনাপতি: নোস্ত্যুগান, পোক্রশ্কা, নেভিলিচ্কি এবং আরও অনেক বিখ্যাত ও বীর কসাক চাইল তাতারদের সঙ্গে সংঘর্ষে অসির ও পেশীর শক্তি পরীক্ষা করতে। যারা থাকতে চাইল তাদের মধ্যেও শক্তিশালী ও গুণবান কসাক কম ছিল না: কুরেন-সেনাপতি দেমিত্রোভিচ্, কুকুবেন্কো, ভের্তিখ্ভিস্ত্, বালাবান ও বুলবার পুত্র অস্তাপ। আরও অনেক খ্যাতনামা কসাক বীরও রইলেন: ভোভ্তুজেন্কো, চেরেভিচেন্কো, স্তেপান গুস্কা, অখ্রিম গুস্কা, মিকোলা গুস্তি, জাদোরোজ্নি, মেতেলিৎস্যা, ইভান জাক্রুতিগুবা, মোসি শিলো, দেগ্ত্যারেন্কো, সিদোরেন্কো, পিস্যারেন্কো, দ্বিতীয় পিসারেন্কো, তৃতীয় একজন পিসারেন্কো এবং আরও অনেক সেরা সেরা কসাক। তাঁরা সকলেই ভ্রমণে ও অভিযানে অভিজ্ঞ; তাঁরা ঘুরেছেন আনাতোলিয়ার তীরে তীরে, ক্রিমিয়ার লবণাক্ত জলাভূমিতে ও স্তেপে, বড় ও ছোট যে সব নদী এসে পড়ে নীপার নদীতে তার পাড়ে পাড়ে, নীপারের সব খাড়িতে ও দ্বীপে; তাঁরা দেখেছেন মোল্দাভিয়া, ভালাখিয়া ও তুরস্কদেশ; কসাকদের দুই-হাল নৌকোতে তাঁরা কৃষ্ণ সাগর পাড়ি দিয়েছেন; পঞ্চাশটি নৌকো নিয়ে তাঁরা আক্রমণ করেছেন বড় বড় ধনসম্পদভরা জাহাজ, তাদের কালে তুর্কী নৌবলের অনেকগুলি ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং ঢের ঢের গুলিবারুদ ছুঁড়েছেন। কতবার তাঁরা পায়ে জড়ানোর জন্য দামী রেশম ও মখমল ছিঁড়ে টুকরো করেছেন। কতবার তাঁরা চক্চকে সেকুইন দিয়ে ভরেছেন তাঁদের কোমরবন্ধের থলি। অগণিত কত অর্থ তাঁরা ব্যয় করেছেন ভূরিভোজনে ও মদ্যপানে—এ অর্থে অন্যেরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত সারাজীবন। তাঁরা সবই উড়িয়ে দিয়েছেন প্রকৃত কসাক-ধরনে, যাকে পেয়েছেন তাকেই খাইয়েছেন, সঙ্গীতের বাজনা দিয়ে সারা পৃথিবীকে ফুর্তিতে মাতোয়ারা করে তুলতে চেয়েছেন তাঁরা। এমন কি এখনও নীপার দ্বীপের নলখাগড়ার তলে কিছু সম্পত্তি—বাটি, রুপার পেয়ালা, হাতের বালা লুকিয়ে রাখেন নি, এমন লোক তাঁদের মধ্যে খুব কম। যদি, দুর্ভাগ্যক্রমে, কোনদিন তাতাররা অকস্মাৎ সেচ্ আক্রমণ করে তা হলে তারা যাতে এগুলি খুঁজে না পায়

সেজন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাতারদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ, যাদের সম্পত্তি তারা নিজেরাই ভুলতে শুরু করেছিল কোথায় মাটি খুঁড়ে তারা তা লুকিয়ে রেখেছে। বিশ্বস্ত বন্ধুদের ও খ্রীষ্টধর্মের জন্য পোলদের উপর প্রতিশোধ নিতে এই সব কসাকেরা থাকতে চাইলেন! বৃদ্ধ কসাক বোভ্দ্যুগও এদের সঙ্গে থাকতে চাইলেন, বললেন, 'আমার এখন যে বয়স তাতে তাতারদের তাড়ানো যায় না; কিন্তু ভালো কসাকের মতো মরার ঠাঁই এখানে আমার আছে। বহুকাল ধরে ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনা করেছি যে যখন আমার মরণ হবে আমি যেন মরতে পারি পবিত্র খ্রীষ্টধর্মের জন্য যুদ্ধে। এখন তাই ঘটতে চলেছে। বুড়ো কসাকের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না।'

সকলে যখন পৃথক হয়ে গিয়ে কুরেন অনুসারে সারিবদ্ধ হয়ে দুই পাশে দাঁড়াল, তখন ক্যাম্প-সর্দার সেই দুই সারির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বললেন:

'তাহলে, ভাই মহাশয়রা, দুই দলই তাহলে খুশি?'

'আমরা সবাই খুশি, বাবা!' উত্তর দিল কসাকেরা।

'এখন, চুমু খেয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নাও; কারণ, আবার জীবিত দেখা হবে কি না, ঈশ্বর জানেন। নিজের নিজের সেনাপতির কথা শুনো, কিন্তু যা তোমরা ভালো বোঝো তাই করো: তোমরাই জানো, কসাকের আত্মসম্মান কী চায়।'

যত কসাক সেখানে ছিল, কেউ বাদ গেল না। পরস্পরকে চুম্বন করল সকলেই। আরম্ভ করলেন সেনাপতিরা; সাদা সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে, একে অন্যের গালে চুমু খেলেন তাঁরা, পরে পরস্পরের হাত ধরে অনেকক্ষণ চেপে রইলেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চায়, 'কী ভাই, আবার দেখা হবে ত?'—কিন্তু কেউই জিজ্ঞাসা করল না, চুপ করে রইল,—দুই সাদা মাথাই রইল চিন্তামগ্ন। কসাকদের এক সারি অন্য সারির কাছ থেকে বিদায় নিল, তারা জানে, দুই দলেরই সামনে আছে প্রচুর কাজ। তবুও তখনই পৃথক হয়ে না যাওয়াই তারা ঠিক করল; তারা অপেক্ষায় রইল রাতের অন্ধকারের, যাতে শত্রুপক্ষ কসাক যোদ্ধাদের সংখ্যাল্পতা না দেখতে পায়। এর পর তারা আহারের জন্য গেল নিজের নিজের কুরেনে।

আহারের পর, যাদের পথ চলতে হবে তারা বিশ্রামের জন্য শয়ন করল এবং আচ্ছন্ন হল দীর্ঘ ও গভীর নিদ্রায়; মুক্তির পরিবেশে এই বুঝি তাদের

শেষ নিদ্রা, এ যেন তারই পূর্বাভাস। তারা ঘুমাল একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত; সূর্য অস্তে গিয়ে কিছুটা অন্ধকার হলে তারা গাড়িগুলিতে আলকাতরা মাখাতে লাগল। সব ঠিকঠাক হলে তারা মালগাড়িগুলিকে আগে চালিয়ে দিল, নিজেরা মাথার টুপি খুলে আবার সঙ্গীদের অভিবাদন জানাল, তারপর ধীরে ধীরে চলল মালগাড়িগুলির পিছন পিছন। অশ্বারোহীরা ঘোড়া চালানোর সময় উঁচু গলায় কোন আদেশ বা শিস না দিয়ে হালকা পায়ে অনুসরণ করল পদাতিকদের, দেখতে দেখতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ ও মাঝে মাঝে গাড়ির চাকার শব্দ ছাড়া চারদিকে নিস্তব্ধ, যে গাড়িগুলি তখনও ঠিকমতো চলছিল না, বা রাতের অন্ধকারে যেগুলিকে ঠিকমতো তৈলাক্ত করা যায় নি, শব্দ উঠছিল তাদের চাকা থেকে।

যে সঙ্গীরা পিছনে রইল তারা দূর থেকে হাত নাড়িয়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল বহুক্ষণ ধরে, যদিও তখন কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না। পরে যখন তারা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেল, উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে যখন তারা দেখল যে তাদের গাড়িগুলির অর্ধেক আর নেই, অনেক অনেক বন্ধুও আর নেই, তখন তাদের অন্তর বিষণ্ণ হল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা চিন্তাকুল হয়ে পড়ল, মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল তাদের স্ফূর্তিপ্রিয় মাথা।

তারাস দেখলেন কসাকের দল বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে, সাহসীর পক্ষে অনুপযোগী এক শোকে কসাকের মাথা ধীরে মাটির দিকে নুয়ে এসেছে, কিন্তু তিনিও কিছু বললেন না। বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়ের দুঃখে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য এদের সময় দিতে তিনি চাইলেন, আর প্রস্তুত হলেন নিস্তব্ধতার মধ্যে উচ্চনাদে কসাক রণধ্বনি করে এদের সকলকে একসঙ্গে জাগ্রত করতে, যাতে তাদের প্রত্যেকের অন্তরে আবার আগের চেয়ে বেশি জোরে ফিরে আসে স্ফূর্তি — সে স্ফূর্তি সম্ভব কেবল সেই বিশাল ও প্রবল স্লাভ চরিত্রে, অন্যের তুলনায় যা বিশীর্ণ নদীর তুলনায় সমুদ্রের মতো। যখন ঝড় আসে, তখন গর্জনে ও বজ্রধ্বনিতে তাতে ঢেউ ওঠে পাহাড়ের মতো, সে ঢেউ ক্ষীণপ্রাণ স্রোতস্বিনীর পক্ষে তোলা সম্ভব নয়; আবার যখন বাতাস পড়ে যায় ও চারদিক শান্ত হয়, তখন তা প্রসারিত হয়ে যায় এক অসীম দর্পণের মতো সমতল হয়ে, তার জল হয়ে ওঠে যে-কোন নদীর চেয়ে স্বচ্ছতর — চিরদিনের নয়নানন্দ।

তারাস তাঁর ভৃত্যদের একটি মালগাড়ি খুলতে আদেশ দিলেন, সেটা

একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কসাকদের মালগাড়ির সারিগ্‌লির মধ্যে এই গাড়িটা ছিল সবচেয়ে বড় ও মজব্‌ত, তার প্রকাণ্ড চাকা লোহার দ্‌ই-পরত আংটা দিয়ে আঁটা; তাতে অনেক ভার চাপানো, অশ্ব-আচ্ছাদনী আর বলদের শক্ত চামড়া দিয়ে সেটা ঢাকা; পিচ মাখানো দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেরা প্‌রনো মদের ছোট বড় পিপায় গাড়িখানি ভরা, বহ্‌কাল ধরে তা ব্‌লবার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। তিনি এটা সঙ্গে এনেছিলেন সমারোহপ্‌র্ণ কোন ঘটনার প্রত্যাশায়, হয়ত এমন কোন মহাক্ষণের, যখন এমন এক সংগ্রাম শ্‌র্‌ হবে যা আগামীকালের স্মরণের যোগ্য; এহেন মহান ম্‌হ্‌র্তে প্রত্যেক কসাক এই সযত্নে-রক্ষিত স্‌রা পান করে পরিপ্‌র্ণ হবে মহান অন্‌ভূতিতে। কর্নেলের আদেশ পেয়ে ভৃত্যেরা ছ্‌টে গেল গাড়ির দিকে, তরবারি দিয়ে কেটে ফেলল বাঁধানো দড়ি, ছিঁড়ে ফেলল প্‌র্‌ অশ্ব-আচ্ছাদনী আর বলদের চামড়া এবং নামিয়ে আনল ছোট-বড় সব পিপা।

'সব নাও তোমরা,' বললেন ব্‌লবা, 'সব, যা কিছ্‌ এখানে আছে। নিয়ে এসো যা কিছ্‌ তোমাদের আছে—কড়া কি ঘোড়াকে জল খাওয়াবার বালতি, টুপি কিংবা দস্তানা; আর তাও যদি না থাকে, তাহলে দ্‌ই হাত জ্‌ড়েই নাও।'

কসাকরা যে যেখানে ছিল নিয়ে এলো কেউ কড়া, কেউ ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর বালতি, কেউ দস্তানা, কেউ টুপি; যার কিছ্‌ নেই সে এলো দ্‌ হাত অঞ্জলি পেতে। তারাসের ভৃত্যেরা তাদের সারিতে প্রবেশ করে পিপা থেকে মদ ঢেলে দিল। কিন্তু তারাস আদেশ দিলেন যতক্ষণ না তিনি নির্দেশ দেন ততক্ষণ কেউ যেন পান না করে, তারা সকলে পান করবে একসঙ্গে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি কিছ্‌ বলতে চান। তারাস ভালো করেই জানতেন যে সেরা প্‌রনো মদ যতই জোরালো হোক না কেন, মান্‌ষের চিত্তকে উত্তেজিত করতে তার যতই শক্তি থাকুক না কেন, তার সঙ্গে যদি সংয্‌ক্ত হয় সময়োপযোগী কথা, তবেই শক্তি দ্বিগ্‌ণিত হয় মদেরও, চিত্তেরও।

ব্‌লবা বলতে লাগলেন, 'আমি আপনাদের আপ্যায়ন করছি, ভাই মহাশয়রা, এই উপলক্ষে নয় যে আপনারা আমাকে আপনাদের নেতা করেছেন — সে সম্মান যত মহৎ-ই হোক না কেন। অথবা আমাদের সাথীদের সঙ্গে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষেও নয়: না, এ দ্‌ই উপলক্ষই উপয্‌ক্ত হত অন্য সময়ে; এই ম্‌হ্‌র্তে তারা উপযোগী নয়। আমাদের সামনে রয়েছে ঢের

ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের কাজ, বিরাট কসাক বীরত্বের! তাই, বন্ধুরা, আসুন আমরা পান করি একসঙ্গে, সকলের আগে আমাদের পবিত্র সনাতন ধর্মবিশ্বাসের নামে: যাতে শেষ পর্যন্ত এমন দিন যেন আসে যখন এ ধর্ম বিস্তৃত হবে সারা পৃথিবীতে, সর্বত্র থাকবে একমাত্র এই পবিত্র ধর্ম, এবং প্রত্যেকটি বিধর্মী পরিণত হবে খ্রীষ্টিয়ানে! আসুন আমরা আর একবার একত্রে পান করি সেচের নামে, যাতে এ সেচ্ দীর্ঘদিন খাড়া থাকে বিধর্মীদের ধ্বংসের জন্য, যাতে প্রতি বছর সেখান থেকে বের হয় খাসা সুন্দর তরুণ বীরেরা। আসুন আমরা আর একবার একত্রে পান করি আমাদের নিজেদের গৌরবের নামেও, যাতে আমাদের পৌত্রেরা ও তাদের সন্তানেরা বলতে পারে যে এককালে এমন মানুষ ছিল যারা বন্ধুত্বের অমর্যাদা করে নি, বন্ধুদের পরিত্যাগ করে নি। তাই, ধর্মের নামে ভাই মহাশয়রা, ধর্মের নামে।'

'ধর্মের নামে!' ভারী গলায় গর্জন উঠল কাছের সারি থেকে।

'ধর্মের নামে!' ধ্বনিত হল দূরের সারি থেকে; তারপর যে যেখানে ছিল, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই পান করল ধর্মের নামে।

'সেচের নামে!' তারাস বললেন এবং হাত উঁচু করে তুললেন মাথার উপরে।

'সেচের নামে!' গম্ভীর শব্দে প্রতিধ্বনি করল সামনের সারিগুলি।

'সেচের নামে!' মৃদু কণ্ঠে বলল বৃদ্ধেরা তাদের সাদা গোঁফে তা দিয়ে; তরুণ বাজপাখির মতো উদ্দীপ্ত হয়ে পুনরুক্তি করল তরুণ কসাকরা, 'সেচের নামে!'

স্তেপের বহুদূর পর্যন্ত শোনা গেল কী ভাবে তাদের সেচ্‌কে স্মরণ করছে।

'এখন শেষ চুমুক, বন্ধুরা, গৌরবের নামে, আর পৃথিবীর যেখানেই তারা থাকুক সব খ্রীষ্টিয়ানের নামে!'

কসাকরা সকলে, সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত, তাদের পানপাত্রে শেষবার চুমুক দিল তাদের গৌরবের নামে ও পৃথিবীর সব খ্রীষ্টিয়ানের নামে। কুরেন দলবলের মধ্যে বহুক্ষণ শব্দিত হতে লাগল এই ধ্বনি:

'পৃথিবীর সব খ্রীষ্টিয়ানের নামে!'

পানপাত্র শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তবু কসাকরা দাঁড়িয়ে রইল হাত তুলে।

তাদের সকলের চোখে পানের প্রভাবে স্ফূর্তির দৃষ্টি ফুটলেও সকলের মনেই প্রবল চিন্তা। সে চিন্তা অর্থলাভ ও যুদ্ধের নানাবিধ লুটের কল্পনা সম্পর্কে নয়, কারা ভাগ্যক্রমে পাবে মোহর, মহার্ঘ অস্ত্রাদি, সূচিকর্মশোভিত কামিজ আর চের্কেসীয় ঘোড়া, তার হিসাবও তারা করছিল না। তারা দাঁড়িয়ে রইল যেন উঁচু পাহাড়ের খাড়াই শৃঙ্গে-বসা এক ঝাঁক ঈগল পাখি, যেন সেখান থেকে দূরে দেখা যায় সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার, তাতে ছড়ানো আছে, ছোট ছোট পাখির মতো, বজরা, জাহাজ ও নানাবিধ নৌকো, আর দূর প্রান্তে প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম তীরভূমি, কীট পতঙ্গের মতো শহর, নীচু দূর্বাদলের মতো বন্য বৃক্ষ। সেই ঈগল পাখিদের মতো তারা তাকিয়ে দেখল উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে, দূরে ঘনায়মান তাদের অন্ধকার অদৃষ্টের দিকে। আসবে, আসবে সেই কাল যখন এই সমগ্র প্রান্তর, তার পোড়ো ডাঙ্গা আর পথঘাট রঞ্জিত হয়ে যাবে কসাকের প্রচুর রক্তে, আকীর্ণ হয়ে যাবে শ্বেত অস্থিতে, আচ্ছন্ন হয়ে যাবে শকটের ভগ্নাবশেষ, তরবারি ও বর্শার ভাঙা টুকরায়। বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হবে জট-পাকানো রক্তমাখা ঝুঁটি ও নুয়ে পড়া গোঁফ সমেত তাদের মুণ্ড। ঈগলেরা তীরবেগে নেমে এসে চঞ্চু ও নখর দিয়ে টেনে আনবে কসাকদের চোখ। কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ অস্থি-সঙ্কুল মৃত্যু-শিবিরের মহিমাও হবে বৃহৎ! পুরুষ-সিংহের কোন কীর্তিই লুপ্ত হবে না, বন্দুকের নলের মধ্যে ছোট এক বিন্দু বারুদের মতো পুড়ে ছাই হবে না কসাক গৌরব। আসবে, আসবে সেই দিন যখন আবক্ষলম্বিত ধূসর শমশ্রু নিয়ে, হয়ত শ্বেতমস্তক বৃদ্ধত্ব সত্ত্বেও প্রবক্তার মতো প্রেরণা আর পরিণত পুরুষের মতো তেজে পূর্ণ হয়ে বান্দুরা-বাদক তার গভীর দরাজ গলায় গান গেয়ে সে কথা শোনাবে। খ্যাতি ছড়াবে সারা পৃথিবীময়, ভবিষ্যতে যারা জন্মাবে তারাও এদের নাম করবে। কেননা পরাক্রান্ত বাক্যের প্রসার বহুদূর, প্রভূত বিশুদ্ধ মূল্যবান রূপায় গড়া এ যেন এক ঘণ্টা, যার মধুর ধ্বনি প্রসারিত হয় সুদূরে, শহর ও গ্রাম, প্রাসাদ ও কুটির জুড়ে, সকলকে সমানভাবে আহ্বান করে পবিত্র প্রার্থনায়।

৯

শহরে একটি লোকও জানত না যে নীপার-কসাকদের অর্ধভাগ তাতারদের পিছনে তাড়া করতে গেছে। পরিশাসন-ভবনের চূড়া থেকে সান্ত্রীরা কেবল দেখেছিল যে মালগাড়ির কতকগুলি বনের দিকে পাঠানো

হচ্ছে; তারা ভেবেছিল, কসাকরা গুপ্তস্থান থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; ফরাসী এঞ্জিনিয়ারও সে রকম ভেবেছিল। ইতিমধ্যে, ক্যাম্প-সর্দারের কথাও মিথ্যা হয় নি, শহরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দিল। বিগত শতাব্দীগুলিতে সচরাচর যেমন ঘটত, সৈনিকেরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির হিসাব রাখে নি। তারা হঠাৎ-আক্রমণের চেষ্টা করে দেখল, তাতে আক্রমণকারী অতি-সাহসীদের অর্ধেক তৎক্ষণাৎ কসাকদের হাতে মারা পড়ল, অন্য অর্ধেক শহরে ফিরে এলো শূন্য হাতে। এই হঠাৎ-আক্রমণের সদ্ব্যবহার করল কিন্তু ইহুদীরা, খুঁজে বার করল সব খবর: কোথায় ও কেন নীপার-কসাকদের পাঠানো হয়েছে, কোন্ কোন্ সেনাপতি তাদের সঙ্গে, কোন্ কোন্ কুরেন ও তাদের সংখ্যা কত, এখানেই বা কত রয়ে গেল এবং তারা কী করবে ভাবছে—এক কথায়, অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরে সব জানাজানি হয়ে গেল। কর্নেলেরা প্রফুল্ল হয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। শহরের চাঞ্চল্য ও গোলমাল থেকে তারাসও এটা বুঝতে পারলেন, তিনিও দ্রুত ব্যবস্থা করতে লাগলেন, আদেশ ও নির্দেশ দিলেন, কুরেনগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করে প্রত্যেকটিকে মালগাড়ি দিয়ে ঘিরে ফেললেন কেল্লার মতো—এই রণকৌশলে নীপার-কসাকরা অজেয় হয়ে উঠত; দুটি কুরেনকে হুকুম দিলেন গুপ্তস্থানে যেতে; মাঠের একটি অংশে পুঁতে রাখলেন তীক্ষ্ন খুঁটি, ভাঙা অস্ত্রশস্ত্র ও বর্শার টুকরা, শত্রুর অশ্বারোহিদলকে সম্ভব হলে এই জায়গায় তাড়িয়ে আনতে হবে। প্রয়োজনমতো সব ব্যবস্থা করা হলে তিনি কসাকদের কাছে এক ভাষণ দিলেন, তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রাণনা দেওয়ার জন্য নয়,—জানতেন, তাদের মনের জোরের জন্য বক্তৃতার প্রয়োজন নেই,—তিনি কেবল চেয়েছিলেন তাঁর অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করতে।

'মহাশয়রা, আমি আপনাদের বলতে চাই, আমাদের বন্ধুত্বের কী প্রকৃতি। আপনাদের পিতা ও পিতামহদের কাছে আপনারা শুনেছেন, আমাদের দেশ কী সম্মান পেয়েছিল সকলের কাছে: গ্রীকদের জানিয়ে ছেড়েছি আমাদের কথা, আমরা কন্স্ট্যাণ্টিনোপ্‌ল্ থেকে কর আদায় করেছি; আমাদের শহরগুলি ছিল সমৃদ্ধ, আমাদেরও ছিল ধর্মমন্দির ও রাজন্যবর্গ—রুশ রক্তের রাজন্যবর্গ, আমাদের রাজন্যবর্গ, ক্যাথলিক বিধর্মী নয়। বিদেশীরা সব কেড়ে নিয়েছে, সব নষ্ট হয়েছে। আছি কেবল আমরা, অনাথের দল, আর আমাদের দেশও যেন আমাদের মতো অনাথা, শক্তিমান

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার মতো শোকার্ত! এহেন সময়ে, বন্ধু সব, আমরা হাত মিলিয়েছি ভ্রাতৃত্ববন্ধনে! এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বন্ধুত্ব! বন্ধুত্বের চেয়ে পবিত্রতর কিছুই নেই! বাপ ভালোবাসে তার সন্তানকে, মা ভালোবাসে তার সন্তানকে, সন্তান ভালোবাসে তার মা-বাবাকে। কিন্তু এ অন্য জিনিস, ভাই সব: জন্তুরাও ভালোবাসে তাদের বাচ্চাদের। কিন্তু কেবল রক্তের নয়, অন্তরের আত্মীয়তা, এ আছে কেবল মানুষের। অন্য দেশেও ভ্রাতৃত্ব হয়েছে, কিন্তু রুশদেশের মতো নয়, এমন বন্ধুত্ব-বন্ধন কোথায়ও হয় নি। আপনাদের অনেকে অনেকদিন বিদেশে থেকেছেন, দেখেছেন সেখানে অনেক মানুষ, আপনাদেরই মতো ঈশ্বর-সৃষ্ট মানুষ, আলাপ করেছেন তাদের সঙ্গে আপন জনের মতো; কিন্তু যখন দরকার হয়েছে অন্তরের কথা বলার, তখন দেখেছেন, তারা বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু আপনাদের মনোমত নয়, আপনাদেরই মতো অথচ আপনাদের নয়! না, না, ভাই সব, যেমন ভালোবাসতে পারে কেবল রুশী আত্মা—কেবল মন দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে নয়, ভগবান যা কিছু দিয়েছেন, তোমার যা কিছু আছে, এই সবকিছু দিয়ে ভালোবাসতে...' এই সময়ে তারাস হাত নেড়ে, সাদা মাথা দুলিয়ে, গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'না, তেমন ভালোবাসতে কেউ কখনও পারে নি! জানি আমি, এখন আমাদের দেশে ঢুকেছে বদমাইসি; আছে এমন সব লোক যারা কেবল নিজেদের শস্যভান্ডারের, নিজেদের ঘোড়ার পালের কথা ভাবে, তাদের চিন্তা কেবল নিজেদের সঞ্চিত মধুটুকুকে নিরাপদে রাখা। তারা অনুকরণ করে কে জানে কোন্ শয়তানী বিদেশী আচরণ; মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে তারা; দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায় না; দেশের লোককে বেচে দেয়, যেমন করে লোকে বেচে বাজারের আত্মা-হীন জন্তুর দলকে। বিদেশী রাজার অনুগ্রহ—এমন কি রাজারও নয়, পোলীয় ধনাঢ্যের নোংরা অনুগ্রহ—যারা তাদের হলদে জুতো দিয়ে ওদের মুখে লাথি মারে, তাদেরও অনুগ্রহ ওদের কাছে কোনরকম ভ্রাতৃত্বের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু যত নীচে সে পড়ুক না কেন, নীচতম নীচের মধ্যেও, তার সমস্ত তোষামোদ ও ময়লা ঘাঁটা সত্ত্বেও, ভাই সব, তার মধ্যেও আছে রুশী আবেগের ফুলকি। সে, ফুলকিও জ্বলে উঠবে একদিন, নিজেকে আঘাত করবে সে হতভাগ্য, দুঃখে দুই হাত কচ্‌লাবে, মাথার চুল ছিঁড়বে, চিৎকার করে অভিশাপ দেবে নিজের ঘৃণ্য জীবনকে, নিজের লজ্জাকর কর্মের মুক্তিমূল্য দিতে প্রস্তুত হবে যন্ত্রণা সহ্য করে। জানুক সকলে, রুশদেশে

বন্ধুত্বের কী মর্ম! আর যদি মৃত্যুর কথা ওঠে, আমরা যেমন করে মরতে পারি তেমন করে মরতে পারে এমন কেউ নেই তাদের মধ্যে!.. না, একজনও না, একজনও না!.. তাদের ইঁদুরের মতো প্রাণে এ হতেই পারে না!'

এইভাবে বললেন নেতা। ভাষণ শেষ হলেও মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি, সে মাথা কসাক বীরত্বের কীর্তিতে শুভ্র। সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সকলকে এই ভাষণ সজোরে নাড়া দিল, এ ভাষণ প্রবেশ করল তাদের অন্তরের গভীরে। সারিবদ্ধ সৈন্যদলে যারা প্রবীণতম তারা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে, তাদের বয়োবৃদ্ধ নয়ন থেকে নীরবে অশ্রু ঝরল; ধীরে ধীরে তারা চোখ মুছল জামার আস্তিন দিয়ে। তারপর সকলে, যেন একমত হয়ে, হাত দুলিয়ে বিচক্ষণ মাথা নাড়ল। স্পষ্টই দেখা গেল, বৃদ্ধ তারাস বহু পরিচিত ও প্রিয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন তাদের মনে, দুঃখ কষ্ট বীর্য ও জীবনের সব কঠিনতার ভিতর দিয়ে যারা প্রবীণ হয়ে উঠেছে এ অনুভূতি তাদের বুকের ধন, আর যে-হৃদয় এখনও কাঁচা ও তরুণ এখনও এই সবকিছু সহ্য করে নি, তারুণ্যের সমস্ত আবেগ নিয়ে তারাও আকুল হয়ে থাকে এই অনুভূতির জন্য—সে আকুলতা দেখে বৃদ্ধ পিতৃপুরুষদের হৃদয় ভরে ওঠে এক চিরন্তন আনন্দে।

ইতিমধ্যেই শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিল শত্রুসৈন্য, বেজে উঠল ঢাক ও তুরী, কোমরে হাত রেখে অভিজাতেরা নির্গত হল অশ্বপৃষ্ঠে, তাদের ঘিরে অসংখ্য ভৃত্য। মোটা কর্নেল হুকুম দিচ্ছিলেন। ঘনবদ্ধ হয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কসাকদের ছাউনিতে, হাতগুলি তাদের ভীতিপ্রদভাবে উত্থিত, বন্দুকের লক্ষ্য স্থির, দৃষ্টিতে অগ্নিবৃষ্টি, দেহ ঢাকা উজ্জ্বল তামার বর্মে। কসাকেরা যখন দেখল শত্রুসৈন্য লক্ষ্যের পরিসরের মধ্যে এসে পড়েছে তখন দীর্ঘ-নলী বন্দুক তুলে একসঙ্গে গুলিবর্ষণ করল, অবিরাম গুলি চালাতে লাগল। এই তুমুল আওয়াজ চারদিকের ক্ষেত্রে ও প্রান্তরে বহুদূর ছড়িয়ে পরিণত হল এক অবিরাম গর্জনে; সমগ্র সমতল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল; নিশ্বাস ফেলার অবকাশ না দিয়ে নীপার-কসাকরা ক্রমাগত গুলি চালাতে লাগল: পিছনের দল সামনের দলের জন্য বন্দুক ভরে দিচ্ছিল; কেমন করে বন্দুক না ভরেই কসাকরা গুলি চালাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে শত্রুরা অবাক হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দুইটি বাহিনীকেই ঢেকে দিয়ে ধোঁয়া এত ঘন হয়ে উঠল যে কিছুই দেখা যায় না কে কখন সারি থেকে খসে পড়ছে; কিন্তু পোলরা বুঝল কী ঘন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে এবং অবস্থা কত দুঃসহ হয়ে উঠছে;

ধোঁয়া এড়ানোর জন্য ও চারদিকে তাকিয়ে দেখার জন্য পিছিয়ে এসে তারা দেখল তাদের দলের অনেককেই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কসাকদের দলে মারা পড়েছে হয়ত শতকরা দু-তিন জন। তবু কসাকরা চালাতে লাগল তাদের বন্দুক, এক মিনিটেরও অবসর দিল না। এমন কি বিদেশী এঞ্জিনিয়ারও এই রণকৌশলে বিস্মিত হল, আগে সে কখনও এমন দেখে নি। সকলের সামনে তখনই সে বলে উঠল, 'নীপার-কসাকরা বীর বটে! অন্য দেশেও এইভাবে লড়াই করা দরকার!' সে উপদেশ দিল কামানগুলিকে ছাউনির দিকে ঘোরাতে। ঢালাই লোহার কামানগুলির বিশাল কণ্ঠ থেকে গভীর গর্জন উঠল; বহুদূরে শব্দায়মান হয়ে কেঁপে উঠল ধরণী, সমস্ত প্রান্তর ছেয়ে গেল দ্বিগুণ ঘন ধোঁয়ায়। বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল দূরের ও কাছের শহরগুলির পথে প্রাঙ্গণে। কিন্তু গোলন্দাজেরা বেশি উঁচুতে লক্ষ করেছিল: আগুনের গোলাগুলির পরিক্রমা অতিবিস্তৃত হয়ে গেল। আকাশে তীক্ষ্ন চিৎকার করতে করতে কসাক-ছাউনির মাথার উপর দিয়ে গিয়ে তারা দূরে ভূমিতলের গভীরে গেঁথে গিয়ে শূন্যে বাতাসে অনেক উঁচুতে উৎক্ষিপ্ত করছিল কালো কালো মাটি। এইরকম আনাড়িপনায় ফরাসী এঞ্জিনিয়ার নিজের মাথার চুল ধরে টানতে লাগল এবং চারপাশে কসাকদের অবিরাম ঘন গুলিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে নিজেই কামান দাগার ভার নিল।

তারাস দূর থেকে দেখলেন যে সমগ্র নেজামাই ও স্তেবলিকিভ্ কুরেন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন; তিনি বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'মালগাড়ির আড়াল থেকে এক্ষুনি দূরে সরে যাও, আর যে যার ঘোড়ায় চড়!' কিন্তু এ দুটি কাজের মতো সময় কসাকরা পেত না যদি অস্তাপ একেবারে শত্রুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ত। ছয়জন গোলন্দাজের পলতে সে কেটে দিল, বাকি চার জনের কাছে পৌঁছতে পারল না—পোলরা তাকে হটিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বিদেশী ক্যাপ্টেন নিজের হাতে পলতে ধরেছে সবচেয়ে বড় কামানটা দাগার জন্য, এত বড় কামান কসাকরা এর আগে দেখে নি। দেখতে ভীষণ তার বিশাল বদন, তার ভিতরে যেন হাজার মরণ। সে কামান যখন গর্জে উঠল এবং তাকে অনুসরণ করল অন্য তিনটি কামান, যখন এই চতুর্গুণ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল স্পন্দিত ভূমি, তখন ধ্বংস হল প্রচুর! একাধিক বৃদ্ধা কসাক-মাতা কাঁদবে তার পুত্রের জন্য, অস্থিময় হাত দিয়ে আঘাত করবে নিজের শীর্ণ বক্ষে। একাধিক নারী বিধবা হবে গ্লুখভ, নেমিরোভ, চের্নিগোভ আর অন্যান্য শহরে। হতভাগিনী প্রতিদিন ছুটবে বাজারে, সকল

পথচারীকে থামাবে, সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে, তাদের মধ্যে আপন প্রিয়তম জন আছে কি না। শহরের ভিতর দিয়ে চলে যাবে অনেক সৈন্যবাহিনী, কিন্তু যে তার সকলের চেয়ে প্রিয় সে আর কোন দিন ফিরে আসবে না।

নেজামাই-কুরেনের ধ্বংস হয়ে গেল অর্ধেক। সোনার মোহরের মতো দানায় ভরা শস্যক্ষেত্র যেমন বিনষ্ট হয় শিলাবৃষ্টিতে, তেমনি করেই বিনষ্ট ও ভূতলশায়ী হল তারা।

সে কী উন্মাদনা কসাকদের! সকলে মিলে সে কী উন্মত্ত অগ্রধাবন! সেনাপতি কুকুবেন্‌কোর কী উত্তপ্ত ক্রোধ যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর কুরেনের ভালো অর্ধটাই আর নেই! মুহূর্তের মধ্যে অবশিষ্ট নেজামাই কসাকদের নিয়ে তিনি শত্রুব্যাহিনীর একেবারে মধ্যে এসে পড়লেন। উন্মত্তভাবে তিনি প্রথমে যাকে দেখলেন তাকে কেটে টুকরো টুকরো করলেন বাঁধাকপির মতো; বহু অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করলেন, বর্শাবিদ্ধ করলেন আরোহী ও অশ্ব উভয়কেই; গোলন্দাজদের কাছে এসে একটি কামান দখল করলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে উমান্‌-কুরেনের সেনাপতি ও স্তেপান গুস্কা সবচেয়ে বড় কামানটি দখল করে ফেলছে। তিনি তাদের সেখানে রেখে, নিজের দল নিয়ে ঘুরলেন অন্য দিকে, সেখানে শত্রুরা জড় হয়েছিল। নেজামাইরা যেদিকে গেল সেদিকেই উন্মুক্ত হল যেন রাজপথ, যেদিকে ঘুরল সেদিকেই সৃষ্টি হল যেন পোলীয় শবদেহে ভরা গলি। দেখতে দেখতে সংখ্যা কমতে লাগল পোলদের, তারা ভূপতিত হল গুচ্ছ গুচ্ছ। মালগাড়িগুলির কাছেই লড়ছেন ভোভ্‌তুজেন্‌কো, অগ্রভাগে চেরেভিচেন্‌কো, দূরের গাড়িগুলির কাছে দেগ্‌ত্যারেন্‌কো, ও তাঁর পিছনে কুরেন-সেনাপতি ভের্তিখ্‌ভিস্ত্‌। দু'জন অভিজাত সেনাপতি ইতিমধ্যেই দেগ্‌ত্যারেন্‌কোর আঘাতে পড়েছে, এখন তিনি যুঝছেন জেদী এক তৃতীয়ের সঙ্গে। এই সেনাপতি শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতি, দামী বর্মে ঢাকা, তার সহায় পঞ্চাশজন অনুচর। সজোরে সে দেগ্‌ত্যারেন্‌কোকে হটিয়ে মাটিতে ফেলে দিল, তাঁর উপর তলোয়ার ঘুরিয়ে চেঁচাল: 'ওরে কসাক-কুত্তারা, তোদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার সঙ্গে লড়তে পারে!'

'এই যে আছে এখানে!' এই বলে এগিয়ে এলেন মোসি শিলো। শক্তিমান এই কসাক-বীর, অনেকবার তিনি সেনাপতিত্ব করেছেন সমুদ্রে, সহ্য করেছেন বহুবিধ কষ্ট। তুর্কীরা একবার তাঁকে দলসুদ্ধ বন্দী করে ত্রেবিজণ্ডের*)

কাছে, জোর করে জাহাজ চালানোর কাজে লাগায়, হাতপা বাঁধে লোহার শিকলে, এক একবার এক এক নাগাড়ে সপ্তাহ ধরে কোন জনার খেতে দেয় নি, কিছুই পান করতে দেয় নি সমুদ্রের লোণা জল ছাড়া! হতভাগ্য বন্দীরা এ সমস্তই সহ্য করে, তবু তাদের নিজস্ব খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে নি। কিন্তু দলপতি মোসি শিলো আর সহ্য করতে পারলেন না, পবিত্র ধর্মাদেশকে পদতলে দলিত করলেন, তাঁর পাপিষ্ঠ মাথায় জড়ালেন ঘৃণার্হ পাগড়ী, পাশার আস্থা অর্জন করে জাহাজের চাবিগুলির ভার পেলেন, নিযুক্ত হলেন সব বন্দীদের পরিদর্শক। হতভাগ্য বন্দীদের দুঃখের অবধি রইল না, তারা ভালো করেই জানত যে যদি কেউ নিজের ধর্ম বিকিয়ে দিয়ে অত্যাচারীর দলভুক্ত হয়, তার অত্যাচার হয় অন্য অ-খ্রীষ্টীয় অত্যাচারীর চেয়ে আরও কঠিন ও অসহনীয়। হলও তাই। মোসি শিলো তাদের তিন তিনজনকে একত্র করে নতুন শিকল পরালেন, এত জোরে দড়িতে বাঁধলেন যে তাদের সাদা হাড় প্রায় দেখা যেত; নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন তাদের ঘাড়ে। এমন একটি ভৃত্য পেয়ে তুর্কীরা যখন আনন্দে ভোজনোৎসব লাগাল এবং তাদের ধর্মাদেশ ভুলে পানোন্মত্ত হল, তিনি তখন চৌষট্টিটি চাবির সবগুলি নিয়ে বন্দীদের মধ্যে বিতরণ করলেন; বন্দীরা শিকল খুলে, সমস্ত শৃংখল ও বন্ধন সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তার বদলে তরবারি নিল তুর্কীদের হত্যা করার জন্য। প্রভূত সম্পদ অধিকার করল কসাকরা এবং স্বদেশে ফিরে এলো সগৌরবে, বহুদিন ধরে বান্দুরা-বাদকেরা প্রশস্তি গাইল মোসি শিলোর। তিনি ক্যাম্প-সর্দার নির্বাচিত হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। কোন সময়ে তিনি এমন অসাধারণ বীরত্বের কাজ করতেন যা বিজ্ঞতমেরও ভাবনার অতীত, আবার কোন সময়ে একান্ত দুর্বুদ্ধি তাঁকে পেয়ে বসত। একবার তিনি পানভোজনে সমস্ত অর্থ ব্যয় করলেন, সেচের প্রত্যেকের কাছে ধার করলেন, অধিকন্তু, চুরি করলেন হীন চোরের মতো: একরাত্রে তিনি অন্য কুরেনের এক কসাকের সম্পূর্ণ অশ্বসাজসজ্জা চুরি করে বাঁধা দিলেন শুঁড়ির দোকানে। এই লজ্জাকর কাজের জন্য তাঁকে বাজারের মধ্যে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল, পাশে থাকল একটি লগুড়, যাতে প্রত্যেক পথচারী তার শক্তিমতো তাঁকে আঘাত করে। কিন্তু নীপার-কসাকদের ভিতরে এমন একজনও পাওয়া গেল না যে তাঁর উপর লগুড় চালাবে, সকলেরই মনে ছিল তাঁর আগেকার গৌরবের কথা। এই ধরনের কসাক ছিলেন মোসি শিলো।

'এখানে এমন লোক আছে যারা তোদের মারতে পারে, ওরে কুকুর!' এই বলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে কী ভীষণ যুদ্ধ তাদের! আঘাতের চোটে দুজনেরই কাঁধের ও বুকের বর্ম বেঁকে গেল। পোলীয় আততায়ীর তলোয়ার তাঁর লোহার বর্ম ভেদ করে দেহ পর্যন্ত পোঁছে কেটে বসল: কসাকের দেহাবরণ লাল হয়ে উঠল রক্তে। কিন্তু শিলো তাতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, তাঁর বলিষ্ঠ বাহু তুলে (সে কি ভীমের মতো বাহু!) হঠাৎ তার মাথায় আঘাত করে তাকে হতচেতন করে দিলেন। তার তামার শিরস্ত্রাণ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল পোল, তারপর শিলো তাকে ক্রমাগত আঘাত করে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। কিন্তু, কসাক, এই শত্রুকে সময় দিও না, চেয়ে দেখ পিছনের দিকে! কসাক কিন্তু পিছনের দিকে চেয়ে দেখলেন না, নিহত শত্রুর একজন ভৃত্য তাঁর ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে দিল। তখন ফিরে দেখলেন শিলো, এই দুঃসাহসিককে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন, কিন্তু বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারদিকে বন্দুকের আওয়াজ। শিলোর শরীর টলতে লাগল, তিনি বুঝলেন তাঁর ক্ষত মারাত্মক, পড়ে গেলেন তিনি, হাত দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'বিদায় ভাই সব, বন্ধু সব! পবিত্র রুশদেশ যেন চিরকাল বেঁচে থাকে, যেন চিরন্তন গৌরব হয় তার!' তাঁর স্তিমিত চোখ তিনি বুজলেন, তাঁর কঠোর দেহ থেকে কসাক আত্মা নিষ্ক্রান্ত হল। কিন্তু সেখানে ইতিমধ্যেই অশ্বপৃষ্ঠে সদলবলে এসে পোঁছেছেন জাদোরোজ্নি, পোলীয় লাইন ভেঙে দিয়েছেন ভের্তিখ্‌ভিস্ত্, এগিয়ে এসেছেন বালাবান।

'কী অবস্থা, ভাই সব?' কুরেন-সেনাপতিদের ডেকে চিৎকার করে বললেন তারাস, 'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে ত? কসাকের শক্তি এখনও কমে নি ত? কসাকেরা হার মানছে না ত?'

'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে, বাবা! কসাকের শক্তি এখনও কমে নি; কসাকেরা এখনও হার মানছে না!'

আবার কসাকেরা সজোরে চেপে ধরে শত্রুবাহিনীকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে দিল। বেঁটে কর্নেল সমাবেশের সংকেত দিয়ে হুকুম দিলেন আটটি রঙীন পতাকা ওড়াতে। তাঁর সৈন্যেরা সমস্ত প্রান্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা দেখে তারা আবার একত্রিত হবে। পোলীয় সৈন্যেরা পতাকার দিকে ছুটে আসছে; কিন্তু তারা সুসংবদ্ধ হওয়ার আগেই কুরেন-সেনাপতি কুকুবেন্‌কো তাঁর নেজামাই কসাকদের নিয়ে আবার তাদের কেন্দ্রে

আঘাত করলেন এবং স্বয়ং মোটা কর্নেলের সঙ্গে লড়তে লাগলেন। কর্নেল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ঘোড়া ঘুরিয়ে, দ্রুতলম্ফে পালালেন; কুকুবেন্‌কো তাঁকে তাড়া করলেন সমস্ত প্রান্তর পার হয়ে, সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হতে দিলেন না। পাশের কুরেন থেকে স্তেপান গুস্কা তা দেখে কর্নেলকে আটকানোর জন্য ছুটে এলেন, তাঁর হাতে দড়ির ফাঁস, তাঁর মাথা ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ঘেঁষানো; উপযুক্ত সময় বুঝে তিনি একেবারেই দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে কর্নেলের ঘাড়ে লট্‌কালেন। কর্নেলের মুখ হয়ে উঠল গাঢ় লাল, দুই হাত দিয়ে দড়ি ধরে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্শার এক প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর উদর বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেখানেই তিনি পড়ে রইলেন ভূমিতে বিদ্ধ হয়ে। কিন্তু গুস্কাও রক্ষা পেলেন না। কসাকেরা লক্ষ করার আগেই, চারটি বর্শা তাঁকে বিঁধে শূন্যে তুলে ধরল। হতভাগ্য কেবল এইটুকু বলতে পারলেন, 'সব শত্রুর বিনাশ হোক, চিরকাল যেন জয় হয় রুশদেশের!' সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কসাকেরা চারদিকে তাকিয়ে দেখল: ওখানে, এক পাশে, মেতেলিৎস্যা পোলদের শিরস্ত্রাণে প্রচণ্ড আঘাত হানছেন; আর এক ধারে, সেনাপতি নেভিলিচ্‌কি তাঁর সেনাদল নিয়ে চাপ দিচ্ছেন; মালগাড়ির ধারে জাক্‌রুতিগুবা শত্রুদের আক্রমণ করে আঘাত করছেন; আর, দূরের মালগাড়িগুলির কাছে তৃতীয় পিসারেন্‌কো একটা সমগ্র দলকে তাড়া করেছেন। আরও দূরে, একেবারে মালগাড়িগুলির উপরে সৈন্যেরা হাতাহাতি লড়াই শুরু করে দিয়েছে।

'তাহলে, ভাই সব?' অশ্বপৃষ্ঠে সকলের সম্মুখে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন সেনাপতি তারাস। 'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে ত? কসাকের শক্তি এখনও কমে নি ত? কসাক এখনও হার মানে নি ত?'

'এখনও আছে, বাবা, বারুদের শিঙায় বারুদ; এখনও আছে কসাকের শক্তি; এখনও হার মানে নি কসাক!'

বোভ্‌দ্যুগ ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে পড়ে গেছেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ঠিক নীচে গুলি এসে বিঁধেছে। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বললেন: 'এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে আমার দুঃখ নেই। ভগবান করুন, যেন এমন মৃত্যু সকলের হয়! রুশদেশের গৌরব যেন চিরদিন থাকে!' ঊর্ধলোকে চলে গেল বোভ্‌দ্যুগের আত্মা, বহুকাল আগে বিগত বৃদ্ধবীরদের

সে আত্মা শোনাবে রুশদেশের লোকেরা কেমন যুদ্ধ করতে পারে, আর তার চেয়েও বড় কথা, কেমন তারা মরতে পারে তাদের পবিত্র ধর্মের জন্য।

তার অল্পকাল পরেই ভূলুণ্ঠিত হলেন কুরেন-সেনাপতি বালাবান। তিনটি মারাত্মক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন — বর্শার, বন্দুকের গুলির ও ভারী তরবারির। সবচেয়ে সাহসী কসাক বীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম; বহু সামুদ্রিক অভিযানে তিনি ছিলেন সেনাপতি; তবে আনাতোলিয়ার সমুদ্রতীরে অভিযানই তাঁর সবচেয়ে গৌরবময়। সেবারে তারা সংগ্রহ করেছিল প্রচুর সেকুইন, তুরস্কদেশের মূল্যবান দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি ও গহনা, কিন্তু ফেরার পথে তাদের বিপদ হল: তুর্কী কামানের পাল্লায় পড়ল হতভাগ্যেরা। তুর্কী জাহাজ থেকে কামানের গোলা তাদের উপর বর্ষিত হতে শুরু করল। তাদের নৌকোগুলির অর্ধেক পাক খেয়ে জলমগ্ন হল, ডুবল একাধিক কসাক, কিন্তু নৌকোর পাশে নলখাগড়া বাঁধা থাকায় নৌকোগুলি একেবারে ডুবল না। সবকটি দাঁড় লাগিয়ে বালাবান যত জোরে সম্ভব চালালেন, তুর্কী জাহাজ থেকে যাতে দেখা না যায় সেইজন্য সূর্যের মুখোমুখি রইলেন। সারা রাত ধরে তারা বালতি ও টুপি দিয়ে জল ছেঁচে গুলির আঘাতে ভাঙা ফাঁকগুলি মেরামত করে নিল; ঢিলা কসাক সালোয়ার কেটে তৈরী হল পাল, এবং পরিপূর্ণ শক্তিতে চালিয়ে তারা দ্রুততম তুর্কী জাহাজকে ছাড়িয়ে গেল। তারা যে নিরাপদে সেচে এসে পেঁৗছেছিল, কেবল তাই নয়। কিয়েভে মেজিগর্স্ক মঠের প্রধান পুরোহিতের জন্য তারা এনেছিল সোনার কারুকাজ-করা পোশাক, এবং জাপোরোজীয় ধর্মমন্দিরের জন্য বিশুদ্ধ রূপার অলংকার। বহুদিন ধরে বান্দুরা-বাদকদল তাদের এই সাফল্যের স্তুতি গেয়েছে। এখন, মৃত্যুযন্ত্রণায় মাথা নীচু করে ধীরস্বরে তিনি বললেন: 'ভাই সব, মনে হচ্ছে আমার, আমি ভালোই মরছি। সাতজনকে কেটে ফেলেছি, ফুঁড়েছি নয়জনকে, অনেককে ঘোড়ার তলায় ফেলেছি, আর কতজনকে যে গুলি করেছি তা মনেই নেই। রুশদেশের সমৃদ্ধি চিরন্তন হোক!..' নির্গত হয়ে গেল তাঁর প্রাণবায়ু।

সাবধান, সাবধান, ওরে কসাকের দল! তোমাদের বীরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পটিকে তোমরা পরিত্যাগ করো না! কুকুবেন্‌কোকে ইতিমধ্যেই শত্রু ঘিরে ফেলেছে, সমস্ত নেজামাই-কুরেনের মাত্র সাতজন আর অবশিষ্ট আছে; তাদেরও শক্তি ফুরিয়ে এসেছে; রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে কুকুবেন্‌কোর পোশাক। তাঁর বিপদ দেখে স্বয়ং তারাস ছুটে এলেন রক্ষার জন্য। কিন্তু

কসাকরা এসে পেঁছল দেরিতে: তাঁর চারপাশের শত্রুকে বিতাড়িত করার আগেই কুকুবেন্‌কোর বুকের ঠিক তলে এসে বিঁধল এক বর্শা। ধীরে ধীরে তিনি কসাকদের বাহুতে ঢলে পড়লেন, তারা তাঁকে তুলে ধরল, স্রোতের মতো উৎসারিত হল তাঁর তরুণ রক্ত, ঠিক যেন বহুমূল্য মদিরা ভূগর্ভস্থ ভান্ডার থেকে কাচপাত্রে আনার সময় অসাবধান ভৃত্য চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে মূল্যবান পাত্রটি ভেঙে ফেলেছে; সমস্ত মদিরা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে, গৃহস্বামী ছুটে এসেছেন মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে; তিনি যে এটা সঞ্চিত করে রেখে ছিলেন তাঁর জীবনের একটি পরম মুহূর্তের জন্য, এই আশায় যে ভগবান তাঁর বৃদ্ধবয়সে একদিন এনে দেবেন যৌবনের সাথীকে, তাঁরা দু'জনে একত্রে এই মদিরা পান করবেন সেই অতীতকালের স্মৃতিতে, যখন মানুষ আনন্দ করতে জানত এখনকার চেয়ে অন্যরকম আর উন্নত ধরনে... কুকুবেন্‌কো চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'বন্ধুরা সব, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি তোমাদের চোখের সামনে মরতে পেরেছি। আমাদের পরে যারা আসবে তাদের জীবন যেন আমাদের চেয়ে ভালো হয়, আর খ্রীষ্টের প্রিয় আমাদের এই রুশদেশ যেন চিরকাল থাকে সুন্দর।' নির্গত হল এই তরুণ প্রাণ। দেবদূতেরা হাত ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন স্বর্গে। সেখানে তিনি সুখে থাকবেন। 'কুকুবেন্‌কো, বসো আমার ডান দিকে!' খ্রীষ্ট তাঁকে বলবেন। 'তুমি কখনও বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙ নি, কর নি কোন অগৌরবের কাজ, লোককে বিপদে পরিত্যাগ কর নি, আমার ধর্মবিধানকে বজায় রেখেছ ও রক্ষা করেছ।' কুকুবেন্‌কোর মৃত্যুতে সকলেই বিষণ্ন হয়ে পড়ল। কসাকদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশই কমছিল; অনেক অনেক বীর আর নেই; তবু দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে রইল কসাকরা।

'কী অবস্থা, ভাই সব?' বললেন তারাস অবশিষ্ট কুরেনগুলিকে। 'বারুদের শিঙায় এখনও বারুদ আছে ত? তরোয়ালের ধার ভোঁতা হয়ে যায় নি ত? কসাকের মর্দানি ফুরোয় নি ত? কসাকরা হঠে যায় নি ত?'

'বারুদ এখনও ঢের আছে, বাবা! তরোয়ালে এখনও আছে ধার; ফুরোয় নি কসাকের মর্দানি; হঠে নি এখনও কসাক!'

কসাকরা আর একবার এমনি তাড়া করল যেন তাদের কোন ক্ষতি হয় নি। মাত্র তিনজন কুরেন-সেনাপতি জীবিত আছে এখন। চারদিকে রক্তের লাল নদী; কসাকদের ও তাদের শত্রুর মৃতদেহগুলি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে এক উঁচু সাঁকোর মতো। তারাস আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন —

সেখানে ইতিমধ্যেই শকুনির দল সারি দিয়েছে। তাদের জন্য কত না ভোজই প্রস্তুত! ওদিকে মেতেলিৎস্যাকে বর্শাফলকে উঁচু করে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে গড়াচ্ছে দ্বিতীয় পিসারেন্‌কোর মাথা, তার চোখের পাতা তখনও চঞ্চল। আবার ওখানে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল অখ্‌ম গুস্কার ছিন্নভিন্ন দেহের চার টুকরো। 'এই বার!' বলে তারাস তাঁর রুমাল নাড়লেন। এই ইঙ্গিত বুঝতে পারল অস্তাপ, গুপ্তস্থান থেকে বেগে বেরিয়ে এসে শত্রুর সওয়ার দলকে প্রচণ্ড আঘাত হানল। পোলরা এ আক্রমণ সহ্য করতে পারল না, অস্তাপ তাদের ক্রমাগত তাড়া করতে লাগল সেই দিকে যেখানে মাটিতে পোঁতা ছিল তরোয়াল ও বর্শার খণ্ডগুলি। ঘোড়ারা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তাদের মাথা ডিঙিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সওয়ারেরা। ঠিক সেই সময়ে যারা মালগাড়ির পিছনে সবচেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই করসুন-কসাকরা শত্রুদল গুলির পাল্লার ভিতরে এসেছে বুঝে, হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি চালাতে লাগল। পোলরা একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল; স্ফূর্তি জেগে উঠল কসাকদের। 'আমাদের জয় হয়েছে!' — সর্বত্র শোনা গেল নীপার-কসাকদের চিৎকার। তুর্যধ্বনি করে তারা উড়িয়ে দিল বিজয়পতাকা। পরাজিত পোলরা চারদিকে পালিয়ে লুকাতে লাগল। 'না, হয় নি, এখনও আমাদের জয় হয় নি!' শহরের তোরণদ্বারের দিকে তাকিয়ে তারাস বলে উঠলেন, আর তিনি ঠিকই বলেছিলেন।

খুলল তোরণদ্বার, বেরিয়ে এলো হুসার পল্‌টন -- সওয়ারী পল্‌টনগুলির মধ্যে তারা সেরা। প্রত্যেক অশ্বারোহীর বাহন বাদামীরঙের দ্রুতগতি ফৌজী ঘোড়া। সকলের আগে লাফিয়ে চলেছে এক বীর, সকলের চেয়ে সুন্দর ও সাহসী। তামার শিরস্ত্রাণের তল থেকে হাওয়ায় দুলছে তার কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, তার বাহুতে উড়ছে এক বহুমূল্য উত্তরীয়, সুন্দরীশ্রেষ্ঠার আপন হাতে তা সেলাই করা। তারাস বজ্রাহতের মতো বিমূঢ় হয়ে গেলেন যখন তিনি দেখলেন যে এ বীর আন্দ্রি। সে তখন যুদ্ধের উত্তেজনায় উন্মত্ত, তার বাহুতে আবদ্ধ উপহারের সে যে যোগ্য এই প্রমাণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটছে যেন দলের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক সুন্দর, দ্রুতগতি এক তরুণ শিকারী কুকুর। অভিজ্ঞ শিকারীর তাড়া শুনে সে কুকুর তীরবেগে এগিয়ে চলছে, সরলরেখার মতো পাগুলি সোজা হয়ে গিয়েছে শূন্যে, দেহটি বাঁকানো পাশের দিকে, তুষার উড়িয়ে শিকারের উত্তেজনায় তার লক্ষ্য খরগোসকে সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বার বার। বৃদ্ধ তারাস দাঁড়িয়ে পড়লেন,

দেখতে লাগলেন কেমন করে সে তার সামনে পথ সাফ করে সামনের লোকদের বিতাড়িত করছে, ডাইনে বাঁয়ে আঘাত চালিয়ে কেটে ফেলছে। তারাস সহ্য করতে পারলেন না, গর্জন করে উঠলেন: 'কী?.. নিজের লোককে?.. নিজের লোককে, শয়তানের বাচ্চা, নিজের লোককে তুই মারছিস?..' কিন্তু আন্দ্রি দেখছে না কে তার সামনে, শত্রুর দল না মিত্রের দল; কিছুই সে দেখছে না। দেখছে কেবল অলকগুচ্ছ, দীর্ঘ অলকগুচ্ছ, আর একটি বক্ষোদেশ, নদীর রাজহংসের মতো তা শুভ্র, দেখছে তুষার-শুভ্র স্কন্ধ ও গ্রীবা, উন্মত্ত চুম্বনের জন্য যার সৃষ্টি — এমন সব কিছু।

'হেই ছোকরারা! যেমন করে পারিস ওকে একটু লোভ দেখিয়ে নিয়ে আয় ত এই বনের মধ্যে আমার জন্য,' তীক্ষ্ম চিৎকার করে উঠলেন তারাস। তাঁর ডাকে ত্রিশজন অতিদ্রুতগতি কসাক তৎক্ষণাৎ ছুটল আন্দ্রিকে লুব্ধ করতে। উ'চু টুপি মাথায় ঠিকভাবে বসিয়ে তারা অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হল সোজা হুসারদের অভিমুখে। অগ্রগামী হুসারদের তারা আক্রমণ করল পাশ থেকে, তাদের বিভ্রান্ত করে পিছনের দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বেশ কিছু আঘাত হানল; আর গোলাকোপিতেন্‌কো আন্দ্রির পিঠে মারল তার তরবারির চওড়া দিকটা দিয়ে। তার পরই তারা সেখান থেকে যত জোরে পারে ছুটে পালাল। সে কী উত্তেজনা আন্দ্রির! ধমনীতে তার তরুণ রক্তের সে কী আলোড়ন! ঘোড়ার গায়ে তীক্ষ্ম কাঁটার আঘাত লাগিয়ে সে বায়ুবেগে ছুটল কসাকদের দিকে, পিছনে তাকিয়ে দেখল না একবারও, জানল না যে তার দলের মাত্র কুড়ি জন তার সঙ্গে সমান বেগে আসতে পারছে। কসাকরাও ঘোড়া ছুটাল পূর্ণগতিতে এবং ঘুরল সোজা বনের দিকে। অশ্বপৃষ্ঠে আন্দ্রি সবেগে তাড়া করল, গোলোকোপিতেন্‌কোকে সে প্রায় ধরে ধরে, এমন সময় হঠাৎ কার যেন সবল হাত তার ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল। আন্দ্রি ফিরে দেখল: তার সামনে তারাস! তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল, হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল সে...

এ যেন এক বিদ্যালয়ের ছাত্র, সহপাঠীকে অসাবধানে চটিয়ে দিয়ে এবং ফলে কপালে রুলারের চোট খেয়ে জ্বলে উঠে, উন্মত্তভাবে বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে তার ভীত সহপাঠীকে তাড়া করেছে, মনে মনে ইচ্ছা তাকে ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে, কিন্তু হঠাৎ তার ধাক্কা লাগল শিক্ষকের সঙ্গে — তিনি তখন ক্লাসে প্রবেশ করছেন। সেই মুহূর্তে বিদ্যালয়ের সে ছাত্র যেমন করে তার উন্মত্ত আবেগকে দমন করে ও অসহ্য ক্রোধকে সংযত

করে — তেমনই এক মুহূর্তে আন্দ্রির ক্রোধ অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন কোন দিন সে কখনও ক্রুদ্ধ হয় নি। তার সামনে সে কেবল দেখতে পেল তার ভীষণ পিতাকে।

'হুঁ, এখন তাহলে কী করা যায়?' তারাস জিজ্ঞাসা করলেন, সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে।

আন্দ্রি জানে না কী বলতে হবে, মাটির দিকে চোখ নীচু করে সে রইল।

'তাহলে, বাছা আমার, তোর পোলরা তোকে সাহায্য করল?'

আন্দ্রি নিরুত্তর।

'বিক্রি করলি? ধর্মবিশ্বাসকে বিক্রি করলি? আপনজনকে বিক্রি করলি? বেশ, নেমে আয় তোর ঘোড়া থেকে!'

শিশুর মতো বিনীতভাবে আন্দ্রি ঘোড়া থেকে নেমে তারাসের সামনে দাঁড়াল জীবন্মৃত অবস্থায়।

'দাঁড়া স্থির হয়ে, নড়িস না! আমি তোকে জন্ম দিয়েছি, আমিই তোকে মারব!' বলে তারাস কয়েক পা পিছিয়ে এসে কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে হাতে নিলেন।

সাদা চাদরের মতো আন্দ্রি বিবর্ণ; দেখা গেল, অতি ধীরে নড়ছে তার ঠোঁট, সে যেন কার নাম উচ্চারণ করছে; কিন্তু এ নাম তার দেশের নয়, তার মায়ের নয়, তার ভাইদের নয় — এ নাম সেই অপূর্ব-সুন্দরী পোলীয় তরুণীর। তারাস বন্দুক ছুঁড়লেন।

কাস্তে-কাটা শস্যশীর্ষের মতো, বুকে লৌহাস্ত্রের সাংঘাতিক আঘাত-লাগা মেষ-শাবকের মতো, মাথা নুয়ে এলো আন্দ্রির, দূর্বাদলের উপর সে পড়ে গেল একটি কথাও না বলে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ সেই বিগত-নিশ্বাস মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন পুত্রহন্তা। মরণেও সে সুন্দর: তার বীরত্বব্যঞ্জক মুখ, অল্প কিছুক্ষণ আগে পূর্ণ ছিল শক্তিতে ও নারীজয়ী অজেয় সম্মোহনে, এখনও তাতে প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ময়কর সৌন্দর্য; মখমলের শোকচিহ্নের মতো কালো ভুরু তার মুখের বিবর্ণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কী কসাকই না সে হতে পারত!' তারাস বললেন, 'দীর্ঘ আকার, কালো ভুরু, মুখ যেন অভিজাতের, হাত সংগ্রামে কঠিন! কিন্তু মরল, মরল বিনা গৌরবে, হীন কুকুরের মতো!'

'বাবা, তুমি করেছ কী? তুমিই ওকে মেরেছ?' এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসতে আসতে অস্তাপ বলল।

তারাস মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করলেন।

স্থিরদৃষ্টিতে মৃতের চোখের দিকে তাকাল অস্তাপ। ভাইয়ের শোকে অভিভূত হয়ে সে বলল:

'তাহলে আমরা একে সসম্মানে সমাধিস্থ করব, বাবা, যাতে শত্রুরা একে অপমান করতে না পারে, না পারে শকুনি-গৃধিনীরা একে ছিঁড়ে খেতে।'

'এর সমাধির জন্যে আমাদের দরকার হবে না!' বললেন তারাস, 'অনেক লোক আছে এর জন্যে কাঁদবে, শোক করবে!'

মিনিট দুয়েক তিনি ভাবলেন: একে কি ফেলে যাবেন নেকড়ে বাঘের শিকার হওয়ার জন্য, না সম্মান করবেন এর বীরোপম সাহসিকতাকে, কেননা সে যেই হোক না কেন, বীর হলে তার মর্যাদা রক্ষা করা বীরের কর্তব্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখা গেল গোলোকোপিতেন্‌কো ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর দিকে আসছে:

'মহাবিপদ, সর্দার, পোলদের জোর বেড়েছে, তাদের সহায়ে এসেছে নতুন সৈন্যদল!..'

গোলোকোপিতেন্‌কোর কথা শেষ হতে না হতে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো ভোভ্‌তুজেন্‌কো:

'মহাবিপদ, সর্দার, ওদের আরও নতুন সৈন্য আসছে!..'

ভোভ্‌তুজেন্‌কোর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘোড়া ছাড়াই বেগে ছুটে এলো পিসারেন্‌কো:

'কোথায় তুমি, বাবা? কসাকরা তোমায় খুঁজছে। ইতিমধ্যেই মারা গেছেন কুরেন-সেনাপতি নেভিলিচ্‌কি আর জাদোরোজ্‌নি, আর চেরেভিচেন্‌কো। তবুও খাড়া আছে কসাকরা, তারা মরতে চায় না তোমাকে চোখে না দেখে; তারা চায় তাদের মৃত্যুর সময় তুমি তাদের দেখ।'

'ঘোড়ায় চড়, অস্তাপ!' হাঁক দিলেন তারাস, দ্রুত চললেন তাঁর কসাকদের দিকে। একবার তাদের দেখবেন এবং মৃত্যুর আগে দেখা দেবেন তাদের নেতা হিসাবে।

কিন্তু বন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বের হওয়ার আগেই শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলল বনের চারদিকে, সর্বত্র গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল অশ্বারোহী সৈন্য তরবারি ও বর্শায় সুসজ্জিত। 'অস্তাপ!.. অস্তাপ, হার মানিস না!..'

চিৎকার করলেন তারাস, এবং চারদিক থেকে যারা এগিয়ে এলো তরবারি উন্মুক্ত করে তাদের আঘাত করতে লাগলেন। অস্তাপের উপর ইতিমধ্যেই লাফিয়ে পড়েছিল ছয়জন; কিন্তু লাফিয়ে পড়েছিল কুক্ষণে। একজনের মাথা উড়ে গেল, অন্য জন পিছাতে গিয়ে ডিগ্‌বাজী খেল; তৃতীয়ের পাঁজরে বিঁধল বর্শা; চতুর্থের সাহস ছিল বেশি, গুলি থেকে সে নিজের মাথা বাঁচাল কিন্তু অগ্নিময় গুলি এসে বিঁধল তার ঘোড়ার বুকে, উন্মত্ত অশ্ব পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার চাপে মারা পড়ল আরোহী। 'বহুৎ আচ্ছা, বাচ্চা!.. বহুৎ আচ্ছা, অস্তাপ!..' গর্জন করলেন তারাস। 'আমিও এখনই যাচ্ছি তোর কাছে!..' তিনিও নিজে তাড়াতে লাগলেন আক্রমণকারীদের। আহত ও নিহত করতে লাগলেন তারাস, যে মাথাই এগিয়ে আসে তাদের উপরেই হানতে লাগলেন তাঁর আঘাত; তবু তাঁর চোখ সমস্তক্ষণ সামনে অস্তাপের দিকে; দেখলেন তাকে নতুন করে আক্রমণ করছে একসঙ্গে আটজন। 'অস্তাপ!.. হার মানিস না, অস্তাপ!..' কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই অস্তাপকে পরাস্ত করেছে; একজন তার গলায় পরিয়ে দিল দড়ির ফাঁস — তারা তাকে বেঁধে নিয়ে চলল। 'অস্তাপ, হায়, অস্তাপ!..' চিৎকার করে তারাস তার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, যারা এগিয়ে এসে বাধা দিল তাদের কেটে টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। 'অস্তাপ, হায়, অস্তাপ!..' এমন সময় তাঁকে আঘাত করল যেন পাথরের মতো ভারী একটা কিছু। তাঁর চোখের সামনে সবকিছুই ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল। ক্ষণেকের তরে মানুষের মাথা, বর্শা, ধোঁয়া, আগুনের ফুলকি একাকার হয়ে ঝলকে উঠল তাঁর চোখে, খেলে গেল পাতায় ভরা গাছের ডালের দৃশ্য। ভূপাতিত ওক-গাছের মতো সশব্দে তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল তাঁর দৃষ্টি।

১০

'অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি!' যেন ভারাক্রান্ত পানোন্মত্ত নিদ্রার পর চেতনা ফিরে পেয়ে তারাস বললেন, তাঁর চারপাশের বস্তুকে চেনার চেষ্টা করতে করতে। এক ভীষণ দুর্বলতায় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন। চোখের সামনে অস্পষ্ট নাচছে এক অচেনা ঘরের দেয়াল ও কোণ। অবশেষে তিনি লক্ষ

করলেন যে তাঁর সামনে বসে আছেন তভ্‌কাচ, মনে হয় যেন তাঁর প্রতিটি নিশ্বাসের জন্য কান পেতে আছেন।

'তবু ভালো,' নিজের মনে ভাবলেন তভ্‌কাচ, 'এ ঘুম তোমার একেবারেই নাও ভাঙতে পারত।' কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না, শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে নির্দেশ দিলেন চুপ করার।

'কিন্তু আমাকে বল আমি কোথায় আছি এখন?' ভাবনাগুলি গুছিয়ে নিয়ে কী ঘটেছে স্মরণ করার চেষ্টা করে আবার প্রশ্ন করলেন তারাস।

'চুপ করে থাক!' কঠিন স্বরে চিৎকার করলেন তাঁর বন্ধু 'বলব আবার কী? দেখতে পাচ্ছ না কি যে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে? আজ দুসপ্তাহ হল আমরা তোমাকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটছি নিশ্বাস বন্ধ করে, প্রচন্ড জ্বরে তুমি বেহুঁশ হয়ে আবোল-তাবোল বকেছ। এই প্রথম তুমি ঘুমিয়েছ শান্ত হয়ে। যদি কপালে দুঃখ না চাও ত চুপ করে থাক।'

কিন্তু চিন্তায় শৃংখলা এনে তারাস তখনও চেষ্টা করতে লাগলেন অতীতের কথা স্মরণ করতে।

'পোলরা ত আমাকে চারদিকে ঘিরে প্রায় আটক করে ফেলেছিল? সে ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে আসার কোন উপায় ত ছিল না?'

'থাম বলছি, শয়তানের বাচ্চা!' রুক্ষভাবে চেঁচালেন তভ্‌কাচ, যেন এক ধাত্রী ধৈর্য হারিয়ে অশান্ত দুষ্টু ছেলেকে শাসন করছে। 'কী লাভ হবে তোমার জেনে তুমি কী ভাবে বেরিয়ে এলে? এই ত যথেষ্ট যে বেরিয়ে এসেছ। এমন লোক ছিল যারা বেইমানি করে নি — এই যথেষ্ট! আমাদের এখনও অনেক রাত ঘোড়ার পিঠে ছুটতে হবে। তুমি কি ভাব যে ওরা তোমাকে সাধারণ কসাক মনে করে? না, হে, না। তারা তোমার মাথার দাম ধরেছে দু হাজার মোহর।'

'আর অস্তাপের কী হল?' হঠাৎ চিৎকার করলেন তারাস। তিনি ওঠার চেষ্টা করলেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যে তাঁর চোখের সামনেই অস্তাপ আক্রান্ত ও আবদ্ধ হয়েছিল, এখনও সে নিশ্চয় পোলদের হাতেই আছে।

তাঁর বয়োবৃদ্ধ মস্তক শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে সব পটি-বন্ধন তিনি ছিঁড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করলেন, চিৎকার করে

কিছু বলার চেষ্টা করলেন — তার বদলে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন, জ্বর-বিকার আবার তাঁকে অভিভূত করল, অর্থহীন সঙ্গতিহীন প্রলাপ-বচনে তিনি রত হলেন।

তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অবিরাম তিরস্কার ও রূঢ় বাক্যবর্ষণ করতে লাগলেন তাঁর উপর। শেষে তিনি তাঁর হাতপা জাপটে ধরে, শিশুর মতো তাঁকে আবার বস্ত্রাবৃত করলেন, তাঁর সকল পটি আবার লাগিয়ে দিলেন, বলদের চামড়ায় ঢাকলেন তাঁর দেহ, কাঠের পাটা গায়ে এঁটে দিলেন, এবং ঘোড়ার জিনে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আবার দ্রুতগতিতে পথ বয়ে ছুটলেন।

'বাঁচ আর মর তোমাকে নিয়ে আমি যাব! পোলরা বিদ্রূপ করবে তোমার কসাক জন্ম নিয়ে, তোমার দেহকে কেটে টুকরো করে জলে ফেলে দেবে, এ কিছুতেই হতে দেব না। আর এমনই যদি হয় যে শেষপর্যন্ত তোমার মৃতদেহ থেকে নখ দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলবে ঈগলপাখি, তাহলে সে হোক স্তেপের ঈগল, আমাদের ঈগল, পোলীয় ঈগল নয়, নয় এমন ঈগল যে উড়ে আসে পোলীয় ভূমি থেকে। তুমি মরে গেলেও তোমাকে আমি নিয়ে যাব ইউক্রেন পর্যন্ত।'

এইভাবে বললেন বিশ্বস্ত বন্ধু। দিনরাত বিনা বিশ্রামে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হলেন তিনি, এবং অচৈতন্য অবস্থায় তারাসকে নিয়ে এলেন একেবারে জাপোরোজীয় সেচ্ পর্যন্ত। সেখানে তিনি অশ্রান্তভাবে তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন নানা ভেষজ ও মলম দিয়ে; তিনি খুঁজে বার করলেন এক পারদর্শিনী ইহুদিনীকে, সে একমাস ধরে নানারকমের ওষুধ সেবন করাল তাঁকে, পরিশেষে তারাস সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। হয় ওষুধপত্র অথবা তাঁর লৌহোপম শারীরিক শক্তির জন্য তিনি বেঁচে উঠলেন। দেড় মাসের মধ্যেই তিনি আবার খাড়া হলেন নিজের পায়ে, তাঁর ক্ষতগুলি শুকিয়ে গেল, কেবল তরবারির আঘাত-চিহ্নগুলি থেকে বোঝা যেত কী গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন এই বৃদ্ধ কসাক।

কিন্তু স্পষ্টতই বিষণ্ণ ও শোকার্ত হয়ে রইলেন তিনি। তাঁর কপালে ফুটে উঠল তিনটি মোটা কুঞ্চন-রেখা, সে রেখা কখনও মিলিয়ে যেত না। তাঁর চারদিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন: সেচে সবই নতুন, পুরনো বন্ধুরা সকলেই মৃত। ন্যায়পক্ষের জন্য, ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্বের জন্য যারা খাড়া হয়েছিল তাদের একজনও অবশিষ্ট

নেই। আর যারা ক্যাম্প-সর্দারের সঙ্গে গিয়েছিল তাতারদের পশ্চাদ্ধাবনে, তারাও অনেক আগে অবলুপ্ত হয়েছে, সকলেই মরেছে — কেউ যুদ্ধের মধ্যেই, কেউ খাদ্য-পানীয় অভাবে ক্রিমিয়ার লবণাক্ত ভূমিতে, কেউ বন্দী অবস্থায় অপমান সইতে না পেরে; আগেকার ক্যাম্প-সর্দার ও তাঁর প্রাচীন সঙ্গী-সাথীদের কেউই আর এ পৃথিবীতে নেই; যেখানে এককালে ছিল কসাক-শক্তির ফুটন্ত উৎস তাতে বহুদিন ধরে দূর্বা গজাচ্ছে। তাঁর মনে হল যেন শেষ হয়ে গেছে এক ভোজনোৎসব — সাড়ম্বর, কোলাহলপূর্ণ এক ভোজনোৎসব: ভোজন-পাত্র সমস্ত ভেঙে চুরমার; একফোঁটা মদও কোথাও পড়ে নেই; নিমন্ত্রিত ও ভৃত্যেরা সব লুঠ করেছে যত মূল্যবান পানপাত্র আর ভোজন-পাত্র; গৃহস্বামী বিষণ্নভাবে দাঁড়িয়ে ভাবছে, 'এ ভোজনোৎসব না হলেই ছিল ভালো।' বৃথা চেষ্টা তাদের তারাসের চিত্তাকর্ষণের বা তাঁকে আনন্দ দানের; বৃথাই শ্বেত-শ্মশ্রু বান্দুরা-বাদকেরা দু'জন বা তিনজনে দল বেঁধে তাঁর কসাক বীরত্বের গৌরবগান গাইতে এলো। শুষ্ক-কঠোর চোখে উদাসীনভাবে তিনি সবকিছুই তাকিয়ে দেখেন, তাঁর পরিবর্তনহীন মুখে ফুটে ওঠে এক অনির্বাপিত বেদনাবোধ, ধীরে মাথা নীচু করে তিনি আর্তনাদ করেন, 'বাছা আমার! আমার অস্তাপ!'

নীপার-কসাকরা এক সামুদ্রিক অভিযানে বের হল। নীপার নদীতে নির্গত হল দু'শ' নৌকো। এশিয়া-মাইনরে দেখা গেল কসাকের মুণ্ডিত মস্তক ও দীর্ঘ ঝুঁটি, তার সমৃদ্ধ তীরভূমিকে তারা বিধ্বস্ত করল অসিতে ও অগ্নিতে; মুসলমান অধিবাসীদের পাগড়ী রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে অসংখ্য ফুলের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে গেল সমুদ্রতীর বয়ে। সেখানে দেখা দিল অনেক নীপার-কসাকের আলকাতরা-মাখানো ঢিলা সালোয়ার, কালো চাবুকসমেত অনেক পেশীবহুল হাত। নীপার-কসাকরা সব আঙুর খেয়ে শেষ করল, নষ্ট করল সব আঙুর-ক্ষেত; মসজিদে বিষ্ঠার স্তূপ প্রক্ষেপ করল; মূল্যবান পারস্যদেশীয় শাল তারা কাজে লাগাল কোমরবন্ধের বদলে এবং তা দিয়ে বাঁধল তাদের আলকাতরা-মাখানো আলখাল্লা। নীপার-কসাকদের ছোট মাপের পাইপ এই সব স্থানে পাওয়া গেছে বহুকাল পরেও। উল্লাসে গৃহাভিমুখে নৌকো ফিরাল তারা; একটা দশ-কামানওয়ালা তুর্কী জাহাজ পিছন থেকে তাদের ধরে ফেলল, একবারের গোলার আঘাতে তাদের হালকা নৌকোগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে দিল পাখির মতো। তাদের এক-তৃতীয়াংশ নিমজ্জিত হল সমুদ্রগর্ভে, কিন্তু অবশিষ্টাংশ আবার একত্রিত হয়ে

নীপার নদীর মোহানায় এসে পৌঁছল, সেকুইন-মুদ্রায় ভরা বারোটি পিপে সমেত। কিন্তু এই সব ব্যাপারে তারাসের আর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে মাঠে বা স্তেপে যেতেন বুঝি শিকার করতে, কিন্তু তাঁর গুলিবারুদ অব্যবহৃত পড়ে থাকত। বন্দুক নামিয়ে তিনি সমুদ্রতীরে বসে থাকতেন বিষণ্ণভাবে। মাথা নীচু করে বসে থাকতেন বহুক্ষণ, কেবলই বলতেন, 'আমার অস্তাপ! আমার অস্তাপ!' সামনে তাঁর বিস্তৃত কৃষ্ণ সাগর ঝলমল করত; দূরে নলখাগড়ায় চিৎকার করত শঙ্খচিল; তাঁর সাদা গোঁফ রূপার মতো ঝক্‌ঝক্ করত, আর একটির পর একটি গড়িয়ে পড়ত অশ্রুবিন্দু।

অবশেষে তারাস আর সহ্য করতে পারলেন না। 'যা হবার হোক, ওর কপালে কী ঘটেছে জানতেই হবে আমাকে: বেঁচে আছে? না কি কবরে? কিংবা হয়ত কবরও সে পায় নি? আমি জানব, তা আমার যা ঘটুক না কেন!' এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উমান্ শহরে এসে উপস্থিত হলেন সশস্ত্র বেশে, সঙ্গে বর্শা ও তরবারি, জিনে লাগানো পথের জলপাত্র, পথের ভোজ্যের মাটির বাসনপত্র, গুলিবারুদ, ঘোড়ার লাগাম ও অন্যান্য সজ্জাদি। তিনি সোজা ঘোড়া চালালেন এক অপরিস্কার নোংরা ছোট কুঁড়ের দিকে, কুঁড়েটির ছোট ছোট জানলাগুলি ধোঁয়ার ঝুলে এমনই ঢাকা যে প্রায় চোখে পড়ে না। তার চিমনির নলে ছেঁড়া ন্যাকড়া গোঁজা, গর্তে-ভরা ছাতে সর্বত্র চড়াই পাখি। দরজার ঠিক সামনে জঞ্জালের স্তূপ। একটি জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক ইহুদিনীর মাথা, মলিন মুক্তায় সাজানো টুপি তার মাথায়।

'কর্তা বাড়িতে আছে?' ঘোড়া থেকে নেমে, দরজার কাছে লোহার আঁকড়ায় লাগাম লাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বুলবা।

'আছেন,' উত্তর দিল ইহুদিনী, এবং ঘোড়ার জন্য এক ঝুড়ি গম ও অশ্বারোহীর জন্য একপাত্র বিয়ার নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

'তোমার ইহুদীটি কোথায়?'

ইহুদিনী বলল, 'তিনি অন্য কামরায়, উপাসনা করছেন।' বুলবা যখন বিয়ারের পাত্র মুখে তুললেন তখন তাকে অভিবাদন করে কুশল কামনা করল সে।

'তুমি এইখানে থেকে আমার ঘোড়াকে খানা-পিনা দাও, আমি গিয়ে তার সঙ্গে একা কথা বলব। তার সঙ্গে আমার কাজ আছে।'

এই ইহুদী আর কেউ নয়, ইয়ান্‌কেল। ইতিমধ্যেই সেখানে সে

পাট্টাদার ও পানশালার অধিকারী হিসাবে জমিয়ে বসেছে; একটু একটু করে চারপাশের সব অভিজাত ও ভদ্রলোকদের কব্জা করেছে; একটু একটু করে তাদের সব অর্থ শুষে নিয়েছে এবং স্থানীয় ব্যাপারে তার ইহুদীয় উপস্থিতি টের পাইয়ে ছেড়েছে। তিন মাইল ক্যাসার্ধের মধ্যে একটি কুটিরও সম্পূর্ণ অবস্থায় রইল না: সব ভেঙে-চুরে পড়ল, সবই মদের স্রোতে ডুবল, রইল কেবল দারিদ্র্য ও ছিন্নকন্থা; সমস্ত অঞ্চল যেন বিধ্বস্ত হল অগ্নিকাণ্ডে অথবা মহামারীতে। ইয়ান্‌কেল যদি আর দশ বছর সেখানে থাকতে পারত তা হলে সে নিশ্চয় সমস্ত এলাকাটিকে উৎসন্ন করে দিত। তারাস তার কামরায় প্রবেশ করলেন। ইহুদী উপাসনা করছিল, তার মাথায় অতি ময়লা এক আবরণ; তার ধর্মের আচরণ অনুযায়ী শেষবারের মতো থুতু ফেলার জন্য যখন সে মুখ ঘুরাল, তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল বুলবার উপর, বুলবা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইহুদীর চোখে সর্বাগ্রে ভেসে উঠল দু হাজার স্বর্ণমুদ্রা যা তাঁর মাথার মূল্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু সে লজ্জিত বোধ করল তার অর্থলোভে, চিরন্তন যে অর্থচিন্তা কীটের মতো ইহুদীর আত্মায় জড়িয়ে থাকে তা দমন করতে চেষ্টা করল সে।

'শোন, ইয়ান্‌কেল!' তারাস বললেন ইহুদীকে, সে ইতিমধ্যেই তাঁর সামনে মাথা নোয়াতে শুরু করেছে এবং সাবধানে দরজায় তালা দিয়েছে যাতে কেউ তাদের দেখতে না পায়। 'আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি — নইলে, নীপার-কসাকেরা তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত কুকুরের মতো; এখন তোমার পালা, এখন আমার একটি কাজ তোমায় করতে হবে!'

ইহুদীর মুখে কুঞ্চিত রেখার আভাস দেখা গেল।

'কী ধরনের কাজ? যদি এমন কাজ হয় যা আমি করতে পারি, তাহলে কেন আমি তা করব না?'

'বেশি কথার দরকার নেই। আমাকে নিয়ে চল ওয়ারশতে।'

'ওয়ারশতে? কী বলছেন আপনি! ওয়ারশতে?' ইয়ান্‌কেল বলল, তার ভুরু ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল বিস্ময়ে।

'বেশি কথা নেই। নিয়ে চল আমাকে ওয়ারশতে। যা হবার হোক, আমি তাকে আর একটিবার দেখতে চাই, অন্তত একটি কথা বলতে চাই তাকে।'

'কার সঙ্গে একটি কথা?'

'অস্তাপের সঙ্গে, আমার ছেলের সঙ্গে।'

'প্রভু কি এখনও জানেন না যে ইতিমধ্যে...'

'জানি, জানি সবই: দু হাজার মোহর তারা ঘোষণা করেছে আমার মাথার জন্য। বোকারামেরা জানে এর দাম! আমি তোমাকে দেব পাঁচ হাজার। এই এখনই দিচ্ছি দু হাজার,' বুলবা চামড়ার থলি থেকে দু হাজার মোহর ঢেলে দিলেন, 'বাকিটা দেব ফিরে এসে।'

ইহুদী তখনই একটা তোয়ালে এনে সেগুলিকে ঢাকল।

'আহ্, কি চমৎকার মোহর! আহ্, বড় ভালো মোহর!' একটিকে হাতে নাচিয়ে ও দাঁতে পরীক্ষা করে সে বলল। 'আমি ভাবছি, যে-লোকের কাছ থেকে প্রভু এই সুন্দর মোহরগুলো লুট করেছেন, সে তার পরে নিশ্চয় একঘণ্টাও বাঁচে নি, সোজা গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল, এই চমৎকার মোহরগুলোর শোকে ডুবে মরেছিল।'

'আমি তোমার কাছে আসতাম না। হয়ত আমি একাই যেতে পারতাম ওয়ারশতে; কিন্তু ওই হারামজাদা পোলরা হয়ত আমাকে চিনে ফেলে আটক করে ফেলবে। মিথ্যারচনায় আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। আর তোমরা, ইহুদীরা, এই জন্যেই জন্মেছ। তোমরা স্বয়ং শয়তানকে ঠকাতে পার; সব চালাকি তোমাদের জানা; সেই জনোই আমি এসেছি তোমার কাছে! তাছাড়া, ওয়ারশতেও আমি একা কিছুই করতে পারতাম না। এখন তোমার মালগাড়িটা সাজাও আর নিয়ে চল আমাকে!'

'প্রভু কি ভাবেন যে আমার ঘোড়াটাকে এখনি এনে গাড়িতে লাগিয়ে, 'হ্যাট্, হ্যাট্, জলদি চল্' বললেই হল? প্রভু কি ভাবেন যে তিনি যেমন আছেন তেমনভাবেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া চলে, লুকানোর দরকার নেই?'

'তাহলে লুকোও আমাকে, যেভাবে পার; একটা খালি মদের পিপের মধ্যে হতে পারে?'

'ওরে ব্বাপ্স! প্রভু ভাবছেন তাঁকে মদের পিপেয় লুকানো যায়? প্রভু কি জানেন না যে সবাই ভাববে পিপেতে ভোদ্কা আছে?'

'তা, ভাবুক-না তারা যে ভোদ্কা আছে।'

'কী বললেন? ভাবুক-না তারা যে ভোদ্কা আছে?' বলল ইহুদী ও তার কানের পাশের চুলের গোছা দু হাতে টেনে পরে হাতদুটি উঁচুতে তুলল।

'তা তুমি এতে এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'প্রভু কি জানেন না যে সবাই ভোদ্কা খেতে চাইবে বলেই ঈশ্বর ভোদ্কার সৃষ্টি করেছিলেন? সেখানকার সব মানুষ ভোজনবিলাসী, মিষ্টি

খেতে ভালোবাসে: পিপে দেখলেই লোকেরা পিপের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে আসবে পাঁচ মাইল পথ, ফুটো করে দেবে পিপেতে আর যেই দেখবে কিছুই গড়িয়ে পড়ছে না, অমনি বলবে, 'ইহুদী কখনও খালি পিপে বয়ে বেড়ায় না; নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে কিছু। ধর্ ইহুদীটাকে, বাঁধ ইহুদীটাকে, কেড়ে নাও ইহুদীটার সব টাকাকড়ি, পাঠাও ইহুদীটাকে জেলে।' কারণ, যেখানে যাকিছু অন্যায় হয় তার দোষ পড়ে ইহুদীর ঘাড়ে; কারণ, ইহুদীকে সবাই ভাবে কুকুরের মতো; তারা ভাবে, যদি কেউ ইহুদী হয় তাহলে সে মানুষই নয়।'

'তাহলে, আমাকে রাখ, মাছের গাড়িতে।'

'সে হয় না প্রভু; ঈশ্বরের দিব্যি, পারব না। সমস্ত পোল্যাণ্ডে লোকেরা এখন ক্ষুধায় পাগল, কুকুরের মতো: তারা সব মাছ চুরি করবে, প্রভুকে ধরে ফেলবে।'

'বেশ, তাহলে শয়তানের পিঠে পার, সেখানেই চাপাও, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়া চাই।'

'শুনুন, শুনুন প্রভু!' — ইহুদী তার জামার আস্তিন গুটিয়ে এবং দু হাত প্রসারিত করে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলল। 'শুনুন কী আমরা করব। এখন সর্বত্র তৈরী হচ্ছে দুর্গ ও প্রাসাদ; বিদেশ থেকে এসেছে ফরাসী এঞ্জিনিয়ারেরা, প্রচুর ইট-পাথর চালান হচ্ছে পথে পথে। প্রভু একটা মালগাড়ির তলায় শুয়ে থাকবেন, তার ওপরে আমি সাজিয়ে দেব ইট। প্রভুকে দেখতে ত বেশ সুস্থ সবল লাগছে, তাই একটু চাপ পড়লে বেশি কিছু ক্ষতি হবে না; আমি তলায় একটা ফাঁক রেখে দেব যাতে প্রভুকে খাওয়ানো যায়।'

'কর যা তোমার খুশি, কেবল নিয়ে চল আমাকে।'

একঘণ্টার মধ্যেই দুটি শীর্ণ ঘোড়ায় টানা ইট-বোঝাই এক মালগাড়ি বের হয়ে পড়ল, উমান্ শহর থেকে। একটা ঘোড়ায় চড়ে বসল ঢ্যাঙা ইয়ান্কেল — পথের মাইল-চিহ্ন দেওয়া খুঁটির মতো সে দেখতে লম্বা — ঘোড়ার পিঠে উঁচুনীচু দোল খাওয়ার সময় তার কানের পাশের দীর্ঘ চুলের গোছা ইহুদী-টুপির তলা থেকে বের হয়ে দুলতে লাগল।

১১

বর্ণিত ঘটনাবলী যে কালে ঘটছিল তখন সীমানায় কোন রকম শুল্কালয়ের কর্মচারী ও উদ্যমী লোকের কাছে ভয়প্রদ সওয়ার পাহারা থাকত না; ফলে সকলেই ইচ্ছামতো মালপত্র চালাচালি করতে পারত। অনুসন্ধান বা পরিদর্শন কেউ করলে, তা করত প্রধানত ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিতে, বিশেষত, মালগাড়িতে যদি এমন কিছু থাকত যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যদি এই ব্যক্তির হাতে থাকত যথেষ্ট শক্তি ও প্রভাব। কিন্তু ইট দেখে কারও লোভ হয় নি এবং তা নির্বিঘ্নে শহরের প্রধান তোরণগুলি পার হয়ে গেল। বুলবা তাঁর সংকীর্ণ খাঁচা থেকে শুনতে পেলেন কেবল পথের গোলমাল, গাড়িচালকদের চিৎকার, আর কিছুই নয়। ইয়ান্‌কেল, তার ক্ষুদ্রাকার ধূলিলিপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে ঝাঁকুনি খেতে খেতে কতকগুলি ঘুরপাক দেওয়ার পর মোড় ঘুরল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। রাস্তার নাম 'ময়লা' বা 'ইহুদী রাস্তা', কেননা এখানে বাস করত ওয়ারশ-শহরের প্রায় সকল ইহুদী। রাস্তাটি দেখলে মনে হত ঠিক যেন বাড়ির পিছনের উঠানগুলি সামনে এসে পড়েছে। মনে হয় যেন সূর্যালোক এখানে কখনই আসে না। কালক্রমে একেবারে কালো হয়ে যাওয়া কাঠের বাড়িগুলি ও জানলা থেকে বেরিয়ে আসা বহুসংখ্যক কাঠের খুঁটির ফলে অন্ধকার আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মাঝেমাঝে দেখা যেত লাল ইটের দেওয়াল, কিন্তু তাও স্থানে স্থানে মলিন হয়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে। কদাচিৎ দেখা যেত দেওয়ালের মাথার চূণকাম-করা সাদা দিকটা, সূর্যালোক তার উজ্জ্বলতা চোখ ধাঁধিয়ে দিত। এখানকার সব দৃশ্যই চোখকে পীড়া দেয়: চিমনির নল, ছেঁড়া ন্যাকড়া, আবর্জনার স্তূপ, ভাঙা-চোরা বাসনপত্র। যা কিছু অব্যবহার্য, তাই ছুঁড়ে ফেলা হত পথে, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিতে সর্বপ্রকারে পথিকের পঞ্চেন্দ্রিয় হত পীড়িত। রাস্তার দু পাশের বাড়িগুলিতে আড়াআড়ি লাগানো খুঁটিগুলির উপর ঝুলত ইহুদীদের মোজা, ছোট পায়জামা ও ধোঁয়ায় ঝলসানো হাঁস। ঘোড়ায় চড়া যাত্রী তার হাত দিয়েই এ খুঁটিগুলি প্রায় ছুঁতে পারত। কখন হয়ত ভেঙে-পড়া ছোট জানলার ভিতর থেকে উঁকি মারত ইহুদী বালিকার সুন্দর মুখ, মলিন পুঁতির-গয়নায় সাজানো। একদল ইহুদী ছোকরা ধুলো-মাখা, ছেঁড়া পোশাক পরা, কোঁকড়া-চুল, চেঁচামেচি করে কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। পাটকিলে-চুলো এক ইহুদী, সারা মুখে নানা

দাগের ফলে তাকে দেখাচ্ছিল চড়াই পাখির ডিমের মতো; জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে তখনই ইয়ান্‌কেলের সঙ্গে কথা শুরু করল তার অবোধ্য ভাষায়, ইয়ান্‌কেল তখনই একটা বাড়ির উঠানে প্রবেশ করল। অন্য একজন ইহুদী পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সেও থেমে কথায় যোগ দিল; শেষ পর্যন্ত বুলবা যখন ইটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন যে তিনজন ইহুদীই কথা বলছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়।

ইয়ান্‌কেল তাঁর দিকে ফিরে বলল যে সব ঠিক হবে, তাঁর অস্তাপ এখন আছে শহরের জেলে এবং যদিও পাহারাদারদের রাজী করানো কঠিন, তবু সে আশা করে যে দেখা করানো যাবে।

বুলবা ইহুদী তিনজনের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ইহুদী আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল তাদের অবোধ্য ভাষায়। তারাস তাদের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। গভীর কী একটা উত্তেজনা যেন তাঁকে আলোড়িত করে তুলেছে, রুক্ষ ও অনাগ্রহ মুখে ফুটে উঠল কেমন যেন অদম্য আশার শিখা — সেরকম আশা কখনও-কখনও দেখা দেয় শুধু সেই মানুষের কাছে যে হতাশার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে; তাঁর বৃদ্ধ হৃদয় সজোরে স্পন্দিত হতে লাগল — যেন যুবকের মতো।

'শোন, ইহুদীরা!' বললেন তিনি, তাঁর কণ্ঠস্বরে উল্লাসের আভাস। 'তোমরা সবকিছু করতে পার এ পৃথিবীতে, সমুদ্রগর্ভ থেকেও খুঁড়ে বার করতে পার; বহুকাল থেকে কথা চলতি আছে যে ইহুদী ইচ্ছে করলে তার নিজের আত্মাকেই চুরি করতে পারে। আমার অস্তাপকে তোমরা ছাড়িয়ে দাও! শয়তানদের হাত থেকে পালাবার পথ করে দাও। এই লোকটাকে আমি বারো হাজার মোহর দেব বলেছি — আমি আরো বারো হাজার দেব। আমার যা কিছু আছে, দামী পানপাত্র, মাটিতে লুকানো সোনা, আমার বাড়ি, আমার শেষ পোশাক আমি দেব, আর তোমাদের সঙ্গে এই চুক্তি করব যে সারা জীবনে যুদ্ধে আমি যা কিছু পাব তার অর্ধেক হবে তোমাদের।

'হায়, তা হয় না, বড় কর্তা, তা হয় না!' ইয়ান্‌কেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'না, হয় না!' বলল অন্য আর একজন ইহুদী।

ইহুদী তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?' সভয়ে দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল তৃতীয় জন। 'হয়ত, ঈশ্বর সহায় হবেন।'

ইহুদী তিনজন জার্মান ভাষায় কথা বলতে লাগল। যতই কান খাড়া করে শুনুন না কেন, বুলবা তাদের একটি কথাও বুঝতে পারলেন না; যা শুনলেন তাতে কেবল বারবার উচ্চারিত হতে লাগল একটি শব্দ — 'মার্দোহায়'।

ইয়ান্‌কেল বলল, 'শুনুন, প্রভু! আমাদের পরামর্শ করতে হবে একজনের সঙ্গে যার সমান লোক পৃথিবীতে কখনও জন্মায় নি। হুঁ, হুঁ! কী অদ্ভুত জ্ঞানী, যেন সলোমন; তিনি যা না পারেন, পৃথিবীতে অন্য কারও সাধ্যি নেই তা করে। আপনি বসুন এখানে; এই চাবী রইল, কাউকে ঢুকতে দেবেন না!'

ইহুদীরা পথে বেরিয়ে পড়ল।

তারাস দরজায় তালা লাগিয়ে ছোট জানলা দিয়ে ইহুদীদের এই ময়লা রাস্তায় তাকিয়ে রইলেন। ইহুদী তিনজন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল; তাদের সঙ্গে শিগগিরই যোগ দিল আর একজন, শেষে আরও একজন। বারবার তিনি শুনতে পেলেন: 'মার্দোহায়, মার্দোহায়'। ইহুদীরা ক্রমাগত পথের একটি কোণের দিকে তাকাচ্ছিল; পরিশেষে, একটি জরাজীর্ণ বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে এলো ইহুদী-জুতা-পরা একটি পা ও ইহুদী-জামার একটি প্রান্ত। 'আঃ, মার্দোহায়! মার্দোহায়!' ইহুদীরা সকলে চিৎকার করে উঠল সমস্বরে। শীর্ণ এক ইহুদী সে, ইয়ান্‌কেলের চেয়ে মাথায় কিছুটা ছোট, কিন্তু মুখে কুঞ্চিত রেখা আরও অনেক বেশি, উপরের ঠোঁট বেশ প্রকাণ্ড; এই ধৈর্যহীন দলের দিকে সে এগিয়ে এলে ইহুদীরা সকলে তৎক্ষণাৎ তাকে সব কথা বলতে লাগল; মার্দোহায় বারবার ছোট জানলাটির দিকে তাকাল, তা থেকে তারাস বুঝলেন আলোচনা হচ্ছে তাঁরই সম্বন্ধে। মার্দোহায় বারবার হাত নাড়াল, শুনতে শুনতে কথায় বাধা দিল, থেকে থেকে পাশের দিকে থুতু ফেলল, জামার প্রান্ত উঁচু করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল কী যেন সব ঝুমঝুমির মতো, ফলে তার ময়লা পায়জামাটা খানিকটা দেখা গেল। শেষে ইহুদীরা সকলে এমন চিৎকার তুলল যে পাহারাদার ইহুদীটি বাধ্য হয়ে থামার জন্য ইঙ্গিত করল। তারাস নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু এই ভেবে তিনি শান্ত হলেন যে পথে ছাড়া ইহুদীরা আর কোন জায়গায় কথা বলতে পারে না এবং স্বয়ং শয়তানও বুঝতে পারে না এদের ভাষা।

মিনিট দুয়েক পরে ইহুদীরা সকলে প্রবেশ করল তাঁর ঘরে। মার্দোহায় তারাসের কাছে এসে তাঁর কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আমরা আর ঈশ্বর যদি কোন কিছু করতে চাই, তাহলে তা করবই।'

তারাস তাকিয়ে দেখলেন এই সলোমনের দিকে, যার সমতুল্য পৃথিবীতে কেউ জন্মায় নি; তিনি যেন আশা পেলেন। বস্তুত, তার চেহারা দেখে কেমন যেন বিশ্বাসের সঞ্চার হয়: তার উপরের ঠোঁট একদম বিকৃত, যে-কারণে ঠোঁটের স্থূলতা আরও বেড়ে গেছে, তা লোকটির আয়ত্তে ছিল না। এই সলোমনের দাড়িতে ছিল মাত্র পনের গাছি চুল, এবং সবগুলিই বাঁ ধারে। সলোমনের মুখে তার বিক্রমের ফলস্বরূপ বহু আঘাতের চিহ্ন। সংখ্যায় সেগুলি এত যে সে নিশ্চয় বহুকাল এদের হিসাব ভুলে গিয়ে আঘাতগুলিকে জন্মকালীন জড়ুল-চিহ্ন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

মার্দোহায়ের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিস্ময়ে যারা পূর্ণ সেই দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল মার্দোহায়। বুলবা একা রইলেন। তিনি পড়েছেন এক অদ্ভুত, অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে: জীবনে এমন অস্থিরতা তিনি আর কখনও অনুভব করেন নি। তিনি যেন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। তিনি যেন আর সেই বুলবা নন যা তিনি ছিলেন — অনমনীয়, অবিচলিত, শক্তিশালী যেন এক ওক-গাছ; এখন তিনি ক্ষীণচিত্ত, দুর্বল। তিনি চমকে ওঠেন প্রতিটি শব্দে, পথের শেষে প্রতিটি নতুন ইহুদী মূর্তির আবির্ভাবে। এইভাবে তিনি কাটালেন সারাটি দিন; আহার বা পান কিছুই করলেন না, পথের ধারের সেই ছোট জানলাটি থেকে একবারও চোখ ফিরালেন না। অবশেষে, সন্ধ্যা পার হয়ে গেলে দেখা দিল মার্দোহায় ও ইয়ান্‌কেল। তারাসের হৃৎস্পন্দন থেমে গেল।

'কী খবর? হবে ত?' বন্য অশ্বের অধীরতায় তিনি প্রশ্ন করলেন তাদের।

উত্তর দেওয়ার মতো সাহস ইহুদীরা সঞ্চয় করার আগেই তারাস লক্ষ করলেন রঙের যে শেষ কেশগুচ্ছ সুন্দরভাবে না হলেও মার্দোহায়ের টুপির তলা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে পড়ত, তা আর নেই। দেখা গেল যে সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু তার বদলে এমন প্রলাপ বকতে লাগল যে তারাস তার একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। ইয়ান্‌কেল নিজেও ক্ষণে ক্ষণে হাত দিয়ে মুখ চাপছিল, যেন সে সর্দিতে কষ্ট পাচ্ছে।

'ওঃ বড় কর্তা!' ইয়ান্‌কেল বলল, 'এখন কিছুই করা যাবে না! এত খারাপ লোক এরা যে থুতু ফেলতে হয় এদের মাথায়। মার্দোহায়ও এই কথা

বলবেন। মার্দোহায় যা করেছেন তা পৃথিবীতে আর কোন মানুষ করতে পারত না; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে আমরা সফল হই। তিন হাজার সৈন্য এখানে জমায়েত আছে, আর কাল প্রাণদণ্ড হবে বন্দীদের সকলের।'

তারাস ইহুদীদের চোখের দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর চাউনিতে আর অধৈর্য বা ক্রোধ নেই।

'তাহলে প্রভু যদি চান দেখা করতে, তা করতে হবে কাল সকালে, সূর্য ওঠার আগেই। পাহারাদারেরা রাজী আছে, একজন হাবিলদারও কথা দিয়েছেন। কিন্তু তারা যেন পরলোকে কোন সুখ না পায়! হায়, হায়, কী ভীষণ লোভী এই মানুষগুলো! আমাদের মধ্যেও এমন লোভী নেই: প্রত্যেক পাহারাদারকে দিলাম পঞ্চাশ মোহর আর হাবিলদারকে...

'ঠিক আছে। নিয়ে চল আমাকে তার কাছে!' তারাস বলে উঠলেন দৃঢ়চিত্তে; তাঁর অন্তরের সমস্ত শক্তি আবার ফিরে এসেছে।

ইয়ান্‌কেলের প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন। তিনি যাবেন একজন বিদেশী কাউন্টের ছদ্মবেশে, জার্মান দেশ থেকে যেন খুব সম্প্রতি এসেছেন; এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পোশাক ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছে এই দূরদর্শী ইহুদী। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গিয়েছিল, গৃহকর্তা, সেই পাটকিলে-চুলো, মুখে মেছেতাওলা ইহুদী, টেনে বার করল পাতলা একখানা তোষক, গাছের ছালের মাদুর দিয়ে তা ঢাকা, সেটা সে বিছিয়ে দিল এক বেঞ্চির উপর বুলবার জন্য। এরকম আর একটি তোষকের উপর ইয়ান্‌কেল শুয়ে পড়ল মেঝেতে। পাটকিলে-চুলো ইহুদী একটা ছোট পাত্র থেকে কী যেন পান করল, জামা খুলে ফেলল, কেবল জুতো ও মোজা পরে থাকায় তাকে দেখতে হল যেন মোরগ-ছানা। তারপর ইহুদিনীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কেমন যেন এক আলমারীর মধ্যে। সেই আলমারীর ধারে মেঝের উপর শুয়ে ছিল দুটি ইহুদী-বাচ্চা, দুটি ঘরোয়া কুকুরের মতো। কিন্তু তারাসের ঘুম নেই; স্থির হয়ে বসে তিনি টেবিলের উপর লঘুভাবে আঙুল বাজাতে লাগলেন; তাঁর মুখের পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে থাকায় ইয়ান্‌কেল ঘুমের মধ্যে হাঁচল, নিজের নাক ঢাকল কম্বল দিয়ে। আকাশে ঊষার প্রথম ক্ষীণ আভাস প্রকাশ পেতে না পেতে তারাস পা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিলেন।

'উঠে পড়, ইহুদী, দাও আমাকে তোমার কাউন্টের পোশাক।'

চোখের পলকে তাঁর সাজ হয়ে গেল; গোঁফ ও ভুরুতে কালো রঙ লাগিয়ে মাথায় পরলেন ছোট কালো টুপি — কসাকদের ভিতর যারা তাঁকে

খুব ভালো করে চেনে তারাও তাঁকে এখন চিনতে পারত না। দেখতে তাঁকে মনে হল পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি নয়। তাঁর গালে ফুটে উঠল স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা, ক্ষতচিহ্নগুলিও যেন তাঁকে কী এক মহিমা এনে দিল। সুবর্ণখচিত সজ্জায় তাঁকে মানাল চমৎকার।

পথগুলি তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন। ব্যবসায়ী লোকেদের একজনকেও ঝুড়ি হাতে তখনও শহরে দেখা যায় নি। বুলবা ও ইয়ানকেল একটা বাড়ির সামনে এলো। বাড়িটি দেখতে যেন বসে-থাকা সারস পাখির মতো। বাড়িটি নীচু, প্রশস্ত, প্রকাণ্ড, কালো রঙ-ধরা তার একধারে, সারসের গলার মতো উঁচু হয়ে গেছে লম্বা সরু একটা মিনার, তার উপর দেখা যায় ছাতের কিছুটা অংশ। এই বাড়িটিতে কাজ চলে অনেক ধরনের: এখানে আছে ছাউনি, কয়েদখানা, এমন কি একটা ফৌজদারী আদালতও। আমাদের পথিকেরা তোরণে প্রবেশ করে যেখানে এসে পড়ল, সেখানটা একটা চওড়া দালান অথবা ছাতওয়ালা প্রাঙ্গণের মতো। হাজারখানেক লোক এখানে ঘুমাচ্ছিল। ঠিক সামনে নীচু দরজা, তার সামনে বসে দু'জন পাহারাদার; একে অন্যের হাতের তালুতে দুই আঙুল দিয়ে আঘাত করে তারা এক ধরনের খেলা খেলছিল। আগন্তুকদের তারা কোন রকম লক্ষই করল না, মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল তখনই, যখন ইয়ানকেল বলল:

'আমরা এসেছি; শুনছেন মশাইরা? আমরা এসেছি।'

একহাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে তাদের মধ্যে একজন বলল, 'চলে এসো!' অন্য হাত বাড়িয়ে দিল তার সঙ্গীর আঙুলের আঘাতের জন্য।

এক সরু অন্ধকার বারান্দায় তারা প্রবেশ করল, সেখান থেকে পৌঁছল আগেকার মতো আর একটি দালানে যার উঁচুদিকে ছোট ছোট জানলা।

'কে যায় ওখানে?' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটি স্বর; তারাস দেখলেন বৃহৎ এক সৈন্যদল, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত। 'কাউকে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই।'

'এ যে আমরা!' ইয়ানকেল চেঁচাল। 'হায় ভগবান, এ যে আমরা, ওগো কর্তারা!'

কিন্তু কেউই তার কথা শুনতে চায় না। ভাগ্যক্রমে, সেই সময়ে একজন মোটা-সোটা লোক এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারা দেখে মনে হয় তিনি সেখানকার প্রধান, কেননা গালাগাল দিচ্ছিলেন সকলের চেয়ে বেশি জোরে।

'প্রভু, এ যে আমরা, আপনি ত আমাদের আগেই চেনেন; স্বয়ং কাউন্টও আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন।'

'যেতে দাও এদের, জাহান্নামে যাক শয়তানের গুষ্টি! আর কাউকে ছেড়ো না। তলোয়ার ফেলে দিয়ে হারামি করেন না...'

এই বাক-পটু আদেশের শেষ পর্যন্ত শুনল না আমাদের পথিকেরা।

'এই যে আমরা... এই আমি... আপন লোকেরা!' যার সঙ্গে দেখা হল প্রত্যেককে বলতে লাগল ইয়ান্‌কেল।

'আমরা কি এখন আসতে পারি?' বারান্দার শেষে এসে সে জিজ্ঞাসা করল একজন পাহারাদারকে।

'পার, তবে বলতে পারি না একেবারে কয়েদখানা পর্যন্ত তোমাদের ঢুকতে দেবে কি না। ইয়ান এখন ওখানে নেই: তার জায়গায় এসেছে অন্য লোক,' উত্তর দিল পাহারাদার।

'সে কী! সে কী!' মৃদু স্বরে বলল ইহুদী। 'এ যে গতিক মন্দ, বড় কর্তা!'

'এগিয়ে চল!' জেদ করে বললেন তারাস।

ইহুদী তাঁর কথা শুনল।

খিলান উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে, তার মধ্যে ভূগর্ভস্থ কারাগৃহের দরজা; তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সৈনিক, গোঁফে তিনটি থাক। প্রথম থাক গিয়েছে পিছুদিকে, দ্বিতীয়টি এসেছে সোজা সামনে ও তৃতীয়টি নেমেছে নীচের দিকে — দেখতে অনেকটা বিড়ালের মতো।

ইহুদী যতদূর সম্ভব শরীর নীচু করে পাশ ঘেঁষে গেল তার দিকে:

'হুজুর! হে মহামান্য প্রভু!'

'তুই, ইহুদী, কিছু বলছিস আমাকে?'

'আপনাকেই বলছি, বড় কর্তা!'

'হুঁ... কিন্তু আমি ত একজন সাধারণ সৈন্য!' বলল তিনথাক গোঁফওয়ালা, তার চোখ খুশিতে ভরা।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, ভগবানের দিব্যি, যে আপনি খোদ শাসনকর্তা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!..' বলতে বলতে ইহুদী মাথা দোলাতে লাগল, হাতের আঙুলগুলি ছড়িয়ে দিল। 'আহা, কেমন সম্ভ্রান্ত চেহারা। ঈশ্বরের দিব্যি, কর্নেল-সাহেব, ঠিক যেন কর্নেল-সাহেব! এখন আর একটু হলেই ত একেবারেই কর্নেল, আস্ত কর্নেল-সাহেব! প্রভুকে বসানো উচিত এমন

ঘোড়ায় যা মাছির মতো জোরে ছোটে, আর ভার দেওয়া উচিত এক রেজিমেণ্টের!'

সৈনিক তার গোঁফের নীচের থাকে তা দিল, চোখ তার একেবারে ভরে গেল খুশিতে।

'ফৌজী লোকেরা কী চমৎকার!' বলে চলল ইহুদী। 'ওঃ, সত্যি বলতে কি, এমন লোক আর হয় না! তাদের ফৌজী সাজসজ্জা... ঝলমল করে যেন সূর্যের মতো; আর ফৌজী লোক দেখলেই মেয়েরা... আহ্, আহ্!..'

ইহুদী আবার মাথা দোলাল।

সৈনিক তার গোঁফের উপরের থাকে পাকা দিল এবং দাঁতের ভিতর দিয়ে যে শব্দটি করল তা শোনাল কিছুটা ঘোড়ার চিঁহিঁ'র মতো।

'প্রভু যদি আমাদের একটু দয়া দেখান!' ইহুদী বলল, 'এই রাজকুমার এসেছেন বিদেশ থেকে, ইনি দেখতে চান কসাকরা কী রকম। ইনি জন্মে কখনও দেখেন নি কী ধরনের লোক এই কসাকরা।'

বিদেশী কাউণ্ট ও ব্যারনদের পোল্যাণ্ডে যাতায়াত ছিল খুবই প্রচলিত: তাঁরা প্রায়ই এখানে আসতেন এবং আসতেন কেবল কৌতূহলের বশে, ইউরোপের এই অর্ধ-এশীয় কোণটিকে দেখার জন্য; মস্কোভিয়া ও ইউক্রেনকে তাঁরা এশিয়ার অংশ বলে ভাবতেন। সেইজন্য সৈনিক নত হয়ে অভিবাদন করল, ভাবল, তার নিজের মতও কিছু বলা দরকার:

'আমি জানি না, মান্যবর মহাশয়,' সে বলল, 'কেন আপনি এদের দেখতে চান। এরা মানুষ নয়, কুকুর। আর তাদের ধর্ম এমন যে কেউ সম্মান করে না।'

বুলবা বলে উঠলেন, 'মিথ্যা বলছিস, শয়তানের বাচ্চা! তুই নিজেই কুকুর। কোন্ সাহসে তুই বলছিস যে আমাদের ধর্মকে কেউ মানে না? তোদের বিরুদ্ধাচারী ধর্মকেই কেউ মানে না!'

'হো, হো!' সৈনিক বলল, 'বুঝেছি, বন্ধু, তুমি কে: তুমি তাদেরই একজন যাদের আমি এখানে চৌকি দিচ্ছি। দাঁড়াও, ডাকছি এখানে আমাদের লোকেদের।'

তারাস টের পেলেন, মহা ভুল হয়েছে, কিন্তু জেদ ও বিরক্তিতে তিনি ভেবে পেলেন না কী ভাবে এর প্রতিকার করা যায়। ভাগ্যক্রমে, ইয়ান্কেল সেই মুহূর্তেই বাঁচিয়ে দিল।

'পরম সম্ভ্রান্ত প্রভু! এ কেমন করে সম্ভব যে কাউণ্ট হবেন কসাক?

আর তিনি যদি কসাকই হবেন তাহলে কাউণ্টের পোশাক, কাউণ্টের চেহারা তিনি পেলেন কী করে?'

'বানানো কথা ঢের হয়েছে!..' সৈনিক তার চওড়া মুখ হাঁ করল চিৎকারের জন্য।

'মহামান্য মহারাজ! চুপ করুন! ঈশ্বরের নামে, চুপ করুন!' চেঁচিয়ে উঠল ইয়ান্‌কেল। 'চুপ করুন! আমরা এর জন্যে আপনাকে এত দেব যা কেউ কখনও দেখে নি: আমরা আপনাকে দেব দুই সোনার মোহর।'

'বটে! দুই মোহর! দুই মোহর ত আমার কাছে কিছুই না: আমি আমার নাপিতকেই দিই দুই মোহর, শুধু আমার দাড়ি অর্ধেক কামানোর জন্যে। একশ' মোহর দিবি ত দে, ইহুদী!' এই বলে সৈনিক তার উপরের গোঁফ পাকাল। 'একশ' মোহর এখনই না দিলে, চেঁচাবই!'

'বড় বেশি চাইছে লোকটা!' ফেকাশে হয়ে গিয়ে সখেদে বলল ইহুদী, তার চামড়ার থলি খুলল সে; দেখে খুশি হল যে থলিতে একশ'র বেশি নেই এবং সৈনিক একশ'র বেশি গুণতেও জানে না। কিন্তু ইয়ান্‌কেল লক্ষ করল যে সৈনিকটি তার হাতে মোহর গোছাচ্ছে এমন ভাব করে যেন আরও বেশি চায় নি বলে তার আফশোস হচ্ছে। তা দেখে সে বলে উঠল, 'প্রভু, প্রভু! শিগগির চলে আসুন! দেখছেন ত এখানকার লোকেরা কি মন্দ!'

'সে আবার কী, ওরে শয়তান,' বললেন বুলবা, 'টাকা নিলি আর দেখতে দিবি না? তা হবে না, দেখতেই হবে। মোহর যখন নিয়েছিস তখন না করা চলবে না।'

'ভাগো, জাহান্নামে যাও! নইলে এক্ষুনি জানিয়ে দেব, তখন... পালাও, বলছি তোমাদের, জল্‌দি!'

'প্রভু! প্রভু! চলে আসুন! হায় ভগবান, চলে আসুন! গোল্লায় যাক ওরা! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এমন স্বপ্ন দেখুক যাতে থুতু ফেলতে হয়,' চিৎকার করল হতভাগ্য ইহুদী।

বুলবা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরলেন এবং পিছিয়ে এলেন; ইয়ান্‌কেল তাঁর পিছনে পিছনে এলো তাঁকে তিরস্কার করতে করতে; তার মোহরগুলি অকারণে খোয়া গেল, এই ভেবে তার গভীর দুঃখ।

'কী হবে লোকটার সঙ্গে লেগে? বলুক না কুত্তাটা যা খুশি! লোকগুলোই অমনি, গাল না পেড়ে পারে না। হায় রে কপাল, ভগবান ওদের কী সৌভাগ্যই না দিয়েছেন! একশ' মোহর কেবল আমাদের তাড়িয়ে

দেবার জন্যে। আর আমাদের ইহুদীদের বেলা: চুল ছিঁড়ে ও মুখে চোট লাগিয়ে এমন অবস্থা করে যে মুখের দিকে চাওয়া যায় না; আমাদের ত কেউ দেয় না একশ' মোহর। হে ঈশ্বর! হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!'

এই অসাফল্যে বুলবা আরও বেশি কৃতসংকল্প হয়ে উঠলেন; তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল।

'চল যাই!' হঠাৎ তিনি যেন চেতনা পেয়ে বললেন। 'চল চত্বরে। দেখতে চাই কত অত্যাচার ওরা করবে ওর ওপর।'

'কিন্তু প্রভু, কেন যাচ্ছেন। আমরা ত আর কিছুই করতে পারব না।'

'চল যাই!' জেদ করে বললেন বুলবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ইহুদী ধাত্রীর মতো তাঁর পিছু পিছু চলল।

বধ্যভূমি খুঁজে পাওয়া কঠিন হল না: চারদিক থেকে লোক সেখানে জমা হচ্ছিল। অতীতের সেই রুক্ষ যুগে এটা ছিল আকর্ষণীয়তম দৃশ্যের অন্যতম এবং তা কেবলমাত্র হীন জনতার জন্য নয়, উচ্চতর শ্রেণীর জন্যও। দলে দলে অতি ধর্মশীলা বৃদ্ধা নারী, আর অতি ভয়কাতর সে সকল কুমারী ও রমণী পরে সারা রাত ধরে রক্তাক্ত মৃতদেহের স্বপ্ন দেখবে এবং ঘুমের মধ্যে সজোরে চিৎকার করে উঠবে পানোন্মত্ত হুসার সৈনিকের মতো, তারা কেউই কৌতূহল নিবৃত্তির এমন সুযোগ ছাড়ত না। 'কী নিষ্ঠুর পীড়ন!' — তাদের মধ্যে অনেকে চোখ বন্ধ করে, মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করত বিকারগ্রস্তভাবে; তা হলেও বহুক্ষণ ধরে সেখানে থেকে যেত। অনেকে মুখ হাঁ করে, হাত বাড়িয়ে সামনের লোকেদের মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত যাতে আরও ভালো করে দেখতে পাওয়া যায়। ছোট, সরু, সাধারণ মাথার ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ত কসাইয়ের এক একটা স্থূল মুখ। সমস্ত প্রকরণ সে নিরীক্ষণ করত এক অভিজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিতে, আর এক-এক অক্ষরের শব্দ দিয়ে কথা বলত কোন অস্ত্রনির্মাণকারী কারিগরের সঙ্গে, সে কারিগর তার আপন-লোক, কেননা ছুটির দিনে তারা একই দোকানে মদ্যপান করে। কেউ কেউ উত্তেজনার সঙ্গে মন্তব্য করতে থাকত, কেউ কেউ বাজী পর্যন্ত রাখত; কিন্তু জনতার অধিকাংশ ছিল সেই ধরনের লোক, যারা সারা পৃথিবীতে যাই ঘটুক না কেন, নাক খুঁটতে খুঁটতে সবই দেখে যায় নির্বিকার ভাবে। সামনের দিকে, প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা নগররক্ষী সেনাদলের ঠিক পাশেই, দাঁড়িয়ে ছিল একজন পোলীয় যুবক। সে হয় অভিজাত, অথবা আপনাকে অভিজাত বলে চালাতে চায়; সামরিক সজ্জায় সে সজ্জিত, তার

যা কিছু সাজ পোশাক ছিল সবই সে পরে এসেছে, একটা ছেঁড়া কামিজ ও পুরনো জুতো ছাড়া আর কিছুই তার ঘরে পড়ে নেই। তার গলায় ঝুলছিল একটির উপর আর একটি — দুটি চেন, তাতে লাগানো মোহরের মতো একটা-কিছু। সে দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রেমিকা ইউজ্বীসিয়াকে পাশে রেখে, ঘন ঘন তাকিয়ে দেখছিল কেউ যেন মেয়েটির রেশমী পোশাক ময়লা না করে। সবকিছুই সে তাকে এমন বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে প্রকৃতপক্ষে বলার মতো কিছুই বাদ পড়ছিল না। সে বলতে লাগল, 'এই যে এত সব লোক দেখছ এখানে, ওগো ইউজ্বীসিয়া, এরা সব দেখতে এসেছে কেমন করে অপরাধীদের প্রাণদন্ড হয়। আর, ওগো সোনা আমার, ওই যে ওখানে লোকটিকে দেখছ যার হাতে কুঠার আর অন্যান্য অস্ত্র, ও হচ্ছে জল্লাদ, ও-ই দেবে প্রাণদন্ড। চাকার তলায় ফেলে কি অন্য কিছু করে ও যখন শাস্তি দেবে, অপরাধী তখনও বেঁচে থাকবে; কিন্তু সোনা আমার, যখন ও মাথাটি কেটে ফেলবে, তখনই মরবে অপরাধী। তার আগে পর্যন্ত সে চেঁচাবে, হাতপা ছুঁড়বে, কিন্তু মাথাটি কেটে ফেল্‌লেই সে আর চেঁচাতে, কি খেতে, কিংবা জলপান করতে পারবে না, কেননা, সোনা আমার, তখন তার আর মাথাই থাকবে না।' ইউজ্বীসিয়া এই সব শুনতে লাগল সভয়ে ও সকৌতূহলে। বাড়িগুলির ছাত লোকে ভরাট। ছোট ছোট গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মারছিল অদ্ভুত গোঁফওয়ালা বহু মুখ, তাদের মাথায় বনেটের মতো টুপি। ঢাকা বারান্দায় বসেছেন অভিজাতবর্গ। সাদা চিনির মতো ঝলমলে এক হাস্যময়ী রূপসীর সুন্দর একখানি হাত পড়ে ছিল রেলিং-এর উপর। যথেষ্ট পরিমাণে স্থূলকায় খ্যাতনামা অভিজাতেরা চারদিকে দেখছিলেন গম্ভীরভাবে। ঝোলানো হাতাওয়ালা ধবধবে পোশাকের এক ভৃত্য সকলকে পরিবেশন করছিল নানাবিধ পানীয় ও খাদ্য। মাঝেমাঝে এক কৃষ্ণনয়না লঘুচিত্ত তরুণী তার গৌরবর্ণ হাতে পিঠে বা ফল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল জনতার মধ্যে। ক্ষুধার্ত বীরদের দল তাদের টুপি তুলে ধরল খাদ্য সংগ্রহ করতে; একজন দীর্ঘদেহ অভিজাত, তার মাথা সকলের উপরে, পরনে ময়লা লাল জামায় বিবর্ণ সোনার সাজ — সেই প্রথমে তার দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে লুফে নিল খাদ্যাদি, চুম্বন করল তার অর্জনকে, বুকের উপর চেপে ধরল এবং পরে মুখে পুরে দিল। বারান্দায় ঝোলানো সোনার খাঁচায় একটি বাজপাখিও ছিল দর্শকদের মধ্যে: মাথা একদিকে হেলিয়ে, এক পা উঁচু করে সেও মনোযোগ দিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ শব্দায়মান

হয়ে উঠল জনতা, চারদিক থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'আনছে... আনছে!.. কসাকদের!..'

এলো তারা খোলা মাথায়, তাতে দীর্ঘ ঝুঁটি; তাদের দাড়িতে ক্ষুর পড়ে নি। তারা এলো নির্ভয়ে, কেমন এক শান্ত দর্পভরে, বিষাদের কোন চিহ্ন তাদের মুখে নেই; তাদের দামী পোশাক এখন জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন; জনতার দিকে তারা তাকিয়ে দেখল না, অভিবাদনও করল না। তাদের সকলের পুরোভাগে অস্তাপ।

বৃদ্ধ তারাস যখন দেখলেন তাঁর অস্তাপকে, কী মনে হচ্ছিল তাঁর? কী হচ্ছিল তাঁর বুকের ভিতরে? জনতার মধ্য থেকে তিনি তাকে দেখতে লাগলেন, তার ক্ষীণতম অঙ্গ-সঞ্চালনও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তারা ইতিমধ্যে শিরশ্ছেদের জায়গায় এসে পড়েছে। অস্তাপ থামল। সকলের আগে তাকেই পান করতে হবে এই ভীষণ পানপাত্র। সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে দেখল, হাত উঁচু করে উচ্চকণ্ঠে বলল:

'ভগবান করুন যেন এরা, এই বিধর্মীর যে দল এখানে দাঁড়িয়ে, খ্রীষ্টানের গলা থেকে আর্তনাদ যেন তারা না শোনে! আমাদের মধ্যে কেউ যেন একটি শব্দ না করে!'

এই বলে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল।

'বেশ বলেছ, বাছা আমার, বেশ বলেছ!' বুলবা বললেন মৃদু স্বরে, তাঁর পক্ককেশ মস্তক মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

অস্তাপের ছিন্নবেশ ছিনিয়ে নিল জল্লাদ; তার হাতপা বাঁধা হল বিশেষভাবে তৈরি কাঠামোয়, এবং... কিন্তু আমরা এই নারকীয় অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে পাঠককে যন্ত্রণা দেব না। এতে পাঠকের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। এ ছিল তদানীন্তন নিষ্ঠুর বর্বর যুগের এক নিদর্শন, যখন মানুষের জীবন ছিল কেবল রক্তাক্ত সামরিক কীর্তি দিয়ে ভরা, মানুষের অন্তর হয়ে উঠত লোহার মতো কঠিন, মানবিক অনুভূতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকত না। অল্প যে কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন এই যুগের ব্যতিরেক-স্বরূপ তাঁরা বৃথাই এই সব ভীতিপ্রদ আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। বৃথাই রাজা ও আলোকপ্রাপ্ত সেনাপতিরা বলেছিলেন যে শাস্তির এই ভীষণতা কেবল কসাকজাতির প্রতিহিংসা-পরায়ণতাকেই উদ্দীপিত করে। কিন্তু রাজশক্তি ও বিজ্ঞ উপদেশ তুচ্ছ হয়ে গেল শাসনকারী ধনাঢ্যের উচ্ছৃংখলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার সামনে; তাদের অবিবেচনায়, অভাবনীয়

অপরিণামদর্শিতায়, শিশুসুলভ আত্মপরায়ণতা ও তুচ্ছ অহংকারে শাসন-পরিষদকে তারা পরিণত করল শাসনকার্যের ব্যঙ্গ-চিত্রে। অস্তাপ তার সকল অত্যাচার সহ্য করল দৈত্যের মতো দৃপ্তভাবে। তখনও, যখন তার হাতের ও পায়ের হাড় ভাঙতে লাগল, যখন এই ভয়ংকর শব্দ জনতার সুদূরের দর্শকেরাও শুনতে পেল মৃত্যু-সম নিস্তব্ধতার মধ্যে, যখন মহিলারা তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, তখনও একটি শব্দ, একটি আর্তনাদও শোনা গেল না, আর্তনাদের মতো কোন শব্দ বের হল না তার মুখ থেকে, তার মুখের একটি রেখাও বিকৃত হল না। তারাস দাঁড়িয়ে ছিলেন জনতার মধ্যে মাথা নীচু করে, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি গর্বভরে উন্নত, তিনি কেবল অনুমোদনের সুরে বলতে লাগলেন, 'বেশ করেছ, বাছা আমার, বেশ করেছ!'

কিন্তু অস্তাপকে যখন শেষ মৃত্যু-যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হল তখন মনে হল যেন তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে। সে চারদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল: হায় ভগবান, সবই অজানা, অপরিচিত মুখ! তার আপনজনের কেউ যদি তার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতে পারত! সে তার দুর্বল মায়ের ক্রন্দন অনুশোচনা শুনতে চায় নি, শুনতে চায় নি কোন পত্নীর উন্মত্ত চিৎকার, যে নিজের কেশ উৎপাটিত করে তার শুভ্র বক্ষে আঘাত করবে; সে শুধু দেখতে চেয়েছিল দৃঢ়চিত্ত পুরুষকে, যার বিজ্ঞ বাণী তাকে দেবে মৃত্যুর আগে শক্তি ও সান্ত্বনা। ভেঙে পড়ে সে অন্তরের বেদনায় চিৎকার করে উঠল:

'বাবা! কোথায় তুমি? শুনতে পাচ্ছ কি?'

'শুনতে পাচ্ছি!' ধ্বনিত হয়ে উঠল সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে, সেখানকার লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গে শিউরে উঠল।

অশ্বারোহী সৈন্যের একদল তৎক্ষণাৎ ছুটল জনতাকে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে। ইয়ান্‌কেল মৃত্যুর মতো বিবর্ণ হয়ে গেল, অশ্বারোহীরা তাকে পার হয়ে যাওয়ামাত্র সে সভয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল তারাসের দিকে; কিন্তু তারাস তখন তার কাছে নেই: তাঁর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

১২

তারাসের চিহ্ন আবার দেখা গেল। ইউক্রেনের প্রান্তে দেখা দিল এক লক্ষ বিশ হাজার কসাক সৈন্য। এখন তারা আর লুঠেরা বা তাতার

খেদানো ছোটখাটো অংশ বা দল নয়। না, এবারে সমস্ত জাতি মাথা তুলেছে, কারণ জনগণের সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত, — মাথা তুলেছে তার অধিকারভঙ্গের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, তার রীতি-নীতির লজ্জাকর তাচ্ছিল্যের জন্য, তার পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ও পবিত্র অনুষ্ঠানের অপমানের জন্য, তার গির্জাঘরকে অপবিত্র করার জন্য, বিদেশী অভিজাতবর্গের অতিরিক্ত উপদ্রবের জন্য, অত্যাচারের জন্য, পোপের অধীন ঐক্যধর্মের বিরুদ্ধে, খ্রীষ্টানদের দেশে ইহুদীদের লজ্জাকর প্রভুত্বের জন্য — সেই সমস্ত-কিছুর জন্য যা বহুকাল ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে কসাকের হৃদয়ে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করেছিল। তরুণ কিন্তু সবলচিত্ত কম্যান্ডান্ট অস্তানিৎসা*) নেতা হলেন এই অসংখ্য কসাক সৈন্যের। তাঁর পাশে রইলেন বয়স্কতর ও অভিজ্ঞ সঙ্গী ও পরামর্শদাতা গুন্যা*)। আটজন কর্নেলের অধীনে আটটি রেজিমেণ্ট, প্রত্যেকটিতে বারো হাজার সৈনিক। কম্যান্ডাণ্টের পিছনে চলল দুজন সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এবং একজন কম্যান্ডারের প্রতীক-বাহক জেনারেল। পতাকা-বাহক জেনারেল অধিনায়কের হাতে প্রধান পতাকা; আরও অনেক পতাকা ও নিশানে বহুদূর পর্যন্ত আকাশে উড়তে লাগল; প্রতীক-বাহকের সহকারী বহন করছিল কম্যান্ডাণ্টের প্রতীকগুলি। আরও অনেক রেজিমেণ্টের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল — যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত, সামরিক সহকারী, রেজিমেণ্টের মুহুরী, তাদের কাছেই পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী; তালিকাভুক্ত কসাকদের পাশাপাশি জমায়েত হল প্রায় সমসংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসৈনিক। চারদিক হতে এলো কসাকরা: তারা এলো চিগিরিন, পেরেয়াস্লাভ্, বাতুরিন, গ্লুখভ্*) থেকে, নীপার নদীর ভাটি আর উজান — উভয় অঞ্চল থেকে এবং চর আর দ্বীপগুলি থেকে। অসংখ্য অশ্ব ও শকট সমস্ত প্রান্তর ছেয়ে ফেলল। এই সমস্ত কসাকদের মধ্যে, আটটি রেজিমেণ্টের মধ্যে ছিল একটি বাছাই-করা রেজিমেণ্ট — সেই রেজিমেণ্টের নেতা ছিলেন তারাস বুলবা। সকলের উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠতা ছিল নানা-বিধ: তাঁর পরিণত বয়স বহুদর্শিতা, স্বকীয় সৈন্যচালনায় নৈপুণ্যে ও শত্রুর প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা। তাঁর নির্মম হিংস্রতা ও নির্দয়তা এমন কি কসাকদের কাছেও মনে হত মাত্রাতিরিক্ত। তাঁর পক্ককেশ মস্তক অগ্নিকাণ্ড ও ফাঁসীকাঠ ছাড়া আর কিছুই মেনে নিত না; সমর-সভায় তাঁর একমাত্র পরামর্শ ছিল শত্রুর নিশ্চিহ্ন নিধন।

যে সমস্ত যুদ্ধকাণ্ডে কসাকরা নিজেদের পরাক্রম জাহির করল তার,

কিংবা এই অভিযানের সমস্ত অগ্রগতির সকল পর্বগুলি বর্ণনা করার প্রয়োজন এখানে নেই: সাময়িক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ আছে। এটা সুবিদিত, রুশদেশে ধর্মের জন্য সংগ্রাম কী ভীষণ: ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে বলবান শক্তি কিছুই নেই। এ শক্তি অজেয় ও ভীতিপ্রদ, যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সদাপরিবর্তনশীল সমুদ্রের মধ্যে এক অ-মানুষী পর্বত। সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত হয় এর আকাশ-মুখী অভেদ্য প্রাচীর, সে প্রাচীর একটি অখণ্ড প্রস্তর দিয়ে গড়া। তাকে দেখা যায় চারদিক থেকে, দ্রুতধাবমান তরঙ্গগুলির দিকে তা চেয়ে থাকে নির্ভয়ে। আর দুর্ভাগ্য সেই জাহাজের যা এসে তাতে আছাড় খেয়ে পড়ে! তার অসহায় মাস্তুলাদি খণ্ড খণ্ড হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ডুবে যায় তার যা কিছু আছে, চমকিত বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হয় তার মরণোন্মুখ নাবিকদের করুণ ক্রন্দনে।

সাময়িক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশদভাবে লিখিত আছে কেমন করে পোলীয় সৈন্যদল পলায়ন করল মুক্তিপ্রাপ্ত শহরগুলি থেকে; কেমন করে সমস্ত বিবেকহীন ইহুদী-সুদখোরদের ফাঁসী হল; রাজকীয় কম্যান্ডাণ্ট নিকোলাই পোতোৎস্কি তার বহুসংখ্যক সৈন্যবাহিনী সত্ত্বেও এই অজেয় শক্তির বিরুদ্ধে কত অসহায় হয়ে পড়ল;*) কেমন করে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে তার সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ অংশ নিমজ্জিত হল একটা ছোট নদীতে; কেমন করে ছোট পোলোন্নয়ে*) শহরে তাকে অবরুদ্ধ করল ভয়ংকর কসাক রেজিমেণ্টগুলি, এবং কেমন করে চরম দুর্গতির চাপে এই পোলীয় কম্যান্ডাণ্ট রাজা ও মন্ত্রিবর্গের নামে শপথ করে বলল যে তারা কসাকদের সব দাবি পূরণ করবে এবং তাদের পূর্বতন সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কসাকেরা এতে বিশ্বাস করল না: পোলীয় শপথের মূল্য কত তা তারা আগেই জানত। ছয় হাজার ডুকাট মূল্যের অশ্বে আরোহণ করে অভিজাত মহিলাদের দৃষ্টি ও অভিজাতবর্গের ঈর্ষা আকর্ষণ করা, অথবা সেনেটারগণকে সাড়ম্বর পান-ভোজনে আপ্যায়ন করে আইনসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা পোতোৎস্কির পক্ষে আর কখনও সম্ভব হত না যদি না স্থানীয় রুশী ধর্মযাজকেরা তার প্রাণরক্ষা করতেন। ধর্মযাজকেরা সকলেই যখন তাঁদের সুবর্ণ-খচিত উজ্জ্বল দীর্ঘ অঙ্গাবরণ পরে, ক্রুশ ও দেবতার প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে, হাতে ক্রুশ ও মাথায় মুকুটসহ স্বয়ং বিশপকে পুরোভাগে নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন কসাকেরা সকলেই তাদের মাথা নত করে টুপি খুলে ফেলল। সেই মুহূর্তে

কসাকরা কাকেও গ্রাহ্য করত না, এমন কি রাজাকেও নয়; কিন্তু তাদের নিজেদের খ্রীষ্টীয় গির্জার বিরুদ্ধাচরণ করতে তারা সাহস করল না, ধর্মযাজকদের তারা মেনে নিল। কম্যাণ্ডাণ্ট ও তাঁর কর্নেলরা স্বীকৃত হলেন পোতোৎস্কিকে মুক্তি দিতে, আর পোতোৎস্কি এই শপথ করল যে সে খ্রীষ্টীয় গির্জাগুলিকে স্বাধীনতা দেবে, অতীতের শত্রুতা ভুলে যাবে, কসাক যোদ্ধাদের কোনরকম অপমান করবে না। কেবল একজন কর্নেল এই শান্তি-ব্যবস্থায় সম্মত হলেন না — তিনি তারাস। মাথা থেকে একগুচ্ছ চুল ছিঁড়ে তিনি চিৎকার করলেন:

'শোন কম্যাণ্ডাণ্ট ও কর্নেলেরা! এই মেয়েলি কাণ্ড কোরো না! বিশ্বাস কোরো না পোলদের: এই কুত্তারা আমাদের ঠকাবেই।'

রেজিমেণ্টের মুহুরী যখন শর্তগুলি উপস্থিত করল এবং কম্যাণ্ডাণ্ট তাতে স্বাক্ষর করলেন, তারাস তখন তাঁর বহুমূল্য তুর্কী তরবারি উন্মুক্ত করে তাকে কাঠির মতো ভেঙে দু'খানা করলেন, তারপর দুই খণ্ডকে দূরে দুই দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন:

'বিদায় এখন! এই তলোয়ারের দু খণ্ড যেমন কোনদিন জোড়া লেগে একটা তলোয়ার হবে না, তেমনই, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীতে আর কখনও আমার দেখা হবে না! মনে রেখো তোমরা আমার বিদায়কালের বাণী' (কথাগুলি বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে লাগল, ধ্বনিত হল এযাবৎ অজানা এক শক্তিতে, — সকলে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল তাঁর দিব্যসুলভ বাণীতে) 'তোমাদের মৃত্যুকালে আমাকে মনে পড়বে তোমাদের। তোমরা কি ভাবছ তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা পেয়েছ; ভাবছ তোমরাই করবে প্রভুত্ব? তা নয়, অন্যেরা প্রভুত্ব করবে তোমাদের ওপর; তুমি, কম্যাণ্ডাণ্ট, তোমার মাথা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেবে, মাথায় গুঁজে দেবে ভুষির চাপ, বহুকাল ধরে মেলায় মেলায় তাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবে! আর তোমরাও মহাশয়রা, বাঁচাতে পারবে না তোমাদের মাথা! তোমাদের থাকতে হবে সেঁৎসেঁতে গহ্বরে, পাথরের দেয়ালের আড়ালে, যদি তোমাদের ভেড়ার মতো জীবন্ত কড়াইয়ে সেদ্ধ না করে।'

'আর তোমরা, জোয়ানেরা!' তিনি বলতে লাগলেন নিজের দলের দিকে ফিরে, 'তোমাদের মধ্যে কে চায় বরণ করতে মৃত্যুর মতো মৃত্যু — রসুইখানার ধারে নয়, মেয়েদের বিছানায় নয়, শুঁড়িখানার কাছে বেড়ার ধারে মাতাল হয়ে বাসি-মড়ার মতো নয়, কে চায় খাঁটি কসাকের মৃত্যু —

বর-কনের মতো সকলে এক পালঙ্কে? না কি তোমরা ফিরে যেতে চাও দেশে, ধর্মত্যাগ করে পিঠের ওপর বইতে চাও পোলীয় পুরুতদের?'

'তোমার সঙ্গে, কর্নেল, তোমার সঙ্গে!' তারাসের রেজিমেণ্টে যারা ছিল সকলে চেঁচিয়ে উঠল, এবং অন্যান্য অনেকেও যোগ দিল তাদের দলে।

'তাই যদি হয়, এসো আমার সঙ্গে!' বললেন তারাস, মাথায় টুপি থাবড়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে যারা পিছিয়ে রইল; নিজের ঘোড়ায় চেপে বসে তিনি তাঁর দলকে হাঁক দিলেন: 'আমাদের কড়া কথা কেউ যেন বলো না! চল জোয়ানরা, এবার ক্যাথলিকদের অতিথি হওয়া যাক!'

এই বলে তিনি ঘোড়ায় চাবুক মারলেন, তাঁর পিছনে চলল একশ' গাড়ির এক দীর্ঘ সারি, তাঁর সঙ্গে চলল পদাতিক ও অশ্বারোহী বহু কস্যাক। যারা পিছিয়ে রইল তাদের দিকে তিনি ফিরে তাকালেন ভীষণ ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে। কারও সাহস হল না তাদের থামায়। সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখ দিয়ে চলে গেল রেজিমেণ্ট, আর তারাস বহুক্ষণ ধরে মুখ ফিরিয়ে ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

স্বয়ং কম্যাণ্ডাণ্ট ও কর্নেলরা দাঁড়িয়ে রইলেন ম্লানভাবে; সকলে চিন্তাকুল হয়ে দীর্ঘকাল নীরবে রইলেন যেন গভীর দুঃখের পূর্বাভাসে তাঁরা ভারাক্রান্ত। তারাসের ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা হয় নি: তিনি যা যা বলেছিলেন সবই ফলে গেল। অল্পকালের মধ্যেই, কানেভে বিশ্বাসভঙ্গের পর, কম্যাণ্ডাণ্টের মাথা তাঁর অনেক প্রধান সেনাপতির মাথার সঙ্গে স্থাপিত হল শূলে।

আর তারাসের কী হল? তারাস নিজের রেজিমেণ্ট নিয়ে সারা পোল্যাণ্ডে বিচরণ করতে লাগলেন, আঠারোটি ছোট শহর ও চল্লিশটি ক্যাথলিক গির্জা পুড়িয়ে দিয়ে ক্রাকভ পর্যন্ত পৌঁছলেন। অনেক উঁচু উঁচু অভিজাতকে তিনি নিহত করলেন, লুঠ করলেন শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী প্রাসাদ; তাঁর কসাকরা অভিজাতদের ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার থেকে বহুকাল ধরে সযত্নে সঞ্চিত মদ ও মধু টেনে বার করে মাটিতে ঢেলে দিল; মূল্যবান বস্ত্র, পোশাক, বাসনপত্রাদি যা কিছু পেল ভেঙে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিল। 'কিছুই ছাড়বে না!' এই ছিল তারাসের একমাত্র কথা। কৃষ্ণ-ভ্রূ মহিলা আর শুভ্র-বক্ষ, সুন্দর-মুখ তরুণীগণকে কোন সম্মান দেখাল না কসাকরা; গির্জা ও বেদীর কাছে গিয়েও তারা রক্ষা পেল না: বেদীর সঙ্গে তাদেরও তারাস

পুড়িয়ে মারলেন। অগ্নিময় শিখার মধ্য থেকে অনেক শুভ্র-কোমল বাহু সকরুণ ক্রন্দনের সঙ্গে উত্থিত হল আকাশের দিকে, সে ক্রন্দনে নিষ্প্রাণ ভূমিতলও বিচলিত হত, স্তেপের দূর্বাদলও তাদের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হত। কিন্তু নির্দয় কসাকরা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করল না, পথ থেকে শিশুদের বর্শার মুখে বিঁধে নিয়ে তাদেরও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। 'ওরে দুরাচার পোলরা, তোদের জন্যে এই হল আমার অস্তাপের শ্রাদ্ধ-উৎসব!' এই ছিল তারাসের একমাত্র কথা। অস্তাপের এই শ্রাদ্ধ-উৎসব তিনি সম্পন্ন করে চললেন প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে। অবশেষে পোলীয় শাসকগণের মনে হল তারাসের এই আক্রমণগুলি সাধারণ ডাকাতির পর্যায়ভুক্ত নয়। সেই একই পোতোৎস্কিকে পাঁচটি রেজিমেণ্ট দিয়ে আদেশ করা হল তারাসকে যেন অনিবার্যভাবে বন্দী করা হয়।

আঁকাবাঁকা গ্রাম্যপথ বয়ে কসাকরা ছয় দিন ধরে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের এড়িয়ে চলল; এই অস্বাভাবিক দৌড় ঘোড়াগুলি আর প্রায় সহ্য করতে পারছিল না, তবু কসাকদের প্রাণ তারা প্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এবারে পোতোৎস্কি ছিল তার উপর প্রদত্ত ভারের যোগ্য: অক্লান্তভাবে এদের পশ্চাদ্ধাবন করে সে উপস্থিত হল দ্নেস্ত্র্ নদীর ধারে, সেখানে এক পরিত্যক্ত ভগ্ন দুর্গের ভিতর তারাস আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য।

দ্নেস্ত্রের একেবারে ধারে এক খাড়াই পাহাড়ের মাথায় দূর থেকে দেখা যেত এই দুর্গের ছিন্নভিন্ন প্রাকার ও ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীর। পাহাড়ের মাথা ভাঙা ইট-পাথরে ভরা, মনে হয় যেন তা যে-কোন মুহূর্তে মাটির দিকে সবেগে গড়িয়ে পড়তে পারে। দু দিকে, সমতলভূমির মুখোমুখী এই স্থানে রাজকীয় কম্যাণ্ডাণ্ট পোতোৎস্কি তারাসকে ঘিরে ফেলল। চার দিন ধরে কসাকরা লড়ল, পোলদের তাড়িয়ে দিল ইট ও পাথর ছুঁড়ে। কিন্তু শেষে তাদের শক্তি ও সঞ্চয় ফুরিয়ে এলো; তারাস স্থির করলেন শত্রুশ্রেণী ভেদ করে বের হবেন। কসাকরা প্রায় ভেদ করে বের হয়েছিল, হয়ত তাদের দ্রুতগতি অশ্বেরা এবারেও বিশ্বস্তভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারত, কিন্তু এই অতি দ্রুত ধাবনের মধ্যে তারাস হঠাৎ থেমে চিৎকার করে উঠলেন, 'দাঁড়াও! আমার তামাকশুদ্ধ পাইপ পড়ে গেছে; আমি চাই না যে আমার পাইপটা পর্যন্ত এই দুরাচার পোলরা পাক!' প্রবীণ সর্দার ঘোড়া থেকে ঝুঁকে পড়ে ঘাসের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন তাঁর পাইপ — জলেস্থলে, যুদ্ধে, গৃহে সে পাইপ তাঁর অচ্ছেদ্য সঙ্গী। এই সময় একদল শত্রুসৈন্য হঠাৎ ছুটে

এসে তাঁর শক্তিশালী স্কন্ধদেশ চেপে ধরল। তিনি নিজের কাঁধে ঝাঁকানি দিলেন, কিন্তু যারা তাঁকে ধরেছিল তারা, আগে যেমন হত, তেমন করে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল না। 'হায় বার্ধক্য, বার্ধক্য!' বলে কেঁদে ফেললেন এই পুষ্টদেহ বৃদ্ধ কসাক। কিন্তু অপরাধ বার্ধক্যের নয়: বহুর শক্তি পরাজিত করল এক-কে। কমপক্ষে ত্রিশজন লোক তাঁকে হাতে-পায়ে জাপটে ধরল। 'ঘুঘু এবার ফাঁদে পড়েছে!' চিৎকার করল পোলরা। 'এখন ভেবে দেখতে হবে কেমন করে এই কুকুরটাকে তার প্রাপ্য মেটানো যায়।' তারা স্থির করল, তাদের কম্যাণ্ডাণ্টের অনুমতি অনুসারে, সকলের সামনে একে জীবন্ত দগ্ধ করবে। কাছেই ছিল একটা গাছের নিষ্পত্র গুঁড়ি, তার মাথায় বাজ পড়েছিল। লোহার শিকল দিয়ে এই গুঁড়িতে তারা তাঁকে বাঁধল, হাতের ভিতর দিয়ে পেরেক ঠুকে তাঁকে উঁচু করে টাঙাল, যাতে বহুদূর থেকে দেখা যায় এই কসাককে; নীচে জমা করল জ্বালানি কাঠ। কিন্তু তারাস এই জ্বালানি কাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলেন না, ভাবলেন না যা দিয়ে তাঁকে দগ্ধ করা হবে সেই আগুনের কথা; তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি দেখছিলেন সেই দিকে যেখানে কসাকরা শত্রুর বিপক্ষে গুলি চালাচ্ছে: উঁচুতে থাকায় তিনি সবই যেন নিজের কর-রেখার মতো স্পষ্ট দেখছিলেন।

'জোরে হাঁকাও, জোয়ানেরা, জোরে হাঁকাও!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'চলে যাও ঐ ঢিবিটায়, বনের পেছনে: সেখানে এরা ধরতে পারবে না!'

কিন্তু বাতাসে তাঁর কথা উড়িয়ে দিল।

'গেল, গেল, সামান্য একটুর জন্যে সব গেল!' হতাশায় বলে উঠলেন তিনি, তারপর চোখ নীচু করে তাকালেন সেইদিকে যেখানে দ্নেস্ত্র্ নদী ঝলমল করছে। আনন্দে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে চারটি নৌকোর গলুই। কণ্ঠের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করে তিনি উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'তীরের দিকে! জোয়ানেরা, তীরের দিকে! বাঁ দিকে ঢালুপথে নেমে এসো! নদীতীরে নৌকো আছে, সবকটিকে নেবে, নইলে এরা পিছু-তাড়া করবে!'

এবারে বাতাস বইছিল অন্য দিক থেকে, কসাকরা তাঁর সব কথা শুনতে পেল। কিন্তু এই উপদেশের ফলে তাঁর মাথায় পড়ল কুঠারের উল্টো পিঠের এমন আঘাত যে তাঁর দৃষ্টিতে সমস্তকিছুই আবর্তিত হতে লাগল।

কসাকরা প্রাণপণ শক্তিতে তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পাহাড়ী পথে;

কিন্তু তাদের অনুসারকেরাও প্রায় তাদের ধরে ফেলল। দেখা গেল, পথটা এত বেশি এঁকে বেঁকে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে যে তাদের দৌড়ে ক্রমাগত বাধা হয়। এক মুহূর্তের জন্য থেমে তারা বলল, 'কপাল ঠুকে চলে এসো, বন্ধু সব!' তারপর চাবুক তুলে শিস দিল — আর তাদের তাতারী ঘোড়ারা পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে, সাপের মতো টানটান হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একেবারে দ্নেস্ত্র্ নদীর মধ্যে। কেবলমাত্র দু'জন নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না, উঁচু থেকে আছাড় খেয়ে পড়ল পাহাড়ী পাথরের উপর, তাদের ঘোড়াসমেত তারা সেখানেই মরল একটিও শব্দ না করে। ইতিমধ্যে অন্য কসাকরা অশ্বপৃষ্ঠে নদীতে সাঁতার দিয়ে নৌকোগুলির বাঁধন খুলতে লাগল। পাহাড়ের প্রান্তে এসে থামল পোলরা, কসাকদের এই অশ্রুতপূর্ব কীর্তিতে তারা বিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগল তারাও ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না? কেবল একজন সতেজ উষ্ণ-শোণিত তরুণ কর্নেল, যে অপূর্ব-সুন্দরী পোলীয় রমণী হতভাগ্য আন্দ্রিকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল তার সহোদর ভাই, সে মুহূর্ত না ভেবে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কসাকদের পিছনে; কিন্তু ঘোড়াশুদ্ধ তিনবার আকাশে পাক খেয়ে সোজা সে আছাড় খেয়ে পড়ল পাহাড়ের ধারাল পাথরগুলির উপরে। পাথরের ধারে ছিন্নভিন্ন হয়ে সেখানেই সে মরল, তার রক্তাক্ত মস্তিষ্কে সিক্ত হয়ে গেল সেই গহ্বরের রুক্ষ গাত্রের গুল্মগুলি।

আঘাতের পর তারাস বুলবার চেতনা ফিরে এলে তিনি তাকালেন দ্নেস্ত্র্ নদীর দিকে, দেখতে পেলেন কসাকেরা ইতিমধ্যেই নৌকো চালিয়ে চলে যাচ্ছে; পাহাড়ের উপর থেকে গুলি চালানো হচ্ছে তাদের দিকে কিন্তু তাদের কাছ পর্যন্ত তা পৌঁছাচ্ছে না। বৃদ্ধ সর্দারের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'বিদায়, বন্ধুরা!' উপর থেকে তিনি তাদের চিৎকার করে বললেন। 'আমাকে মনে রেখো, আগামী বসন্তে আবার এসো আর এক দফা গৌরবের আক্রমণের জন্যে! পোলীয় শয়তানেরা, কী ভাবছিস তোরা? ভাবছিস কি, সংসারে এমন কিছু আছে যাতে কসাকরা ভয় পাবে? একটু অপেক্ষা কর্, সে সময় আসবে, আসবেই সে সময়, যখন তোরা দেখতে পাবি সনাতনী রুশীদের কী প্রবল শক্তি! দূরের ও কাছের জাতিরা তা অনুভব করছে এখনই: রুশ দেশ থেকে এমন সম্রাটের উদয় হচ্ছে, যাঁর কাছে নতিস্বীকার করবে না এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই!..'

নীচের ধ্বনি থেকে শিখা উপরে উঠে, তাঁর দুই পা ঘিরে সমস্ত গাছটিকে ছেয়ে ফেলল... কিন্তু পৃথিবীতে কোথায় সেই আগুন, সেই অত্যাচার, সেই শক্তি যা রুশ শক্তিকে পরাজিত করতে পারে!

দ্নেস্ত্র্ ছোট নদী নয়, তার অনেক খাড়ি, ঘন নলখাগড়ার বন, অগভীর চড়া ও গভীর গহ্বর; তার জলস্রোত আয়নার মতো ঝলমলে, শোনা যায় রাজহাঁসের কলরোল, দেখা যায় দর্পিত হাঁসের দ্রুত সঞ্চরণ; বহু স্নাইপ, লাল-গলা পাখি, আরও নানা জলপক্ষীর বাস তার তীরে তীরে ও খাগড়া-বনে। কসাকরা দ্রুতগতিতে চলল তাদের সরু সরু দুই-হালের নৌকোয় সমতালে দাঁড় চালিয়ে, সাবধানে চড়ার পাশ কাটিয়ে জলপক্ষীদের চমকিত ও বিক্ষিপ্ত করে। দাঁড় টেনে চলল তারা আর বলতে লাগল তাদের সর্দারের কথা।

‘সেণ্ট পিটার্সবুর্গের উপাখ্যান’ থেকে

নাক

১

মার্চমাসের ২৫ তারিখে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে একটা অসাধারণ রকমের অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ভজ্‌নেসেন্‌স্কি এভিনিউয়ের অধিবাসী নাপিত ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ (পদবীটা তার হারিয়ে গেছে, এমন কি নেই তার দোকানের সাইনবোর্ডেও, যেখানে আঁকা আছে একগালে সাবানের ফেনামাখা এক ভদ্রলোকের ছবি আর লেখা আছে 'রক্তমোক্ষণও করা হয়'), বেশ ভোরে ঘুম ভাঙতেই নাপিত ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ গরম রুটির গন্ধ পেল। খাটের ওপর দেহটা সামান্য উ'চু করে তুলতেই সে দেখতে পেল যে কফির দারুণ ভক্ত, পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলা, তার সহধর্মিণীটি চুল্লী থেকে সদ্য-সে'কা রুটি টেনে বার করছে।

'প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্‌না, আজ আর আমি কফি খাব না,' ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ বলল, 'তার বদলে পি'য়াজ দিয়ে খানিকটা গরম রুটি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

(আসলে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ মনে মনে কফি এবং রুটি দুটোই চাইছিল, কিন্তু সে জানত যে একবারে দুটি বস্তু চাওয়া হবে সম্পূর্ণ নিরর্থক, যেহেতু প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্‌না এ ধরনের আবদার মোটেই বরদাস্ত করতে পারত না।) 'আহাম্মকটা রুটি খাক গে; আমারই ভালো, বাড়তি এক ভাগ কফি জুটবে,' মনে মনে এই ভেবে তার স্ত্রী টেবিলের ওপর একটা রুটি ছুঁড়ে দিল।

ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ভদ্রতার খাতিরে জামার ওপরে কোট চাপাল, টেবিলের পাশে বসে পড়ে খানিকটা নুন ঢালল, দুটো পি'য়াজ ছাড়াল, ছুরি হাতে নিল এবং গম্ভীর মুখভঙ্গি করে রুটি কাটতে প্রবৃত্ত হল। রুটিটা দুই আধখানা করে কাটার পর মাঝখানটায় তার চোখ পড়ল, সে অবাক হয়ে গেল সাদা একটা কিছু দেখতে পেয়ে। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ

সন্তর্পণে সেটাকে ছুরি দিয়ে খোঁচাল, আঙ্গুল দিয়ে টিপে দেখল। 'আঁটসাঁট গোছের দেখছি!' সে মনে মনে বলল, 'কী হতে পারে এটা?'

সে আঙ্গুল পুরে দিয়ে টেনে বার করল — নাক! ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ থ হয়ে গেল; চোখ রগড়াতে লাগল, জিনিসটা হাতড়ে দেখতে লাগল: নাক — নাক যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! শুধু তা-ই নয়, মনে হচ্ছিল যেন কোন চেনা লোকের। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ভাব। কিন্তু যে ক্রোধ তার স্ত্রীরত্নটির ওপর এসে ভর করল সেটার তুলনায় এই আতঙ্ক নেহাৎই তুচ্ছ।

'ওরে কসাই, কোথায় তুই কাটলি এই নাকটা, শুনি?' রাগে চেঁচিয়ে বলল সে। 'ঠগ! মাতাল! আমি নিজে তোর নামে পুলিশে রিপোর্ট করব! কী ডাকাত! আগেই আমি তিন তিনজন লোকের কাছে শুনেছি, দাড়ি কামানোর সময় তুই লোকের নাক নিয়ে এমন টানাটানি করিস যে নাক কোন রকমে জায়গায় টিকে থাকে।'

কিন্তু ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের তখন জীবন্মৃত অবস্থা। সে চিনতে পারল যে এই নাকটা সরকারী কালেক্টর কভালিওভের ছাড়া আর কারও নয়। লোকটা প্রতি বুধবার ও রবিবার তার কাছে কামাতে আসে।

'দাঁড়াও, প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্‌না! আমি ওটাকে একটা নেকড়ায় জড়িয়ে কোনায় রেখে দিই; ওখানে না হয় খানিকক্ষণ পড়ে থাক, পরে বাইরে নিয়ে যাব।'

'কোন কথা শুনতে চাই না! ভেবেছিস কাটা-নাক ঘরে পড়ে থাকবে, এটা আমি বরদাস্ত করব?.. চালাকি! জানিস ত কেবল চামড়ার বেলটের ওপর ক্ষুর ঘষতে, শিগগিরই নিজের কাজটা করার মতোও অবস্থা তোর থাকবে না রে হতভাগা, পাজি, বদমাশ! তোর হয়ে পুলিশের কাছে আমি সাফাই গাইতে যাব ভেবেছিস?.. ওরে আমার বুদ্ধির ঢেঁকি, হতচ্ছাড়া নোংরা কোথাকার! নিয়ে যা এখান থেকে বলছি! এক্ষুনি! যেখানে খুশি নিয়ে যা! ত্রিসীমানায় যেন ওটাকে দেখতে না পাই!'

ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ দাঁড়িয়ে রইল মড়ার মতো কাঠ হয়ে। সে ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা খুঁজে পেল না।

'কে জানে বাবা কী করে এটা হল,' সে হাত দিয়ে কানের পেছনটা চুলকে শেষ কালে বলল। 'গতকাল মাতাল অবস্থায় ফিরেছিলাম না কি তাও ত ঠিক বলতে পারছি না। এদিকে সমস্ত দেখেশুনে মনে হচ্ছে ঘটনাটা

অবাস্তব, কেন না রুটি হল গিয়ে সেঁকা জিনিস, আর নাক একেবারেই অন্য বস্তু। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!..'

ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ চুপ করে গেল। পুলিশ তার কাছ থেকে নাক খুঁজে পেলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে — এই চিন্তায় তার সংজ্ঞা লোপ পাবার মতো অবস্থা হল। ততক্ষণে তার যেন মনে হতে লাগল যে সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে রুপোর জরিতে সুন্দর কাজ করা লাল টকটকে কলার, তলোয়ার... সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। অবশেষে সে তার ট্রাউজার্স্ ও বুটজোড়া বার করল, ঐ সমস্ত জঞ্জাল নিজের গায়ে আঁটল, তার পর প্রাসকোভিয়া ওসিপভ্‌নার কঠোর নির্দেশের সঙ্গে তাল রেখে নাকটাকে নেকড়ায় জড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

তার ইচ্ছে ছিল কোথাও ওটাকে পাচার করে দেয়: হয় তোরণের নীচে বেদির আড়ালে, নয়ত কোন রকমে আচমকা হাত থেকে ফেলে দিয়ে পাশের কোন গলিতে সটকে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন না কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে লাগল। তারা তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিল জিজ্ঞেসবাদ: 'কোথায় চললে?' কিংবা 'এত সকালে কাকে খেউরি করতে চললে?' — ফলে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ কিছুতেই ফাঁক পাচ্ছিল না। আরেক বার সে ওটাকে হাত থেকে একেবারে ফেলেই দিয়েছিল, কিন্তু গুমটিতে প্রহরারত কনস্টেব্‌ল্ দূর থেকেই তার হাতিয়ার টাঙ্গিটা দিয়ে নির্দেশ করে বলল: 'এই যে কী একটা জিনিস যেন তোমার হাত থেকে পড়ে গেছে!' ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের পক্ষে তখন নাকটা তুলে নিয়ে পকেটে লুকিয়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সে হতাশ হয়ে পড়ল। পরন্তু দোকানপাট খুলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত অবিরাম বেড়ে চলল।

সে ঠিক করল ইসাকিয়েভ্‌স্কি ব্রীজের দিকে যাবে: সেখান থেকে কি আর কোনমতে ওটাকে নেভা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না? ...হ্যাঁ, আমারই খানিকটা অপরাধ বটে যে বহু দিক থেকে শ্রদ্ধাভাজন ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন কথাই আমি বলি নি।

যে কোন নিষ্ঠাবান রুশী কর্মকুশলীর মতো ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ছিল পাঁড় মাতাল। যদিও সে প্রতিদিন অন্য লোকের চিবুকের ওপর ক্ষৌরিকর্ম করত, তার নিজের চিবুকে কিন্তু কস্মিনকালে ক্ষুর পড়ত না। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের টেইল-কোট (ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ কদাচ ফ্রক-কোট পরত

না) ছিল চকরাবকরা; অর্থাৎ সেটা কালো ছিল বটে, কিন্তু আগাগোড়া খয়েরি-হলুদ ও ছাইরঙা ছোপ ধরা; কলারটা চিকচিক করত, আর তিনটি বোতামের জায়গায় ঝুলত কেবলই সুতো। ইভান ইয়াকভ্লেভিচ ছিল ভয়ঙ্কর মানববিদ্বেষী — সরকারী কালেক্টর কভালিওভ যখন দাড়ি কামানোর সময় অভ্যাসবশে তাকে বলত: 'ইভান ইয়াকভ্লেভিচ, তোমার হাতে সব সময় একটা দুর্গন্ধ!' — জবাবে ইভান ইয়াকভ্লেভিচ প্রশ্ন করত: 'দুর্গন্ধ কেন হতে যাবে?' 'জানি না ভায়া, তবে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়,' সরকারী কালেক্টর বলত, আর এর প্রতিফলস্বরূপ ইভান ইয়াকভ্লেভিচ এক টিপ নস্যি টেনে নিয়ে তার গালে, নাকের নীচে, কানের পেছনে, চিবুকের নীচে — এক কথায় নিজের খেয়ালখুশিমতো যেখানে সেখানে সাবান ঘষে দিত।

এহেন শ্রদ্ধাভাজন নাগরিকটি দেখতে দেখতে ইসাকিয়েভ্স্কি ব্রীজে এসে পৌঁছুল। সে প্রথমেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল; তার পর রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ল, যেন ব্রীজের নীচে অনেক মাছ ছুটোছুটি করছে কিনা দেখার উদ্দেশ্যে। অবশেষে চুপি-চুপি নেকড়ায় জড়ানো নাকটা ফেলে দিল। তার মনে হল যেন কয়েক মন ওজনের ভার হঠাৎ বুক থেকে নেমে গেল; ইভান ইয়াকভ্লেভিচ ঈষৎ হাসলও। সরকারী কর্মচারীদের চিবুকে খেউরি করতে না গিয়ে সে এক গ্লাস পাঞ্চের অর্ডার দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল 'খানা আর চা' সাইনবোর্ড লেখা একটা প্রতিষ্ঠানের দিকে, এমন সময় ব্রীজের অন্য প্রান্তে সে দেখতে পেল গালপাট্টা জুলপিধারী, তেকোনা টুপি মাথায়, তলোয়ারধারী সম্ভ্রান্ত চেহারার পুলিশ ইনস্পেক্টরকে। ভয়ে ইভান ইয়াকভ্লেভিচের প্রাণ উড়ে গেল; ইতিমধ্যে পুলিশ ইনস্পেক্টর তার দিকে আঙ্গুল নেড়ে ইশারা করে বলল:

'এদিকে এসো দেখি ভালোমানুষের পো!'

ইভান ইয়াকভ্লেভিচের দস্তুর জানা ছিল, তাই অনেক দূর থেকেই মাথার টুপি খুলে চটপট তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল:

'সালাম হুজুর!'

'না না ভায়া, ও সব হুজুর-টুজুর নয়, বল দেখি ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিলে ওখানে?'

'ভগবানের দিব্যি কর্তা খেউরি করতে যাচ্ছিলাম, কেবল দেখলাম নদী কী রকম তরতর করে বয়ে চলেছে।'

'মিছে কথা, মিছে কথা! ও সব বলে পার পাবে না। ঠিক মতো জবাব দাও বলছি!'

'আমি, কর্তা, কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে সপ্তাহে দুবার এমন কি তিনবারও আপনার খেউরি করতে রাজী,' ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ জবাব দিল।

'না বন্ধু ওতে চলবে না! তিনজন নাপিত আমার খেউরি করে, আর এ কাজটাকে তারা পরম সম্মানের বলেও মনে করে। এবারে বলে ফেল দেখি বাপু ওখানে কী করছিলে?'

ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ ফেকাসে হয়ে গেল।... কিন্তু এখানে ঘটনা সম্পূর্ণ কুয়াসায় ঢাকা পড়ে যায়, তাই অতঃপর যে কী ঘটল তার বিন্দুবিসর্গ আমাদের জানা নেই।

২

খুব ভোরে সরকারী কালেক্টর কভালিওভের ঘুম ভেঙে গেল। অতঃপর সে ঠোঁট নেড়ে আওয়াজ করল, 'বর্‌র্‌...' — যেটা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে বরাবরই করে থাকে, যদিও নিজেই বলতে পারে না কারণটা কী। কভালিওভ আড়িমুড়ি ভেঙে টেবিলের ওপর থেকে ছোট আয়নাটা তাকে দিতে বলল। গতকাল সন্ধ্যায় তার নাকের ওপর যে ফুসকুড়িটা উঠেছিল সেটা একবার দেখার ইচ্ছে হল; কিন্তু সে বেজায় হকচকিয়ে গেল যখন দেখতে পেল যেখানে নাক থাকার কথা সে জায়গাটা পুরোপুরি চেটাল। ঘাবড়ে গিয়ে কভালিওভ জল আনতে বলল, সে তোয়ালে দিয়ে চোখ রগড়াল কিন্তু ঠিকই, নাক নেই! সে ঘুমোচ্ছে কিনা জানার উদ্দেশ্যে হাতড়ে দেখতে লাগল। না, ঘুমোচ্ছে বলে ত মনে হয় না। সরকারী কালেক্টর কভালিওভ খাট থেকে লাফিয়ে নেমে গা ঝাড়া দিল: নাক নেই!.. সে তৎক্ষণাৎ পরনের পোশাক তলব করল, সোজা ছুটল পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে।

কিন্তু এই অবসরে কভালিওভ সম্পর্কে কিছু বলা অবশ্যক, যাতে পাঠক বুঝতে পারেন এই সরকারী কালেক্টরটি কোন্ গোত্রের লোক ছিল। যে সমস্ত সরকারী কালেক্টর তাঁদের বিদ্যার সার্টিফিকেট ও ডিগ্রীর জোরে এই খেতাবের অধিকারী হন, ককেশাসে যাঁরা কালেক্টর পদ লাভ করেন*) তাঁদের

সঙ্গে এঁদের কোনমতেই তুলনা চলে না। এঁরা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দুই জাতের। বিদ্বান সরকারী কালেক্টররা... কিন্তু রাশিয়া এমনই আজব একটা দেশ যে কোন একজন সরকারী কালেক্টর সম্পর্কে কিছু বলে দেখুন না, অমনি রিগা থেকে কাম্‌চাত্‌কা পর্যন্ত সব সরকারী কালেক্টর সেটাকে নিজের গায়ে নেবেন। যে-কোন খেতাব এবং পদ সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কভালিওভ ছিল ককেশীয় সরকারী কালেক্টর। সে মাত্র দু বছর হল এই খেতাব পেয়েছে, তাই মুহূর্তের জন্যও সেটাকে ভুলতে পারে না; আর নিজের কৌলীন্য ও গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে কখনও সরকারী কালেক্টর বলত না, সব সময় উল্লেখ করত মেজর বলে। রাস্তায় জামাকাপড়ের ফিরিওয়ালী কোন মেয়েলোকের সঙ্গে দেখা হলে সচরাচর বলত: 'বুঝলে গো, আমার বাড়িতে চলে এসো; সাদোভায়া স্ট্রীটে আমার ফ্ল্যাট; কেবল জিজ্ঞেস করলেই হল মেজর কভালিওভ কোথায় থাকে; যে কেউ দেখিয়ে দেবে।' আর সুশ্রী চেহারার কোন মেয়ের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যেত তাহলে তাকে পরন্তু গোপন নির্দেশ দিত এই বলে: 'লক্ষ্মীটি আমার, জিজ্ঞেস করবে মেজর কভালিওভের ফ্ল্যাটটা কোথায়।' অতএব আমরাও এখন থেকে এই সরকারী কালেক্টরটিকে মেজর বলেই উল্লেখ করব।

মেজর কভালিওভের অভ্যাস ছিল প্রতি দিন নেভ্‌স্কি এভিনিউতে পায়চারী করা। তার জামার কলার সব সময় বড় বেশি পরিচ্ছন্ন আর কড়া মাড় দেওয়া। তার জুলফিজোড়া ছিল এমন এক জাতের, যা এখনও দেখতে পাওয়া যায় জেলা আর সদরের আমিনদের মধ্যে, স্থপতি, রেজিমেণ্টের ডাক্তার, এমন কি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে — মোট কথা, যে-সমস্ত পুরুষমানুষের গাল ভরাট ও আরক্তিম এবং যারা বেশ ভালো বস্টন খেলে তাদের সকলেরই মধ্যে: এ ধরনের জুলফি গালের ঠিক মাঝখান দিয়ে এসে সোজা চলে যায় নাক অবধি। মেজর কভালিওভ দামী লাল পাথরের অসংখ্য সীল বুকে ঝোলাত, কতকগুলির ওপর থাকত নানা প্রতীকচিহ্ন আবার কতকগুলির ওপর বুধবার, বৃহস্পতিবার, সোমবার — এই সব খোদাই করে লেখা থাকত। মেজর কভালিওভ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এসেছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, সঠিক ভাবে বলতে গেলে, তার খেতাবের উপযোগী চাকুরীর সন্ধানে: এ ব্যাপারে সফল হলে তার পদ হবে ছোট লাট পর্যায়ের, আর তা না হলে সে কোন একটা বিশিষ্ট ডিপার্টমেণ্টে প্রশাসনিক পদ নেবে। বিয়ের ব্যাপারেও মেজর কভালিওভের আপত্তি নেই, কিন্তু

একটি মাত্র শর্তে — পাত্রীর পুঁজির পরিমাণ হতে হবে দু লাখ। সুতরাং মেজর যখন তার মোটামুটি চলনসই ও মাঝারি গোছের নাকের বদলে যাচ্ছেতাই রকমের লেপাপোঁছা, সমান জায়গা দেখতে পেল তখন তার যে কী মনের অবস্থা হতে পারে তা পাঠকের সহজেই অনুমেয়।

এমনই দুর্ভাগ্য যে রাস্তায় একটাও ঘোড়ার গাড়ির দেখা মিলল না, ওপরের ঢিলে আচকানটা গায়ে জড়িয়ে, যেন নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে এমন ভঙ্গিতে রুমালে মুখ ঢেকে তাকে পায়ে হেঁটে চলতে হল। 'হয়ত এটা আমার মনেরই ভুল: নাকটা বেমালুম উধাও হয়ে গেল এ হতেই পারে না' — ভাবতে ভাবতে সে ইচ্ছে করেই, আয়নায় একবার দেখার উদ্দেশ্যে এক মিঠাইয়ের দোকানে এসে উপস্থিত হল। সৌভাগ্যবশত দোকানে কেউ ছিল না; ছোকরা চাকরগুলি ঘরদোর সাফ করছিল, চেয়ার সাজিয়ে রাখছিল; কেউ কেউ ঘুম চোখে বারকোশে করে গরম গরম পেস্ট্রি বার করে আনছিল; চেয়ার-টেবিলের ওপরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল গতকালের কফি-ঢালা খবরের কাগজ। 'যাক, ভগবানের কৃপায় কেউ নেই,' সে বলল, 'এই ফাঁকে তাকিয়ে দেখা যেতে পারে।' সে ভয়ে ভয়ে আয়নার দিকে এগিয়ে গেল, তাকিয়ে দেখল। 'ধুত্তোর, এ কি যাচ্ছেতাই কান্ড!' তাকানোর পর সে বলল। 'নাকটার জায়গায় অন্তত কিছু একটাও যদি থাকত, তা নয়, কিছুই নেই!..'

বিরক্ত হয়ে ঠোঁট কামড়ে সে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, ঠিক করল আজ আর অভ্যাসমতো কারও দিকে তাকাবে না, কারও উদ্দেশে অমায়িক হাসি হাসবে না। হঠাৎ একটা বাড়ির দরজার সামনে সে পাথরের মূর্তির মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; তার চোখের ওপর ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা: প্রবেশপথের সামনে এসে থামল একটা জুড়িগাড়ি; গাড়ির দরজা খুলে যেতে ঘাড় কুঁজো করে লাফ দিয়ে নামলেন ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক, ছুটে গিয়ে সিঁড়ি বয়ে উঠতে লাগলেন ওপরে। কভালিওভ কী দারুণ আতঙ্কিত ও বিস্মিতই না হয়ে গেল যখন এই লোকটিকে চিনতে পারল তার নিজের নাক বলে! এই অসাধারণ দৃশ্য দেখে তার মনে হল যেন চোখের সামনে সমস্ত কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে; তার মনে হচ্ছিল এই বুঝি পড়ে যাবে। কিন্তু ঠিক করল কপালে যা-ই থাক না কেন, অপেক্ষা করে থাকবে যতক্ষণ না নাক গাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। তার সর্বাঙ্গ তখন জ্বরো রুগীর মতো থরথর করে কাঁপছে। দু মিনিট বাদে নাক বাস্তবিকই বেরিয়ে এলেন। তাঁর ইউনিফর্মে সোনালি জরির কাজ, বিশাল খাড়া কলার আঁটা;

পরনে ছিল হরিণের নরম চামড়ার প্যাণ্ট; পাশে ঝুলছিল তলোয়ার। পালকগোঁজা টুপি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পদমর্যাদার দিক থেকে তিনি একজন সরকারী পরামর্শদাতা। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছিল তিনি সাক্ষাৎকারের জন্য কোথাও চলেছেন। এ পাশে ও পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোচম্যানের উদ্দেশে তিনি হাঁক দিলেন: 'গাড়ি লাগাও!' বলেই তিনি চেপে বসলেন, গাড়িও ছুটল।

বেচারি কভালিওভের তখন মাথা খারাপ হওয়ার জো। সে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতেই পারছিল না। এই গতকালও যে-নাক তার মুখে সাঁটা ছিল, যার গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে কোন ভাবেই চলার ক্ষমতা নেই, সেটা কী করে সত্যি-সত্যিই ইউনিফর্ম ধারণ করতে পারে! সে ছুটল জুড়িগাড়ির পিছু পিছু। গাড়িটা সৌভাগ্যবশত তখনও বেশি দূর যেতে পারে নি এবং যেতে যেতে থেমে দাঁড়িয়েছে কাজান ক্যাথেড্রালের সামনে।

সে ক্যাথেড্রালের ভেতরে দ্রুত পা চালাল, ভিখিরি বুড়িদের সারির মাঝখান দিয়ে ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে সে গির্জার ভেতরে প্রবেশ করল। নাক খসে পড়া এই ভিখিরি-বুড়িদের কাপড়ে জড়ানো মুখের ওপর চোখের দুটো ফোকর দেখে এক কালে তার বড়ই হাসি পেত। গির্জার ভেতরে প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা বেশি ছিল না; তারা সকলে কেবল দরজায় ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কভালিওভের অবস্থা তখন এমনই বেসামাল যে প্রার্থনা করার কোন সাধ্য তার ছিল না, সে আনাচে-কানাচে সর্বত্র দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল সেই ভদ্রলোকটিকে। অবশেষে সে তাঁকে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। নাকের মুখটা পুরাপুরি ঢাকা পড়ে গেছে বিশাল খাড়া কলারের আড়ালে, তিনি পরম ভক্তি গদগদ ভঙ্গিতে প্রার্থনা করছিলেন।

'কী করে ওঁর সামনে যাওয়া যায়?' কভালিওভ ভাবল। 'ইউনিফর্ম, টুপি — সব কিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে উনি একজন সরকারী পরামর্শদাতা। কী জানি ছাই, জানি না কী ভাবে কী করা উচিত!'

সে তাঁর কাছাকাছি এসে কাশতে শুরু করল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও নাকের ভক্তি-গদগদ অবস্থার কোন বিকার ঘটল না, তিনি মাথা নুইয়ে প্রণাম করে চললেন।

'স্যার...' ভেতরে ভেতরে জোর করে সাহস সঞ্চয় করে বলল কভালিওভ, 'শুনছেন স্যার...'

'কী চাই আপনার?' ঘাড় ফিরিয়ে বললেন নাক।

'আমার তাজ্জব লাগছে স্যার... আমার মনে হয়... আপনার নিজের জায়গা জানা থাকা উচিত। আর হঠাৎ কিনা আমি আপনার সাক্ষাৎ পেলাম, কোথায়? — না, গির্জায়। আপনাকে মানতেই হবে...'

'মাফ করবেন, আপনার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।... স্পষ্ট করে বলুন।'

'কী করে এ'কে বুঝিয়ে বলি?' কভালিওভ মনে মনে ভাবল, শেষকালে আবার সাহস সঞ্চয় করে বলতে শুরু করল:

'অবশ্য আমি, হ্যাঁ আমি... আসলে একজন মেজর। আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না যে নাক ছাড়া চলাফেরা করা আমার শোভা পায় না। ভস্ক্রেসেন্স্কি ব্রীজের ওপর যারা ছাড়ানো কমলালেবু-টেবু বিক্রি করে ঐ রকম কোন ফিরিওয়ালী মেয়ের পক্ষে নাকছাড়া বসে থাকা চলে; কিন্তু যেহেতু আমার সম্ভাবনা আছে... তাছাড়া বহু বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে— সরকারী পরামর্শদাতা চেখ্‌তারিওভের স্ত্রী ইত্যাদি আরও অনেকের সঙ্গে চেনা পরিচিতি থাকায়... আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন... আমি আর কী বলব স্যার, জানি না...' (বলার সঙ্গে সঙ্গে মেজর কভালিওভ অসহায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল)। 'মাফ করবেন... ব্যাপারটাকে যদি ঠিক কর্তব্য ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়... তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারেন...'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' নাক জবাব দিলেন। 'একটু বোঝার মতো করে বলুন।'

'স্যার...' কণ্ঠস্বরে আত্মমর্যাদার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল কভালিওভ, 'জানি না, আপনার কথাগুলোর অর্থ কী হতে পারে... এখানে সমস্ত ব্যাপারটা, মনে হয় জলের মতো পরিষ্কার... নাকি আপনি চান... আরে আপনি যে আমারই নাক!'

নাক মেজরের দিকে তাকালেন, সামান্য ভ্রূকুটি করলেন।

'আপনি ভুল করছেন মশাই। আমি আমার নিজের গুণেই আমি। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকারও সঙ্গত কারণ নেই। আপনার ইউনিফর্মের বোতাম দেখে মনে হচ্ছে আপনি অন্য কোন দপ্তরে কাজ করেন।'

এই বলে নাক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার প্রার্থনায় মন দিলেন।

কভালিওভ এখন সব গুলিয়ে ফেলল, বুঝে উঠতে পারছিল না কী

করা যায়, সে কিছুই ভাবতে পারছিল না। এমন সময় কোন ভদ্রমহিলার পোশাকের মধুর খসখস আওয়াজ কানে এলো; এগিয়ে এলেন এক বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা — সর্বাঙ্গে লেসের সজ্জা আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক তন্বী — পরনে সাদা পোশাক, মেয়েটির সুঠাম কটিদেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে, মাথায় ঈষৎ হলদেটে রঙের টুপি, ফুরফুরে পেস্ট্রির মতো হাল্‌কা। ডজন খানেক কলার আঁটা পোশাক পরনে, বিশাল জুলফিধারী এক দীর্ঘকায় ভৃত্য তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, নস্যিদানি খুলল।

কভালিওভ খানিকটা এগিয়ে এলো, সে তার জামার কেম্ব্রিক কাপড়ের কলারটা টেনে বার করল, সোনার চেন-এ তার যে-সমস্ত সীল ঝুলছিল সেগুলি ঠিকঠাক করে নিল এবং এপাশে-ওপাশে হাসি ছড়াতে ছড়াতে মনোযোগ দিল তন্বী মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তখন বসন্তের ফুলের মতো সামনের দিকে সামান্য হেলে পড়ে তার স্বচ্ছপ্রায় অঙ্গুলিসমেত সাদা ধবধবে হাতটা উঠিয়ে কপালে ঠেকাচ্ছিল। কভালিওভ যখন টুপির আড়ালে তার গোলগাল, উজ্জ্বল ধবধবে চিবুক আর প্রথম বসন্তের গোলাপের রঙ ছোপানো গালের একাংশ দেখতে পেল তখন তার হাসি আরও প্রশস্ত আকার ধারণ করল। কিন্তু হঠাৎ সে এক লাফে পিছিয়ে গেল, যেন ছেঁকা লেগেছে। তার মনে পড়ে গেল যে নাকের জায়গাটায় তার একেবারেই কিছু নেই, তার চোখে জল এসে গেল। সে ঘুরে দাঁড়াল ইউনিফর্মধারী ভদ্রলোকটিকে সোজাসুজি এই কথা বলার জন্য যে তিনি আসলে সরকারী পরামর্শদাতার ভেক নিয়েছেন, আসলে তিনি একটা ঠগ, ইতর, তিনি তারই পৈতৃক নাক বৈ আর কিছু নন।... কিন্তু নাক তখন আর সেখানে ছিলেন না; এই অবসরে তিনি সরে পড়েছেন, সম্ভবত আরও কারও সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে।

ফলে কভালিওভ হতাশ হয়ে পড়ল। সে পিছু হটে গিয়ে বাইরে চলে এলো, থামের সারি দেওয়া তোরণের নীচে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল কোথাও নাকের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। তার বেশ ভালোমতো মনে আছে যে নাকের টুপিতে ছিল পালক গোঁজা আর ইউনিফর্মটায় ছিল সোনালি জরির কাজ। কিন্তু ওভারকোটটা সে খেয়াল করে দেখে নি, তার জুড়িগাড়ির বা ঘোড়াগুলির রঙও নয়, এমন কি তাঁর পেছনে কোন ভৃত্য বা চাপরাসী ছিল কিনা তাও নয়। তাছাড়া এত বেশি সংখ্যক জুড়িগাড়ি পেছনে সামনে ছুটে চলছিল এবং এত দ্রুত গতিতে,

যে আলাদা করে চেনাও কঠিন; আর সেগুলির মধ্য থেকে আলাদা করে চিনতে পারলেই বা কী? — থামানোর কোন সাধ্যও তার হত না। দিনটা ছিল চমৎকার, রোদ ঝলমলে। নেভ্স্কি লোকে লোকারণ্য; পলিৎসেইস্কি ব্রীজ থেকে শুরু করে আনিচ্কভ ব্রীজ পর্যন্ত সর্বত্র ফুটপাথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মহিলাদের স্রোত — যেন পুরোদস্তুর ফুলের প্রবাহ। ঐ ত চলেছে তার পরিচিত এক কাছারির উপদেষ্টা, যাকে সে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল বলে ডাকে, বিশেষত বাইরের লোকজনের সাক্ষাতে। ঐ ত ইয়ারিগিন, সিনেটের হেডক্লার্ক, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যে বস্টন খেলার সময় আটে খেললেই বাজী হেরে যায়। ঐ যে ককেশাসে কালেক্টরের খেতাব পাওয়া আরও এক মেজর — হাত নেড়ে কাছে আসতে বলছে...

'জাহান্নামে যাক!' কভালিওভ বলল। 'এই কোচম্যান, আমাকে সোজা নিয়ে চল পুলিশ কমিশনারের কাছে!'

কভালিওভ একটা ছেকরা গাড়িতে চেপে বসে কেবল কোচম্যানের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল: 'জলদি হাঁকাও!'

'পুলিশ কমিশনার আছেন কি?' বার-বারান্দায় পদার্পণ করে সে চেঁচিয়ে বলল।

'উঁহু নেই,' দরোয়ান জবাব দিল, 'এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

'বোঝ কাণ্ড!'

'হুঁ,' দরোয়ান যোগ করল, 'এই ত কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন। আর মিনিটখানেক আগে যদি আসতেন তাহলে বাড়িতে পেয়ে যেতেন।'

কভালিওভ মুখে রুমাল চাপা দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়ল, হতাশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল:

'চালাও!'

'কোথায়?' কোচম্যান জিজ্ঞেস করল।

'সিধে হাঁকাও!'

'সিধে? তা কী করে হবে? ওখানে ত রাস্তা মোড় নিয়েছে: ডাইনে না বাঁয়ে?'

এই প্রশ্নে কভালিওভ থতমত খেয়ে গেল, সে আবার বাধ্য হয়ে ভাবতে বসল। তার যে রকম অবস্থা তাতে সবচেয়ে ভালো হয় পৌর পুলিশ দপ্তরে গিয়ে যোগাযোগ করা, কারণ এমন নয় যে পুলিশের সঙ্গে এর কোন সরাসরি সম্পর্ক আছে, কারণটা হল এই যে পুলিশ দপ্তরের হুকুম অন্যান্য দপ্তরের

তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি জারী হওয়ার সম্ভাবনা। নাক যেখানে চাকরী করে বলে জাহির করছে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দাবি করাটা অবিবেচকের কাজ হবে, কেন না নাকের নিজের জবাব থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেছে যে এই লোকটির ন্যায়নীতির কোন বালাই নেই, আর এক্ষেত্রে সে ডাহা মিথ্যা কথা বলে যেতে পারে, যেমন বলেছিল আগে, যখন সে সাফ জানিয়ে দেয় যে কস্মিনকালেও মেজর কভালিওভকে দেখে নি। সুতরাং কভালিওভ পৌর পুলিশ দপ্তরে যাবার প্রায় হুকুম দিয়ে বসেছিল, এমন সময় আবার তার মাথায় এই চিন্তা খেলে গেল যে প্রথম সাক্ষাতেই যে ঠগ ও জোচ্চরটা তার সঙ্গে এমন নির্লজ্জ ব্যবহার করল, সে আবার দিব্যি সময়ের সুযোগ নিয়ে কোন উপায়ে শহর থেকে সটকেও পড়তে পারে — আর তাহলে সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হতে পারে কিংবা, ভগবান না করুন, পুরো এক মাস ধরেও চলতে পারে। শেষকালে সে যেন আকাশ থেকে প্রত্যাদেশ পেল। স্থির করল সরাসরি খবরের কাগজের অফিসে যাবে এবং সময় থাকতে যাবতীয় লক্ষণাদির বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে, যাতে যে কেউ ওটা দেখামাত্র উদ্ধার করে তার কাছে এনে হাজির করতে পারে কিংবা অন্তত হদিশ দিলেও দিতে পারে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সে কোচম্যানকে খবরের কাগজের অফিসের দিকে গাড়ি চালাতে হুকুম দিল এবং সারা রাস্তা ধরে কোচম্যানের পিঠে কিল ঘুষি বর্ষণ করতে করতে বলে চলল: 'জলদি চালা ইতর! জলদি, জলদি ঠগ কোথাকার!' 'ওঃ বাবু!' কোচম্যান এই বলতে বলতে মাথা ঝাঁকাতে লাগল, রাশ আলগা করে দিল তার ঘোড়ার, যেটার গায়ে ছিল লোমশ বলোনিজ কুকুরের মতো লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া পশম। ছেকরা গাড়ি শেষকালে থামল, কভালিওভ হাঁপাতে হাঁপাতে, ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করল একটা ছোট আকারের রিসেপ্‌শন রুমে, যেখানে পুরনো টেইল-কোট পরনে, চশমা-নাকে এক পক্ককেশ কেরানি দাঁতে পালকের কলম ধরে টেবিলের পাশে বসে বসে তার সামনে এনে রাখা এক গাদা তামার পয়সা গুনছিল।

'এখানে কে বিজ্ঞাপন নেন?' কভালিওভ চেঁচিয়ে বলল। 'এই যে, নমস্কার!'

'নমস্কার,' পক্ককেশ কেরানিটি এক মিনিটের জন্য চোখ তুলে কথাটা বলেই আবার সামনে রাখা পয়সার স্তূপের ওপর চোখ নামাল।

'আমি কাগজে ছাপাতে চাই...'

'যদি কিছু মনে না করেন... দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন,' ডান হাতে কাগজের ওপর সংখ্যা লিখতে লিখতে এবং বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে পাশে রাখা অ্যাবাকাসের ঘুঁটির সারিতে দুটো ঘুঁটি সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল।

লেস লাগানো পোশাক পরনে এক ভৃত্যগোছের লোক, যার চেহারা দেখে মনে হয় কোন অভিজাত বাড়িতে কাজ করে, দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের পাশে; লোকটার হাতে ধরা ছিল একটা চিরকুট। সে তার মিশুকে স্বভাবের পরিচয় দেওয়া শিষ্টাচারসম্মত বিবেচনা করে বলল:

'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না স্যার, কুকুরটার দাম একটা আধুলিও হবে না, মানে আমি হলে ত ওটার জন্যে আটটা তামার পয়সাও দিতাম না; কিন্তু রানী-মা ভালোবাসেন, কী দারুণই না ভালোবাসেন! — আর তাই, যে ওটার সন্ধান দিতে পারবে তাকে একশ' রুব্‌ল পুরস্কার! আর যদি ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, যেমন এই এখন আপনার আমার মধ্যে কথা হচ্ছে, তাহলে বলব মানুষের রুচির কোন সীমা-পরিসীমা নেই: শিকারীর কথাই ধরুন না কেন, কোন শিকার খোঁজার বা শিকারের পেছনে তাড়া করার মতো কুকুরের জন্য পাঁচশ', হাজার দিতেও কার্পণ্য করবে না — কুকুর ভালো জাতের হলেই হল।'

কেরানি মহোদয় গম্ভীর ভঙ্গিতে এই কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে আনা চিরকুটটিতে কটা অক্ষর আছে তা-ও গুনে চলছিল। তার আশেপাশে চিরকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বহু সংখ্যক বৃদ্ধা, দোকানকর্মী ও চৌকিদার শ্রেণীর লোকজন। কোনটাতে প্রকৃতিস্থ স্বভাবচরিত্রের এক কোচম্যান সেবাদান-প্রার্থী; কোনটাতে ছিল ১৮১৪ সালে প্যারিস থেকে আনীত স্বল্পকাল ব্যবহৃত এক গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন; কোনটাতে ধোবির কাজে অভ্যস্ত, তবে অন্যান্য কাজেরও উপযোগী উনিশ বছর বয়স্কা ভূমিদাস-কন্যা সেবা-প্রার্থিনী; এছাড়াও বিজ্ঞাপনের মধ্যে ছিল একটা স্প্রিং-ছাড়া মজবুত ছেকরা গাড়ি, ছাইরঙা চক্করওয়ালা সতেরো বছর বয়স্ক তরুণ তেজী ঘোড়া, লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত শালগম ও মুলোর নতুন বীজ; দুটো আস্তাবল, সেই সঙ্গে চমৎকার বার্চ অথবা ফারগাছের বাগান করার উপযোগী প্রশস্ত জমি সমেত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন বাগানবাড়ি; একটা বিজ্ঞাপনে আবার ছিল পুরনো জুতোর সোল ক্রয়েচ্ছুদের প্রতি আহ্বান — প্রতি দিন সকাল আটটা থেকে তিনটের মধ্যে নিলাম ঘরে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের। গোটা দলটা যে-ঘরে এসে জড় হয়েছিল সেটা

ছিল ছোট, ঘরের বাতাস ছিল দারুণ ভারী; কিন্তু সরকারী কালেক্টর কভালিওভের পক্ষে কোন গন্ধ টের পাবার উপায় ছিল না, যেহেতু সে মুখে রুমাল চাপা দিয়েছে, তা ছাড়া খোদ তার নাকটাই, ভগবান জানেন, কোন্ জায়গায় অবস্থান করছিল।

'মশাই শুনছেন? আমার আর্জিটা... বড় দরকারী,' অধৈর্য হয়ে শেষকালে সে বলে ফেলল।

'এক্ষুনি, এক্ষুনি! দু রুব্‌ল তেতাল্লিশ কোপেক! এক মিনিট! এক রুব্‌ল চৌষট্টি কোপেক!' বুড়ি আর দরোয়ান শ্রেণীর লোকদের মুখের ওপর চিরকুটগুলো ছুঁড়ে দিতে দিতে পক্ককেশ কেরানি মহোদয় বলে যাচ্ছিলেন। 'আপনার কী চাই?' অবশেষে কভালিওভের উদ্দেশে সে বলল।

'আমার আর্জিটা হল এই যে...' কভালিওভ বলল, 'এমন একটা কান্ড ঘটে গেছে যাকে প্রতারণা না জুয়াচুরি কী বলব, এখনও আমি কোন মতে বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, কেবল এই কথাগুলি ছাপিয়ে দিন যে দুর্বৃত্তটিকে যে-ব্যক্তি ধরে আমার কাছে এনে হাজির করতে পারবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।'

'আপনার নাম, পদবী জানতে পারি কি?'

'না, নাম-টামে কী দরকার? ও সব আমি প্রকাশ করতে পারব না। সরকারী পরামর্শদাতা চেখতারিওভের স্ত্রী, স্টাফ অফিসারের স্ত্রী পালাগেইয়া গ্রিগরিয়েভ্‌না পদ্‌তোচিনা... এরকম বহু লোকজন আমার চেনাপরিচিত। ভগবান না করুন, হঠাৎ যদি জানাজানি হয়ে যায়! আপনি স্রেফ লিখুন না কেন সরকারী কালেক্টর, কিংবা আরও ভালো হয় যদি লেখেন জনৈক মেজর পদাধিকারী।'

'আর যে পালিয়েছে সে কি আপনার গোলাম-টোলাম কেউ?'

'আরে না গোলাম আর কোথায়? তা হলে ত তেমন বড় প্রতারণা বলা যেত না! আমার কাছ থেকে পালিয়েছে... নাসিকা...'

'হুম্! বড় অদ্ভুত নাম! তা এই নাসিকা বাবাজীটি কি আপনার প্রচুর পরিমাণ টাকা মেরেছে?'

'নাসিকা হল গিয়ে... আপনি যা ভাবছেন তা নয়! নাক, আমার একেবারে নিজস্ব নাক যাকে বলে, সেটা খোয়া গেছে, কোথায় জানি না। শয়তানের কারসাজি!'

'কিন্তু কী ভাবে খোয়া গেল? কোথায় যেন একটা গোলমাল ঠেকছে, ভালোমতো বুঝতে পারছি না।'

'না, কী ভাবে, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারছি না; তবে বড় কথা এই যে সে এখন শহরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজেকে সরকারী পরামর্শদাতা বলে জাহির করছে। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এই মর্মে বিজ্ঞাপন ছাপান যে ওটাকে ধরতে প্যারলে যেন বিন্দুমাত্র দেরি না করে, অনতিবিলম্বে আমার কাছে এনে হাজির করা হয়। আপনিই বিচার করে দেখুন না, সত্যিই ত শরীরের এমন একটা দৃষ্টিগোচর অংশ ছাড়া আমার চলবে কী করে? এটা ত আর আমার পায়ের কড়ে আঙ্গুল নয় যে পা বুট জুতোর ভেতরে গলিয়ে দিলে — ব্যস, আঙ্গুল না থাকলেও কারও জানার উপায় নেই। আমি বৃহস্পতিবার-বৃহস্পতিবার সরকারী পরামর্শদাতা চেখ্‌তারিওভের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই, স্টাফ অফিসারের স্ত্রী পালাগেইয়া গ্রিগরিয়েভ্‌না পদ্‌তোচিনার কাছেও যাই — তাঁর আবার বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে আছে — দু'জনের সঙ্গেই আমার দারুণ দহরম-মহরম। তাই বলি কি আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, এখন আমি কী করে... কী করে এখন আমি তাঁদের কাছে যাই?'

কেরানি যে ভাবে শক্ত করে ঠোঁট কামড়াল তাতে বোঝা গেল যে সে ভাবনায় পড়ে গেছে।

'না এ ধরনের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় ছাপানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে সে বলল।

'কেন? কী কারণে?'

'পারব না, বললাম ত। পত্রিকার সুনাম নষ্ট হতে পারে। সকলেই যদি লিখতে শুরু করে যে তাদের নাক খোয়া গেছে তা হলে... অমনিতেই লোকে বলে যে পত্রিকায় অনেক আজেবাজে জিনিস, মিথ্যে গুজব ছাপানো হয়।'

'কিন্তু এটা আজেবাজে হল কী করে শুনি? আমার ত মনে হয় সে রকম কিছুই এর মধ্যে নেই।'

'নেই, সেটা আপনার মনে হচ্ছে। অথচ এই ধরুন না কেন গত সপ্তাহের ঘটনাটা। আপনি যেমন এসেছেন ঠিক সেই ভাবেই একজন সরকারী কর্মচারী এলো একটা চিরকুট নিয়ে, হিসাব করে দাঁড়াল দুই রুব্‌ল তিয়াত্তর কোপেক, আর গোটা বিজ্ঞাপনের বক্তব্যটা হল এই যে কালো

লোমওয়ালা এক পুডল্ কুকুর হারিয়েছে। মনে হতে পারে এতে আর কী আছে? কিন্তু ব্যাপারটা গড়াল মানহানির মামলায়: আসলে এই পুড্‌ল ছিল এক ক্যাশিয়ার — কোন্ প্রতিষ্ঠানের তা মনে করতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি ত আর কোন পুড্‌ল সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছি না, বিজ্ঞাপন দিচ্ছি আমার নিজের নাক সম্পর্কে: অর্থাৎ, বলতে গেলে খোদ নিজের সম্পর্কে।'

'না এ ধরনের বিজ্ঞাপন আমি কোন মতেই ছাপাতে পারি না।'

'আমার নাক সত্যি সত্যিই খোয়া গেলেও নয়।'

'খোয়া যদি গিয়ে থাকে সে হল গিয়ে ডাক্তারের কাজ। শুনেছি এমন লোকও আছে যারা যে-কোন রকম নাক বসাতে পারে। কিন্তু সে যাক গে, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি বেশ রগুড়ে লোক, লোকজনের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসেন।'

'ভগবানের পবিত্র নামের দিব্যি! ব্যাপারটা যখন এতদূর এসে ঠেকেছে, তাহলে দেখাতেই হচ্ছে।'

'ঝামেলায় কাজ কী!' কেরানি নস্যি টানতে টানতে বলে চলল, 'অবশ্য তেমন ঝামেলা যদি মনে না করেন, তাহলে একবার দেখতে পেলে মন্দ হত না।'

সরকারী কালেক্টর কভালিওভ মুখের ওপর থেকে রুমাল সরিয়ে নিল।

'আসলে কিন্তু সত্যিই দারুণ অদ্ভুত!' কেরানি বলল, 'জায়গাটা একেবারে লেপাপোঁছা, যেন সবে সেঁকা একটা চাপাটি। হ্যাঁ এমনই সমান যে বিশ্বাস করা যায় না!'

'তাহলে, এখনও কি আপনি তর্ক করবেন? আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে না ছাপালে চলছে না। আমি আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব; এই উপলক্ষে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় আমি বড়ই আনন্দিত — নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করছি...'

এ থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে মেজর এবারে খানিকটা খোসামোদের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'ছাপানোটা অবশ্যই তেমন কঠিন ব্যাপার নয়,' কেরানি বলল, 'তবে এতে আপনার কোন ত লাভ আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি নেহাৎই এ ব্যাপারে কিছু করতে চান তাহলে বরং যার কলমের জোর আছে এমন কাউকে দিয়ে

বিষয়টাকে অসাধারণ প্রকৃতির ঘটনা বলে লেখান, প্রবন্ধটা 'উত্তরের মধুকর' কাগজে ছাপতে দিন' (এই বলে সে আরও এক টিপ নস্যি নিল) 'যুবসম্প্রদায়ের উপকারের জন্য' (বলতে বলতে সে নাক মুছল) 'কিংবা অমনিতেই সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য।'

সরকারী কালেক্টর সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল। সে চোখ নামাল খবরের কাগজের পাতার উপরে, যেখানে ছিল থিয়েটারের বিজ্ঞপ্তি — সেখানে এক আকর্ষণীয় অভিনেত্রীর নাম চোখে পড়তে তার মুখে প্রায় হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল, তার হাতও চলে গেল পকেটে, পাঁচ রুবলের নোট কাছে আছে কিনা দেখার উদ্দেশ্যে, যেহেতু কভালিওভের মতে স্টাফ অফিসারদের বসা উচিত গদিওয়ালা সীটে — কিন্তু নাকের কথাটা মনে পড়তেই সব বরবাদ হয়ে গেল।

কেরানিটি নিজেও যেন কভালিওভের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়ল। কভালিওভের দুঃখ অন্তত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও লাঘবের বাসনায় সে গুটি কয়েক কথায় তার সমবেদনা জানানো সৌজন্যমূলক বলে গণ্য করল:

'সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আপনার জীবনে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। এক টিপ নস্যি নেওয়া কি আপনার পক্ষে ভালো হবে না? এতে মাথার যন্ত্রণা আর মনমরা ভাবটা ছেড়ে যায়; এমন কি অর্শের পক্ষেও এটা ভালো।'

বলতে বলতে কেরানিটি কভালিওভের সামনে নস্যিদানি ধরে টুপি পরিহিতা কোন এক মহিলার প্রতিকৃতি আঁকা ঢাকনাটা বেশ কায়দা করে ঘুরিয়ে নীচে সরিয়ে দিল।

এহেন হঠকারিতায় কভালিওভের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

'আমি ভেবে পাই না, এ নিয়ে আপনি রসিকতা করেন কী বলে,' সে রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে নস্যি যেখান দিয়ে টানব সেই জিনিসটাই আমার নেই? জাহান্নামে যাক আপনার নস্যি! এই অবস্থায় ওটার দিকে তাকানোরও প্রবৃত্তি নেই আমার — আপনার ঐ জঘন্য বেরেজিন্স্কি মার্কা ত দূরের কথা, যদি খোদ রাপে* এনে দিতেন তা হলেও নয়।'

---

* রাপে — নস্যি (ফরাসী)।

এই বলে সে দারুণ বিরক্ত হয়ে খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে রওনা দিল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উদ্দেশে। লোকটি ছিল চিনির পরম ভক্ত। তার বাড়িতে পুরো সামনের ঘরটা, যেটা আবার খাবার ঘরও বটে, চিনির ডেলায় সাজানো — সেগুলি বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে উপঢৌকন দিয়েছে ব্যবসায়ীরা। বাড়ির রাঁধুনি এই সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পা থেকে তার আনুষ্ঠানিক জ্যাক-বুট জোড়া খুলছিল; তলোয়ার এবং আর সব সামরিক উপকরণ ইতিমধ্যেই শান্ত ভাবে ঘরের এ কোনায় ও কোনায় ঝুলছিল, আর ভয়ঙ্কর তেকোনা টুপিটা নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে তার তিন বছরের ছেলে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখন যুদ্ধবিপর্যস্ত, সামরিক জীবনের পর শান্তিসুখ উপভোগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কভালিওভ যখন তার কাছে এসে উপস্থিত হল তখন সে হাতপা টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে কঁকিয়ে উঠে বলল: 'আঃ, ঘণ্টা দুয়েক আরামসে ঘুম দেওয়া যাবে!' তাই আগে থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে কালেক্টরের আগমন ছিল সম্পূর্ণ অসময়োচিত; জানি না, আমার ত মনে হয় ঐ সময় সে যদি অন্তত কয়েক পাউন্ড চা কিংবা খানিকটা বনাত কাপড়ও আনত তাহলেও তেমন একটা সাদর অভ্যর্থনা পেত না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিল যাবতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের পরম উৎসাহদাতা, তবে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত ব্যাঙ্ক নোট। 'জিনিসের মতো জিনিস বটে,' সে সচরাচর বলত, 'এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছুই নেই: খাওয়ানোর দরকার নেই, জায়গা অল্প লাগে, পকেটে সব সময় জায়গা হয়ে যায়, পড়ে গেলেও ভাঙে না।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শুষ্ককণ্ঠে কভালিওভকে অভ্যর্থনা জানাল, বলল যে মধ্যাহ্নভোজের পর তদন্ত চালানোর সময় নয়, স্বয়ং প্রকৃতির নির্দেশ এই যে পেট পুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করা উচিত (এ থেকে কালেক্টর বুঝতে পারল যে প্রাচীন জ্ঞানীদের বাণী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অজানা নয়), তাছাড়া কোন ভালো লোকের নাক কেউ ছিনিয়ে নেয় না, আর দুনিয়ায় মেজর অনেক রকমের আছে, এমনও আছে যাদের পরনে একটা ভদ্রস্থ জামা পর্যন্ত নেই, যারা অস্থানে-কুস্থানেও যাতায়াত করে।

অর্থাৎ রেখে ঢেকে নয়, সরাসরি মুখের ওপর! এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কভালিওভ ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর লোক। তার নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলা হোক না কেন সে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু তার পদ বা খেতাব

নিয়ে লোকে কিছু বলবে এটা সে কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারে না। তার এমনও মনে হল যে নাট্যাভিনয়ে মেজরের নীচের শ্রেণীর সৈন্যদের নিয়ে যা খুশি দেখানো হোক না কেন আপত্তি নেই, কিন্তু স্টাফ অফিসারদের ওপর আক্রমণ করা চলে না। পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের অভ্যর্থনায় সে এমন হতভম্ব হয়ে গেল যে মাথা ঝাঁকিয়ে মর্যাদাব্যঞ্জক স্বরে, দুই হাত সামান্য ছড়িয়ে সে বলল: 'আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার পক্ষ থেকে এধরনের অপমানজনক মন্তব্যের পর আমার আর কিছুই বলার নেই।' সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে যখন সে ফিরে এলো তখন নিজের পায়ে প্রায় কোন সাড়ই পাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই সমস্ত অনর্থক খোঁজাখুঁজির পর নিজের ফ্ল্যাটটাকে তার কাছে মনে হতে লাগল ভয়ানক কুৎসিত আর বিষণ্ণ ধরনের। সামনের ঘরটাতে প্রবেশ করতে সে দেখতে পেল যে চাকর ইভান ছোপ ধরা চামড়ার কোচে চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে ছাদের কড়িকাঠ লক্ষ্য করে থুতু ফেলছে, বেশ সাফল্যের সঙ্গে বারবার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করছে। লোকটার এই ঔদাসীন্যে কালেক্টর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, সে টুপি দিয়ে তার কপালে এক ঘা কষিয়ে দিয়ে বলল: 'শুয়োর কোথাকার, সব সময় আজেবাজে কাজ!'

ইভান তৎক্ষণাৎ তার জায়গা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সাঁ করে ছুটে এলো প্রভুর গা থেকে আচকানটা খোলার জন্য।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মেজর গদি আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল, অবশেষে পর পর কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'হা ভগবান! হা ভগবান! কেন এই দুর্ভাগ্য? যদি হাত কিংবা পা যেত, সেও ছিল এর চাইতে ভালো; কান যদি যেত সেটা খারাপই হত, কিন্তু তাও সহ্য করা যেত; কিন্তু নাক ছাড়া মানুষ — কে জানে বাপু তাকে কী বলা যায়? — পশু নয়, পাখি নয়, মানুষও নয়। স্রেফ তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার বস্তু! আর তাও যদি কাটা যেত যুদ্ধে কিংবা ডুয়েলে, কিংবা আমার নিজের কোন দোষে; কিন্তু দেখ, খোয়া গেল বিনা কারণে, বেফায়দা, ঝুটমুট!.. না, না এ হতে পারে না,' খানিকটা ভেবে নিয়ে সে যোগ করল। 'নাক খোয়া যাওয়া, এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সম্ভবত আমি স্বপ্ন দেখছি, নয়ত নেহাৎই আমার মনের ভ্রান্তি; এমনও ত হতে পারে যে জলের বদলে আমি ভুলক্রমে খেয়ে

ফেলেছি ভোদ্‌কা, যে ভোদ্‌কা আমি দাড়ি কামানোর পর চিবুকে ঘষি। বোকা ইভানটা ওটা উঠিয়ে রাখে নি, সম্ভবত আমি খেয়ে ফেলেছি।'

সে যে মাতাল নয় এ বিষয়ে সত্যি সত্যি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মেজর নিজের গায়ে এত জোরে চিমটি কাটল যে যন্ত্রণায় নিজেই চেঁচিয়ে উঠল। এই যন্ত্রণার ফলে তার সম্পূর্ণ প্রত্যয় হল যে সে সক্রিয় এবং জাগ্রত অবস্থায়ই আছে। সে ধীরে ধীরে আয়নার দিকে এগিয়ে গেল এবং প্রথমে এই আশায় চোখ কোঁচকাল যে নাকটা হয়ত যথাস্থানে দেখা গেলেও যেতে পারে; কিন্তু পর মুহূর্তেই এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠল:

'ওঃ কী বিদঘুটে দৃশ্য!'

ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই দুর্বোধ্য। বোতাম, রুপোর চামচ, ঘড়ি কিংবা ঐ ধরনের কিছু জিনিস খোয়া গেলে না হয় একটা মানে হয়, কিন্তু গেল ত গেল — এ কী খোয়া গেল? তাও আবার কিনা নিজের ফ্ল্যাটে!.. মেজর কভালিওভ সমস্ত পরিস্থিতি সবে মনে মনে বিবেচনা করে এটাই সত্যের অনেকটা কাছাকাছি বলে অনুমান করল যে এর জন্য সম্ভবত স্টাফ অফিসার পদ্‌তোচিনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ দায়ী নয় — ভদ্রমহিলার ইচ্ছে ছিল সে যেন তার মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে তার নিজেরও মন্দ লাগত না কিন্তু চূড়ান্ত কোন কথা দেওয়ার ব্যাপারটা সে পরিহার করে এসেছে। স্টাফ অফিসারের পত্নী যখন কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানালেন তখন সে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিল; সবিনয়ে জানালে যে তার বয়স এখনও কম, তার আরও পাঁচ বছর চাকরী করা দরকার যাতে বয়স পুরোপুরি বেয়াল্লিশ হয়। আর সেই কারণে স্টাফ অফিসারের পত্নী সম্ভবত প্রতিহিংসাবশত তার সর্বনাশ করার মতলব এঁটেছেন, হয়ত কোন ডাইনী-টাইনীর সাহায্য নিয়েছেন, কেননা নাকটা যে কাটা গেছে এটা কোন মতেই অনুমান করা যায় না: তার ঘরে কেউ আসে নি, নাপিত ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ তার দাড়ি কামিয়েছে বটে, কিন্তু সে ত বুধবারে, গোটা বুধবার ধরে, এমনকি পুরো বিষ্যুদবারটাও তার নাক অক্ষত ছিল — এটা তার মনে আছে এবং বেশ ভালোই জানা আছে; তাছাড়া সে রকম হলে ত ব্যথাই টের পেত, আর নিঃসন্দেহে কোন ক্ষত অত তাড়াতাড়ি শুকোতে পারে না এবং চাপাটির মতো অমন লেপাপোঁছাও হতে পারে না। সে মনে মনে মতলব আঁটতে লাগল: স্টাফ অফিসারের স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে মামলা ঠুকবে,

নাকি নিজেই তার বাসায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। দরজার সমস্ত ফাঁক ফোকর দিয়ে আলোর ঝলক এসে ঘরে প্রবেশ করল — বোঝা গেল যে সামনের ঘরে ইভান ইতিমধ্যেই মোমবাতি জেবলেছে। ফলে মেজরের ভাবনায় ছেদ পড়ল। অচিরেই মোমবাতি আগ বাড়িয়ে ধরে সারা ঘর উজ্জবল আলোয় আলোকিত করে আবির্ভাব ঘটল স্বয়ং ইভানের। কভালিওভের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল রুমাল তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা চাপা দেওয়া যেখানে গতকালও বিরাজ করছিল তার নাক, যাতে কর্তার এই অদ্ভুত অবস্থা দেখে ডাহা বোকা লোকটার মুখ হাঁ না হয়ে যায়।

ইভান তার নিজের খুপরিতে ফিরে চলে যেতে না যেতে সামনের ঘরে শোনা গেল অপরিচিত কণ্ঠস্বর, কে যেন জিজ্ঞেস করল:

'সরকারী কালেক্টর কভালিওভ এখানে থাকেন কি?'

'ভেতরে আসুন, মেজর কভালিওভ এখানে,' ঝট্ করে লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলতে খুলতে কভালিওভ বলল।

প্রবেশ করল এক পুলিশ কর্মচারী। চেহারাটা সুন্দর, দু'পাশের জুলপিজোড়া না একেবারে ফেকাসে, না গাঢ় রঙের, গাল বেশ ভরাট — এ হল সেই পুলিশ কর্মচারীটি, কাহিনীর শুরুতে যাকে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ইসাকিয়েভ্‌স্কি ব্রিজের প্রান্তে।

'যদি কিছু মনে না করেন, আপনিই কি নাক হারিয়েছেন?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।'

'ওটা এখন পাওয়া গেছে।'

'বলেন কী?' মেজর কভালিওভ চেঁচিয়ে উঠল। আনন্দে তার বাকাস্ফূর্তি হল না। সে চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল তার সম্মুখে দণ্ডায়মান দারোগার দিকে — দারোগা সাহেবের ফোলাফোলা ঠোঁট আর গালের ওপর মোমবাতির কাঁপা কাঁপা উজ্জবল আলো নাচছিল। 'কী ভাবে পেলেন?'

'অদ্ভুত ঘটনাক্রমে: ওটাকে প্রায় পথেই পাকড়াও করা হয়। একটা গাড়িতে চেপে বসে রিগায় চলে যাবার তাল করছিল। পাশপোর্টটা ছিল অনেক আগের লেখা, এক সরকারী কর্মচারীর নামে। আর অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে গোড়ায় আমি নিজেও ওকে কোন ভদ্রলোক বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার সঙ্গে চশমা ছিল, তাতেই না আমি তৎক্ষণাৎ দেখতে পেলাম যে ওটা হল নাক। আমার আবার দৃষ্টিটা ক্ষীণ কিনা,

আপনি যদি আমার সামনাসামনি দাঁড়ান তাহলে আমি কেবল দেখতে পাব যে আপনার মুখ আছে, কিন্তু না নাক, না দাড়ি কিছুই ঠাহর করতে পারব না। আমার শাশুড়ী ঠাকরুন, মানে আমার স্ত্রীর মাও কিছুই দেখতে পান না।'

কভালিওভ উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে পড়ল।

'ওটা কোথায়? কোথায় আছে? আমি এক্ষুনি যাব।'

'অধীর হবেন না। ওটা আপনার দরকার জেনেই আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে একাজে নাটের গুরু হল ভজ্‌নেসেন্‌স্কায়া স্ট্রীটের এক ঠক নাপিত, যে এখন হাজত বাস করছে। আমি বহুদিন যাবৎ মাতলামি ও চুরির জন্য তাকে সন্দেহ করছিলাম, এই দু'দিন আগেও একটা দোকান থেকে সে এক ডজন বোতামের একটা পাতা সরিয়েছে। আপনার নাক যেমন ছিল অবিকল তেমনি আছে।'

এই বলে পুলিশ ইনস্পেক্টর পকেটে হাত গলিয়ে বার করল কাগজে মোড়া নাক।

'হ্যাঁ এটাই!' কভালিওভ চেঁচিয়ে বলল। 'আরে এটাই ত! আসুন, আজ আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন।'

'খেতে পারলে পরম কৃতার্থ বোধ করতাম, কিন্তু কিছুতেই পারছি নে: আমাকে আবার এখান থেকে যেতে হবে সংশোধনাগারে।... সমস্ত জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে।... আমার বাড়িতে আমাদের সঙ্গে বাস করেন শাশুড়ী ঠাকরুন, মানে আমার স্ত্রীর মা, এছাড়া আছে ছেলেপুলে; বিশেষত বড়টা রীতিমতো সম্ভাবনাপূর্ণ: বড় বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু পড়াশুনো চালানোর কোন রকম সঙ্গতিই নেই।'

ইঙ্গিতটা আঁচ করতে পেরে কভালিওভ টেবিল থেকে একটা দশ রুব্‌লের নোট তুলে নিয়ে ইনস্পেক্টরের হাতে গুঁজে দিল। ইনস্পেক্টর নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলে, আর ঠিক পরক্ষণেই কভালিওভ শুনতে পেল রাস্তায় তার কণ্ঠস্বর — চাষাভুষো শ্রেণীর একটা বোকা লোক গাড়ি নিয়ে সোজা বুলভারে উঠে পড়ায় তাকে সে উত্তম মধ্যম দিচ্ছে।

পুলিশ ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর কালেক্টরটি কয়েক মিনিট কেমন যেন একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ডুবে রইল। অপ্রত্যাশিত আনন্দে সে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল, যে দেখা এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা ফিরে

পেতে তার বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেল। সে সন্তর্পণে দুই হাতে অঞ্জলি পেতে উদ্ধার প্রাপ্ত নাকটা রেখে সেটাকে মনোযোগ দিয়ে আরও একবার দেখল।

'হ্যাঁ ঠিকই, এটাই বটে!' মেজর কভালিওভ বলল। 'হ্যাঁ এই ত বাঁ দিকে সেই ফুসকুড়িটা, যেটা গতকাল উঠেছিল।'

মেজর আনন্দে প্রায় হেসেই ফেলল।

কিন্তু পৃথিবীতে কোন কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়, আর এই কারণেই আনন্দও পরবর্তী মুহূর্তে প্রথম মুহূর্তের মতো গভীর থাকে না; তারও পরের মুহূর্তে হয়ে আসে আরও ক্ষীণ এবং অবশেষে মনের সাধারণ অবস্থার সঙ্গে অলক্ষিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় — জলের বুকে ঢিল পড়লে যে বৃত্তাকার লহরীর সৃষ্টি হয় তা যেমন শেষ পর্যন্ত মসৃণ জলপৃষ্ঠে মিশে যায় ঠিক তেমনি। কভালিওভ ভাবতে শুরু করল, আর তখনই তার চৈতন্য হল যে ব্যাপারটা এখনও মিটে যায় নি: নাক খুঁজে পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তাকে যে সাঁটতে হবে, যথাস্থানে লাগাতে হবে!

'কিন্তু যদি আটকানো না যায় তাহলে?'

নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন করার পর মেজর ফেকাসে হয়ে গেল।

একটা দুর্বোধ্য আতঙ্ক এসে তার ওপর ভর করল। সে ছুটে চলে গেল টেবিলের দিকে, নাকটা যাতে কোন মতেই বাঁকা বসানো না হয় তার জন্য সে আয়না টেনে বার করল। তার হাত কাঁপছিল। সে সাবধানে, হুঁশিয়ার হয়ে নাকটাকে তার আগেকার জায়গায় বসাল। ওঃ কী সাংঘাতিক! নাক এ'টে থাকছে না! সে ওটাকে মুখের সামনে নিয়ে এলো, মুখের সামান্য ভাপ দিয়ে একটু গরম করে নিয়ে আবার দুই গালের মাঝখানকার সমতল জায়গায় এনে ধরল; কিন্তু নাক কিছুতেই জায়গায় থাকছে না।

'এই! এই! লেগে থাক্, আহাম্মক কোথাকার!' সে তাকে বলল। কিন্তু নাক তখন কাঠের টুকরোর মতো, টেবিলের ওপর পড়ে এমন এক বিদ্ঘুটে আওয়াজ করল যেন একটা ছিপি। খি'চুনির ফলে মেজরের মুখ বে'কে গেল। 'তা হলে কি ওটা জোড়া লাগবেই না?' সে ভয় পেয়ে বলল। কিন্তু কতবারই না সে তাকে যথাস্থানে রাখতে গেল, সব চেষ্টা বৃথা।

ঐ বাড়িরই দোতলায় সবচেয়ে ভালো ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন এক ডাক্তার। ইভানকে ডেকে মেজর তাঁকে আনতে পাঠাল। এই ডাক্তারটি বিশিষ্ট চেহারার পুরুষ, তাঁর ছিল চমৎকার কালো কুচকুচে জুলফি, তাজা

স্বাস্থ্যবতী ঘরনী। তিনি সকালে টাটকা আপেল খান, রোজ সকালে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে গার্গল্ করেন এবং পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে মুখের ভেতরটা অসাধারণ পরিষ্কার রাখেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন। কত দিন যাবত দুর্ঘটনাটা ঘটেছে জিজ্ঞেস করার পর ডাক্তার চিবুক ধরে মেজর কভালিওভের মাথা ওপরে তুললেন এবং আগে যেখানে নাক ছিল ঠিক সেই জায়গাটায় বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এমন টুসকি মারলেন যে মেজর মাথাটা ঝটকা মেরে পেছনে হেলাতে বাধ্য হল, আর তার ফলে মাথার পেছন দিকটা দেয়ালে ঠুকে গেল। চিকিৎসক বললেন যে ওটা কিছু নয়, তিনি তাকে দেয়াল থেকে খানিকটা সরে আসতে পরামর্শ দিলেন, তাকে মাথাটা প্রথমে ডান দিকে হেলাতে আজ্ঞা করলেন এবং যেখানে আগে নাক ছিল সেই জায়গা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন: 'হুম্!' অতঃপর তাকে আজ্ঞা করলেন বাঁ দিকে মাথা হেলাতে এবং বললেন 'হুম্!' আর পরিশেষে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আবার এমন একটা টুসকি মারলেন যে দাঁত দেখতে গেলে ঘোড়া যেমন করে, সেই ভাবে মেজর কভালিওভ মাথা ঝটকা দিল। এহেন পরীক্ষার পর চিকিৎসক মাথা নাড়িয়ে বললেন:

'না, সম্ভব নয়। আপনি বরং এই অবস্থায়ই থাকুন, কেন না কিছু করতে গেলে আরও খারাপ হতে পারে। ওটাকে লাগানো যে যায় না এমন নয়; আমি হয়ত এক্ষুনি লাগিয়েও দিতাম; কিন্তু আমি আপনাকে সত্যি করে বলছি, এতে আপনার খারাপই হবে।'

'চমৎকার কথা! নাক ছাড়া আমার চলবে কী করে শুনি?' কভালিওভ বলল। 'এখন যেমন আছে এর চেয়ে খারাপ ত আর কিছু হতে পারে না! এটা যে ছাই কী, তা একমাত্র শয়তানই জানে! এরকম যাচ্ছেতাই অবস্থায় কোথায় আমি মুখ দেখাব? আমার ভালো ভালো চেনাপরিচিত লোকজন আছে; এই ত আজই দুটো বাড়ির সান্ধ্য আসরে আমার যাওয়া দরকার। অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ: সরকারী পরামর্শদাতা চেখ্তারিওভের স্ত্রী, স্টাফ অফিসারের স্ত্রী পদ্তোচিনা... যদিও তাঁর বর্তমান আচরণের পর পুলিশের মাধ্যমে কিছু করা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আপনার কাছে মিনতি করছি,' কভালিওভ কাতর কণ্ঠে বলল, 'কোন উপায় কি নেই? কোন রকমে আটকে দিন, ভালো হোক খারাপ হোক, লেগে থাকলেই হল; তেমন বিপদ দেখলে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলে ধরে রাখতেও

আমি পারি। তাছাড়া আমি নাচিও না, সুতরাং অসাবধানবশত বেচাল হয়ে গিয়ে যে ক্ষতি করব এমন সম্ভাবনা নেই। আপনার ভিজিটের জন্য কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে যদি বলেন তা হলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমার সাধ্যে যতটা কুলোয়...'

'বিশ্বাস করুন,' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় উঠল না, নীচেও নামল না, সম্মোহন শক্তিসম্পন্ন সুমধুর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি ব্যক্তিগত লাভের জন্য কখনও চিকিৎসা করি না। এটা আমার নিয়ম এবং শাস্ত্রকলার বিরোধী। ভিজিটের জন্য ফী আমি অবশ্যই নিই, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে না নিলে লোকে মনে দুঃখ পাবে। আপনার নাক আমি নিশ্চয় লাগিয়ে দিতে পারতাম; কিন্তু হলফ করে বলছি, আপনি যদি নেহাৎই আমার কথা বিশ্বাস না করেন, এর ফল অনেক বেশি খারাপ হবে। বরং প্রকৃতির নিজের কার্যকলাপের ওপর ছেড়ে দিন। ঘন ঘন ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোন, আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি নাক থাকলে আপনি যেমন সুস্থ থাকতেন, না থাকলেও ততটাই থাকবেন। আর নাকটা, আমার পরামর্শ যদি শোনেন, স্পিরিট দিয়ে একটা বয়ামের ভেতরে রেখে দিন, কিংবা আরও ভালো হয় যদি তার সঙ্গে যোগ করেন বড় চামচের দু চামচ ঝাল ভোদ্‌কা ও ঈষদুষ্ণ ভিনিগার — তা হলে ওটার বদলে আপনি বেশ ভালো দাম পেতে পারেন। এমন কি আমি নিজেই নিতে পারি — যদি আপনার দাম তেমন চড়া না হয়।'

'না, না! কোন দামেই বিক্রি করব না!' মেজর কভালিওভ মরিয়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'ওটা নষ্ট হয়ে যাক তাও সই!'

'মাফ করবেন!' জবাবে ডাক্তার বললেন, 'আমি আপনার উপকারে আসতে চেয়েছিলাম।... তা কী আর করা যাবে! আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না, এটা ত অন্তত আপনি দেখেছেন।'

এই বলে ডাক্তার গুরুগম্ভীর চালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কভালিওভ তাঁর মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাল না, কেবল গভীর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেল ডাক্তারের কালো টেইল-কোটের হাতার ফাঁক থেকে উঁকি মারছে শার্টের তুষারধবল ও পরিচ্ছন্ন হাতার অগ্রভাগ।

পর দিনই সে ঠিক করল অভিযোগ দায়ের করার আগে স্টাফ অফিসারের পত্নীকে একটা চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করবে তার হক জিনিস তিনি তাকে বিনা যুদ্ধে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা। চিঠিটার বয়ান ছিল এই:

'প্রিয় মহাশয়া

আলেক্সান্দ্রা গ্রিগরিয়েভ্‌না,

'আপনার অদ্ভুত আচরণের কারণ আমার বোধগম্য নহে। আপনি এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে এবংবিধ আচরণের ফলে আপনার লাভের কোন সম্ভাবনা নাই এবং কোন মতেই আপনি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে আমাকে বাধ্য করিতে পারিবেন না। বিশ্বাস করুন, আমার নাসিকা সংক্রান্ত ঘটনা আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি এবং ইহাও নিশ্চিত জানি যে উক্ত কর্মে মূলত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন আপনি — আপনি ব্যতীত অপর কেহ নহে। উহার আকস্মিক স্থানচ্যুতি, পলায়ন ও ছদ্মবেশ ধারণ — কখনও সরকারী কর্মচারীর বেশ ধারণ, অবশেষে নিজ মূর্তি ধারণ, আপনার, কিংবা আপনার তুল্য যাঁহারা মহৎ কর্মে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মন্ত্রের প্রভাব ব্যতিরেক অন্য কিছু নহে। আমার পক্ষ হইতে আমি এই মর্মে আপনাকে পূর্বাহ্নে অবগত করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি যে আমার উল্লিখিত নাসিকা যদি অদ্যই যথাস্থানে প্রত্যাবর্তিত না হয় তাহা হইলে আমি আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইব।

'এতদসত্ত্বেও, আপনাকে পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

'ভবদীয় সেবক

প্লাতন কভালিওভ।'

'প্রিয় মহাশয়

প্লাতন কুজ্‌মিচ,

'আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আশ্চর্য বোধ করিলাম। আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে এবংবিধ অন্যায় ভর্ৎসনা কোন মতেই প্রত্যাশা করি নাই — আপনার নিকট হইতে ত অবশ্যই নহে। আপনার অবগতির জন্য জ্ঞাপন করিতেছি যে-সরকারী কর্মচারীর উল্লেখ আপনি করিয়াছেন তাহাকে আমি কদাচ স্বগৃহে অভ্যর্থনা জানাই নাই — ছদ্মবেশে নহে, স্বমূর্তিতেও নহে। সত্য বটে, ফিলিপ ইভানভিচ পতান্‌চিকভ আমার গৃহে আসিতেন। আর যদিচ তিনি যথার্থই আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা

করিয়াছিলেন এবং যদিচ তিনি সুপাত্র, আচরণে সংযত ও পরম বিদ্বান, তথাপি আমি তাঁহাকে কদাচ কোন রূপ আশা-ভরসা প্রদান করি নাই। আপনি নাসিকার প্রসঙ্গও উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আপনি যদি এমত বলিতে চাহেন যে আমি আপনার প্রতি উন্নাসিকতা প্রকাশ করিতেছি অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, তাহা হইলে আমি এই ভাবিয়া বিস্মিত না হইয়া পারি না যে আপনি নিজেই এই সম্পর্কে বলিতেছেন, যখন আমি — আপনার অবিদিত নাই — সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত মত পোষণ করি; অপিচ এক্ষণে যদি আইনমতে আপনি আমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন তাহা হইলে আমি এই মুহূর্তে আপনার তুষ্টি বিধানে প্রস্তুত, যেহেতু ইহা চিরকালই আমার একান্ত কাম্য ছিল এবং উক্ত ভরসায় আমি সর্বদা আপনার সেবায় প্রস্তুত আছি।

আলেক্সান্দ্রা পদ্‌তোচিনা।

'না,' কভালিওভ চিঠি পড়ার পর বলল। 'ঠিকই ভদ্রমহিলার কোন দোষ নেই। তাঁকে দোষী সাবাস্ত করা যায় না! যে-লোক কোন অপরাধে দোষী তার পক্ষে এমন চিঠি লেখা সম্ভব নয়!' সরকারী কালেক্টরের এটা জানা ছিল, কেন না ককেশাস অঞ্চলে থাকার সময় কয়েক বার তাকে তদন্তে যেতে হয়। 'কী ভাবে, কোন্ ফেরে পড়ে এমন ঘটনা ঘটল? কী জানি ছাই!' শেষকালে সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল।

ইতিমধ্যে এই অসাধারণ ঘটনা সম্পর্কে শহরময় গুজব রাষ্ট্র হয়ে গেছে এবং সচরাচর যা হয়ে থাকে — বেশ খানিকটা রঙ ফলিয়ে। সেই সময় অসাধারণত্বের প্রতি সকলের বিশেষ প্রবণতা ছিল: এর মাত্র কিছুদিন আগে জনসাধারণ সম্মোহন শক্তির প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ছিল। পরন্তু কনিউশেন্নায়া স্ট্রীটের নাচিয়ে চেয়ারের ঘটনা তখনও পুরনো হয়ে যায় নি, তাই শিগগিরই লোকে যখন বলতে শুরু করল যে সরকারী কালেক্টর কভালিওভের নাক কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় নেভ্‌স্কি এভিনিউতে নিয়মিত ঘুরে বেড়ায়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। প্রতি দিন অসংখ্য কৌতূহলী লোকজন জড় হতে লাগল। কে যেন বলল যে নাক য়ুঙকারের দোকানে*) আছে — অমনি য়ুঙকারের দোকানের সামনে এমন ভিড় জমে গেল যে পুলিশের হস্তক্ষেপ দরকার হয়ে

পড়ল। থিয়েটারের প্রবেশপথের সামনে নানা ধরনের শুকনো মিঠাইয়ের জনৈক বিক্রেতা — ভদ্র চেহারার জুলফিধারী ফাটকাবাজ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মজবুত গোছের, চমৎকার কয়েকটা কাঠের বেঞ্চি বানিয়ে কৌতূহলী লোকজনকে সেগুলির ওপর দাঁড়ানোর আমন্ত্রণ জানাল — একেকজন দর্শকের কাছ থেকে আশি কোপেক করে নিতে লাগল। কোন এক মান্যগণ্য কর্নেল এর জন্য বিশেষ করে বাড়ি থেকে আগে আগে বের হলেন এবং অতি কষ্টে ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি দারুণ বিরক্ত হয়ে গেলেন যখন দোকানের শো কেস্-এ নাকের বদলে দেখতে পেলেন সাধারণ পশমী গেঞ্জি এবং একটা ছাপানো ছবি, যাতে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে তার পায়ের স্টকিং ঠিক করছে, আর গাছের আড়াল থেকে খোলা ওয়েস্ট কোট পরনে, ছাগল দাড়িওয়ালা এক ফুলবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছে — আজ দশ বছরেরও বেশি কাল হল ঐ একই জায়গায় ঝুলছে ছবিটা। সরে এসে তিনি আক্ষেপ করে বললেন: 'এরকম অর্থহীন, অবিশ্বাস্য গুজব ছড়িয়ে লোকজনকে বিভ্রান্ত করার কোন মানে হয়?'

তারপর আরও একটি গুজব রটল এই মর্মে যে নেভ্স্কি এভিনিউতে নয়, তাভ্রিচেস্কি বাগানে ঘুরে বেড়ায় মেজর কভালিওভের নাক — বহু দিন হল নাকি সে ওখানে; আর খোজরেভ মির্জা*) যখন ওখানে বাস করতেন তখন নাকি তিনি প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলাখেলা দেখে দারুণ অবাক হয়ে যান। সার্জিকাল একাডেমির কিছু ছাত্র সেখানে রওনা দেয়। সম্ভ্রান্ত বংশের কোন এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা বিশেষ পত্রযোগে বাগানের ওয়ার্ডেনকে তাঁর ছেলেমেয়েদের এই দুর্লভ দৃশ্য দর্শনের সুযোগ দানের এবং সম্ভব হলে কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও উপদেশাত্মক ভাষ্য দানের অনুরোধ জানান।

শৌখিন সমাজের যত লোকজন, যারা বড় বড় সান্ধ্য আসরে নিয়মিত যাতায়াত করত, মহিলাদের হাসাতে ভালোবাসত, তারা এই ঘটনায় পরম পুলকিত হল, কেন না তাদের রসদ ইতিমধ্যে একেবারেই ফুরিয়ে এসেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক শ্রদ্ধাভাজন ও সংযত লোকজন রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন। এক ভদ্রলোক বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কী করে বর্তমান এই আলোকপ্রাপ্ত যুগে এমন উদ্ভট কল্পনা ছড়াতে পারে এটা তাঁর পক্ষে বোধগম্য নয়, আর সরকারই বা কেন এদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না তা ভেবে তিনি বিস্মিত। ভদ্রলোকটি স্পষ্টতই সেই জাতের ভদ্রমণ্ডলীর একজন

যাঁরা সমস্ত ব্যাপারে, এমন কি তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে প্রাত্যহিক ঝগড়াঝাঁটির ক্ষেত্রেও, সরকারকে জড়িত করতে কুণ্ঠিত হন না। অতঃপর... কিন্তু এখানে সমগ্র ঘটনা আবার ঢাকা পড়ে যায় কুয়াসায়, এবং অতঃপর কী যে ঘটল তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

৩

দুনিয়ায় আজেবাজে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটে। কখনও কখনও কোন কার্যকারণ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না: সরকারী পরামর্শদাতার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যে নাক এখানে ওখানে ভ্রমণ করছিল এবং শহরে এত বড় সোরগোল তুলেছিল, সেই নাকই একদিন হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই আবার ফিরে এলো যথাস্থানে, অর্থাৎ মেজর কভালিওভের দুই গালের ঠিক মাঝখানটায়। ঘটনাটি ঘটল এপ্রিল মাসের সাত তারিখে। ঘুম ভাঙার পর দৈবক্রমে আয়নায় দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল — নাক! হাত দিয়ে চেপে ধরল — নাকই বটে! 'হেঁ হেঁ!' কভালিওভ বলল এবং আনন্দে সে খালি পায়ে গোটা ঘর জুড়ে প্রায় এক পাক কসাক ত্রোপাক নাচ নেচেই ফেলেছিল, কিন্তু ইভানের আগমনে ব্যাঘাত ঘটল। মেজর তৎক্ষণাৎ হাতমুখ ধোয়ার সরঞ্জাম দিতে বলল, হাতমুখ ধোয়ার পর সে আরও একবার আয়নার দিকে তাকাল: নাক! তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে সে আবার তাকাল আয়নার দিকে: যথার্থই নাক!

'ইভান দ্যাখ দেখি, আমার নাকের ওপর যেন একটা ফুসকুড়ি উঠেছে,' কথাটা বলেই সে মনে মনে ভাবতে লাগল: 'সর্বনাশ, ইভান যদি বলে বসে: 'না কর্তা, ফুসকুড়ি কোথায়, নাকই ত নেই দেখছি!''

কিন্তু ইভান বলল:

'কিছু নেই, কোন ফুসকুড়ি-টুসকুড়ি নেই — নাক পরিষ্কার!'

'ভালো কথা, জাহান্নামে যাক!' মনে মনে এই কথা বলে মেজর তুড়ি মারল। এই সময় দরজায় উঁকি মারল নাপিত ইভান ইয়াকভ্লেভিচ, কিন্তু এমন ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে, যেন একটা বেড়াল মাংসের খণ্ড চুরি করার অপরাধে এই মাত্র উত্তম মধ্যম খেয়েছে।

'আগে বল্ দেখি হাত পরিষ্কার আছে ত?' দূরে থেকেই কভালিওভ ওর উদ্দেশে তর্জন করে বলল।

'আছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'ভগবানের দিব্যি, পরিষ্কার আছে কর্তা।'

'থাকলেই ভালো, দেখিস কিন্তু!'

কভালিওভ বসল। ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ একটা তোয়ালে দিয়ে তাকে জড়াল, চোখের পলকে ব্রাশের সাহায্যে তার পুরো দাড়ি এবং গালের একটা অংশ এমন ফেটানো ক্রীমের পুঞ্জে পরিণত করে ফেলল, যা পরিবেশিত হয়ে থাকে ব্যবসায়ীদের বাড়ির জন্মদিনের পার্টিতে।

'বোঝ কান্ড!' নাকটার দিকে তাকিয়ে ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ মনে মনে বলল, তারপর মাথা অন্য দিকে কাত করে একপাশ থেকে সেটাকে দেখল। 'দেখ দেখি! ভাবাই যায় না!' মনে মনে বলতে বলতে সে অনেকক্ষণ ধরে নাক দেখতে লাগল। অবশেষে নাকের ডগা ধরার উদ্দেশ্যে সে এত সন্তর্পণে ও আলতো করে দুটো আঙ্গুল সামান্য ওঠাল যে তা কল্পনাই করা যায় না। এটাই ছিল ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচের অভ্যস্ত রীতি।

'দেখিস, দেখিস, সাবধান!' কভালিওভ চেঁচিয়ে বলল।

এই কথায় ইভান ইয়াকভ্‌লেভিচ থতমত খেয়ে, স্তম্ভিত হয়ে হাত নামিয়ে ফেলল, জীবনে আর কখনও এমন স্তম্ভিত সে হয় নি। শেষ পর্যন্ত সে সন্তর্পণে ক্ষুর দিয়ে মেজরের চিবুকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল; ঘ্রাণেন্দ্রিয় না ধরে দাড়ি কামাতে যদিও তার পক্ষে রীতিমতো অসুবিধাজনক ও কঠিন ঠেকছিল তথাপি সে কোন রকমে তার খসখসে বুড়ো আঙ্গুল মেজরের গালে ও নীচের মাড়িতে ঠেকিয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত দাড়ি কামানো সারল।

সব হয়ে যেতে কভালিওভ তৎক্ষণাৎ তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরে নিল, একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে সোজা চলল মিঠাইয়ের দোকানে। প্রবেশ করতে করতে দূরে থেকেই সে হাঁক দিয়ে বলল: 'বয়, এক কাপ চকোলেট!' আর নিজে সেই মুহূর্তে এগিয়ে গেল আয়নার দিকে: নাকে আছে বটে! সে খুশি হয়ে পেছন ফিরল, চোখ সামান্য কুঁচকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাল দু'জন সামরিক অফিসারের দিকে, যাদের একজনের নাক ওয়েস্ট কোটের বোতামের চেয়ে কোন অংশে বড় ছিল না। এর পর সে রওনা দিল কোন এক ডিপার্টমেন্টের অফিসে যেখানে সে চেষ্টা-চরিত্র করছিল ছোট লাটের পদ লাভের — আর নেহাৎই না জুটলে যাতে কোন প্রশাসনিক

পদ পাওয়া যায়, তার জন্য। রিসেপশন-রুমের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করল: নাক যথাস্থানে আছে! অতঃপর সে গেল আরেকজন কালেক্টর বা মেজরের কাছে — খুব রসিক লোক, তার নানা ধরনের খোঁচামারা মন্তব্যের জবাবে কভালিওভ প্রায়ই বলত: 'হুঁ, তোমাকে আর চিনি নে? হুল ফোটাতে ওস্তাদ!' পথে সে ভাবল: 'মেজরও যদি আমাকে দেখে হাসিতে ফেটে না পড়ে তা হলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে যা যা থাকার ঠিক আছে, যথাস্থানে আছে।' কিন্তু কালেক্টরটির প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। 'ভালো, ভালো, মরুক গে ছাই!' কভালিওভ মনে মনে ভাবল। পথে স্টাফ অফিসার পদতোচিনের স্ত্রী আর কন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল, সে তাদের উদ্দেশে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল, তার দেখা পেয়ে তারা উল্লসিত হয়ে চেঁচাল: তার মানে, কিছুই ঘটে নি, কোন ক্ষয়ক্ষতি তার হয় নি। সে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল এবং ইচ্ছে করেই নস্যিদানি বার করে তাদের সামনে বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে নাকের দুটো প্রবেশপথেই নস্যি ঠাসতে ঠাসতে মনে মনে বলল: 'তোমাদের, এই মেয়ে জাতটার এমনই হওয়া উচিত! মুরগীর জাত কোথাকার! যাই বল না কেন, তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। হ্যাঁ নেহাৎ যদি par amour* হত তাহলে না হয় কথা ছিল!' এর পর থেকে মেজর কভালিওভ নেভ্স্কি এভিনিউতে, থিয়েটারে সর্বত্র পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর নাকও পরম নিশ্চিন্তে বসে রইল তার মুখের ওপর, এমন কি কোনকালে যে স্থানচ্যুত হয়েছিল তেমন লক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল না। আর এর পর কভালিওভকে সর্বক্ষণ দেখা যেত খোশ মেজাজে, তার মুখে হাসি লেগে থাকত। সে সোৎসাহে সমস্ত সুন্দরী মহিলার পিছু নিত, এমন কি একবার সে শহরের বাজার পাড়ায় এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে পদক ঝোলানের একটা ফিতেও কেনে, যদিও কারণটা ছিল অজ্ঞাত, কেন না সে নিজে কোন পদকের অধিকারী ছিল না।

এমনই ঘটনা ঘটেছিল আমাদের এই সুবিশাল দেশের উত্তরের মহানগরীতে! কেবল এখনই সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তার মধ্যে অনেক কিছু অবিশ্বাস্য আছে। দস্তুরমতো অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত উপায়ে নাকের স্থানচ্যুতি এবং সরকারী পরামর্শদাতার বেশে

---

* প্রেমে পড়ে (ফরাসী)।

বিভিন্ন স্থানে নাকের আবির্ভাবের কথা যদি ছেড়েও দিই, এ জিনিসটা কভালিওভ কেন বুঝতে পারল না যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে নাক সম্পর্কে ঘোষণা করা সঙ্গত নয়? আমি এখানে এই অর্থে বলছি না যে বিজ্ঞাপনের পেছনে অর্থ ব্যয় আমার কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে: এটা নেহাৎই বাজে কথা, আমি আদৌ অর্থগৃধ্নু শ্রেণীর লোকে নই। কিন্তু ব্যাপারটা অশোভন, অসঙ্গত, ভালো নয়! তা ছাড়া আরও একটা কথা — নাক কী করে সদ্য সেঁকা রুটির ভেতরে এলো, আর খোদ ইভান ইয়াকভ্লেভিচের বা কী হল?.. না, এটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, একেবারেই না! কিন্তু আরও অদ্ভুত, সবচেয়ে দুর্বোধ্য ব্যাপার হল এই যে লেখকরা কী বলে এমন বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন! স্বীকার করতে বাধা নেই, এটা সম্পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, এটা আসলে... না, না, আমি মোটে বুঝে উঠতে পারছি না। প্রথমত, এতে স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার নেই; আর দ্বিতীয়ত... হ্যাঁ, দ্বিতীয়তও কোন উপকার দেখি না। সোজা কথা, আমি জানি না এটা কী।...

সে যাই হোক না কেন, এসব সত্ত্বেও, যদিও এটা ওটা এবং আরও কিছু অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, এমন কি হয়ত বা... আর সত্যিই ত, সামঞ্জস্যহীন কাণ্ডকারখানা কোথায়ই বা না ঘটে?.. কিন্তু এসব সত্ত্বেও, একটু ভেবেচিন্তে দেখলে, এই সমস্তটার মধ্যে কিছু একটা আছে, অবশ্যই আছে। যে যাই বলুন না কেন, এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে — ক্বচিৎ, তবে ঘটে।

পোর্ট্রেট

প্রথম খণ্ড

শচুকিন দ্‌ভোরের*) ছবির স্টলের সামনে যত লোক ভিড় করে দাঁড়াত তত আর কোথাও দাঁড়াত না। এই স্টলে সাজানো থাকত বহু বিচিত্র ধরনের কৌতূহল-উদ্রেককারী সামগ্রীর সংগ্রহ: অধিকাংশ ছবিই তেলরঙে আঁকা, গাঢ় সবুজ বার্ণিশের প্রলেপ লাগানো, গাঢ় হলুদ রঙের চটকদার ফ্রেমে বাঁধাই। শীতের দৃশ্য — সাদা গাছপালা, অগ্নিদাহের রক্তিমাভার মতো টকটকে লাল সন্ধ্যা, পাইপ-মুখে এক ফ্লেমিশ চাষী, একটা হাত তার দোমড়ানো — মানুষের চেয়ে শুধু জামার কাফ্‌-আঁটা ঢাকা টার্কী-মোরগের সঙ্গেই যার বেশি মিল — এই হত সচরাচর সেগুলির বিষয়বস্তু। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করা যায় গোটা কয়েক খোদাই-কাজ — ভেড়ার চামড়ার টুপি-মাথায় খোজরেভ-মির্জার প্রতিকৃতি, তেকোনা টুপিপরা, বাঁকা নাকওয়ালা কিছু জেনারেলের প্রতিকৃতি। সর্বোপরি, এ ধরনের স্টলের দরজার গায়ে সচরাচর বড় বড় পাতার ওপর চটা-ধরা এমন সমস্ত ছবির প্রিন্ট তাড়া বেঁধে ঝোলানো থাকে যেগুলি রুশী মানুষের সহজাত প্রতিভার সাক্ষ্যবহ। একটিতে রাজকুমারী মিলিক্‌ত্রিসা কির্‌বিতিয়েভ্‌না*), অন্যটিতে জেরুসালেম শহর, যার ঘরবাড়ি আর গির্জার ওপর দিয়ে কোন রকম শিষ্টাচারের বালাই না রেখে বয়ে চলেছে লাল রঙের বন্যা; সে রঙ আবার গড়িয়ে পড়েছে মাটির একাংশের গায়ে এবং দস্তানা পরা অবস্থায় প্রার্থনারত দুটি রুশী চাষীর ওপর। এই শিল্পসৃষ্টিগুলির ক্রেতা সাধারণত তেমন বেশি হয় না, কিন্তু দর্শকের কমতি নেই। দেখা যাবে, কোন ফাঁকিবাজ ছোকরা চাকর হয়ত তার মনিবের জন্য সরাইখানা থেকে দুপুরের খাবার নিয়ে যাবার পথে টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে সেগুলির সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে

পড়েছে — আর বলাই বাহুল্য এরপর তেমন একটা গরম সুপ মনিবের গলাধঃকরণ করার কথা নয়। ছবিগুলির সামনে ইতিমধ্যেই ঠিক দাঁড়িয়ে পড়েছে গ্রেটকোট পরনে এক সৈনিক — পুরনো বাজারের এক বিশিষ্ট রাজপুরুষ — পেনসিল কাটার দুটো ছুরি সে বিক্রি করতে এসেছে; আর আছে ওখ্‌তার*) এক পসারিনী — বাক্সভর্তি জুতো নিয়ে। যে যার নিজের মতো রস উপভোগ করে: চাষীরা সচরাচর আঙুল দিয়ে খোঁচায়; পুরনো বাজারের বিশিষ্ট রাজপুরুষরা রীতিমতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে; ছোকরা চাকররা আর কুটির শিল্পীদের শিক্ষানবিস ছোকরারা হাসাহাসি করে, তারা আঁকা ক্যারিকেচারের নকল করে একে অন্যকে ভেঙায়; খসখসে মোটা পশমি কাপড়ের গ্রেটকোট-গায়ে বুড়ো চাকরেরা দেখে কেবল ফাঁক বুঝে কোথাও একটু কুঁড়েমি করার উদ্দেশ্যে; আর পসারিনীরা, অল্পবয়সী রুশী মেয়ের দল লোকে কী নিয়ে গালগল্প করছে তা শোনার জন্য এবং কী দেখছে তা দেখার জন্য সহজাত প্রবৃত্তি বশে ছুটে আসে।

এই সময় স্টলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজের অজানতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তরুণ শিল্পী চার্তকোভ। পুরনো গ্রেটকোট ও শ্রীহীন পোশাকের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ছিল নিজের কাজে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ এমন এক মানুষের চেহারা, যে তার বেশভূষার দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ পায় না, যদিও বেশভূষার প্রতি অল্পবয়সীদের বরাবরই একটা গোপন মোহ থাকে। সে স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, এই কদাকার ছবিগুলি দেখে প্রথমে তার মনে মনে হাসি পেল। অবশেষে নিজের অজানতেই তাকে আচ্ছন্ন করে বসল একটি চিন্তা: সে ভাবতে লাগল, কোন্ ধরনের লোকের এই ছবিগুলির দরকার? রুশী লোকেরা যে ইয়েরুস্‌লান লাজারেভিচ বা অতিভুক ও অতিপায়ী কিংবা ফোমা ও ইয়েরেমার*) ছবি অবাক হয়ে দেখে এটা তার কাছে বিচিত্র ঠেকে না — আঁকা বিষয়গুলি সহজসরল, জনসাধারণের বোধগম্য; কিন্তু এই সব রঙচঙে, নোংরা, তৈলচর্চিত জেবড়া ছবির ক্রেতা কোথায়? কার দরকার এই ফ্লেমিশ চাষীরা, লাল-নীল রঙের এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেখানে বেশ খানিকটা উন্নত পর্যায়ের শিল্পের দাবি থাকা সত্ত্বেও আসলে তার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে? এটাকে মোটেই স্বয়ংশিক্ষিত শিশুর কাজ বলা চলে না। তা-ই যদি হত তাহলে তাদের মধ্যে সামগ্রিক নির্মম ক্যারিকেচারের ভাব ছাপিয়ে ফুটে উঠত তীব্র আবেগ। কিন্তু এখানে যা চোখে পড়ে তা হল শিল্পকলার ওপর জোর করে চেপে

বসা নেহাৎই স্থূল, অক্ষম, বস্তাপচা অসারতা, যখন তার স্থান হওয়া উচিত ছিল নীচুস্তরের হস্তশিল্পের মধ্যে, যে-হস্তশিল্পের অসারতা বস্তুতপক্ষে তার ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠাবশতঃই খোদ শিল্পে চালান করেছে নিজস্ব কারিগরি। একই রঙ, একই রীতি, সেই একই একঘেয়ে, মামুলি হাত, যাকে মানুষের হাত না বলে স্থূল ভাবে তৈরি কোন স্বয়ংচল যন্ত্রের হাত বলাই বোধহয় সঙ্গত।.. অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল এই নোংরা ছবিগুলির সামনে, এখন আর সে ছবির কথা মোটেই ভাবছিল না; কিন্তু ইতিমধ্যে স্টলের মালিক, খসখসে মোটা পশমী কাপড়ের গ্রেটকোট-গায়ে, সেই রোববার থেকে খেউড়ি-না-করা বাসি দাড়ি নিয়ে ভোঁতা চেহারার একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে তাকে উত্যক্ত করে চলছিল এবং কী তার পছন্দ, কী তার দরকার না জেনেশুনেই দরাদরি করতে নেমে পড়েছিল, জিনিসের দাম হাঁকছিল।

'এই চমৎকার চাষী আর ছোট্ট ল্যান্ডস্কেপটার জন্যে নেব পঁচিশ। কী দারুণ পেইন্টিং! চোখ টাটানোর মতন বটে; পাইকারী বাজার থেকে সদ্য পাওয়া; বার্নিশ এখনও শুকোয় নি। নয়ত শীতকাল, শীতকালটাই নিন না কেন। পনেরো রুবল। আরে কেবল ফ্রেমটারই ত ঐ দাম। দেখুন দেখি কেমন শীতকাল!' এই বলে ব্যবসায়ীটি ক্যানভাসে মৃদু টোকা দিল — সম্ভবত শীতকালের সমস্ত উদার সৌন্দর্যের পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে। 'আজ্ঞা করুন, সবগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে আপনার বাড়ি দিয়ে আসি। কোথায় দিয়ে আসতে আজ্ঞা হয়? ওরে ছোঁড়া, দড়ি দে দেখি এদিকে।'

'দাঁড়াও ভাই, অত তাড়াতাড়ি নয়,' চটপটে ব্যবসায়ীটি সত্যি সত্যিই ছবিগুলি একসঙ্গে বাঁধতে যাচ্ছে দেখে সংবিৎ ফিরে পেয়ে শিল্পী বলল। এতক্ষণ দোকানে দাঁড়িয়ে থাকার পর কিছু না কেনার জন্য তার কেমন যেন বিবেকে বাধছিল, তাই সে বলল:

'একটু অপেক্ষা কর, দেখি আমার নেবার মতো কিছু এখানে আছে কিনা,' এই বলে সে নীচু হয়ে মেঝে থেকে তুলতে লাগল কতকগুলি রঙচটা, ধুলোমাখা পুরনো, নিকৃষ্ট ছবি; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কোন কদর না থাকায় সেগুলি স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল। সেখানে ছিল কিছু প্রাচীন পারিবারিক পোর্ট্রেট, যাদের উত্তর পুরুষদের সন্ধান সম্ভবত ইহজগতে মিলবে না; ছিল ছেঁড়া ক্যানভাসে কিছু ছবি, যাদের পরিচয় উদ্ধার করার কোন উপায় নেই এবং গিলটি-চটা ফ্রেম — এক কথায়, যত রাজ্যের পুরনো

জঞ্জালে। কিন্তু শিল্পী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, মনে মনে সে ভাবছিল: 'বলা যায় না, কিছুর সন্ধান মিললেও মিলতে পারে।' সে একাধিকবার শুনেছে বটতলার দোকানদারদের ছবির জঞ্জালের ভেতরে কখনও কখনও বড় বড় শিল্পীর আঁকা ছবি খুঁজে পাবার ঘটনা।

লোকটা কোথায় হাত দিয়েছে দেখতে পেয়ে দোকানের মালিকের ব্যস্তসমস্ত ভাব ঘুচে গেল, সে উপযুক্ত গাম্ভীর্য ধারণ করে আবার চলে গেল তার আগের জায়গায়, দোরগোড়ায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাতে স্টল দেখিয়ে পথচারীদের উদ্দেশে ডাকাডাকি শুরু করে দিল: 'আসুন স্যার, এই যে ছবি! আসুন, আসুন; পাইকারী বাজার থেকে সদ্য পাওয়া।' এই ভাবে হাঁকডাক সে যথেষ্ট পরিমাণে করল — অধিকাংশই অবশ্য বৃথা; উল্টো দিকে ছেঁড়া জামাকাপড়ের যে দোকানদারটি তারই মতন নিজের দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তার সঙ্গে প্রাণভরে বকবকও করল, শেষকালে দোকানে ক্রেতা আছে মনে পড়ে যেতে রাস্তার লোকজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দোকানের ভেতরে চলে গেল। 'কি স্যার, কিছু পছন্দ হল?' ইতিমধ্যে শিল্পী বেশ কিছুক্ষণ হল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটা পোর্ট্রেটের সামনে, যেটা কোন এক কালে বিরাট, জমকাল ফ্রেমে বাঁধানো ছিল, কিন্তু এখন তার ওপর সামান্যই চকচক করছে গিল্টির চিহ্ন।

ছবিতে ছিল গালের হাড় বার করা, জীর্ণশীর্ণ, তামাটে রঙের এক বৃদ্ধ; তার মুখাবয়বে যেন তুলে ধরা হয়েছে মাংসপেশীর আক্ষেপজনক সঞ্চালনের মুহূর্ত, সেখানে উত্তরের মানুষের শক্তির কোন অভিব্যক্তি ছিল না। তাতে ছিল দক্ষিণের দাবদাহ! লোকটি ছিল ঢিলে এশীয় পোশাকে আচ্ছাদিত। পোর্ট্রেটটি যতই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধূলিধূসরিত হোক না কেন, তার মুখের ওপর থেকে যখন ধুলো সরিয়ে ফেলা সম্ভব হল, তখন চার্তকোভের চোখে পড়ল এক উঁচুদরের শিল্পীর কাজের নিদর্শন। পোর্ট্রেটটা অসমাপ্ত বলেই মনে হল; কিন্তু তুলির শক্তি লক্ষ করার মতো। সবচেয়ে অসাধারণ ছিল চোখজোড়া: মনে হচ্ছিল সেগুলির মধ্যে শিল্পী যেন প্রয়োগ করেছেন তুলির সমস্ত শক্তি ও অদম্য অধ্যবসায়। চোখজোড়া স্রেফ তাকাচ্ছিল — এমন কি খোদ পোর্ট্রেটটার ভেতর থেকে এমন ভাবে তাকাচ্ছিল যেন তার অদ্ভুত সজীবতার দরুন ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল ছবির সামঞ্জস্য। ছবিটাকে সে যখন দরজার কাছে নিয়ে এলো তখন তার চোখের দৃষ্টি যেন তীব্রতর হল। লোকজনের মনেও পড়ল প্রায় ঐ একই ছাপ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল এক

স্ত্রীলোক, সে চিৎকার করে 'তাকাচ্ছে, তাকাচ্ছে,' বলে পিছিয়ে গেল। কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর, দুর্বোধ্য উপলব্ধিতে চার্তকোভ নিজেও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, ছবিটাকে সে মাটির ওপর খাড়া করে রাখল।

'নিচ্ছেন? নিন তাহলে ছবিটা!' মালিক বলল।

'কত দাম?' শিল্পী জিজ্ঞেস করল।

'এর জন্যে আর বেশি কী চাইব? তিনটি সিকি দিন।'

'না।'

'আচ্ছা, কত দেবেন আপনিই বলুন।'

'বিশ কোপেক,' এই বলে শিল্পী স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হল।

'হুঃ, এটা একটা দাম হল! আরে, বিশ কোপেকে ত ফ্রেমটাও কেনা যায় না। তবে কি আগামীকাল এসে কিনে নিয়ে যাবেন? ফিরে আসুন স্যার, ফিরে আসুন! আরও অন্তত দশটা কোপেক দিন। নিন, নিন, বিশ কোপেকই দিন। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, কেবল বউনির খাতিরে। প্রথম খদ্দের কিনা!'

তারপর হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন বলতে চাইল: 'তা-ই হোক, যাক গে ছবিটা!'

এই ভাবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে পড়ে চার্তকোভকে পুরনো ছবিটা কিনতে হল। সঙ্গে সঙ্গে সে এই কথাও ভাবল: 'আচ্ছা, এটা কিনলাম কেন? এটা দিয়ে আমার কী হবে?' কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। সে পকেট থেকে বিশ কোপেক ব্যর করে মালিককে দিল, পোর্ট্রেটটা বগলদাবা করে রওনা দিল। পথে তার মনে পড়ে গেল যে বিশ কোপেক সে দিল সেটা ছিল তার শেষ কপর্দক। হঠাৎ তার মন বিষাদে ভরে গেল; তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল আক্ষেপ, উদাসীন শূন্যতা। 'চুলোয় যাক! কী বিশ্রী এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা!' কোন রুশী খারাপ অবস্থায় পড়লে যেমন উপলব্ধি করে সেই ভঙ্গিতে সে বলল। সব কিছুর প্রতি একটা অপরিসীম ঔদাসীন্যের ভাব নিয়ে সে প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো দ্রুত পদক্ষেপে চলল। গোধূলির রক্তিম আভা তখনও অর্ধেক আকাশ জুড়ে রয়ে গেছে; এই দিকে মুখ করে যে-সমস্ত ঘরবাড়ি আছে সেগুলি তার ঈষদুষ্ণ আলোকে ঈষৎ উদ্ভাসিত; ইতিমধ্যে চাঁদের নীল-নীল শীতল দ্যুতি উত্তরোত্তর প্রগাঢ় হয়ে উঠছে। পথচারীদের পদচালনা আর বাড়িঘরের আধাস্বচ্ছ হালকা ছায়া পুচ্ছের আকারে এসে পড়ছে মাটিতে। শিল্পী

ততক্ষণে অল্প অল্প করে তাকাতে শুরু করেছে কেমন যেন স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, সন্দেহজনক আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে, আর ঐ অবস্থায় প্রায় একই সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: 'কী হালকা তুলির টান!' এবং 'বিরক্তিকর, চুলোয় যাক!' পোর্ট্রেটটা অনবরত তার বগলের তলা থেকে ফসকে পড়ে যাচ্ছিল, সেটাকে ঠিক করে যথাস্থানে চালান করতে করতে সে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

ক্লান্ত এবং গলদঘর্ম অবস্থায় সে কোন রকমে এসে পৌঁছুল ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের পনেরো নম্বর লাইনে তার নিজের বাসায়। অতি কষ্টে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে জঞ্জালে ভর্তি এবং কুকুর-বেড়ালের চিহ্নে শোভিত সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠল। দরজায় ধাক্কা দিতে কোন সাড়া মিলল না: বাড়িতে কাজের লোকটা ছিল না। সে জানলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করার প্রস্তুতি নিল; এমন সময় পেছনে শোনা গেল নীল জামা পরা ছোকরার পদশব্দ। এই ছেলেটা একাধারে তার সহযোগী, মডেল, রঙ মেশানোর কারিগর আবার ঝাড়ুদারও বটে — যদিও ঝাড়ু দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুটজোড়া দিয়ে মেঝে নোংরা করে ফেলে। ছোকরার নাম নিকিতা। প্রভু বাসায় না থাকলে সে সর্বক্ষণ গেটের বাইরে, রাস্তায় রাস্তায় সময় কাটায়। অন্ধকারের দরুন তালার ফুটো চোখে না পড়ায় চাবি ঢোকানোর জন্য নিকিতাকে অনেকক্ষণ কসরৎ করতে হল। অবশেষে দরজা খোলা হল। চার্ত্কোভ প্রবেশ করল নিজের কামরায় — বাইরের হলঘরটাতে। শিল্পীদের ঘর বরাবরই যেমন অসহ্য ঠান্ডা হয়ে থাকে এটাও তেমনি; অবশ্য প্রসঙ্গত বলতে হয়, সে দিকে তাদের কোন খেয়াল থাকে না। গায়ের ওভারকোটটা নিকিতার হাতে না দিয়ে সেটা পরা অবস্থায়ই সে প্রবেশ করল তার স্টুডিওতে। স্টুডিও বলতে একটা বড়সড় চৌকোনা ঘর, ঘরের ছাদ নীচু, জানলার শার্সি হিমে জমে গেছে, ঘরে রাখা আছে শিল্পীর যত রাজ্যের আবর্জনা: প্লাস্টারের হাতের টুকরো, ফ্রেমে বসানো তৈরি ক্যানভাস, সদ্য শুরু করা ও পরিত্যক্ত স্কেচ, চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রাখা ভারী পর্দা। সে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওভারকোটটাকে গা থেকে খুলে ফেলে দিল, আনা পোর্ট্রেটটা অন্যমনস্ক ভাবে খাড়া করে রেখে দিল দুটি ছোট ক্যানভাসের মাঝখানে, তারপর ধপ করে গিয়ে পড়ল সঙ্কীর্ণ ছোট সোফাটার ওপর, যেটাকে আদৌ চামড়ায় মোড়া বলা চলে না, কেননা যে-সমস্ত পেতলের পেরেক দিয়ে কোন এককালে চামড়া টান করে

লাগানো ছিল তাদের সারি এখন স্বচ্ছন্দচারী, আর ওপরের চামড়াও ঐ একই রকমের স্বচ্ছন্দচারী, ফলে নিকিতা তার তলায় গ‍ুঁজেছে নোংরা মোজা, শার্ট আর রাজ্যের না-কাচা কাপড়চোপড়। খানিকটা বসে থেকে, এই সংকীর্ণ ছোট কোচটাতে যতক্ষণ সম্ভব গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করার পর শেষকালে সে মোমবাতি চাইল।

'মোমবাতি নেই,' নিকিতা বলল।

'নেই মানে?'

'তা গতকালও ত ছিল না,' নিকিতা বলল।

সত্যি সত্যি গতকালও যে মোমবাতি ছিল না তা মনে পড়ে যেতে শিল্পী শান্ত হল, চুপ করে গেল। সে জামাকাপড় ছেড়ে দীর্ঘকালীন পরিধানে সম্প‍ূর্ণ দ‍ুর্দশাগ্রস্ত, ছিন্নভিন্ন ড্রেসিংগাউন পরল।

'হ্যাঁ, ভালো কথা, বাড়িওয়ালা এসেছিল,' নিকিতা বলল।

'টাকার জন্যে এসেছিল, তাই ত? জানি,' হাল ছেড়ে দিয়ে হাত নেড়ে বলল শিল্পী।

'কিন্তু সে একা ছিল না,' নিকিতা বলল।

'আর আবার কে ছিল?'

'জানি না... থানার দারোগা না কে যেন।'

'দারোগা আবার কেন?'

'জানি না কেন; তার পর বলল, ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকি আছে।'

'কিন্তু তাতে কী হবে?'

'কী হবে তা আমি জানি না। বলল, ভাড়া যদি না দিতে চায় তাহলে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিক। কালকে দ‍ু'জনে আবার আসবে বলে গেছে।'

'আস‍ুক গে,' চার্তকোভ বিষণ্ণ ঔদাস্যভরে বলল। তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করল কালো মেঘ।

তর‍ুণ চার্তকোভ ছিল প্রতিভাবান শিল্পী, তার মধ্যে ছিল বহ‍ু প্রতিশ্র‍ুতি: তার তুলির টানে ক্ষণে ক্ষণে ঝলক দিত পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, বোধশক্তি আর প্রকৃতির নিকটতর সান্নিধ্যে আসার প্রবল বাসনা। তার অধ্যাপক তাকে একাধিকবার বলেছেন: 'দেখ ভাই, তোমার প্রতিভা আছে, সেটা যদি তুমি নষ্ট কর তা হলে আফশোসের কথা হবে। কিন্তু তুমি অসহিষ্ণ‍ু। একটা কোন জিনিসের প্রলোভনে তুমি হয়ত পড়লে, সেটা হয়ত তোমার মনে ধরল — অমনি তা নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলে —

বাদবাকি আর সব তোমার কাছে আজেবাজে, যেন ছেলেখেলা, সে দিকে তুমি তাকাতেই চাও না। দেখো, তুমি যেন ফ্যাশনের ছবি-আঁকিয়ে না হয়ে পড়। এখনই দেখতে পাচ্ছি, তোমার রঙ যেন বড় বেশি ছটফটে হয়ে গলা চড়াতে শুরু করেছে। তোমার ছবির রেখাগুলো তেমন জোরাল নয়, আর কখনও কখনও ত নেহাৎই দুর্বল, লাইন দেখা যায় না; তুমি এখনই কায়দাদুরস্ত আলো ফোটানোর পেছনে ছুটছ, ছুটছ এমন জিনিসের পেছনে যা প্রথম দৃষ্টিতে মুগ্ধ করে। দেখো, তুমি ইংরেজী ধারার খপ্পরে গিয়ে পড়বে কিন্তু। সাবধান; এখনই সোসাইটি তোমাকে টানতে শুরু করেছে; আমি কোন কোন সময় তোমার গলায় জড়ানো দেখেছি ফুলবাবুর স্কার্ফ, মাথায় বাহারের টুপি... জিনিসটা প্রলোভনজনক, টাকার জন্যে ফ্যাশনের ছবি, পোর্ট্রেট আঁকতে নামা যেতে পারে। কিন্তু তাতে তোমার প্রতিভার বিনাশ ঘটবে, কোন বিকাশ ঘটবে না। ধৈর্য ধর। প্রত্যেকটি কাজের পেছনে ভালোমতো চিন্তা কর, বাবুয়ানি ছাড় — ঐ পথে অন্যেরা টাকা রোজগার করে করুক। তোমার যা পাবার তা যথাসময় পাবে।’

অধ্যাপক কতকটা সত্যি কথাই বলেছিলেন। এটা ঠিকই যে আমাদের তরুণ শিল্পীটির মাঝে মাঝে আমোদফুর্তি করার, বাবুয়ানি করার — এক কথায়, কোথাও কোথাও নিজের যৌবন জাহির করার বাসনা জাগে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আত্মসংযমের ক্ষমতা তার ছিল। সময় সময় হাতে তুলি নিয়ে সব ভুলে থাকতে সে পারত আর তুলি যখন সে ছাড়ত, তখন মনে হত ঠিক যেন একটা মধুর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। তার রুচিবোধের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটতে লাগল। রাফাএলের সমস্ত গভীরতা সে এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই গুইদোর*) দ্রুত ব্রাশের কাজের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে, টিশিয়ানের আঁকা পোর্ট্রেট দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, প্রাচীন ফ্লেমিশ শিল্পীদের রচনা তাকে মুগ্ধ করে। যে আবরণে সেকালের ছবিগুলির রূপ আড়াল পড়ে আছে তা এখনও তার সামনে সম্পূর্ণ খসে না পড়লেও সেগুলির ভেতরে একটা কিছু প্রত্যক্ষ করার মতো ক্ষমতা তার হয়েছে, যদিও সেকালের বড় বড় শিল্পীরা যে আমাদের বোধবুদ্ধির সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছেন, অধ্যাপকের এই কথার সঙ্গে সে মনে মনে একমত নয়; তার বরং মনে হয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দী কোন কোন ব্যাপারে তাঁদের চেয়ে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে এবং প্রকৃতির অনুকরণ এখন যেন হয়ে উঠেছে অনেক উজ্জ্বল, জীবন্ত ও

কাছের; এক কথায়, এই ক্ষেত্রে তার ভাবনাচিন্তা ছিল আর দশটা তরুণের মতো, যারা নতুন একটা কিছু হৃদয়ঙ্গম করার পর মনের গহনে সেই নিয়ে গর্ববোধ করে। মাঝে মাঝে তার খারাপ লাগত যখন দেখতে পেত বিদেশ থেকে আগত কোন চিত্রকর — ফরাসী কিংবা জার্মান — কখনও কখনও আবার বৃত্তিতে আদৌ শিল্পী নয় — কেবল হাতের অভ্যস্ত কৌশল, দ্রুত তুলির আঁচড় আর রঙের ঔজ্জ্বল্য দিয়েই সাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং চোখের পলকে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করে ফেলে। সে যখন খাওয়াদাওয়া এবং সমগ্র বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়ে কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে থাকত তখন এই সব চিন্তা তার মাথায় আসত না, আসত কেবল তখনই যখন তা রীতিমতো আবশ্যক হয়ে দেখা দিত, যখন রঙ-তুলি কেনার কোন সঙ্গতি তার থাকত না, যখন নাছোড়বান্দা বাড়িওয়ালা দিনে দশ বার করে এসে বাড়ি ভাড়া দাবি করত। তখন তার ক্ষুধার্ত কল্পনা ধনী চিত্রকরের ভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষা বোধ করত; তখন তার মাথায় যে-চিন্তা খেলে যেত তা একজন রুশীর পক্ষে স্বাভাবিক: মনে হত সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, সবকিছুর প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে, শোকে-দুঃখে একটা ক্ষিপ্ততায় মেতে ওঠে। এখন তার অনেকটা এই রকম দশা চলছিল।

'হুঃ, ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর!' সে বিরক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করল। 'আরে, ধৈর্যেরও ত একটা সীমা আছে। ধৈর্য ধর! কাল আমি খাব কোন টাকায়? ধার আমাকে কেউ দেবে না। আর আমার যাবতীয় ছবি ও ড্রইং বেচার চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই, ওগুলোর জন্যে সাকুল্যে পাব বিশ কোপেক। ওগুলো অবশ্যই দরকারী, এটা আমি উপলব্ধি করি: কোনটা বিফলে যায় নি, প্রত্যেকটির ভেতরেই আমি কিছু না কিছু জেনেছি। কিন্তু তাতে লাভটা কী? স্টাডি, স্কেচ — সবই স্টাডি আর স্কেচ, তাদের কোন শেষ নেই। আর আমার নাম যখন লোকে জানে না তখন কেই বা ওগুলো কিনবে? কারই বা দরকার নেচার স্টাডির ক্লাসে অ্যান্টিক থেকে আঁকা আমার ছবি, কিংবা আমার অসমাপ্ত ছবি সাইকি অথবা আমার ঘরের দৃশ্য, কিংবা আমার নিকিতার পোর্ট্রেট, যদিও সত্যি বলতে গেলে কি সেটা যে-কোন শৌখিন চিত্রকরের কাজের চেয়ে সুন্দর? তা হলে আসল ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? কেন আমি কষ্ট পাচ্ছি, কেনই বা শিক্ষানবিসের মতো অ-আ-ক-খ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যখন আমারও সাফল্য অন্যদের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম হতে পারত না, আমিও তাদের মতো টাকাপয়সার মালিক হতে পারতাম?'

এই কথাগুলি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী অকস্মাৎ শিউরে উঠল, বিবর্ণ হয়ে গেল: কার যেন বেদনাপীড়িত বিকৃত মুখ মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্যানভাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার দিকে উঁকি মারছে। দুটি ভয়ঙ্কর চোখ সোজা তার দিকে নিবদ্ধ, যেন তাকে গিলে খেতে আসছে; মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল নীরব থাকার ভয়ঙ্কর নির্দেশ। ভয় পেয়ে গিয়ে সে চিৎকার করে নিকিতাকে ডাকতে গেল। নিকিতা অবশ্য ইতিমধ্যেই সামনের হল-ঘরটাতে মহা দাপটে নাসিকাগর্জন শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু শিল্পী হঠাৎ তাকে ডাকা থেকে বিরত হল, হেসে ফেলল। তার ভয়ের উপলব্ধি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। এটা ছিল তার কেনা সেই পোর্টেটটি যার কথা সে বিলকুল ভুলে গিয়েছিল। চাঁদের আলোয় ঘর আলোকিত, সেই আলো ছবিটার ওপরও এসে পড়েছে, ফলে তাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত জীবন্ত। শিল্পী ছবিটার গা থেকে ধুলো মুছে খুঁটিয়ে দেখার জন্য প্রস্তুত হল। জলে স্পঞ্জ ভিজিয়ে নিয়ে ছবির ওপর স্পঞ্জটা কয়েকবার বুলাল, তার গায়ে জমে থাকা ধুলো ও নোংরার প্রায় পুরো স্তরটাকে উঠিয়ে ফেলল, নিজের সামনের দেয়ালে টাঙাল আর এবারে অসাধারণ কাজটি দেখে সে আগের চেয়েও বেশি অবাক হল: গোটা মুখটা প্রায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে আর চোখ দুটো তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যে শিল্পী শেষ পর্যন্ত আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল, বিস্মিত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল: 'তাকাচ্ছে, মানুষের চোখ দিয়ে তাকাচ্ছে!' হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বহুকাল আগে বিখ্যাত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা একটি প্রতিকৃতি* সম্পর্কে অধ্যাপকের মুখে শোনা একটি ঘটনা। প্রতিকৃতিটির উপর মহাশিল্পী কয়েক বছরের শ্রম ব্যয় করেন, তথাপি তাঁর মতে ওটা ছিল অসমাপ্ত কাজ, অথচ ভাসারির*) বর্ণনা অনুযায়ী ঐ প্রতিকৃতিই সকলের কাছে তাঁর সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ও পূর্ণতম শিল্পসৃষ্টি রূপে গণ্য। তার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ছিল চোখজোড়া, যাতে তাঁর সমকালীনরা বিস্মিত; এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, প্রায় চোখে না পড়ার মতো শিরা-উপশিরা বাদ যায় নি, ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এখানে, তার সামনে উপস্থিত পোর্ট্রেটটাতে ছিল কী যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটাকে আদৌ শিল্প

---

* এখানে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির লুভরে সংরক্ষিত বিখ্যাত প্রতিকৃতি 'মোনা লিসা'র প্রসঙ্গ উল্লিখিত। — সম্পাঃ

বলা চলে না: ছবির নিজস্ব সামঞ্জস্য পর্যন্ত এখানে লঙ্ঘিত। এই চোখ-জোড়া ছিল জ্যান্ত, মানুষের চোখ! মনে হচ্ছিল যেন জীবন্ত মানুষের মাথা থেকে কেটে এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন শিল্পসৃষ্টি — তার বিষয়বস্তু যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন — দেখামাত্র মানুষের মন যেমন পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, এখানে তা একেবারেই ছিল না; এখানে ছিল কেমন যেন পীড়াদায়ক, শ্রান্তিকর অনুভূতি। 'এটা কী?' শিল্পীর অজানতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। 'এখানে যা আছে তা প্রকৃতি, জীবন্ত প্রকৃতি; তা-ই যদি হয় তা হলে কেন আমার এই অদ্ভুত অপ্রীতিকর অনুভূতি? নাকি অন্ধের মতো, প্রকৃতির আক্ষরিক অনুকরণটা দোষের, আর সেই কারণেই তা বাড়াবাড়ি রকমের, বেসুরো চিৎকার বলে ঠেকছে? নাকি, এর মানে এই যে বস্তুর সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব না করে তাকে যদি উদাসীন ও অনাসক্ত দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায়, তাহলে তা অবশ্যই তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত, নিগূঢ়, দুরধিগম্য চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত না হয়ে দেখা দেবে নিছক তার ভয়াবহ বাস্তবতা নিয়ে — কোন অপূর্ব মানুষকে উপলব্ধি করতে গিয়ে যখন কেউ শবব্যবচ্ছেদের ছুরির আশ্রয় নেয়, তার অন্ত্রকে কাটা ছেঁড়া করে দেখতে পায় একটা কুৎসিত মানুষকে, তখন যে বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে এটাও কি সে রকম হবে না? কেনই বা কোন শিল্পীর রচনায় সাধারণ, হীন প্রকৃতি প্রকাশ পায় এমন এক আলোকে যে হীনতার কোন ছাপ তাতে ত অনুভব করা যায়ই না, বরং মনে হয় যেন পরম তৃপ্তি উপভোগ করা গেল এবং অতঃপর তোমার চারদিকে সব কিছু যেন আরও শান্ত আরও মসৃণ গতিতে প্রবাহিত ও আন্দোলিত হতে থাকে? আর কেনই বা ঐ একই প্রকৃতি অন্য শিল্পীর রচনায় মনে হয় হীন, অপরিচ্ছন্ন, যদিও সত্যি বলতে গেলে কি প্রকৃতির প্রতি তাঁরও নিষ্ঠা কম ছিল না? কিন্তু না, তাঁর রচনার মধ্যে আলোকসম্পাতকারী কিছু একটার অভাব আছে। যেমন প্রকৃতির দৃশ্য: সে দৃশ্য যত ঐশ্বর্যময়ই হোক না কেন, কিসের যেন একটা অভাব থেকে যায় যদি আকাশে সূর্য না থাকে।'

সে আবার এগিয়ে গেল ছবিটার দিকে এই আশ্চর্য চোখ দুটোকে নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে, আর আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করল যে চোখজোড়া ঠিকই তাকিয়ে আছে তার দিকে। এটাকে প্রকৃতির নকল বলা চলে না, কবর থেকে উঠে আসা প্রেতাত্মার মুখে যদি কখনও অদ্ভুত সজীবতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এ যেন তেমনি। এই স্বপ্নের ঘোর হয়ত বা সঞ্চার করেছে

চাঁদের আলো, যার ফলে দিনের আলোয় দেখা সব কিছু ধারণ করে অন্য, বিপরীত রূপ। অথবা এর অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন কে জানে, ঘরের মধ্যে একা বসে থাকতে হঠাৎ তার ভয়-ভয় করতে লাগল। সে ধীরে ধীরে পোর্ট্রেটটা থেকে সরে গেল, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, চেষ্টা করল ওটার দিকে না তাকাতে, অথচ নিজের অজানতে, আপনা আপনিই তার আড়চোখের দৃষ্টি ওখানে গিয়ে পড়তে লাগল। শেষকালে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতেও তার ভয় হতে লাগল; তার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে আরও একজন কেউ বুঝি তার পেছন পেছন পায়চারি করতে থাকবে। তাই সে থেকে থেকে ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে পিছু ফিরে তাকাতে লাগল। ভীতু স্বভাবের লোক সে কখনই ছিল না; কিন্তু তার কল্পনাশক্তি ও স্নায়ুতন্ত্রী ছিল সংবেদনশীল, আর সেই সন্ধ্যায় তার নিজেরই বোধগম্য হচ্ছিল না এই অনিচ্ছাকৃত ভীতির কারণ। সে কোনায় গিয়ে বসল, কিন্তু এখানেও তার মনে হল এখুনি কেউ যেন কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে উঁকি মারবে। সামনের হল-ঘর থেকে নিকিতার নাসিকাগর্জন ভেসে আসছিল, কিন্তু তাতেও ভয় তার কাটল না। শেষকালে চোখ না তুলে সে ভয়ে ভয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পার্টিশান-পর্দার আড়ালে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ল। পর্দার ফাঁক দিয়ে তার চোখে পড়ছিল জ্যোৎস্নালোকিত নিজের ঘরটি। সে দেখতে পেল সোজা দেয়ালে ঝুলছে পোর্ট্রেটটা। চোখের দৃষ্টি আরও ভয়ঙ্কর, আরও অর্থবহ দৃষ্টিতে সে তাকে বিদ্ধ করছিল, আর মনে হচ্ছিল যেন তার দিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাতে সে আগ্রহী নয়। মনে মনে দারুণ বিপর্যস্ত হয়ে শিল্পী শয্যা ছেড়ে ওঠা সমীচীন বোধ করল; শয্যার চাদরটা তুলে নিয়ে পোর্ট্রেটের দিকে এগিয়ে গেল, ওটাকে পুরো ঢেকে দিল।

এই কাজ করার পর সে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে শয্যায় শয়ন করল। ভাবতে লাগল শিল্পীর দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের কথা। তার মনে হল এই পৃথিবীতে কী কণ্টকাকীর্ণই না শিল্পীর পথ। এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিন্তু পর্দার ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিছানার চাদরে জড়ানো পোর্ট্রেটটার ওপর। চাঁদের আলোয় বিছানার চাদর অনেক বেশি ধবধবে দেখাচ্ছিল, আর তার মনে হতে লাগল যে ভয়ঙ্কর চোখজোড়া যেন মোটা কাপড় ভেদ করেও জ্বলজ্বল করছে। সে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে আরও কঠিন দৃষ্টি হানল, অনেকটা এই বলে নিজেকে

বুঝ দেবার জন্য যে ওটা নেহাৎই বাজে ব্যাপার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই... সে দেখতে পাচ্ছে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে: বিছানার চাদরটা আর সেখানে নেই... পোর্ট্রেটটা পুরোপুরি খোলা, আর চারপাশে যা কিছুই থাকুক না কেন সব জিনিসের পাশ কাটিয়ে সোজা তাকাচ্ছে তার দিকে, চোখের দৃষ্টিতে যেন তার মর্মস্থল ভেদ করছে।... তার হৃৎপিণ্ড আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। সে দেখতে পেল বৃদ্ধ নড়েচড়ে উঠল, হঠাৎ ছবির ফ্রেমের ওপর দু হাত ভর দিল। অবশেষে হাতে ভর দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়াল এবং দুই পা বার করে দিয়ে ফ্রেম থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।... পর্দার ফাঁক দিয়ে এখন দেখা যাচ্ছিল কেবল ফাঁকা ফ্রেমটা। ঘর মুখরিত হয়ে উঠল পদশব্দে, পদশব্দ ক্রমেই চলে আসতে লাগল পর্দার কাছাকাছি। বেচারি শিল্পীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। আতঙ্কে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল, তার আশঙ্কা হচ্ছিল এই বুঝি পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আর হলও ঠিক তাই—সেই একই তামাটে মুখ নিয়ে পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে বড় বড় চোখের দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে তাকাল। চাতৃ্‌ কোভ চেঁচানোর চেষ্টা করল — অনুভব করল যে স্বর বেরোচ্ছে না, সে নড়াচড়ার চেষ্টা করল, হাত-পা নাড়ার চেষ্টা করল— অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে পাড়ল না। তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, সে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল এক ধরনের ঢিলেঢোলা এশীয় আলখাল্লা পরনে এই দীর্ঘদেহী, ভয়াবহ অপমূর্তিটির দিকে, অপেক্ষা করতে লাগল লোকটা কী করে দেখার জন্য। বৃদ্ধ প্রায় তার পদতলে বসে পড়ল, এর পর তার ঢিলে আলখাল্লার ভাঁজের ভেতর থেকে কী যেন টেনে বার করল। জিনিসটা ছিল একটা থলি। বৃদ্ধ থলির খুঁট খুলে দুটি কোনা ধরে ঝাড়া দিল: ভারী আওয়াজ তুলে লম্বা লম্বা বেলনের আকারের কতকগুলি ভারী মোড়ক মেঝের ওপর এসে পড়ল; প্রত্যেকটি মোড়ক জড়ানো ছিল নীল কাগজে, আর প্রত্যেকটির ওপর স্পষ্ট লেখা ছিল '১০,০০০ মোহর'। ঢিলে হাতার ভেতর থেকে অস্থিসার লম্বা লম্বা হাত বার করে বৃদ্ধ মোড়কগুলি খুলতে শুরু করল। ঝলমল করে উঠল সোনা। শিল্পীর আতঙ্কে সংবিৎহারা ভাব ও যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি যত তীব্রই হোক না কেন, তার দৃষ্টি কিন্তু সম্পূর্ণ নিবদ্ধ হয়ে রইল সোনার ওপর — সে স্থির হয়ে দেখতে লাগল অস্থিসার হাতের ভেতরে সোনার মোড়ক খুলে যাচ্ছে, সোনা চকচক করছে, মৃদু ও চাপা টুংটাং আওয়াজ তুলছে, আবার মোড়ক

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সময় সে দেখতে পেল একটা মোড়ক অন্য মোড়কগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুটা দূরে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে তার খাটের একেবারে পায়ার কাছে, শিয়রের দিকে। সে প্রায় আবিষ্টের মতো কাঁপতে কাঁপতে মোড়কটা খপ করে তুলে নিল এবং ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল বৃদ্ধ লক্ষ করে কিনা। কিন্তু বৃদ্ধ সম্ভবত খুবই ব্যস্ত ছিল। সে নিজের সবগুলি মোড়ক গুছিয়ে নিল, সেগুলি আবার থলির ভেতরে রাখল এবং তার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই পর্দার ওপাশে চলে গেল। চার্তকোভের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল যখন সে ঘরের ভিতরে শুনতে পেল ক্রমশ অপসৃয়মাণ পদধ্বনি। সে মোড়কটাকে বেশ শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে রাখল, ওটার জন্য তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল; এমন সময় হঠাৎ কানে এলো পদশব্দ আবার এগিয়ে আসছে পর্দার দিকে — সম্ভবত বৃদ্ধের মনে পড়ে গেছে যে একটা মোড়কের ঘাটতি আছে। ঐ যে আবার সে বেরিয়ে এলো পর্দার ওপাশ থেকে, তাকাল তার দিকে। নিদারুণ মরিয়া হয়ে শিল্পী সর্বশক্তিতে মোড়কটা হাতে চেপে ধরল, অঙ্গ সঞ্চালনের আপ্রাণ চেষ্টা করল, চেঁচাল — তার ঘুম ভেঙে গেল।

তার সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে ঠাণ্ডা ঘামে; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়ে উঠেছে যতদূর সম্ভব তীব্র; বুক এমনই সঙ্কুচিত হতে লাগল যে মনে হচ্ছিল তার ভেতর থেকে বুঝি অন্তিম নিশ্বাস নিষ্ক্রান্ত হতে চাইছে। 'এটা কি সত্যিই স্বপ্ন ছিল?' সে দু হাতে মাথা চেপে ধরে বলল; কিন্তু যা সে দেখল তা এমনই ভয়ঙ্কর রকমের সজীব যে স্বপ্ন বলে মনে হয় না। সে জেগে উঠেও দেখতে পেল বৃদ্ধকে ফ্রেমের ভেতরে চলে যেতে, এমন কি তার ঢিলে পোশাকের প্রান্তও এক ঝলক চোখে পড়ল, আর স্পষ্ট অনুভব করল এই কিছুক্ষণ আগেও তার হাতে ধরা ছিল ভারী কোন জিনিস। চাঁদের আলোয় ঘর আলোকিত, অন্ধকার কোনাগুলিতেও সেই আলো গিয়ে পড়েছে, আর তারই ফলে ক্যানভাস, প্লাস্টারের তৈরি হাত, চেয়ারের ওপর-রাখা ভারী পর্দা, প্যাণ্টলুন, অপরিষ্কার জুতো — সব দেখা যাচ্ছে। কেবল এই সময়ই তার খেয়াল হল যে সে শয্যায় শুয়ে নেই, স্রেফ দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি পোর্ট্রেটটার সামনে। কী ভাবে সে এখানে এসে পৌঁছুল এ ব্যাপারটা তার কোন মতেই বোধগম্য হল না। সে আরও অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে পোর্ট্রেটটা পুরোপুরি খোলা আর তার ওপরে বিছানার

চাদর বাস্তবিকই নেই। আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে চোখ মেলে তাকাতে সে দেখতে পেল জীবন্ত মানুষের চোখ সরাসরি তাকে বিঁধছে। তার মুখে ফুটে উঠল বিন্দু বিন্দু ঠান্ডা ঘাম; সে সরে যেতে চাইল, কিন্তু অনুভব করল তার পা যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। আর সে দেখতে পেল — এটাকে স্বপ্ন মোটেই বলা যায় না — বৃদ্ধের মুখরেখা নড়েচড়ে উঠল, ঠোঁটজোড়া প্রসারিত হতে লাগল তার দিকে, যেন তাকে শুষে নিতে চায়।... মরিয়া হয়ে সে আর্তনাদ করে এক লাফে সরে গেল — এবং জেগে উঠল।

'তাহলে কি এটাও স্বপ্ন?' তার হৃৎপিন্ড তখন কাঁপতে কাঁপতে ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম; এই অবস্থায় সে নিজের চারপাশ হাতড়ে দেখল। হ্যাঁ, সে শয্যায় শুয়ে আছে ঠিক সেই অবস্থায়, যেমন ভাবে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার সামনে পর্দা; চাঁদের আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পোর্ট্রেট, দিব্যি বিছানার চাদরে ঢাকা — যেমন সে নিজে ঢেকে রেখেছিল। তার মানে, এটাও ছিল স্বপ্ন। কিন্তু মুঠো করা হাতে এখনও অনুভব করা যাচ্ছে যেন সেখানে কিছু একটা ছিল। হৃৎপিন্ড এত জোরে জোরে ওঠা-পড়া করছিল যে প্রায় ভয়াবহই বলা চলে; বুকের ভেতরে একটা অসহ্য ভার। সে ফাঁকের ভিতর দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাদরটার দিকে। আর স্পষ্ট দেখতে পেল চাদর সরে যেতে শুরু করেছে, যেন কারও হাত তার নীচে নড়াচড়া করছে, চেষ্টা করছে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। 'ভগবান, হা ভগবান, এটা কী!' মরিয়া হয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে সে চেঁচিয়ে বলল এবং জেগে উঠল।

এটাও তাহলে ছিল স্বপ্ন! সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। সে তখন সংজ্ঞাহীন, বুদ্ধি তার অর্ধেক লোপ পেয়েছে, কী যে হচ্ছে তা সে আর বুঝে উঠতে পারছিল না: কোন দুঃস্বপ্ন, না বাস্তুভূতের প্রভাব, জ্বরবিকার, না জীবন্ত দৃশ্য — কী এটা? উত্তেজিত নাড়ীর প্রবল স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শিরায়-উপশিরায় ধাবমান রক্তের গতি ও মানসিক চাঞ্চল্য অন্তত কিছুটা প্রশমনের উদ্দেশ্যে সে জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওপরের একটা পাল্লা খুলে দিল। স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহে সে চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। তখনও ঘরবাড়ির ছাদ আর সাদা দেয়ালের গায়ে লেগে ছিল জ্যোৎস্নার দীপ্তি, যদিও আকাশে ঘন ঘন চলছিল খন্ড খন্ড কালো মেঘের আনাগোনা। সর্বত্র নীরবতা; মাঝে মাঝে দূর থেকে কানে ভেসে আসছিল কোন যাত্রিবাহী ছেকড়া গাড়ির মৃদু ঝাঁকুনির আওয়াজ —গাড়ির

গাড়োয়ান দৃষ্টির অগোচরে কোন এক গলির ভিতরে বিলম্বিত আরোহীর অপেক্ষায় থেকে থেকে অলস বেতো ঘোড়ার অঙ্গসঞ্চালনের তালে তালে ঘুমে ঢলে পড়েছে। জানলার ওপরের পাল্লা দিয়ে মুখ বার করে সে অনেকক্ষণ উঁকি মেরে দেখল। ইতিমধ্যে আকাশে ফুটে উঠছে আসন্ন ঊষাকালের লক্ষণ; অবশেষে একটা ঝিমুনির ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে অনুভব করায় সে পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে সরে গেল, শয্যায় শয়ন করল, অচিরেই আচ্ছন্ন হল সংজ্ঞাহীন গাঢ় নিদ্রায়।

তার নিদ্রা ভঙ্গ হল বেশ দেরিতে, প্রচন্ড মদ্যপানের পর লোকের যেমন অবস্থা হয় ভেতরে ভেতরে সেই রকম এক অপ্রীতিকর অবস্থা সে অনুভব করল; মাথায় একটা বিশ্রী ধরনের ব্যথা। ঘরের ভেতরে ঝুপসি ভাব; বাতাসে ছড়ানো ছিল অপ্রীতিকর আর্দ্রতা। জানলার যে-সমস্ত ফাঁক ফোকরের গায়ে প্রাথমিক রঙ-লাগানো ক্যানভাস আর ছবি ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলি ভেদ করে প্রবেশ করছে সেই আর্দ্রতা। জলে ভেজা মোরগের মতো বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন মুখে সে ধপ্ করে গিয়ে বসল তার শতচ্ছিন্ন সোফাটার ওপর। সে বুঝতে পারছিল না কোন্ কাজে হাত দেবে, কী করবে। শেষকালে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গোটা স্বপ্নটা। একটু একটু করে যত মনে পড়তে থাকে ততই বেশি করে স্বপ্নটা তার কল্পনায় এত অসহ্য রকমের জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় যে তার সন্দেহ পর্যন্ত হতে থাকে যে ব্যাপারটা আদৌ স্বপ্ন ও নিছক বিকারের ঘোর, নাকি অন্য কিছু — কোন অলৌকিক ঘটনা। বিছানার চাদরের ঢাকনা খুলে দিনের আলোয় সে এই ভয়ঙ্কর পোর্ট্রেটটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। চোখ দুটির অসাধারণ সজীবতায় সত্যি সত্যিই বিস্মিত হতে হয়, কিন্তু সেগুলির মধ্যে বিশেষ ধরনের ভীতিকর কিছুই সে খুঁজে পেল না; কেবল মনে হল ব্যাখ্যার অতীত, কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি মনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও সে কিন্তু মোটেই নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারছিল না যে ব্যাপারটা ছিল স্বপ্ন। তার মনে হল স্বপ্নের মধ্যে যেন বাস্তবতার কোন ভয়ঙ্কর খন্ডাংশ আছে। তার মনে হল এমন কি বৃদ্ধের দৃষ্টি ও মুখভঙ্গির মধ্য দিয়ে যেন কিছু একটা প্রকাশ পাচ্ছিল, যেন প্রকাশ পাচ্ছিল যে আজ রাতে সে তার কাছে এসেছিল; সে অনুভব করছিল, এই কিছুক্ষণ আগেও তার হাতে ধরা ছিল কোন ভারী জিনিস, যা এক মিনিট আগে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে।

তার মনে হচ্ছিল, মোড়কটা কেবল যদি আরেকটু শক্ত করে ধরে রাখতে পারত তাহলে সেটা হয়ত জাগরণের পরও তার হাতে থেকে যেত।

'হা ভগবান, এই টাকার অন্তত একটা অংশও যদি পাওয়া যেত!' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর কল্পনায় সে দেখতে পেল থলি থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে তার চোখে-দেখা সবগুলি মোড়ক, যাদের প্রতিটির গায়ে আছে প্রলোভনজনক লেখা: '১০,০০০ মোহর'। মোড়কগুলি খুলে যেতে লাগল, সোনা ঝকঝক করে উঠল, আবার মোড়ক গোটানো হতে লাগল, আর সে দুচোখের স্থির ও ফাঁকা দৃষ্টি শূন্যে মেলে বসে রইল, এ ধরনের বস্তু থেকে দৃষ্টি সরানোর মতো মনের অবস্থা তার ছিল না — যেন একটা শিশু মিষ্টির থালার সামনে বসে বসে অন্যদের খাওয়া দেখছে আর সমানে ঢোক গিলছে। অবশেষে দরজায় টোকা পড়তে অপ্রীতিকর হলেও তাকে ফিরে আসতে হল বাস্তবে। বাড়িওয়ালা প্রবেশ করল থানার দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে। সকলেরই জানা আছে যে ধনীদের কাছে উমেদারের মুখ যেমন, চুনোপুঁটি লোকজনের কাছে থানার দারোগার আবির্ভাব তার চেয়েও অপ্রীতিকর। যে ছোট বাড়িটাতে চার্তকোভ বাস করত তার বাড়িওয়ালা ছিল এমন সমস্ত সৃষ্টিকর্মের একটি, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের পনেরো নম্বর লাইনের, সেন্ট পিটার্সবুর্গের দিককার কিংবা কলোম্নার সুদূর প্রান্তের বাড়ির মালিকরা — এ জাতীয় সৃষ্টিকর্মের সংখ্যা রুশদেশে কম নয়, আর বহু ব্যবহারে জীর্ণ ফ্রক-কোটের বর্ণের মতো এদেরও চরিত্র নির্ধারণ করা কঠিন। যৌবনে লোকটা ছিল ক্যাপ্টেন, তার গলার জোর ছিল, অসামরিক কর্মচারী হিশেবেও কোথাও কোথাও কাজ করেছে, চাবকানোর ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ ছিল, আর ছিল চটপটে, ফুলবাবু এবং নিরেট; কিন্তু বার্ধক্যে এসে তার এই কড়া ধাঁচের বৈশিষ্ট্যগুলি মিলেমিশে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। এখন সে বিপত্নীক, অবসরপ্রাপ্ত, এখন সে আর বাবুয়ানি করে না, লম্বা-চওড়া কথা বলে না, ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে যায় না; এখন তার একমাত্র আগ্রহ চা পানে আর চাপান করতে করতে এটা-ওটা আবোল-তাবোল বকাতে। ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে সে পোড়া বাতির সলতে ঠিক করে; নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক মাসের শেষে টাকা আদায়ের জন্য তার ভাড়াটিয়াদের কাছে দর্শন দেয়; নিজের বাড়ির ছাদ দেখার জন্য রাস্তায় বেরোতে হলে চাবিটা তার হাতে থাকে; বেশ কয়েক বার চৌকিদারকে

দাবড়ানি দিয়েছে খোঁড়লের ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুম মারার জন্য — এক কথায়, সে এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত লোক, পুরোদস্তুর হৈ হল্লার জীবন ও ঘোড়ার গাড়ির ঝাঁকুনি উপভোগের পর কতকগুলি কদর্য অভ্যাস ছাড়া যার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'দয়া করে নিজের চোখেই দেখুন ভারুখ্ কুজ্মিচ,' দু হাত ছড়িয়ে দারোগা সাহেবের উদ্দেশে বলল বাড়িওয়ালা, 'এই যে বাড়ি ভাড়ার টাকা দেওয়ার নাম নেই, দেওয়ার নামগন্ধটি নেই।'

'কী করে দেব টাকা না থাকলে? অপেক্ষা করুন, শোধ করব।'

'অপেক্ষা করার উপায় আমার নেই মশাই,' বাড়িওয়ালা তার হাতে ধরা চাবিটা নাড়িয়ে বিশেষ ভঙ্গি করে রাগতস্বরে বলল, 'আমার বাড়িতে বাস করছেন লেফটানেন্ট কর্নেল পতগোন্কিন, আজ সাত বছর হল আছেন; আমার ভাড়াটিয়া আন্না পেত্রোভ্না ভুখ্মিস্তেরভা — তাকে ভাড়া দিয়েছি চালাঘর, আস্তাবলে ঘোড়া রাখার দুটি চালা, তার তিন-তিনটে চাকর — এমনই আমার সব ভাড়াটে। সত্যি বলতে গেলে কি আমি কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে বসি নি। অতএব দয়া করে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মানে মানে ফ্ল্যাট খালি করে দিন।'

'হ্যাঁ, শর্ত মেনে নিয়েই যখন এসেছেন তখন দয়া করে ভাড়াটা মিটিয়ে দিন,' দারোগা তার উর্দির বোতামের নীচে একটা আঙ্গুল গুঁজে দিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

'কিন্তু প্রশ্নটা হল, মেটাব কী দিয়ে? আমার এখন একটি কানাকড়িও নেই।'

'তা-ই যদি হয় তবে আপনার জীবিকায় যে-সমস্ত জিনিসপত্র তৈরি হয়েছে তাই দিয়ে ইভান ইভানভিচের পাওনা মেটান — ভাড়ার টাকার বদলে তিনি ছবি নিতে রাজী হলেও হতে পারেন।'

'না মশাই, ছবির জন্যে ধন্যবাদ। বুঝতাম যদি হত দেয়ালে টাঙানোর উপযোগী বেশ ভালো ভালো বিষয়ের ছবি, নিদেনপক্ষে যদি থাকত তারা-চিহ্ন বুকে আঁটা কোন জেনারেল কিংবা প্রিন্স কুতুজভের পোর্ট্রেট। তা ত নয় ঐ দেখুন, এঁকেছেন একটা চাষাকে, এলেবেলে কামিজপরা একটা চাষাকে — ওর চাকর, যেটা রঙ গোলে। ঐ শুয়োরটাকে দেখে আবার পোর্ট্রেট আঁকা — দেব ওটার ঘাড়ে এমন এক রন্দা! — আমার সব আগলের পেরেকগুলো উপড়ে ফেলে দিয়েছে, ঠগ কোথাকার! এই যে, দেখুন না আঁকার কী

বিষয় — এই যে, আঁকা হয়েছে ঘর। তাও বুঝতাম, যদি ঘরটা হত ঝাড়া পোঁছা, সাজানো-গোছানো; তা ত নয়, দেখুন এঁকেছেন কেমন — যত রাজ্যের নোংরা আর হাবিজ্যাবি গড়াগড়ি যাচ্ছে সে-সব সুদ্ধ। একবার দেখুন আমার ঘরের কী দুর্দশা হয়েছে, দয়া করে স্বচক্ষে দেখুন। আমার এখানে সাত বছর ধরে বাস করছেন এমন সমস্ত ভাড়াটিয়া আছেন, কর্নেলরা আছেন। আন্না পেত্রোভ্না বুখ্‌মিস্তেরভা।... না, আমি আপনাকে না বলে পারছি না আর্টিস্টের চেয়ে জঘন্য ভাড়াটে আর হয় না: শুয়োর, থাকেও শুয়োরেরই মতন। ভগবান না করুন, এরকম লোকের পাল্লায় যেন না পড়তে হয়।'

বেচারি চিত্রকরের ধৈর্য ধরে এসব কথা শুনে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। দারোগা ইতিমধ্যে ছবি আর স্টাডিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে প্রবৃত্ত হল। এর দ্বারা সে এটাই দেখাতে চাইল যে বাড়িওয়ালার চেয়ে তার মনটা অনেক বেশি সরস এবং শিল্পকলা উপলব্ধির ব্যাপারেও সে নেহাৎ আনাড়ী নয়।

একটা ক্যানভাসের ওপর নগ্ন নারীর ছবি আঁকা দেখে সেটার গায়ে আঙুল বিঁধিয়ে দিয়ে দারোগা বলল, 'হেঁ হেঁ, এ যে দেখছি... যাকে বলে নাগরী। আর এটার নাকের নীচটা অমন কালো কেন? নস্যি দিয়েছে নাকি নাকে?'

'ছায়া,' তার দিকে চোখ তুলে না তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল চার্তকোভ।

'তা ওটাকে বড় বেশি নজরে পড়ার মতন জায়গায়, নাকের তলায় না দিয়ে অন্য কোন জায়গায় চালান করলেও হত,' দারোগা বলল, 'আর এটা কার পোর্ট্রেট?' বৃদ্ধের পোর্ট্রেটটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলে চলল, 'ওঃ বড় ভয়ঙ্কর। সত্যিই যেন অত ভয়ঙ্কর ছিল; দেখ কাণ্ড, আরে এ যে রীতিমতো তাকাচ্ছে! ওরে ব্বাপ্‌স, যেন শয়তানের স্যাঙাত! এ কার ছবি এঁকেছেন আপনি?'

'ওটা হল গিয়ে একজনের...' চার্তকোভ তার কথা শেষ করার অবকাশ পেল না: একটা মড়মড় আওয়াজ শোনা গেল। দারোগা সাহেব একটু বেশি জোরেই ফ্রেমটার ওপর চাপ দিয়ে ফেলেছিল, আর সম্ভবত তার পুলিশী হাতের কুঠারসুলভ ভারের কল্যাণে পাশের তক্তাগুলি ভেঙে ভেতরে বসে গেল, একটা পড়ে গেল মেঝেতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারী ঝনাৎ শব্দে পড়ল নীল কাগজের মোড়ক। চার্তকোভের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল

'১০,০০০ মোহর' লেখাটার ওপরে। সে উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল মোড়ক তুলে নেবার জন্য, খপ্ করে তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে মোড়কটা মুঠো করে ধরল, ভারে ঝুলে পড়ল তার হাত।

'মনে হল যেন টাকার ঝন্‌ঝন্ শুনলাম,' মেঝেতে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে দারোগা বলল, কিন্তু যে রকম বিদ্যুৎগতিতে ছোঁ মেরে চার্তকোভ ওটাকে কুড়িয়ে নিল তাতে জিনিসটা তার পক্ষে দেখা সম্ভব হল না।

'আমার কী আছে না আছে তা জানার আপনাদের কী দরকার?'

'দরকার এই কারণে যে আপনার কাজ হবে এখুনি বাড়িভাড়া বাবদ পাওনা বাড়িওয়ালাকে মিটিয়ে দেওয়া; আপনার টাকা আছে অথচ আপনি বাড়িভাড়া শোধ করতে চাইছেন না — এই হল ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, আজই আমি ওর পাওনা মিটিয়ে দেব।'

'তা হলে আগে কেন শোধ করতে চাইছিলেন না, শুনি? শুধুই কি তাই? — বাড়িওয়ালার মনের শান্তি ভঙ্গ করছেন, পুলিশকেও উদ্ব্যস্ত করে তুলছেন?'

'কেন না এই টাকাটায় হাত দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না; আজ সন্ধ্যায়ই আমি ওকে সব মিটিয়ে দেব, আর কালই চলে যাব ফ্ল্যাট ছেড়ে, কেন না এমন বাড়িওয়ালার বাড়িতে থাকার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

'তাহলে, বুঝলেন ইভান ইভানভিচ, আপনার পাওনা উনি মিটিয়ে দেবেন,' বাড়িওয়ালার উদ্দেশে বলল দারোগা। 'আর আজ সন্ধ্যায় আপনার দাবি যদি পুরোপুরি না মেটে, তা হলে, মাফ করবেন চিত্রকর মশাই, আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

এই বলে সে তার তেকোনা টুপি মাথায় পরে বেরিয়ে এলো বার-বারান্দায়, আর মাথা নীচু করে তাকে অনুসরণ করল বাড়িওয়ালা। বাড়িওয়ালাকে দেখে কেমন যেন চিন্তিত মনে হল।

'ভগবানকে ধন্যবাদ, শয়তান ওদের সরিয়ে নিয়ে গেছে!' সামনের হল-ঘরের দরজা ভেজানোর আওয়াজ শুনে চার্তকোভ বলল।

সে সামনের হল-ঘরটাতে উঁকি মারল, তারপর সম্পূর্ণ একা থাকার উদ্দেশ্যে একটা ছুতো করে নিকিতাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল, নিকিতা চলে যাবার পর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো এবং দুরুদুরু বুকে মোড়ক খুলতে শুরু করল। ভেতরে ছিল মোহর, প্রত্যেকটি

ঝকঝকে নতুন, জ্বলন্ত, যেন আগুন। প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে সে অনেকক্ষণ বসে রইল স্বর্ণস্তূপের পাশে, বারবার মনে মনে প্রশ্ন করতে লাগল এ সব স্বপ্নে ঘটছে কিনা। মোড়কে ঠিক দশ হাজার মোহরই ছিল; বাইরে থেকে দেখতেও মোড়কটা অবিকল সেই রকম যেমন সে দেখেছিল স্বপ্নে। কয়েক মিনিট ধরে সে মোহরগুলি হাতড়াল, কিন্তু কিছুতেই ধাতস্থ হতে পারল না। পরবর্তী বংশধররা দেউলিয়া হয়ে যাবে নিশ্চিত জেনে নিঃসম্বল অবস্থা থেকে ভবিষ্যতে তাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পিতৃপিতামহের গুপ্তধন ও গোপন দেরাজওয়ালা পেটরা রেখে যাওয়ার নানা ঘটনা হঠাৎ তার কল্পনায় জেগে উঠল। সে মনে মনে ভাবল, 'এমনও ত হতে পারে যে কোন ঠাকুর্দা তার নাতির জন্য উপহার রেখে যাবার বাসনায় পারিবারিক পোর্ট্রেটের ফ্রেমের ভেতরে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল?' রোমাণ্টিক উন্মাদনায় সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয়ে সে এমনও ভাবতে লাগল এখানে তার ভাগ্যের সঙ্গে এর কোন গোপন যোগসূত্র আছে কি? —পোর্ট্রেটের অস্তিত্ব তার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত কি? আর ওটাকে কেনাটাই কি কোন একটা পূর্বনির্ধারিত ব্যাপার নয়? সে কৌতূহলভরে পোর্ট্রেটের ফ্রেমটা নিরীক্ষণ করে দেখতে প্রবৃত্ত হল। তার একটা পাশ খুঁড়ে খোপ মতন বানানো, ওপরটায় এমন কৌশলে তক্তা আঁটা যে সে-তক্তা নজরেই পড়ে না; দারোগাসাহেবের আসুরিক হাতের পাল্লায় পড়ে ওটা যদি না ভাঙত তা হলে অন্তিমকাল অবধি মোহরগুলি দিব্যি শান্তিতে থাকত। পোর্ট্রেটটি লক্ষ করতে করতে শিল্পের উচ্চ মান, চোখের অসাধারণ কারিকুরি আবার তাকে অবাক করে দিল; চোখ দুটো এখন আর তার কাছে ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছিল না, কিন্তু তবু নিজের অজ্ঞাতেই মনের ভেতরে বারবার খেলে যেতে লাগল একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি। 'নাঃ,' সে মনে মনে বলল, 'তুমি যারই ঠাকুর্দা হও না কেন আমি তোমাকে কাচে বাঁধিয়ে রাখব, আর এর জন্যে তোমাকে বানিয়ে দেব সোনার ফ্রেম।' এই বলে সে সামনে পড়ে থাকা সোনার স্তূপের ওপর হাত রাখল, আর সেই স্পর্শে দ্রুত স্পন্দিত হয়ে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। 'এগুলো দিয়ে কী করা যায়?' মোহরের স্তূপের ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ভাবল, 'এখন অন্তত তিন বছরের সংস্থান আমার আছে, ঘরের ভেতরে বন্ধ থেকে বসে কাজ করতে পারি। এখন আমার রঙ কেনার টাকা আছে, খাবারদাবার, চা, আমার দৈনন্দিন প্রয়োজন ও ঘর ভাড়ার টাকা আছে; এখন আমার ব্যাঘাত ঘটাতে, আমাকে বিরক্ত করতে কেউ আসবে

না; একটা চমৎকার দেখে ডামি কিনব, প্লাস্টারের টর্সোর ফরমাস দেব, পায়ের মডেল বানাব, ভেনাস মূর্তি যোগাড় করব, সেরা ছবির প্রিণ্ট যত পারি কিনব। আর তিন বছর যদি তাড়াহুড়ো না করে, বিক্রির জন্য মাথা না ঘামিয়ে, নিজের মনে ছবি এঁকে যেতে পারি তা হলে আমি ওদের সকলকে ছাড়িয়ে যাব, আমি নামজাদা শিল্পী হতে পারব।'

বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সায় দিয়ে সে এই কথা বলল বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা ছাড়িয়ে সোচ্চার ও তীক্ষ্ম হয়ে উঠল অন্য এক কণ্ঠস্বর। সে যখন আরও একবার দৃষ্টিপাত করল সোনার দিকে, তখন তার ভেতরের বাইশ বছরের আত্মা আর টগবগে যৌবন বলল অন্য কথা। এযাবৎ যা কিছু সে দেখে এসেছে ঈর্ষার দৃষ্টিতে, যা কিছু দূর থেকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তাকে লোভ সংবরণ করে থাকত হয়েছে, সে সবই এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। ওঃ, একথা মনে হওয়া মাত্র কী তীব্রই না হয়ে উঠল তার হৃৎস্পন্দন! ফ্যাশন দুরন্ত টেইল কোট পরা যাবে, দীর্ঘ উপবাস ভঙ্গ হবে, চমৎকার ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া যাবে, এক্ষুনি যাওয়া যাবে থিয়েটারে, মিষ্টির দোকানে এবং এবং ইত্যাদি ইত্যাদি — আর যেমন ভাবা, অমনি টাকাগুলি তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

প্রথমেই সে গেল এক দরজির কাছে, আপাদমস্তক নতুন সাজ চড়াল অঙ্গে এবং শিশুর মতো অনবরত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল; সে বেশ কিছু গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধনদ্রব্য কিনে ফেলল, তার পর নেভ্‌স্কি এভিনিউয়ের উপর প্রথমেই আয়না আর ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডো-ওয়ালা যে জমকাল ফ্ল্যাটটা চোখে পড়ল কোন দরাদরি না করে সেটা ভাড়া নিয়ে ফেলল, অন্যমনস্ক ভাবে দোকান থেকে কিনল দামী হাত-চশমা, অন্যমনস্ক ভাবেই কিনল প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সংখ্যক, এক গাদা টাই; সেলুনে গিয়ে চুল কোঁকড়া করে নিল, অকারণেই ঘোড়ার গাড়ি চেপে দুবার শহরে চক্কর মারল, মিষ্টির দোকানে গিয়ে ঠেসে যত রাজ্যের মিষ্টি আর পেস্ট্রি খেল, তার পর গেল এক ফরাসীর রেস্তোরাঁয় — এই রেস্তোরাঁটা সম্পর্কে এত দিন ধরে সে এমন সমস্ত ভাসা-ভাসা গুজব শুনে এসেছে যে ওটা তার কাছে ছিল চীন দেশের মতো। সেখানে সে কোমরে হাত ঠেকিয়ে, অন্যদের দিকে বেশ অহঙ্কৃত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে এবং আরশির সামনে কুঞ্চিত কেশসজ্জা অবিরাম গোছগাছ করতে করতে আহার করল। সে এক বোতল শ্যাম্পেন পান করল — এই বস্তুটির সঙ্গেও এযাবৎ তার বেশির ভাগ

পরিচয় ছিল লোকের মুখে শুনে। মদিরায় মস্তিষ্কে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো তখন সজীব, চটপটে — রুশীতে যাকে বলে, পারলে শয়তানকে দেখে নেয়। ফুটপাথ ধরে গটগট করে যেতে যেতে হাত-চশমা দিয়ে সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলল। সেতুর ওপর সে তার এক কালের অধ্যাপক মশাইকে দেখতে পেয়ে কৌশলে ঝট করে এমন ভাবে তাঁর পাশ কাটিয়ে গেল যেন তাঁকে আদৌ লক্ষ করে নি। সে চলে যাবার পর অধ্যাপক মশাই হতভম্ব হয়ে আরও অনেকক্ষণ সেতুর উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর মুখে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

সমস্ত জিনিস—ইজেল, ক্যানভাস, ছবি—যা যা তার ছিল, ঐ সন্ধ্যারই স্থানান্তরিত হল চমৎকার ফ্ল্যাট-বাড়িটাতে। যে সব জিনিস অপেক্ষাকৃত ভালো সেগুলিকে লোকের চোখে পড়ার মতো জায়গায় সাজিয়ে রাখল, আর যেগুলি তেমন ভালো নয় সেগুলিকে ঠেলে রেখে দিল একটা কোনায়, তারপর অনবরত আয়নার দিকে তাকাতে তাকাতে জমকাল ফ্ল্যাটটার এ ঘরে ও ঘরে পায়চারি করতে লাগল। তার মনের মধ্যে জেগে উঠছিল এই মুহূর্তে যশের পুচ্ছ চেপে ধরার এবং নিজেকে জগতের সামনে জাহির করার এক অদম্য বাসনা! সে যেন শুনতে পাচ্ছিল লোকজনের চিৎকার: 'চার্তকোভ, চার্তকোভ! চার্তকোভের ছবি দেখেছেন কি? কী চটপটে চার্তকোভের তুলির টান! কী দারুণ প্রতিভা চার্তকোভের!' সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের ঘরে পায়চারি করছিল, কোথায় যে ভেসে চলছিল তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। পর দিন এক শ'টা মোহর নিয়ে সে চলল একটা চলতি সংবাদপত্রের প্রকাশকের কাছে, তার সহৃদয় সহায়তা গ্রহণের উদ্দেশ্যে; সাংবাদিকটি তৎক্ষণাৎ চার্তকোভকে 'পরম শ্রদ্ধাভাজন' বলে উল্লেখ করে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল, দুই হাত ধরে করমর্দন করে বিশদভাবে তার নাম, কুল, পদবী, নিবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করল। পর দিনই নব-উদ্ভাবিত চর্বির বাতির বিজ্ঞাপনের নীচে প্রকাশিত হল 'চার্তকোভের অসাধারণ প্রতিভা প্রসঙ্গে' শিরনামায় এক প্রবন্ধ। তাতে লেখা ছিল: 'সর্বতোপ্রকারে পরম প্রাপ্তিযোগরূপে গণ্য, এক অপূর্ব সুযোগের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া রাজধানীর শিক্ষিতমহলের প্রীতিবর্ধনে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে আমাদিগের সমাজে পরম রমণীয় গঠনপ্রকৃতি ও সুললিত মুখাবয়বের অভাব নাই, কিন্তু তাহাদিগকে অলৌকিক ক্যানভাসে সঞ্চারণপূর্বক ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের হস্তে সমর্পণ

করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি ছিল না; এক্ষণে উক্ত অভাবের পূরণ ঘটিয়াছে: প্রয়োজনীয় সকল গুণের আধারস্বরূপ এক শিল্পীর সন্ধান মিলিয়াছে। এক্ষণে সুন্দরীমাত্রে নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে বসন্তের পুষ্পে পুষ্পে পক্ষসঞ্চারণকারী প্রজাপতিসুলভ বায়বীয়, লঘু, মনোরম, অলৌকিক তাঁহার সৌন্দর্য যাবতীয় সুষমা সমেত চিত্রিত হইবে। পরিবারের শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব পরিবার-পরিজন পরিবৃত অবস্থায় নিজেকে দেখিতে পাইবেন। বণিক, যোদ্ধা, নাগরিক, রাষ্ট্রবিদ — প্রত্যেকে নবোদ্যোমে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। সত্বর, সত্বর, আপনার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের অবসরবিনোদন ও আমোদপ্রমোদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে, যে-কোন স্থান হইতে আসুন, পদার্পণ করুন উজ্জ্বলিত পণ্যশালায়। শিল্পীর জমকাল স্টুডিও (নেভ্স্কি এভিনিউ অমুক নম্বরের বাড়ি) তাঁহার ভ্যান ডাইক[*] ও টিশিয়ান-সমকক্ষ তুলিকায় অঙ্কিত প্রতিকৃতিসমূহে শোভিত। মূল বিষয়বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা ও তাহার সহিত সাদৃশ্য, না তুলিকার অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য ও সজীবতা — কিসে যে আশ্চর্য হইতে হয় তাহা বলা দুরূহ। হে শিল্পীপ্রবর, আপনি ধন্য! আপনি লটারির লাকি টিকেট বাহির করিয়াছেন। দীর্ঘজীবী হউন, আন্দ্রেই পেত্রোভিচ,' (স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অন্তরঙ্গতার দিকে সাংবাদিকটির বিশেষ ঝোঁক ছিল।) 'নিজেকে এবং আমাদিগকে ধন্য করুন। আমরা আপনার মূল্য দিতে জানি আপনার পুরস্কার হইবে জনসাধারণের প্রবাহ এবং তৎসহ অর্থযোগ — যদিও আমাদিগের সহযোগী কতিপয় সাংবাদিক উহার প্রবল বিরোধী।'

আমাদের শিল্পী এই বিজ্ঞপ্তি পড়ে গোপন তৃপ্তি লাভ করল; তার মুখে প্রকাশ পেল দীপ্তি। সে সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু হয়েছে — এটা ছিল তার পক্ষে একটা সংবাদ; সে কয়েক বার পংক্তিগুলি পাঠ করল। ভ্যান ডাইক ও টিশিয়ানের সঙ্গে তুলনায় সে রীতিমতো অহঙ্কৃত বোধ করল। 'দীর্ঘজীবী হউন, আন্দ্রেই পেত্রোভিচ!' — কথাটাও তার বেশ ভালো লাগল; ছাপার অক্ষরে তার নাম ও কুল পরিচয়ের উল্লেখ — এহেন সম্মান ইতিপূর্বে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগল, হাত বুলাতে বুলাতে মাথার চুল এলোমেলো করে ফেলল, কখনও গদি-আঁটা চেয়ারে বসে পড়ে, কখনও সেখান থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোফার ওপর গিয়ে বসে, আর প্রতি মুহূর্তেই ভাবতে থাকে মহিলা ও পুরুষ আগন্তুকদের কী ভাবে অভ্যর্থনা জানাবে। হাতের তুলিতে কমনীয়

গতিভঙ্গির সঞ্চারণ পরখ করে দেখার উদ্দেশ্যে সে ক্যানভাসের দিকে গিয়ে তার ওপর মোটা ব্রাশের দ্রুত টান মারল। পর দিন তার দরজার ঘণ্টি বেজে উঠতে সে দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেল। পশুলোমের কলার আঁটা চাপরাসধারী গ্রেট কোট পরিহিত ভৃত্যের পেছন পেছন এসে প্রবেশ করলেন এক ভদ্রমহিলা আর অল্পবয়সী, আঠারো বছর বয়সী একটি মেয়ে — ভদ্রমহিলারই কন্যা।

'মঁসিয়ে চার্ত্কোভ?' ভদ্রমহিলা বললেন।

শিল্পী মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল।

'আপনার সম্পর্কে এত লেখা হয়েছে; আপনার পোর্ট্রেট নাকি চূড়ান্ত রকমের নিখুঁত।' এই বলে মহিলা হাত-চশমা চোখের সামনে ধরে দ্রুত ছুটে গেলেন দেয়ালের দিকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে দেয়ালে কিছুই ছিল না। 'কিন্তু আপনার পোর্ট্রেট কোথায়, দেখছি না ত?' মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

'সরিয়ে রাখা হয়েছে,' শিল্পী খানিকটা বিমূঢ় হয়ে বলল, 'আমি সবে এই ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি, তাই ওগুলো এখনও আসার পথে... এসে পৌঁছোয় নি।'

'আপনি কি ইতালি গিয়েছিলেন?' হাত-চশমাটাকে দিয়ে তাক করার মতো আর কিছু খুঁজে না পেয়ে শিল্পীর দিকেই বাগিয়ে ধরে মহিলা বললেন।

'না, ইতালি আমি যাই নি, তবে যাবার ইচ্ছে আছে ... অবশ্য বলতে গেলে কি যাত্রাটা আপাতত স্থগিত রেখেছি।... এই যে চেয়ার, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। আপনি নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত?'

'ধন্যবাদ, আমি গাড়িতে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। আরে এই ত, শেষ পর্যন্ত আপনার কাজ দেখতে পাচ্ছি!' মুখোমুখি দেয়ালটার দিকে ছুটে গিয়ে মেঝের ওপর খাড়া করে রাখা তার স্টাডি, স্কেচ, খসড়া ছবি ও পোর্ট্রেটগুলির ওপর হাত-চশমাটা বাগিয়ে ধরে মহিলা বলল। 'C'est charmant! Lise, Lise, venez ici!'* আর ঘরটা — যেন টেনিয়ারের*) ঘর। দেখছিস: অগোছাল, চতুর্দিকে অগোছাল, টেবিল, তার ওপরে বাস্ট, প্যালিট; এই যে ধুলো — দেখেছিস ধুলো কেমন আঁকা!

---

* 'কী চমৎকার! লিজা, লিজা, এদিকে আয়!' (ফরাসী)

C'est charmant!* এই যে আরেকটা ক্যানভাসে এক মহিলার চেহারা — মুখ ধুচ্ছে — quelle jolie figure!** আঃ চাষা! Lise, Lise, রুশী কামিজ পরনে চাষা। দ্যাখ: চাষা! তার মানে, আপনি কেবল পোর্ট্রেটই আঁকেন না?'

'ওঃ এ আজেবাজে ব্যাপার... নেহাৎই চাপল্য... স্টাডি...'

'আচ্ছা, আজকালকার পোর্ট্রেট-শিল্পীদের সম্পর্কে আপনার মত কী? এটা কি সত্যি নয় যে আজকাল আর টিশিয়ানের পর্যায়ের কেউ নেই? তাদের রঙে নেই সেই শক্তি, নেই সেই... আফশোসের কথা যে রুশভাষায় আমি আপনাকে প্রকাশ করে বলতে পারছি না,' (মহিলাটি ছিলেন চিত্রকলা রসিকা, হাত-চশমা নিয়ে ইতালির সমস্ত আর্ট গ্যালারি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন।) 'তবে হ্যাঁ, মঁসিয়ে নোল্... ওঃ কী তাঁর আঁকার হাত! কী অসাধারণ তুলির টান! আমার ত মনে হয় তাঁর ছবিগুলোর মুখের প্রকাশব্যঞ্জনা টিশিয়ানের চেয়েও বেশি। মঁসিয়ে নোল্কে আপনি চেনেন না?'

'কে এই নোল্?' শিল্পী জিজ্ঞেস করল।

'মঁসিয়ে নোল্! ওঃ কী প্রতিভা! তিনি ওর পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন যখন ওর বয়স ছিল মাত্র বারো। আমাদের বাসায় আপনাকে অবশ্যই আসতে হয়। Lise, তুই ওকে তোর অ্যালবামটা দেখা। আপনি জানেন, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য হল এই, যাতে এক্ষুনি ওর পোর্ট্রেট আঁকা শুরু করে দেন।'

'তা আর বলতে? আমি এই মুহূর্তে শুরু করতে প্রস্তুত।'

চোখের পলকে সে তৈরি ক্যানভাসসমেত ইজেল টেনে নিল, হাতে তুলে নিল প্যালিট এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মহিলার কন্যার পাণ্ডুর মুখের ওপর। সে যদি মানবপ্রকৃতিবিদ হত তাহলে বলনাচের প্রতি শিশুসুলভ প্রবল আকর্ষণের আভাস, দ্বিপ্রাহরিক আহার পর্যন্ত এবং আহারের পরবর্তী সময়ের অতিরিক্ত দীর্ঘসূত্রতার জন্য আক্ষেপ ও বিরক্তির ভাব, নতুন পোশাকে বেরিয়ে গিয়ে আমোদ-ফুর্তি করার বাসনা, তার আত্মা ও উপলব্ধির উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন শিল্পকলার যে-সমস্ত প্রেরণা মা তাকে দিচ্ছেন সেগুলির প্রতি নিরাসক্ত অধ্যবসায় প্রয়োগের পীড়াদায়ক চিহ্ন —

* চমৎকার! (ফরাসী)

** কী সুন্দর মুখ! (ফরাসী)

তৎক্ষণাৎ মেয়েটির মুখাবয়বে সে লক্ষ করতে পারত। কিন্তু এই স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র মুখাকৃতির মধ্যে শিল্পী যা দেখতে পেল তা কেবলই তার তুলিকার পক্ষে প্রলোভন-উদ্রেককারী অঙ্গের প্রায় পোর্সেলিনতুল্য স্বচ্ছতা, মুগ্ধকর মৃদু ক্লান্তির ভাব, উজ্জ্বলবর্ণের ক্ষীণ গ্রীবাদেশ আর অভিজাতসুলভ হালকা দেহ-সৌষ্ঠব। এযাবৎ তার তুলি কাজ করেছে কেবল কতকগুলি স্থূল মডেলের কর্কশ চেহারা নিয়ে, কোন কোন ক্লাসিকাল মাস্টারের কপি আর বাঁধা-ধরা প্রাচীন নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু এবারে সে আগে থাকতেই জয়লাভের জন্য প্রস্তুত, দেখাতে প্রস্তুত তার এই তুলির ক্ষিপ্রতা ও ঔজ্জ্বল্য। সে ইতিমধ্যে মনে মনে কল্পনা করতে পারছিল এই স্নিগ্ধ মুখাবয়বটি কেমন দাঁড়াবে।

'বুঝলেন কিনা,' ভদ্রমহিলার মুখে ঈষৎ স্পর্শকাতর অভিব্যক্তি পর্যন্ত খেলে গেল, 'আমার ইচ্ছে হল... ওর পরনে এখন আছে গাউন; সত্যি কথা বলতে গেলে কি, গাউনে আমরা এত অভ্যস্ত যে এ পোশাক ওর পরনে থাকে ওটা আমার ইচ্ছে নয়; আমার ইচ্ছে, ওকে এমন ভাবে আঁকা হয় যেন ও সাদামাঠা কোন পোশাকে, কোন মাঠ-টাঠের ব্যাকগ্রাউন্ডে গাছের ছায়ায় বসে আছে, আর দূরে যেন থাকে পশুপাল কিংবা কোন উপবন... যাতে ও যে কোন বলনাচের আসরে বা ফ্যাশনের কোন জলসায় যাচ্ছে এটা বোঝা না যায়। আমাদের এই সমস্ত বলনাচ, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আত্মাকে এত দূর বিপর্যস্ত করে, ছিটেফোঁটা অনুভূতিকে পর্যন্ত এতটা নষ্ট করে যে... সারল্য, সারল্য যেন বেশি করে থাকে।'

হায়! মাতৃদেবী এবং কন্যা কারও মুখ দেখে বুঝতে বাকি থাকে না, তারা বলনাচের আসরে নেচে নেচে এত হয়রান হয়ে গেছে যে দুজনেরই চেহারা দাঁড়িয়েছে প্রায় মোমের মতো।

চার্তকোভ কাজে হাত দিল, সে তার মডেলকে বসাল, গোটা ব্যাপারটা খানিকটা মনে মনে ভেবে নিল। সে কল্পিত বিন্দুগুলি স্থির করতে করতে শূন্যে তুলি বুলাল, একটা চোখ খানিকটা কোঁচকাল, পিছে সরে গেল, দূরে থেকে তাকিয়ে দেখল — এবং ছবির প্রাথমিক কাজ শুরু ও শেষ করতে সে সময় নিল এক ঘণ্টা। প্রাথমিক কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এবারে সে রঙ লাগাতে প্রবৃত্ত হল, সে কাজে ডুবে গেল। ইতিমধ্যে সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়েছে, এমন কি বিস্মৃত হয়েছে যে অভিজাত মহিলারা তার ঘরে আছেন, এমন কি নিজের কাজে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন শিল্পীর বেলায় যেমন হয় তেমনি সেও

জোরে জোরে নানা রকম শব্দ উচ্চারণ করে, সময় সময় গুন গুন করে গান গেয়ে শিল্পীসুলভ কিছু কিছু ভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছিল। কোন রকম শিষ্টাচারের বালাই না রেখে সে ঝট করে তুলি নাড়িয়ে তার মডেলকে মাথা তুলতে বাধ্য করল। অবশেষে মডেল দারুণ ছটফট করতে লাগল, প্রকাশ করতে লাগল পুরোপুরি ক্লান্তির ভাব।

'আর নয়, প্রথম বারের জন্য যথেষ্ট,' মহিলা বললেন।

'আরেকটু,' আত্মবিস্মৃত শিল্পী বলল।

'না, আর নয়! Lise, তিনটে বাজল!' কোমরবন্ধে সোনার চেন্-এ ঝোলানো ছোট্ট একটা ঘড়ি বার করতে করতে তিনি বললেন, তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন: 'ওঃ বড় দেরি হয়ে গেল!'

'আর মাত্র এক মিনিট,' চার্তকোভ শিশুর মতো মিনতি ভরা, অকপট স্বরে বলল।

কিন্তু মহিলাকে এবারে তার শৈল্পিক দাবির প্রশ্রয় দিতে মোটেই ইচ্ছুক মনে হল না, তিনি এর বদলে পরের বার আরও বেশিক্ষণ বসার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

'এটা কিন্তু আফশোসের কথা হল,' চার্তকোভ মনে মনে ভাবল, 'হাতটা সবে খুলতে শুরু করেছিল।' তার মনে পড়ে গেল, সে যখন ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে নিজের স্টুডিওতে কাজ করত তখন কেউ তাকে বাধা দিত না, তার বিঘ্ন ঘটাত না; নিকিতা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না করে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকত — যত খুশি তার ছবি আঁক; এমন কি সে ফরমাস মাফিক পোজে ঘুমিয়ে পড়তেও পারত। শিল্পী বিরক্ত হয়ে তার তুলি ও প্যালিট চেয়ারের ওপর রেখে দিল এবং বিষণ্ণ মনে থমকে দাঁড়াল ক্যানভাসের সামনে। উচ্চবর্গের মহিলার কাছ থেকে প্রশংসালাভের প্রতিক্রিয়াবশত তার সম্মোহিত ভাব কেটে গেল। সে তাদের বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে দ্রুত ছুটে গেল দরজার দিকে; সিঁড়িতে সে পরের সপ্তাহে তাঁদের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ পেল। সে যখন ঘরে ফিরে এলো তখন তাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। অভিজাত মহিলাটি তাকে সম্পূর্ণ মুগ্ধ করেছে। এযাবৎ এ ধরনের জীবকে তার মনে হত যেন নাগালের বাইরে, মনে হত তাদের জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তকমাধারী চাপরাসী ও সুবেশধারী গাড়োয়ান সমেত জমকাল গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ানো এবং সাদাসিধে ওভারকোট পরনে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ পথচারীদের

দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকানো। আর এখন হঠাৎ কিনা এমনই একটি জীব এসে হাজির হল তার ঘরে! সে এখন পোর্ট্রেট আঁকছে, অভিজাতগৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ পেয়েছে। একটা অসাধারণ পরিতৃপ্তি তাকে পেয়ে বসল; সে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পড়ল আর এর জন্য নিজের পুরস্কার স্বরূপ চমৎকার মধ্যাহ্নভোজন করল, সন্ধ্যাবেলায় থিয়েটার দেখতে গেল এবং নেহাৎই বিনা প্রয়োজনে আবার গাড়ি করে শহরে পাক খেল।

এর পরের কয়েক দিন অভ্যস্ত কোন কাজ তার মাথায় একেবারেই স্থান পেল না। সে কেবল প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন দরজায় ঘণ্টা বাজবে। অবশেষে অভিজাত মহিলাটি তাঁর পাণ্ডুবর্ণ কন্যাকে সঙ্গে করে এলেন। সে তাঁদের বসাল এবং উচ্চবর্গের চালের দাবিদার রূপে, কায়দা করে ক্যানভাস টেনে নিয়ে আঁকতে শুরু করে দিল। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ও সুস্পষ্ট আলোকের উদ্ভাস তাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করল। সে তার হালকা গড়নের মডেলের মধ্যে এমন অনেক কিছু দেখতে পেল যা হৃদয়ঙ্গম করে ক্যানভাসে সঞ্চারিত করতে পারলে পোর্ট্রেটটা বেশ উঁচুদরের হতে পারে; সে দেখতে পেল মডেল এখন যে ধারণা নিয়ে তার সামনে হাজির হয়েছে সেটাকে যদি পুরোপুরি সেই ভাবে রূপ দেওয়া যায় তাহলে বৈশিষ্ট্যসূচক কিছু একটা সৃষ্টি হয়। যা এখনও অন্যদের নজরে পড়ে নি তা প্রকাশ করবে এই উপলব্ধিতে হৃৎপিণ্ডে ঈষৎ শিহরন পর্যন্ত জাগল। কাজ তার মন-প্রাণ জুড়ে বসল। এবারেও মডেলের অভিজাত বংশোদ্ভবের কথা বিস্মৃত হয়ে সে সম্পূর্ণ ডুবে গেল তার তুলিতে। সে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল কী ভাবে তার ক্যানভাসের ওপর ফুটে উঠছে সপ্তদশী তরুণীর হালকা মুখাবয়ব ও স্বচ্ছপ্রায় দেহসৌষ্ঠব। প্রতিটি সূক্ষ্ম আভাস, হালকা হলদেটে ভাব, চোখের নীচের প্রায় অলক্ষিত ঈষৎ নীল আভা সে ধরতে পারছিল এবং অবশেষে যখন সে কপালের ওপরকার ছোট্ট ফুসকুরিটাকেও বাগে আনার তাল করছে, এমন সময় হঠাৎ মাথার ওপরে শুনতে পেল কন্যার মাতার কণ্ঠস্বর: 'আঃ এটা আবার কেন? এটার দরকার নেই,' ভদ্রমহিলা বললেন। 'তা ছাড়া এই দেখুন... এই যে, কতকগুলো জায়গায়... যেন খানিকটা হলদেটে ভাব, আবার এই এখানে সম্পূর্ণ গাঢ় রঙের কিছু ছোপ।' শিল্পী এই বলে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল যে ঠিক এই ছোপ আর হলদেটে ভাবই চমৎকার মানিয়েছে এবং তার ফলে মুখে স্নিগ্ধ ও হালকা আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জবাবে

ভদ্রমহিলা বললেন যে এগুলি কোন আমেজ সৃষ্টি করছে না, একেবারেই বেমানান লাগছে; আর এ হল নেহাৎই তার কল্পনা। শিল্পী সরল মনে বলল, 'যদি আপত্তি না থাকে তাহলে এখানে কেবল একটা জায়গায় সামান্য হলুদের ছোঁয়া দিই।' কিন্তু এই জিনিসটাই ভদ্রমহিলা অনুমোদন করলেন না। তিনি জানালেন যে Lise কেবল আজকেই সামান্য বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে, নইলে কোন হলদেটে ভাব তার মুখে দেখা যায় না, বরং তার মুখের সজীব রঙ দেখে বিশেষ করে অবাক হতে হয়। শিল্পীর তুলি ক্যানভাসের ওপর যা ফুটিয়ে তুলেছিল শিল্পী বিষণ্ণ মনে তা মুছে ফেলতে প্রবৃত্ত হল। অলক্ষিতপ্রায় বহু রেখা লোপ পেল আর সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা লোপ পেল সাদৃশ্যও। সে আবেগ-অনুভূতি বিসর্জন দিয়ে ছবিতে প্রয়োগ করতে লাগল গতানুগতিক বর্ণলেপ, যা শিল্পীমাত্রেরই এত বেশি মুখস্থ যে আপনা-আপনিই হাতে এসে যায় এবং যার ফলে জীবন্ত মডেল থেকে গৃহীত কোন মুখ পর্যন্ত কেমন যেন নিরুত্তাপ আদর্শ পরিগ্রহ করে, যেমন দেখা যায় শিক্ষার্থীদের গত-বাঁধা আঁকার মধ্যে। কিন্তু আপত্তিকর বর্ণলেপ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ায় ভদ্রমহিলা সন্তুষ্ট হলেন। কাজটা যে এত সময় নিচ্ছে কেবল এতেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, সেই সঙ্গে যোগ করলেন যে তিনি শুনেছিলেন শিল্পী নাকি দুটি সিটিং-এ পোর্ট্রেট পুরোপুরি শেষ করতে পারেন। শিল্পী এ কথার কোন জবাব খুঁজে পেল না। মহিলাদু'জন উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হলেন। শিল্পী তুলি রেখে দিয়ে তাঁদের দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিল, এর পর অনেকক্ষণ বিমূঢ় অবস্থায় পোর্ট্রেটটার সামনে একই জায়গায় স্থির হয়ে থেকে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ওটাকে দেখতে লাগল, এদিকে তার মাথার ভেতরে খেলে চলল তার নজরে পড়া সেই সমস্ত স্নিগ্ধ নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য, সেই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আভাস ও অশরীরী আভা যেগুলি নির্মম হাতে বিলোপ করে দিয়েছে তার তুলি। এই ভাবনায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে সে পোর্ট্রেটটাকে এক দিকে সরিয়ে রাখল, খুঁজে খুঁজে নিজের জিনিসপত্রের মাঝখানের একটা জায়গা থেকে বার করল পরিত্যক্ত সাইকির মাথা। বহুকাল আগে এটাকে সে স্কেচ করে ক্যানভাসে তুলেছিল। মুখটি আঁকা হয়েছে দক্ষতার সঙ্গে কিন্তু জীবন্ত শরীরী মূর্তি পরিগ্রহ না করে তা হয়ে আছে কেবলই সাধারণ রূপের সমবায়ে গঠিত সম্পূর্ণ আদর্শায়িত, নিরুত্তাপ মূর্তি। কিছুই করার না থাকায় সে এখন ওটাকে নিয়ে কাজ করতে লেগে গেল — অভিজাত

সাক্ষাৎকারিনীর মুখের মধ্যে যা যা সে লক্ষ করেছিল তার সবগুলি মনে করে করে সে এই ছবিটার ওপর প্রয়োগ করতে লাগল। তার উপলব্ধ রেখা, সূক্ষ্ম আভাস ও বর্ণসুষমা এখানে যে রকম বিশুদ্ধ রূপে এসে বিন্যস্ত হল তা তখনই সম্ভব যখন শিল্পী প্রকৃতিকে দীর্ঘকাল অবলোকনের পর শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তার সমকক্ষ শিল্প সৃষ্টি করে। সাইকি জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল, যে-চিন্তা এতক্ষণ ছিল প্রায় অপ্রত্যক্ষ তা ধীরে ধীরে ধারণ করতে লাগল দৃশ্য শরীরী মূর্তি। শৌখিন সমাজের এই অল্পবয়সী মেয়েটির মুখের আদল শিল্পীর অজানতেই সঞ্চারিত হল সাইকিতে, সাইকির মধ্য দিয়ে তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এমন এক অভিব্যক্তি লাভ করল যা সত্যিকারের মৌলিক সৃষ্টি বলে আখ্যাত হওয়ার অধিকার রাখে। মনে হচ্ছিল যেন মডেল সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড ও সামগ্রিক ধারণাকে সে সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়েছে, পুরোপুরি ডুবে গেছে তার কাজে। কয়েক দিন ধরে সে কেবল এই ছবি নিয়ে ব্যাপৃত থাকল। এক দিন ঠিক এই কাজটা নিয়েই যখন সে ব্যস্ত, তখন আগমন ঘটল পরিচিত ভদ্রমহিলাদ্বয়ের। সে ইজেল থেকে ছবিটা সরানোর অবকাশ পর্যন্ত পেল না। দুজনেই গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

'Lise, Lise! ওঃ চেহারার কী মিল! Superbe, superbe!* কী ভালোই না হয়েছে যে আপনি ভেবেচিন্তে ওকে গ্রীক পোশাক পরিয়েছেন। আঃ, কী চমকই না সৃষ্টি করেছেন!'

শিল্পী বুঝতে পারছিল না ভদ্রমহিলাদের মধুর বিভ্রান্তিটা কী ভাবে ভাঙ্গা যায়। সে লজ্জিত হয়ে মাথা নামিয়ে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল:

'এটা সাইকি।'

'সাইকির মতো করে এঁকেছেন? C'est charmant!' মা হেসে বললেন, সেই সঙ্গে মেয়ের মুখেও ফুটে উঠল হাসি। 'আচ্ছা Lise সত্যি কিনা, তোকে সাইকির মতন করে আঁকলে বেশি মানায়? Quelle idée délicieuse!** কিন্তু কী কাজ! এটা কররেজিও*⁾। স্বীকার করছি, আমি আপনার সম্পর্কে পড়েছি, শুনেওছি, কিন্তু আপনার প্রতিভা যে এরকম তা জানা ছিল না। না, এখন আপনাকে আমার পোর্ট্রেটও অবশ্যই আঁকতে হবে।'

---

* অপূর্ব, অপূর্ব! (ফরাসী)

** কী অপরূপ চিন্তা! (ফরাসী)

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ভদ্রমহিলারও ইচ্ছা কোন সাইকির রূপ ধারণ করা।

'এদের নিয়ে কী করা যায়?' শিল্পী ভাবল। 'যদি ওদের নিজেদেরই এটা মনোগত অভিপ্রায় হয়, তা হলে ওরা যে নামে চায় সাইকি সেই নামেই চালান হোক,' এই ভেবে সে ওদের শুনিয়ে বলল:

'কষ্ট করে আরেকটু সিটিং দিন, আমি সামান্য কতকগুলো টাচ দেব।'

'ওঃ, আমার ভয় হচ্ছে আপনি হয়ত... অমনিতেই এখন এমন মিল!'

কিন্তু শিল্পী বুঝতে পারছিল, ওদের আশঙ্কা হচ্ছিল হলদেটে ভাবটা নিয়ে। তাই সে এই বলে ওদের আশ্বস্ত করল যে সে কেবল চোখে আরেকটু ঔজ্জ্বল্য ও ব্যঞ্জনা দেবে। আসলে কিন্তু তার বড়ই লজ্জা লাগছিল, তাই চূড়ান্ত নির্লজ্জতার জন্য পাছে কেউ তাকে ধিক্কার দেয় এই ভয়ে মডেলের সঙ্গে অন্তত কিছুটা সাদৃশ্যসৃষ্টির ইচ্ছা তার মনে মনে ছিল। আর ঠিকই, সাইকির রূপ ভেদ করে অবশেষে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল পাণ্ডুবর্ণ তরুণীর মুখাকৃতি।

'হয়েছে!' মেয়ের মা বলল। তার ভয় হতে লাগল সাদৃশ্যটা শেষ পর্যন্ত বড় বেশি না হয়ে পড়ে।

হাসি, অর্থ, প্রশংসা, আন্তরিক করমর্দন, মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ — সব রকমে পুরস্কৃত হল শিল্পী; এক কথায়, তোষামোদজনক সহস্র পুরস্কার প্রাপ্তি তার ঘটল। পোর্ট্রেটটি শহরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। ভদ্রমহিলা সেটি বন্ধুমহলে দেখালেন; মডেলের সাদৃশ্য বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পক্ষমতার বলে শিল্পী সৌন্দর্য সঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন তাতে সকলে বিস্মিত। বলাই বাহুল্য, যে-কোন বক্তা যখন শেষোক্ত মন্তব্যটি করে তখন তার মুখের ওপর ঈর্ষার মৃদু ঝলক না খেলে পারে না। শিল্পীর ওপর অকস্মাৎ বন্যাস্রোতের ধারায় এসে পড়ল কাজের চাপ। মনে হল যেন গোটা শহর তার কাছে ছবি আঁকানোর জন্য উন্মুখ। মুহূর্তে মুহূর্তে তার দরজায় ঘণ্টা বাজে। এক দিক থেকে এর ফল ভালো হলেও হতে পারত, অসংখ্য মুখ, তাদের বৈচিত্র্য শিল্পীর হাতে-কলমে শিক্ষার অফুরান উৎস হয়ে দেখা দিতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এরা সকলেই ছিল এমন সমস্ত লোকজন যাদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন, সকলেই ব্যস্তবাগীশ, কর্মব্যস্ত কিংবা শৌখিন সমাজভুক্ত — যার অর্থ হল অন্য যে কারও চেয়ে বেশি কর্মব্যস্ত আর সেই কারণে চরম অসহিষ্ণু। চতুর্দিক থেকে একমাত্র দাবি

উঠতে থাকে ভালো হওয়া চাই এবং তাড়াতাড়ি করা চাই। শিল্পী দেখল চরম উৎকর্ষসৃষ্টির চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে, তাকে সম্বল করতে হবে তুলির ক্ষিপ্র চটপটে টান আর কৌশল। তাকে ধরতে হবে কেবল মোটামুটি, একমাত্র সামগ্রিক অভিব্যক্তিটি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটির গভীরে প্রবেশ করে তুলি চালালে চলবে না — এক কথায়, প্রকৃতিকে তার চূড়ান্ত রূপে পর্যবেক্ষণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে যে তার কাছে যারা ছবি আঁকাতে আসত তাদের প্রায় সকলেরই বিভিন্ন ধরনের আরও বহু আবদার থাকত। ভদ্রমহিলারা দাবি করতেন পোর্ট্রেটে মুখ্যত যেন আঁকা হয় কেবল আত্মা আর চরিত্র, বাদবাকি ব্যাপারকে ক্ষেত্রবিশেষে আদৌ অনুসরণ করার দরকার নেই, যেখানে যত কোনা আছে সেগুলিকে সুডৌল করে দিতে হবে, সমস্ত খুঁতকে হালকা করে দেখাতে হবে এবং পারলে সেগুলিকে একেবারেই এড়াতে হবে। এক কথায়, পুরোপুরি প্রেমে পড়ার মতো যদি নাও হয়, মুখটা যেন অন্তত তাকিয়ে দেখার মতো হয়। আর তার ফলে ছবি আঁকানোর জন্য বসতে গিয়ে তারা অনেক সময় এমন বক্তব্য প্রকাশ করত যাতে শিল্পীকে বিস্মিত হতে হত: কারও ইচ্ছা মুখে যেন বিষাদের ভাব প্রকাশ পায়, কেউ চায় স্বপ্নালু ভাব আবার কারও বা ইচ্ছা, যে করেই হোক মুখের ফাঁকটা যেন কম করে দেখানো হয়, আর এই উদ্দেশ্যে মুখটাকে এত দূর সঙ্কুচিত করে রাখত যে শেষকালে তা পরিণত হত প্রায় ছুঁচের মাথার মতো একটি বিন্দুতে। আবার এত সব সত্ত্বেও তার কাছ থেকে তারা দাবি করত চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য ও অকপট স্বাভাবিকতা। পুরুষেরাও ভদ্রমহিলাদের চেয়ে কোন অংশে কম যেত না। কারও দাবি, তার মাথাটা যেন এমন ভাবে বাঁকানো থাকে যাতে তেজ ও দৃপ্ত ভাব প্রকাশ পায়; কেউ চায় ভাবে ঢুলুঢুলু ঊর্ধ্বগামী দুটি চোখ; রক্ষিবাহিনীর জনৈক লেফটান্যাণ্ট দাবি করে বসলেন চোখে যেন অবশ্যই প্রকাশ পায় যুদ্ধং দেহি ভাব; উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বাসনা মুখে যেন বেশি করে থাকে সারল্য, মহত্ত্ব, আর একটা হাত যেন ভর দেওয়া থাকে গ্রন্থের উপর, যার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকবে: 'ইনি চিরকাল সত্যের পূজারী।' প্রথম প্রথম শিল্পী এই সমস্ত দাবির পেছনে বড় বেশি মাথা ঘামাত: গোটা ব্যাপারটা তাকে চিন্তা করতে হত, ভালোমতো ভেবেচিন্তে দেখতে হত, অথচ সময় তাকে দেওয়া হত খুবই কম। অবশেষে সে বুঝতে পারল আসল ব্যাপারটা কী, তাই এখন আর তাকে বিন্দুমাত্র অসুবিধায় পড়তে

হয় না। এমন কি দ্বটো তিনটে কথা শোনামাত্র সে আগে থাকতে ধরে ফেলত কে কী রকম ভাবে নিজেকে আঁকাতে চায়। যে ব্যক্তি রণদেবতার মতন করে নিজেকে দেখতে চায় তার ম্বখে সে এ°কে দিত রণদেবতার ম্বখের আদল, যার লক্ষ্য বাইরন, তাকে বাইরনীয় ভঙ্গি ও প্রবণতা দিত। কারিন্‌না, উণ্ডিনা,অ্যাস্‌পাসিয়া*) — যা-ই হতে চান না কেন ভদ্রমহিলারা, শিল্পী মহা উৎসাহে সব কিছ্বতে রাজী হয়ে যেত, এমন কি নিজে থেকে তাদের প্রত্যেকের চেহারায় যথেষ্ট পরিমাণে সৌন্দর্য যোগ করতে লাগল, আর সেটা, বলাই বাহ্বল্য, কোন ক্ষেত্রে বিফলে গেল না — এর জন্য কখন কখন শিল্পীকে এবং চেহারার দারুণ অমিলকেও ক্ষমা করা হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে সে নিজেই তার তুলির আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ও চাতুর্যে অবাক হতে শ্বরু করল। আর যারা ছবি আঁকাতে আসত তারা ত বলাই বাহ্বল্য, পরম ম্বগ্ধ; তারা ঘোষণা করল যে শিল্পী মহাপ্রতিভাধর।

চার্ত্‌কোভ সর্বতোপ্রকারে শৌখিন চিত্রকররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সে এখানে ওখানে ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে বেড়াতে লাগল, গ্যালারিতে, এমন কি প্রমোদভ্রমণেও ভদ্রমহিলাদের সাহচর্য দিতে লাগল, পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা করতে শিখল এবং উঁচু গলায় জাহির করতে লাগল যে শিল্পীকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, তার উচিত নিজের খ্যাতি রক্ষা করে চলা, অথচ শিল্পীরা বেশভূষা করে ম্বচিদের মতন, তারা ভালো আদব-কায়দা জানে না, উঁচুদরের বৈশিষ্ট্য অন্বসরণ করে না, শিক্ষা-সংস্কৃতি বোধের কোন বালাই তাদের নেই। নিজের বাড়িতে, স্টুডিওতে সে চ্বড়ান্ত পর্যায়ের পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রচলন করল, দ্বটি জমকাল চাপরাশী নিয়োগ করল, কিছ্ব ফুলবাব্ব শিষ্য জোটাল, দিনে কয়েকবার করে পোশাক পালটাতে লাগল, চুল কোঁকড়া করল, সাক্ষাৎকারীদের অভ্যর্থনা জানানোর উপযোগী নানা রকম আদব-কায়দার উৎকর্ষসাধনে মন দিল, ভদ্রমহিলাদের উপর প্রীতিকর ছাপ ফেলার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য নানা উপায়ে বাহ্য শোভাবর্ধনে প্রবৃত্ত হল; এক কথায়, দেখতে দেখতে এমন হল যে এককালে যে বিনয়ী শিল্পীটি ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপে তার ছোট্ট কুঠুরিতে সকলের অলক্ষিতে কাজ করত তাকে আর এখন চেনাই যায় না। শিল্পীদের সম্পর্কে এবং তাদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে সে এখন চোখা-চোখা মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে: তার দৃঢ় মত এই যে আগেকার দিনের শিল্পীদের উপর বাড়াবাড়ি রকমের

গ্নণাবলী আরোপিত হয়েছে; রাফাএলের আগে পর্যন্ত তাঁরা যা এ'কেছেন তাকে মান্নষের আকৃতি না বলে শ্নটকি মাছ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; সেগ্নলির মধ্যে যে কোন পবিত্র ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ এই চিন্তাটা বিচারকর্তা দর্শকদের কল্পনামাত্র; স্বয়ং রাফাএলও যে সব ভালো এ'কেছেন এমন নয়, তাঁর বহ্ন রচনার জনপ্রিয়তার পেছনে আছে নিছক তাঁর কিংবদন্তীসন্নলভ খ্যাতি; মিকেল-আঞ্জেলো*) একটা হামবড়া, কেন না একমাত্র যা নিয়ে তিনি বড়াই করতে চাইতেন তা হল শারীরবিদ্যা, অন্যথা ল্যালিত্যের ছিটেফোঁটা তাঁর মধ্যে নেই, আর সত্যিকারের ঔজ্জবল্য, তুলির জোর ও বর্ণসন্নষমা যদি খ্নজতে হয় তা হলে তা পাওয়া যাবে কেবল এখনই, বর্তমান শতাব্দীতে। আর এখানে, স্বভাবতই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সে নিজেও এই প্রসঙ্গের আওতায় এসে পড়ে।

'না, আমি বন্ঝতে পারি না,' চার্তকোভ বলত, 'কীভাবে লোকে এত কষ্ট করে বসে বসে গলদঘর্ম হয়ে কাজ করে। যে-লোক একটা ছবি নিয়ে কয়েক মাস ধরে পড়ে থাকে, আমার মতে সে পরিশ্রমী, কিন্তু শিল্পী নয়। তার মধ্যে প্রতিভা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্রতিভা তার বক্তব্য প্রকাশ করে সাহসের সঙ্গে এবং দ্রন্ত। এই দেখন্ন না, আমার ক্ষেত্রে,' সচরাচর উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে সে বলত, 'এই পোর্ট্রেটটি আমি এ'কেছি দন্ দিনে, এই মাথাটা এক দিনে, এটা কয়েক ঘণ্টায়, আর এটা করতে লেগেছে এক ঘণ্টার কিছন্ বেশি সময়। না, যেখানে খ্নটিয়ে খ্নটিয়ে আঁচড়ের পর আঁচড় টানা হয় তাকে আমি... আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, শিল্পকলা বলতে রাজী নই; এটা নেহাৎই কারিগরী, শিল্পকলা নয়।'

এই ধরনের সমস্ত মতামত সে তার সাক্ষাৎকারীদের কাছে ব্যক্ত করত আর সাক্ষাৎকারীরা তার তুলির শক্তিতে ও চাতুর্যে অবাক হয়ে যেত, এমন কি এই ছবিগন্লি যে এত দ্রন্ত আঁকা হয়েছে তা শন্নে তারা পন্লকিত হত, তারপর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত: 'একেই বলে প্রতিভা, খাঁটি প্রতিভা। দেখন্ন দেখন্ন, ওঁর কথা বলার ভঙ্গি, কী রকম জন্বলজন্বল করছে ওঁর চোখ দন্টো! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure।*

নিজের সম্পর্কে এই রকম কথাবার্তা শন্নে শিল্পী আহ্লাদিত হত।

---

* ওঁর সমস্ত চেহারার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছন্ আছে। (ফরাসী)

পত্রিকায় যখন ছাপার অক্ষরে তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশিত হত তখন সে শিশুর মতো আনন্দিত হত, যদিও সেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য হত তার কেনা, তার নিজেরই টাকায়। এ ধরনের ছাপা কাগজের পাতা সে সর্বত্র বহন করে বেড়াত এবং যেন অনিচ্ছাকৃত ভাবেই চেনাপরিচিত লোকজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে সেটা বার করে দেখাত আর তাতে তার সরল, অকপট মন চরম আত্মপ্রসাদে ভরে উঠত। তার খ্যাতি বেড়ে চলল, ফরমাসও বাড়তে লাগল। একই ধারার পোর্ট্রেট আর মুখ এঁকে এঁকে এখন তার বিরক্তি ধরে যেতে শুরু করেছে — সেগুলির ভঙ্গি ও মুদ্রা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। সে এখন আর তেমন উৎসাহ নিয়ে সেগুলি আঁকে না, চেষ্টা করে কোনরকমে মাথার স্কেচটা আঁকে আর বাকিটা শেষ করতে দেয় তার শিষ্যদের। আগে সে যা-হোক, কোন একটা নতুন ভঙ্গির সন্ধান করত, চেষ্টা করত শক্তি আর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি দিয়ে তাক লাগাতে। এখন এটাও তার কাছে একঘেয়ে হয়ে আসতে লাগল। ভাবনাচিন্তা ও উদ্ভাবন করতে করতে তার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এ ছিল তার সাধ্যের বাইরে, তা ছাড়া সময়ও তার ছিল না: তুচ্ছ আমোদপ্রমোদে বিক্ষিপ্ত জীবন এবং সমাজ, যে-সমাজে একজন শৌখিন মানুষের ভূমিকা গ্রহণের জন্য সে সচেষ্ট। এ সবই তাকে শ্রম ও ভাবনাচিন্তার জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার তুলি হয়ে আসতে লাগল নিরাবেগ ও ভোঁতা, সে এখন আবেগ-অনুভূতি বিবর্জিত, বহুকালের বস্তাপচা, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। সরকারী আমলা ও সামরিক কর্মচারীদের বৈচিত্র্যহীন, নিরুত্তাপ, সদা পরিপাটি এবং বলা যেতে পারে, কুলুপ-আঁটা মুখ, তুলির পক্ষে তেমন প্রশস্ত ক্ষেত্র হয়ে দেখা দিল না: জমকাল ভারী ভারী ঝালর, তীব্র গতিভঙ্গি, গভীর আবেগ — সমস্তই বিস্মৃত হল তুলি। ছবিতে মূর্তিবিন্যাস, নাটকীয় শিল্পগুণে আর উঁচুদরের ভঙ্গি সম্পর্কে ত কোন কথাই উঠতে পারে না। তার সামনে থাকত কেবল উর্দি, কাঁচুলি আর টেইল-কোট — এমনই জিনিস, যেগুলির সামনে শিল্পী অনুভব করেন ঔদাসীন্য, অন্তর্হিত হয় তাঁর যাবতীয় কল্পনাশক্তি। তার সৃষ্টিতে এখন আর অতি সাধারণ সৃষ্টির গুণাবলী পর্যন্ত দেখা যেত না, তথাপি এখনও সেগুলি আগের মতোই বিখ্যাত, যদিও সত্যিকারের বোদ্ধা ও শিল্পীরা তার সাম্প্রতিক সৃষ্টি দেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁদের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁরা আগে থেকে চার্তকোভকে চিনতেন, তাঁরা

বুঝে উঠতে পারলেন না, একেবারে সূচনায় প্রতিভার লক্ষণ চাতুর্কৌশলের মধ্যে এত উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কী করে তা লোপ পেয়ে যেতে পারে। তাঁরা বৃথাই জল্পনাকল্পনা করতে থাকেন, একজন মানুষ যখন সবে তার নিজের সমস্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ অর্জন করল, ঠিক তখনই কী ভাবে তার প্রতিভার দীপ্তি নিভে যেতে পারে।

কিন্তু প্রমত্ত শিল্পীটি তাঁদের সমালোচনায় কর্ণপাত করল না। ইতিমধ্যে সে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছুতে শুরু করেছে যখন বুদ্ধি এবং বয়স — দু দিক থেকেই একটা স্থিতির ভাব আসে; সে স্থূলকায় হতে শুরু করেছে, প্রস্থেও বেশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এখন পত্রপত্রিকায় সে দেখতে পায় তার নামের আগে বিশেষণ: 'আমাদের সম্মানীয় আন্দ্রেই পেত্রোভিচ', 'আমাদের শ্রদ্ধাভাজন আন্দ্রেই পেত্রোভিচ'। সে বিভিন্ন সম্মানজনক চাকুরী গ্রহণের প্রস্তাব পায়, বিভিন্ন পরীক্ষায় ও কমিটিতে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পায়। পরিণত বয়সে সচরাচর যেমন ঘটে, এখন সে প্রবলভাবে ঝুঁকতে থাকে রাফাএল ও প্রাচীন শিল্পীদের প্রতি — কারণ এই নয় যে তাঁদের পরম গুণাবলীতে তার পুরোপুরি প্রত্যয় জন্মেছে, এর উদ্দেশ্য হল তাঁদের হাতিয়ার করে তরুণ শিল্পীদের সরাসরি খোঁচা দেওয়া। এই বয়সে যারা উপনীত হয় তাদের সকলের যেমন অভ্যাস, তেমনি সেও কোন বাছবিচার না করে নীতিভ্রংশ ও অপকৃষ্ট মানসিক প্রবণতার জন্য যুবসম্প্রদায়কে তিরস্কার করতে থাকে। সে এখন বিশ্বাস করতে থাকে যে জগতে সবই অনায়াসলভ্য, ঐশ্বরিক প্রেরণা বলে কিছু নেই এবং সমস্ত কিছু এক কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও একরূপত্বের অধীন হওয়া উচিত। এক কথায়, তার জীবন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যখন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে আন্দোলিত সমস্ত কিছু মানুষের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, যখন ছড়ের প্রবল টান অন্তরে তেমন একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, হৃদয়ের তন্ত্রীতে মর্মস্পর্শী সুর জাগিয়ে তোলে না, যখন সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসে অনাহত শক্তি আগুনে ও শিখায় পরিণত হয় না, কিন্তু নিঃশেষে দগ্ধ যাবতীয় অনুভূতি স্বর্ণঝঙ্কারের কাছে উত্তরোত্তর সুগম হতে শুরু করে, তার প্রলোভনজনক সঙ্গীতের প্রতি বড় বেশি মনোযোগী হতে থাকে এবং অল্পে অল্পে, নিজের অজ্ঞাতসারে তার দ্বারা চেতনাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হতে দেয়। যশোলাভের যোগ্যতা যার নেই, যশকে যে-ব্যক্তি অপহরণ করেছে, যশ তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না; যার যোগ্যতা আছে কেবল তারই অন্তঃকরণে যশ জাগাতে পারে

অবিরাম শিহরন। আর এই কারণেই তার সমস্ত উপলব্ধি ও আবেগ ঝুঁকে পড়ল স্বর্ণের দিকে। স্বর্ণ হয়ে উঠল তার কামনা, তার আদর্শ, তার আতঙ্ক, তৃপ্তি ও লক্ষ্য। তার সিন্দুকে ব্যাঙ্কনোটের তাড়া জমে উঠতে লাগল এবং যাদের কপালে এই ভয়ঙ্কর দান জোটে তাদের সকলের মতোই সেও হয়ে উঠতে থাকল নীরস, সোনা ছাড়া আর সব কিছুর প্রতি নিরাসক্ত, অকারণ অর্থগৃধ্নু, উদ্দেশ্যহীন সঞ্চয়কারী। সে প্রায় পরিণত হতে চলেছিল সেই সমস্ত অদ্ভুত জীবের একটিতে, যাদের সংখ্যা আমাদের এই অনুভূতিলেশহীন সমাজে নেহাৎ কম নয়, যাদের দিকে জীবন ও হৃদয়ের শক্তিতে ভরপুর মানুষ আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকায় — তার মনে হয় এরা যেন পাথরের চলন্ত কফিন, ভেতরে হৃৎপিণ্ডের বদলে আছে শবদেহ। কিন্তু একটি ঘটনা তাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিল, তার সমগ্র জীবনের ধারায় আলোড়ন তুলল।

একদিন সে তার টেবিলে একটা চিরকুট দেখতে পেল, তাতে শিল্পকলা একাডেমী জানিয়েছে যে ইতালি থেকে সেখানে উৎকর্ষসাধনরত এক রুশ শিল্পীর আঁকা একটি নতুন ছবি এসেছে এবং একাডেমীর বিশিষ্ট সদস্য হিশেবে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক এসে ছবিটার উপর তাঁর মতামত ব্যক্ত করে যান। এই শিল্পীটি তারই একজন প্রাক্তন বন্ধু — অল্প বয়স থেকেই শিল্পকলার প্রতি বন্ধুটির প্রবল আকর্ষণ ছিল, একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও জ্বলন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সে তার মনপ্রাণ তাতে সমর্পণ করে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, এবং নিজের অতি প্রিয় অভ্যাস পরিহার করে, চলে যায় সেই বিস্ময়কর শহরে — রোমে, যেখানে গগনমণ্ডলের অপরূপ সুষমাহেতু পরিপূর্ণতা লাভ করে শিল্পকলার লালনাগার — সেই রোমে, যার নামে শিল্পীর অগ্নিগর্ভ হৃদয়ে এত প্রবল, এমন তীব্র স্পন্দন জাগে। সেখানে সে সন্ন্যাসব্রতধারীর মতো অন্য কোন কাজে মন বিক্ষিপ্ত না করে শ্রমে আত্মনিয়োগ করল। তার চরিত্র, তার অসামাজিক স্বভাব, সামাজিক আদব-কায়দা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা কিংবা নিজের নগণ্য, বেয়াড়া পোশাক-পরিচ্ছদের ফলে শিল্পী-নামের যে মানহানি সে ঘটিয়েছে, তা নিয়ে লোক কিছু বলছে কিনা সে-ব্যাপারে মাথা ঘামানোর অবকাশ তার ছিল না। সতীর্থরা তার উপর বিরক্ত হল কিনা তাতে তার কিছু আসত-যেত না। সে সকলকে উপেক্ষা করে, সমস্ত কিছু সমর্পণ করে শিল্পের হাতে। অক্লান্ত ভাবে আর্ট গ্যালারির পর আর্ট গ্যালারি দর্শন করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বড় বড় শিল্পীদের সৃষ্টির

সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের তুলির যাদুকরী শক্তি অনুধাবন করে, ধরার চেষ্টা করে। নিজেকে কয়েক বার এই মহান শিল্পগুরুদের সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা না ক'রে, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নিজের জন্য মৌন অথচ অর্থপূর্ণ জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সে কোন রচনা সমাপ্ত করত না। সে কোন উত্তেজনাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে যেত না; সে রুচিবাগীশদের পক্ষ নিত না আবার তাদের বিরুদ্ধাচরণও করত না। সব জিনিসকে সে সমানভাবে তার প্রাপ্য সম্মান দিত, যেখানে যতটুকু সুন্দর, সেখান থেকে কেবল সেটুকুই নিষ্কাশন করে নিত। অবশেষে গুরুর পদে বরণ করল কেবল একজনকে — দেবতুল্য রাফাএলকে। সেই মহিমাময় কবি-শিল্পীর মতো সেও বহু মাধুর্য ও পরম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ অসংখ্য রচনাদি পাঠ করার পর শেষ পর্যন্ত তার উপাস্য গ্রন্থ রূপে রেখে দিল একমাত্র হোমারের 'ইলিয়াড', যেহেতু সে আবিষ্কার করল যে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত কিছুই তার মধ্যে আছে এবং এমন কিছুই নেই যা এখানকার মতো এত গভীর ও চরম উৎকর্ষ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই কারণেই তার পাঠশালা থেকে সে আহরণ করল সৃজনের সুমহান ধারণা, চিন্তার প্রবল সৌন্দর্য আর ঐশী তুলিকার পরম মাধুর্য।

হলঘরে প্রবেশ করে চার্তকোভ দেখতে পেল ইতিমধ্যে ছবির সামনে বিপুল সংখ্যক দর্শকের একটা ভিড় এসে জমায়েত হয়েছে। যে সুগভীর নীরবতা এখানে সর্বত্র বিরাজ করছিল, কলারসিকদের বিপুল সমাগমে সে রকম কদাচিৎ ঘটে থাকে। সে দ্রুত তার চেহারায় বিদগ্ধজনোচিত গুরুগম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল; কিন্তু হা ভগবান, এ কী সে দেখল!

তার সামনে ছিল শিল্পীর সৃষ্টি — কুমারী নারীর মতো সুন্দর, অকলঙ্ক, অনিন্দনীয়। এক মহাপ্রতিভাসুলভ বিনম্র ভঙ্গিতে, দিব্য, নিষ্পাপ ও সরল রূপ নিয়ে সেই সৃষ্টি সব কিছুর মাথা ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। মনে হচ্ছিল যেন ক্যানভাসের দিব্য মূর্তিগুলি তাদের উপর এতগুলি চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখে হতচকিত হয়ে লজ্জায় তাদের সুন্দর চোখের পাতা নামিয়ে নিয়েছে। নতুন হাতের তুলির অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে রসজ্ঞরা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। পরম মহিমান্বিত ভঙ্গির মধ্যে রাফাএলকে চর্চার পরিচয়, তুলির টানের চরম উৎকর্ষের মধ্যে কররেজিওকে চর্চার আভাস — বুঝিবা সর্বধারার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। কিন্তু সর্বাধিক

লক্ষণীয়, আধিপত্যবিস্তারকারী ছিল স্বয়ং শিল্পীর অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির প্রকাশ। ছবির শেষ খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত ছিল তাতে পরিকীর্ণ; সর্বত্র উপলব্ধি করা যাচ্ছিল সঙ্গীতি ও অভ্যন্তরীণ শক্তি। সর্বত্র ধরা পড়েছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এই প্রবহমান সুডোল রেখা, যা একমাত্র কোন সৃজনী শিল্পীরই চক্ষুগোচর হতে পারে, আর নকলনবিসের হাতে পড়ে হয়ে ওঠে কৌণিক। এটা প্রত্যক্ষ যে শিল্পী বহির্জগৎ থেকে নিষ্কাশিত যাবতীয় বস্তু প্রথমে আত্মস্থ করেছেন, আর তার পর সেখান থেকে, অন্তরের সেই উৎস থেকে তার উৎসারণ ঘটিয়েছেন এক সমন্বিত, ঐশ্বর্যময় গীতি রূপে। আর প্রকৃতির নিছক নকল ও সৃজনের মধ্যে যে কি আকাশ-পাতাল তফাৎ, একজন অজ্ঞ লোকের কাছে পর্যন্ত তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন আওয়াজ নেই, সাড়াশব্দ নেই—ছবি থেকে চোখ ফেরানোর সাধ্য কারও ছিল না, আর যে অসাধারণ নীরবতা তাদের সকলের মধ্যে নেমে এসেছিল, ভাষায় তার প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। এদিকে ছবির মহিমা প্রতি মুহূর্তে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর হয়ে চলেছে; ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর, আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর হয়ে এই সৃষ্টি যেন সমগ্র পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হল একটি মুহূর্তে—এ যেন শিল্পীর উপর বর্ষিত দিব্য প্রেরণার ফলশ্রুতি, এমন একটি মুহূর্ত যার জন্য সমগ্র মানবজীবন একটি আয়োজনমাত্র। ছবির চারদিকে যে-সমস্ত দর্শক ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মুখমণ্ডল বয়ে অসংযত অশ্রুধারা উদ্‌গতপ্রায়। মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত ধরনের রুচি, স্পর্ধিত, বিপথগামী যাবতীয় রুচিবিকৃতি যেন একত্রে মিলিত হয়ে দিব্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে মৌন স্তব। চার্তকোভ স্থির হয়ে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল ছবিটার সামনে। অবশেষে অল্প অল্প করে দর্শকবৃন্দ ও রসজ্ঞদের মধ্যে যখন চাঞ্চল্য জেগে উঠল, যখন তাঁরা রচনার গুণাগুণ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবং শেষকালে যখন তাকে অনুরোধ জানানো হল তার নিজের মতামত ব্যক্ত করার, তখন তার সংবিৎ ফিরে এলো। চেহারায় সে নেহাৎই সাধারণ ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল, নিঃশেষিত শিল্পীরা, নীচতাবশত যে রকম মামুলি রায় দিয়ে থাকে, সেই ভঙ্গিতে সেও যা বলতে গেল তা কতকটা এই ধরনের: 'হ্যাঁ, অবশ্যই, শিল্পীর যে প্রতিভা আছে এটা সত্যিই মানতে হয়; কিছু একটা অবশ্যই আছে; দেখা যাচ্ছে, তিনি কিছু একটা প্রকাশ করতে চান; তবে মূলে যদি প্রবেশ করা যায়...' আর

এর পরে, বলাই বাহুল্য, যে-ধরনের প্রশংসাবাণী যুক্ত হওয়ার কথা তা কোন শিল্পীর কাছেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। চার্তকোভ এটাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে পড়ল, জবাবে সে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা দমন করতে পারল না, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মাদের মতো হল্ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে সে এক মিনিটের জন্য স্থির হয়ে, শূন্য মনে দাঁড়িয়ে রইল তার জমকাল স্টুডিওর মাঝখানে। তার সমগ্র সত্তা, সমগ্র জীবনধারা এক মুহূর্তের মধ্যে জাগরিত হল, যেন তার যৌবন ফিরে এসেছে, যেন প্রতিভার নির্বাপিত স্ফুলিঙ্গ আবার জ্বলে উঠল। তার চোখের ওপরে বাঁধা পটিটা হঠাৎ খসে গেল। হা ভগবান! এমন নির্মমভাবে সে কিনা যৌবনের সেরা সময়গুলি নষ্ট করেছে; ধ্বংস করেছে, নিভিয়ে দিয়েছে এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা বুকের ভেতরে সঞ্চার করতে পারত উত্তাপ, ইতিমধ্যে বিকশিত হতে পারত পরম গৌরবে ও সৌন্দর্যে, হয়ত বা ঠিক এই ভাবেই বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয়কে বিচলিত করে অশ্রুসিক্ত করে তুলতে পারত। এই সব কিছুকে কিনা ধ্বংস করে দেওয়া, সম্পূর্ণ নির্মম ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া! মনে হল এই মুহূর্তে যেন অকস্মাৎ, দপ্ করে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল কোন এক কালের পরিচিত আবেগ ও উত্তেজনা। তুলি হাতে নিয়ে সে এগিয়ে গেল ক্যানভাসের দিকে। প্রবল প্রয়াসের ফলে তার মুখে ঘাম জমে উঠল; তার মনপ্রাণ তখন কেন্দ্রীভূত একটি বাসনায়, সে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে কেবল একটি চিন্তায়: সে অধঃপতিত দেবদূতের ছবি আঁকবে। এই আইডিয়াটি তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খায়। কিন্তু হায়! তার রূপকল্পনা, ভঙ্গি, বস্তুবিন্যাস, ভাবনাচিন্তা যেন ক্যানভাসে জোর করে চাপানো ও অসংলগ্ন মনে হল। তার তুলি ও কল্পনা ইতিমধ্যে বড় বেশি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, আর নিজের উপর নিজেরই আরোপিত এই সীমানা ও বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসার অক্ষম প্রয়াস এখন পদে পদে সূচনা করল ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতি। ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব অর্জনের পথে ধাপে ধাপে জ্ঞান ও প্রাথমিক নিয়ম শিক্ষার যে ক্লান্তিকর দীর্ঘ সোপান আরোহন করতে হয় তা সে অবজ্ঞা করে এসেছে। আক্ষেপে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। সে হুকুম দিল তার স্টুডিও থেকে সাম্প্রতিক যাবতীয় কাজ, সমস্ত নিষ্প্রাণ শৌখিন ছবি, হুসার, বনেদী মহিলা আর উচ্চপদস্থ আমলাদের পোর্ট্রেট যেন সরিয়ে ফেলা হয়। সে

নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে গৃহবন্দী হয়ে রইল এবং বলে দিল কাউকে যেন সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়; সে কাজে সম্পূর্ণ ডুবে গেল। ধৈর্যবান যুবকের মতো, শিক্ষার্থীর মতো সে কাজে বসল। কিন্তু তার তুলিতে যা বেরিয়ে আসতে লাগল তাতে ছিল অকৃতজ্ঞতার নির্মম আঘাত। নেহাৎই প্রাথমিক বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য তাকে পদে পদে থামতে হচ্ছিল; সাধারণ, তুচ্ছ যান্ত্রিক কৌশল সমস্ত আবেগকে নিরুৎসাহিত করে দিয়ে কল্পনার অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলিতে এসে যাচ্ছিল জড় রূপ, সেই একই মামুলি ভঙ্গিতে হাত দুটো ভাঁজ করা, মাথা অসাধারণ ভঙ্গিমা নিতে ভরসা পায় না, এমন কি পোশাকের ভাঁজগুলি পর্যন্ত জড়সড়, দেহের অপরিচিত ভঙ্গির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আবরণ সৃষ্টিতে অনিচ্ছুক। এটা সে অনুভব করতে পারছিল, নিজেই অনুভব করতে পারছিল, দেখতে পাচ্ছিল।

'কিন্তু আমার কি আদৌ কোন প্রতিভা ছিল?' শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি আত্মপ্রবঞ্চনা করি নি ত?' এই বলে সে এগিয়ে গেল তার আগেকার রচনাগুলির দিকে, যেগুলি এক কালে প্রাচুর্য ও আবদারের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে তার দরিদ্র খুপরিতে এত বিশুদ্ধরূপে, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সে এঁকেছিল। এখন সে সেগুলির দিকে এগিয়ে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, সেই সঙ্গে তার স্মৃতিতে জেগে উঠতে লাগল আগেকার দরিদ্র জীবনযাত্রা। 'হ্যাঁ,' সে হতাশ হয়ে বলল, 'আমার প্রতিভা ছিল। সর্বত্র, সবগুলিতে তার লক্ষণ ও চিহ্ন স্পষ্ট...'

সে থমকে দাঁড়াল, এমন সময় হঠাৎ কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ: সে দেখতে পেল এক জোড়া চোখ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা ছিল শুকিন দ্ভোর-এ কেনা সেই অসাধারণ পোর্ট্রেটটা। ছবিটা সব সময় ঢাকা থাকত, অন্যান্য ছবির গাদার মধ্যে চাপা পড়ে ছিল এবং ওটার কথা সে বিলকুল ভুলেই গিয়েছিল। এককালে যে সমস্ত শৌখিন পোর্ট্রেট ও ছবিতে তার স্টুডিও ভরে থাকত, এখন সেগুলি সব অপসারিত হতে তার যৌবনের, আগেকার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে সঙ্গে এই পোর্ট্রেটটি যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ওপরে জেগে উঠল। তার আগাগোড়া মনে পড়ে গেল এই ছবি সম্পর্কিত অদ্ভুত ঘটনা, মনে পড়ল যে এটা, এই অদ্ভুত পোর্ট্রেটটাই তার রূপান্তরের জন্য কতকটা দায়ী। এমন অলৌকিক উপায়ে গুপ্তধন

প্রাপ্তির ফলে তার মধ্যে শূন্যগর্ভ প্রেরণার জন্ম নিতেই যে বিনষ্ট হয়েছে তার প্রতিভা, একথা মনে হতেই কেমন যেন ক্ষিপ্ততা তার উপরে এসে ভর করতে উদ্যত হল। সেই মুহূর্তে সে ঘৃণিত পোর্ট্রেটটা সরিয়ে নেবার হুকুম দিল। কিন্তু তার উত্তেজিত মন এতে শান্ত হল না: সমস্ত উপলব্ধি, সমগ্র সত্তা গভীর তলদেশ পর্যন্ত ঝাঁকুনি খেল, সে অনুভব করল এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা, যে-যন্ত্রণা বিস্ময়কর ব্যতিক্রমরূপে কখনও কখনও দেখা যায় প্রকৃতির মধ্যে, যখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন প্রতিভা তার সাধ্যের সীমানা ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়; এ হল সেই যন্ত্রণা যা কোন যুবককে মহান কর্মে প্রবৃত্ত করে, কিন্তু যে-ব্যক্তি স্বপ্নচারিতার সীমানা ছাড়িয়ে যায় তার কাছে পরিণত হয় অতৃপ্ত তৃষ্ণায়; এ এক ভয়ানক যাতনা যার তাড়নায় মানুষ ভয়াবহ দুষ্কর্ম সাধনে সক্ষম হয়। সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিদারুণ ঈর্ষায়। তীব্র বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিল তার চোখেমুখে যখন সে দেখতে পেল প্রতিভার চিহ্নবহ শিল্পকর্মটি। সে দাঁত কড়মড় করতে লাগল, তার ইচ্ছে হচ্ছিল রক্তচোষা সরীসৃপের মতো চোখের দৃষ্টিতে ওটাকে গ্রাস করে ফেলে। তার মনের মধ্যে জেগে উঠল এমন এক প্রবল নারকীয় বাসনা যার সাক্ষাৎ মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ মেলে। ক্ষিপ্ত শক্তি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ বাসনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। যাবতীয় সেরা সেরা শিল্পসৃষ্টি সে কিনে নিতে শুরু করল। ছবি কেনার পর সেটাকে সে সন্তর্পণে তার ঘরে নিয়ে আসে, তারপর ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে সেটাকে ছেঁড়ে, কুটি কুটি করে, ফালাফালা করে কাটে, পদদলিত করে। যে বিপুল পরিমাণ বিত্ত সে সঞ্চয় করেছিল তা তার এই নারকীয় বাসনা মেটানোর সমস্ত উপকরণ যোগাতে লাগল। সে তার সমস্ত সোনার থলির মুখ খুলল, সিন্দুকের ডালা খুলল। এই হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিটি যত সুন্দর সুন্দর সৃষ্টি ধ্বংস করে, ইতিপূর্বে আর কখনও অজ্ঞতার কোন দানবীয় রূপের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় নি। যে-কোন নিলামের জায়গায় তার আবির্ভাব ঘটামাত্র অন্য সকলে আগে থেকেই শিল্পসৃষ্টি কেনার আশা ছেড়ে দিত। এ যেন জগতের সমস্ত সুসঙ্গতি ছিনিয়ে নেবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই রুষ্ট দেবলোক এখানে প্রেরণ করেছে এই ভয়াবহ অভিশাপটিকে। এই ভয়ানক আবেগ তার উপর ছড়িয়ে দিল কেমন যেন একটা ভয়ঙ্কর বর্ণলেপ: তার মুখের উপর এঁকে দিল স্থায়ী বিরক্তির

ভাব। তার চেহারায় আপনা থেকেই ফুটে উঠল জগতের প্রতি ঘৃণা ও অস্বীকৃতির ভাব। পুশ্‌কিন যে ভয়াল দানবের*) চরম রূপ এঁকেছিলেন, সে যেন তারই প্রতিমূর্তি। তার মুখে বিষাক্ত কথা আর অবিরাম নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই উচ্চারিত হয় না। পথে তার সাক্ষাৎপ্রাপ্তি যেন হার্পিদানবীর*) মুখোমুখি হওয়া। তার পরিচিত সমস্ত লোকজন পর্যন্ত তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এ ধরনের সাক্ষাৎকার এড়ানোর চেষ্টা করত, তারা বলত যে এহেন সাক্ষাৎকার অতঃপর দিনটাকে বিষিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

জগতের এবং শিল্পেরও সৌভাগ্য বলতে হবে যে এমন সঙ্কটজনক ও জোরজবরদস্তির জীবন দীর্ঘকাল চলা সম্ভব হল না: কামনার বিস্তার তার ক্ষীণ শক্তির পক্ষে বড় বেশি অশোভন ও প্রচণ্ড ছিল। ক্ষিপ্ততায় ও উন্মত্ততায় সে ঘন ঘন আক্রান্ত হয়ে পড়তে লাগল এবং অবশেষে সব মিলে তা অতি ভয়ানক অসুস্থতার আকার ধারণ করল। প্রচণ্ড স্নায়বিক জ্বরবিকার, সেই সঙ্গে অতি দ্রুত অগ্রসরমান ক্ষয়রোগ তার উপর এমন প্রবল ভাবে হানা দিল যে তিন দিনে তার দেহ পূর্বতন সত্তার ছায়ামাত্রে পরিণত হল। এর সঙ্গে যুক্ত হল মারাত্মক পাগলামীর যাবতীয় লক্ষণ। কখনও কখনও কয়েকজনে মিলেও তাকে ধরে রাখতে পারত না। সে মনে মনে দেখতে পেত অসাধারণ পোর্ট্রেটটির বহুকালের বিস্মৃত জীবন্ত চোখজোড়া, আর তখন তার ক্ষিপ্ততা হয়ে উঠত ভয়ানক। তার শয্যা ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে থাকত তাদের সকলকেই তার মনে হত যেন ভয়াবহ পোর্ট্রেট। তার চোখে সেই পোর্ট্রেট হয়ে উঠত দুটো, দুটো থেকে চারটে এবং দেখতে দেখতে মনে হত যেন গোটা দেয়াল জুড়ে ঝুলছে পোর্ট্রেট আর পোর্ট্রেট; তাদের স্থির, জীবন্ত দৃষ্টি যেন বিদ্ধ করছে তাকে। ভয়ঙ্কর পোর্ট্রেটগুলি তাকাচ্ছে ছাদের কড়িকাঠ থেকে, মেঝে থেকে, আর এই স্থির চোখগুলির আরও স্থান সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে যেন ঘর প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে, অবিরাম বাড়ছে আর বাড়ছে। তার চিকিৎসার ভার যিনি নিয়েছিলেন সেই ডাক্তার ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বার তার অদ্ভুত বৃত্তান্ত শোনার পর তার জীবনের ঘটনা ও কল্পিত অপমূর্তির মধ্যে গোপন সম্পর্ক খুঁজে বার করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই বার করতে পারলেন না। রোগী নিজের মর্মবেদনা ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারছিল না, উপলব্ধি করতে পারছিল না, তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল কেবল ভয়ঙ্কর বিলাপ আর অসংলগ্ন কথা।

অবশেষে চরম অথচ ভাষাহীন যন্ত্রণার প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। তার মৃতদেহ দেখতে হল ভয়ঙ্কর। তার বিপুল সম্পদেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না; তবে কোটি কোটি টাকা মূল্যের মহৎ শিল্পকর্মের ছিন্নভিন্ন টুকরো দেখে লোকে বুঝতে পারল কী ভয়ানক কাজে ব্যয়িত হয়েছে সে সম্পদ।

দ্বিতীয় খণ্ড

অসংখ্য জুড়িগাড়ি, ছেকরা গাড়ি ও ফিটনগাড়ি একটা বাড়ির প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির ভিতরে নিলামে বিক্রি হচ্ছিল কোন এক ধনী শিল্পরসিকের সম্পত্তি। ইনি তাঁদেরই একজন যাঁরা সারাটা জীবন পবনদেব আর মদনদেবতাদের মাঝখানে মধুর তন্দ্রায়*) নিমগ্ন হয়ে থাকেন, যাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন এবং এর জন্য তাঁদের বিচক্ষণ পিতৃপুরুষের সঞ্চিত, এমনকি প্রায়শ তাঁদের নিজেদের শ্রমে অর্জিত কোটি কোটি টাকা মুক্ত হস্তে ব্যয় করে থাকেন। বলাই বাহুল্য এ ধরনের শিল্পকলা-পৃষ্ঠপোষক আজ আর নেই, আমাদের এই ঊনবিংশ শতাব্দী বহুকাল হল পরিণত হয়েছে বিরসবদন মহাজনে, যার একমাত্র পরিতৃপ্তি কেবল কাগজের উপর লেখা অঙ্কের আকারে নিজের কোটি কোটি মুদ্রায়। দীর্ঘ হলঘরটি বহু বিচিত্র বর্ণময় আগন্তুকের ভিড়ে ছেয়ে গেছে — যেন ভাগাড়ে শকুন পড়েছে। তাদের মধ্যে আছে নীলরঙের জার্মান কোট পরনে রুশ ব্যবসায়ীরা — বড় দোকানপাড়ার, এমনকি পুরনো বাজারের ব্যবসায়ীদের পুরো একটা দঙ্গল। এই পরিবেশে তাদের চেহারা ও হাবভাব অনেকটা যেন দৃঢ় প্রত্যয়শীল ও স্বচ্ছন্দ; রুশী ব্যবসায়ী যখন নিজের দোকানে খরিদ্দারকে আপ্যায়ন করে তখন তার মধ্যে সচরাচর যে গদগদ কৃতার্থম্মন্য ভাব দেখা যায় এখানে তার কোন চিহ্ন ছিল না। এই হলঘরে এমন অসংখ্য অভিজাত লোকজন ছিল, অন্য জায়গা হলে যাদের সামনে বিনীত প্রণামের ঘটায় তারা নিজেদেরই হাইবুট-বাহিত ধূলিকণা ঝাঁট দিতে ইতস্তত করত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে তারা কাউকে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিল না। এখানে তারা একেবারেই বাধাবন্ধনমুক্ত, শিষ্টাচারের কোন বালাই না রেখে পণ্যদ্রব্যের

গুণাগুণ জানার বাসনায় বইপুঁথি ও ছবি হাতড়ে হাতড়ে দেখছিল এবং বুক ফুলিয়ে কাউণ্ট খেতাবধারী শিল্পরসজ্ঞদের দরের উপর দর হাঁকছিল। এখানে ছিল নিলামের অবশ্যম্ভাবী এমন বহু আগন্তুক যারা প্রাতরাশের বদলে রোজ নিলামে গিয়ে ধরনা দেয়; ছিল অভিজাত শ্রেণীর রসজ্ঞ, যারা নিজেদের সংগ্রহ বৃদ্ধি করার একটি সুযোগও হাতছাড়া না করা তাদের অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করত এবং যারা বেলা বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত করার মতো আর কোন কাজ খুঁজে পেত না; এছাড়া ছিল সেই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী যাদের পোশাক ও পকেট বড়ই দৈন্যদশাগ্রস্ত, যারা লেশমাত্র স্বার্থপ্রণোদিত না হয়ে প্রতিদিন হাজির হয় — তবে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কোন্ ব্যাপার কোথায় গিয়ে গড়ায়, কে বেশি দর দেয়, কে কম হাঁকে, কে কার উপর দাম চড়ায়, কে কোন্ জিনিস পায় ইত্যাদি লক্ষ করা। বহুসংখ্যক ছবি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল; সেগুলির সঙ্গে একাকার হয়ে ছিল আসবাবপত্র, আর সেই সঙ্গে বাঁধানো মলাটের গায়ে পূর্বতন মালিকের আদ্যক্ষর-আঁকা বইপুঁথি, সেদিকে সপ্রশংস দৃষ্টিপাতের মতো বিন্দুমাত্র কৌতূহলও সম্ভবত পূর্বতন মালিকের ছিল না। চীনদেশীয় ফুলদানি, টেবিলের জন্য মার্বেলপাথরের ফলক, গ্রিফিন ও স্ফিংক্সের মূর্তি এবং সিংহের থাবায় সাজানো, বাঁকাচোরা ভঙ্গির পুরনো ও নতুন, গিল্টি-ছাড়া ও গিল্টি-লাগানো আসবাবপত্র, ঝাড়লণ্ঠন ও পিলসুজ — সব ছিল স্তূপ করা, দোকানে যেমন সাজানো গোছানো থাকে সে রকম আদৌ নয়। সব মিলে শিল্পকলার কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। সচরাচর নিলামে আমাদের যে অনুভূতি জাগে তা ভীতিপ্রদ: তার মধ্যে অনেকটা যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায়। যে হলঘরে নিলাম ডাকা হয় সেটা সব সময় কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার; জানলাগুলি আসবাবপত্র ও ছবিতে ঠেসাঠেসি হয়ে থাকায় ঘরের মধ্যে আলো তেমন একটা প্রবেশ করতে পারে না, লোকের চোখেমুখে থমথমে নিস্তব্ধতার ভাব, নিলামদার অন্ত্যেষ্টিমন্ত্রোচ্চারণসুলভ কণ্ঠে হাঁক দিয়ে হাতুড়ি ঠোকে, অদ্ভুত গতিকে যে-সমস্ত হতভাগ্য শিল্পনিদর্শন এখানে এসে পড়েছে সেগুলির উদ্দেশ্যে সে উচ্চারণ করে অন্ত্যেষ্টিস্তোত্র। এ সমস্তই যেন অদ্ভুত অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়াকে অনেক বেশি তীব্র করে তোলে।

নিলাম পুরোদমে চলছিল বলেই মনে হয়। ভদ্র লোকজনের গোটা একটা দল একসঙ্গে ভিড় করে সামনে এগিয়ে এসেছে, প্রত্যেকে উত্তেজিত ভাবে

একে অন্যের উপর দর হাঁকছিল। চতুর্দিক থেকে শোনা যেতে লাগল 'রুব্ল, রুব্ল, রুব্ল' হাঁক; নিলামদার প্রস্তাবিত দরের উল্লেখ পর্যন্ত করার ফুরসৎ পেল না, অমনি দেখতে দেখতে প্রথম ডাকের চারগুণ চড়ে গেল। চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে লোকজন দর হাঁকছিল একটা পোর্ট্রেটের জন্য। চিত্রকলা সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র বোধ আছে, এই পোর্ট্রেটটি তাকে বিচলিত না করে পারে না। শিল্পীর তুলির উঁচু মানের টান এতে প্রত্যক্ষ। পোর্ট্রেটটার ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার সংস্কার সাধন ও নবরূপ প্রাপ্তি ঘটেছে — এতে আঁকা ছিল ঢিল্য আলখিল্লাধারী কোন এক এশীয়র শ্যামবর্ণ চেহারা। অদ্ভুত তার মুখের অভিব্যক্তি, কিন্তু চারপাশের লোকজনকে যেটা সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করেছিল তা হল তার অসাধারণ জীবন্ত চোখজোড়া। যত বেশি করে তার দিকে তাকানো যায় ততই যেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চোখদুটি প্রত্যেকের অন্তর ভেদ করতে থাকে। এই অস্বাভাবিকতা, শিল্পীর এই অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রায় সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছবিটার জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে পিছিয়ে গেছে কেননা দর অবিশ্বাস্য রকমের চড়ে গেছে। এখনও ক্ষান্ত হন নি দু'জন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, চিত্রকলাপ্রেমী — দু'জনের কেউই কোন মতে ছবিটা হাতছাড়া করতে রাজী নন। তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন এবং দর হয়ত মাত্রাতিরিক্ত চড়িয়েও বসতেন, কিন্তু এমন সময় সমবেত দর্শকদের মাঝখান থেকে একজন ঘোষণা করলেন:

'যদি অনুমতি করেন, আপনাদের বাদপ্রতিবাদ সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখতে বলি। আমার মনে হয় সম্ভবত অন্য যে কারও চেয়ে পোর্ট্রেটটার ওপর আমার দাবি বেশি।'

এই কথায় সকলের দৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ল মানুষটির উপর। সুঠাম গড়ন, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, দীর্ঘ, কালো রঙের কোঁকড়া চুল তাঁর। এক ধরনের প্রশান্ত ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত তাঁর প্রীতিকর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাচ্ছিল যাবতীয় ক্লান্তিকর শৌখিনতার চমক বিবর্জিত এক মানুষের আত্মা; তাঁর বেশভূষায় ফ্যাশনের কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না: সবকিছু মিলে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠছিল একজন আর্টিস্টের পরিচয়। ইনি সত্যি সত্যিই শিল্পী — শিল্পী ব., উপস্থিত লোকজনের অনেকেই যাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে।

'আমার কথাগুলো আপনাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকতে পারে,' সকলের

মনোযোগ তাঁর উপর এসে পড়েছে দেখে তিনি বলে চললেন, 'কিন্তু আপনারা যদি একটা ছোট বৃত্তান্ত ধৈর্য ধরে শুনতে রাজী থাকেন তাহলে হয়ত দেখতে পাবেন যে আমি কোন ভুল কথা বলি নি। সমস্ত লক্ষণ থেকে আমি নিশ্চিত যে এটাই হল সেই পোর্ট্রেট, এত দিন আমি যার সন্ধান করছিলাম।'

উপস্থিত প্রায় সকলের চোখমুখ স্বভাবতই তীব্র কৌতূহলে উদ্দীপিত হয়ে উঠল, খোদ নিলামদারের মুখ পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল, তার হাতের হাতুড়ি উঠতে উঠতে থেমে গেল, সেও শোনার জন্য প্রস্তুত হল। বৃত্তান্তের শুরুতে অনেকেরই দৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবে পোর্ট্রেটটার ওপর গিয়ে পড়ে, কিন্তু পরে বিবরণকারীর বৃত্তান্ত যত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে লাগল, ততই সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে পড়ল একমাত্র তাঁর ওপর।

'শহরের যে অংশের নাম কলোম্না, সেটা আপনাদের পরিচিত।' এই বলে তিনি শুরু করলেন। 'এখানে সবকিছুই সেণ্ট পিটার্সবুর্গের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা ধরনের; এটা না রাজধানী, না মফস্বল শহর; কলোম্নার রাস্তায় প্রবেশ করলে অনুভব করবেন যেন যৌবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ এখানে পদার্পণ করে না, রাজত্ব করে আখণ্ড নীরবতা ও অবসর এবং রাজধানীর গতিচাঞ্চল্যের থিতানো ক্ষীণ রেশটুকু। এখানে বসবাস করতে আসে অবসরভোগী আমলারা, বিধবারা, স্বল্পবিত্তবান লোকজন, সিনেটের বিচারবিভাগের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে — আর সেই কারণে নিজেদের দণ্ডস্বরূপ যারা এখানে প্রায় সারাটা জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে; আসে চাকুরী পর্বের শেষে রাঁধুনিরা — সারা দিন ধরে তারা লক্ষ্যহীন ভাবে বাজারে ঘুরে বেড়ায়, খুচরো দোকানে চাষাভুষোদের সঙ্গে এটা ওটা আবোল-তাবোল বকবক করে এবং রোজকার খুচরো খরিদ পাঁচ কোপেকের কফি ও চার কোপেকের চিনি কেনে, আর আসে গোটা এক শ্রেণীর লোক যাদের এক কথায় নাম দেওয়া যায় পাঁশুটে — এদের পোশাক-পরিচ্ছদে, চোখেমুখে, চুলে কেমন যেন একটা ছাই-ছাই ভাব আছে — যেমন হতে পারে দিনের বেলায়, আকাশে যদি কখনও না ওঠে ঝড়, না থাকে সূর্য — নেহাৎই না এদিক, না ওদিক অবস্থা: কুয়াসা এসে থিতিয়ে বসে, বস্তুর যাবতীয় তীক্ষ্নতা মিলিয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। এই শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে আছে থিয়েটারের অবসরভোগী কর্মচারী, অবসরভোগী চুনোপুঁটি কেরানিরা,

রণদেবতার অবসরভোগী মানসসন্তানেরা, যাদের একটা চোখ খুবলানো, ঠোঁট কাটা। এই লোকগুলি একেবারেই নির্লিপ্ত ধরনের: চলাফেরার সময় ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না, কোন কথা বলে না, কিছু ভাবে না। তাদের ঘরে সম্বল বলতে বিশেষ কিছু মিলবে না; কখনও কখনও মিলবে নেহাৎই এক পাঁইট খাঁটি ভোদ্‌কা, যা তারা বৈচিত্র্যহীন ধারায় সারা দিন ধরে চুকচুক করে টেনে চলে; আর সেই কারণেই মেশ্চান্‌স্কায়া স্ট্রীটের বেপরোয়া তরুণ জার্মান কারিগরটি যে রকম প্রবল উচ্ছ্বাসে সচরাচর রবিবার-রবিবার ভোদ্‌কা সেবন করতে ভালোবাসে এবং রাত বারোটা পেরোলেই হয়ে পড়ে গোটা ফুটপাথের একছত্র অধিপতি, এক নিশ্বাসে ভোদ্‌কা সেবনের সেই জাতীয় কোন প্রতিক্রিয়াও তাদের মস্তিষ্কে জাগে না।

'কলোম্‌নার জীবনযাত্রা ভয়ঙ্কর নির্জন: জুড়িগাড়ি কদাচিৎ চোখে পড়ে; একমাত্র ব্যতিক্রম হল যাতে চেপে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যায়, আর সেই গাড়ির ঘর্ঘর, ঝনঝন ও টুংটাং আওয়াজ সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতাকে কেবল ভেঙে খানখান করে দেয়। এখানে পদযাত্রীদের রাজত্ব; কালেভদ্রে মন্থর গতিতে চলে ঘোড়ার গাড়ি—তাও যাত্রিহীন, বয়ে নিয়ে চলে মরকুটে ঘোড়ার জন্য খড়ের বোঝা। মাসে পাঁচ রুব্‌ল ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যায় — এমন কি সকালের কফিসমেত। এখানে সেরা অভিজাত সম্প্রদায় বলতে পেনসনভোগিনী বিধবারা; তাদের আচার-আচরণ বেশ ভালোই, তারা প্রায়ই নিজেদের ঘরদোর ঝাঁট দেয়, বান্ধবীদের সঙ্গে গোরুর মাংস ও বাঁধাকপির চড়া দাম নিয়ে আলাপ করে। তাদের সম্বল বলতে প্রায়ই থাকে অল্পবয়সী কন্যা, শান্তশিষ্ট, কখনও কখনও সুশ্রী প্রকৃতির জীব, খেঁকি কুকুর আর একটি দেয়াল ঘড়ি, যার পেণ্ডুলামের টিক্‌ টিক আওয়াজে ঝরে পড়ছে বিষণ্ণতা। এর পরের স্তরে আছে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, যাদের আয় এতই কম যে কলোম্‌নার বাইরে যাবার সামর্থ্য তারা রাখে না; এরা মুক্ত মানুষ, যেমন হয়ে থাকে সমস্ত মঞ্চশিল্পীরা। আমোদ-প্রমোদের জন্যই এদের জীবনধারণ। এরা ড্রেসিংগাউন পরে বসে বসে পিস্তল মেরামত করে, কার্ডবোর্ড জোড়া দিয়ে এটা-ওটা টুকিটাকি জিনিস বানায়, বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে ঘুঁটি কিংবা তাস খেলে — এই ভাবে কাটে তাদের সকালটা, আর বলতে গেলে সন্ধ্যাটাও, কেবল কখন-সখন এর সঙ্গে এসে জোটে পাঞ্চ। কলোম্‌নার এসমস্ত হোমরা-চোমরা আর অভিজাত সম্প্রদায়ের পরে যাদের উল্লেখ করতে হয় তারা হল নগণ্য, ইতরজন। তাদের তালিকা

দেওয়া কঠিন, যেমন কঠিন পুরনো গাঁজলায় উৎপন্ন অসংখ্য কীটের সংখ্যা নির্ধারণ করা। এদের মধ্যে আছে বুড়িরা, যারা পুজো-আর্চা করে; বুড়িরা, যারা পান করে; এমন সমস্ত বুড়িও আছে যারা পুজো-আর্চা করে আবার পানও করে; আছে বুড়িরা, যারা রহস্যজনক উপায়ে জীবনধারণ করে; তারা কালিন্‌কিন ব্রিজ থেকে পুরনো বাজারে পিঁপড়েদের মতো টেনে নিয়ে চলে পুরনো নেকড়া ও কাপড়চোপড়, সেখানে পনেরো কোপেকে সেগুলি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে; এক কথায়, মানবজাতির পরম হতভাগ্য অংশ, তলানিবিশেষ, যাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায় কোন পরম হিতৈষী অর্থনীতিজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়।

'এদের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল এটাই দেখানো যে এই শ্রেণীর লোকজনকে প্রায়ই কোন-না-কোন আকস্মিক সাময়িক সাহায্যের সন্ধানে অথবা ঋণের ভরসায় থাকতে হয়; আর এরই ফলে তাদের মাঝখানে বসত পাতে বিশেষ ধরনের মহাজন সম্প্রদায়, যারা বন্ধকের বিনিময়ে এবং চড়া সুদে স্বল্প পরিমাণ অর্থের সংস্থান করে দেয়। এই চুনোপুঁটি মহাজনরা যে-কোন রাঘব বোয়াল মহাজনের তুলনায় অনেক বেশি নির্দয় হয়ে থাকে, কেননা তাদের উদ্ভব যে দারিদ্র্যপীড়িত ও চরম দুর্দশাগ্রস্ত পরিবেশের মধ্যে তা ধনী মহাজনের চোখে পড়ে না, যেহেতু তার সম্পর্ক কেবল সেই জাতের লোকজনের সঙ্গে যারা জুড়িগাড়ি চেপে আসে। এই কারণে চুনোপুঁটিদের মন থেকে বেশ আগে থাকতেই যাবতীয় মানবিক অনুভূতি অন্তর্ধান করে। এই ধরনের মহাজনদের মধ্যে ছিল একজন... কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো, যে-ঘটনার কথা আমি বলতে চলেছি, তা ঘটেছিল গত শতাব্দীতে, আমাদের স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় একাতেরিনার রাজত্বকালে। বুঝতেই পারছেন যে কলোম্‌নার খোদ চেহারার, এবং তার অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার এখন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মহাজনদের মধ্যে ছিল একজন — সর্বতোপ্রকারে এক অসাধারণ জীব; বহুকাল আগে সে শহরের এই অংশে এসে বসত পাতে। লোকটা চলাফেরা করত ঢিলা এশীয় পোশাকে; মুখের পোড়া রঙ দেখে বোঝা যেত সে দক্ষিণের কোন দেশের লোক হবে, কিন্তু ভারতীয়, গ্রীক না পারসিক — ঠিক কোন্ জাতের তা কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারত না। দীর্ঘ, প্রায় অসাধারণ দীর্ঘ তার আকৃতি, তামাটে, শীর্ণ, ঝলসানো মুখ এবং কেমন যেন দুর্বোধ্য, ভয়ঙ্কর তার বর্ণ, অসাধারণ আগুনের গোলার মতো বড় বড় চোখ, ঝুলে পড়া ঘন

ভুরু — রাজধানীর আর সব পাঁশুটে বাসিন্দাদের থেকে তাকে রীতিমতো বিশিষ্ট করে তোলে। তার বাসস্থানটিও আর দশটা ছোট কাঠের বাড়ির মতো ছিল না। বাড়িটা ছিল পাথরের তৈরি — জেনোয়াদেশীয় সদাগরেরা যে রকম বাড়ি এক কালে প্রচুর সংখ্যক বানিয়েছিল, অনেকটা সেই ধরনের— রীতিবিরুদ্ধ, বেমানান আকারের জানলা, লোহার খড়খড়ি ও খিল। অন্যান্য মহাজনের সঙ্গে এই মহাজনটির পার্থক্য এখানেই ছিল যে সে নিঃসম্বল বুড়ি থেকে শুরু করে অমিতব্যয়ী সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ পর্যন্ত যে কাউকে যে-কোন পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে পারত। তার বাড়ির সামনে প্রায়ই দেখা যেত চোখ ধাঁধানো ঝকঝকে যত ঘোড়ার গাড়ি, গাড়ির জানলা দিয়ে অনেক সময় উঁকি মারত শৌখিন সমাজের জমকাল মহিলার মাথা। সঙ্গত কারণেই জনরব রটে যায় যে তার সিন্দুকগুলি অগাধ পরিমাণ টাকাপয়সা, ধনরত্ন, মণিমুক্তা ও নানা ধরনের বন্ধকী জিনিসে ভর্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য মহাজনসুলভ লোলুপতা তার আদৌ ছিল না। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টাকা দিত, পরিশোধের যে মেয়াদ ও শর্ত নির্ধারণ করে দিত তা রীতিমতো লাভজনক বলেই মনে হত; কিন্তু কোন এক অদ্ভুত আঙ্কিক কৌশলে সুদের পরিমাণ হয়ে দাঁড়াত অত্যধিক। অন্তত জনরব এটাই ছিল। কিন্তু যেটা সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল এবং যা অনেককে অবাক না করে পারত না তা হল যারা তার কাছ থেকে টাকা পেত তাদের অদ্ভুত পরিণতি: তাদের প্রত্যেকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত শোচনীয় উপায়ে। এটা নিছকই লোকের ধারণা, অর্থহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গালগল্প, না ইচ্ছাকৃত রটনা — জানা যায় না। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে সকলের চোখের সামনে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল সেগুলিকে জলজ্যান্ত ও চমকপ্রদ দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করতে হয়।

'তৎকালীন অভিজাত সমাজের মধ্যে শিগগিরই সদ্বংশের এক যুবক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুবক অল্প বয়সেই রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করে, যা কিছু সত্য ও উদাত্ত সে ছিল তার একনিষ্ঠ পূজারী, মানুষের বুদ্ধি ও শিল্পসৃষ্টির প্রতি তার ছিল প্রবল অনুরাগ, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শিল্প-পৃষ্ঠপোষকের সমস্ত লক্ষণ তার মধ্যে ছিল। অচিরেই স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে সে তার গুণের যোগ্য সমাদর লাভ করল, সম্রাজ্ঞী তাকে নিয়োগ করলেন তার নিজস্ব দাবির সম্পূর্ণ উপযোগী এক গুরুত্বপূর্ণ পদে, যে পদে থেকে সে জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য এবং সাধারণ ভাবে লোকের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করতে পারে। সম্ভ্রান্ত যুবকটির

চারধারে এসে জুটলেন শিল্পী, কবি ও বিদ্বৎমণ্ডলী। তার ইচ্ছে হত সকলকে কাজ দেয়, সকলের প্রেরণা যোগায়। সে নিজের খরচে বহু সংখ্যক প্রয়োজনীয় প্রকাশনের উদ্যোগ নিল, এখানে ওখানে বহু জিনিসের ফরমাস দিল, উৎসাহদানের জন্য পুরস্কারাদি ঘোষণা করল। এই ব্যাপারে তার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত সে ভেঙে পড়ল। কিন্তু মহৎ কর্মের প্রেরণা তখনও তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। হাল ছেড়ে দিতে সে নারাজ, সে সর্বত্র ঋণের জন্য খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, এবং শেষকালে শরণাপন্ন হল আমাদের পূর্বপরিচিত মহাজনটির। মহাজনের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের পর স্বল্প কালের মধ্যে এই ব্যক্তিটির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল: প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান লোকজনের উপর সে নিগ্রহ ও উৎপীড়ন চালাতে লাগল। সমস্ত রচনার মধ্যে সে দেখতে শুরু করল খারাপ দিক, প্রতিটি শব্দের অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করল। সেই সময় দুর্ভাগ্যবশত ফরাসী বিপ্লব ঘটল। এই ঘটনা হঠাৎ তার কাছে যত রকমের সম্ভব ঘৃণ্য আক্রমণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত কিছুর মধ্যে সে একটা না একটা বিপ্লবী প্রবণতা দেখতে শুরু করল, সর্বত্র পেতে লাগল শ্লেষের আভাস। সে এত দূর সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ল যে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই সন্দেহ করতে লাগল, ভয়ানক ভয়ানক, অন্যায় অভিযোগ লিখতে শুরু করল, বহু লোকের দুর্গতির কারণ হয়ে দেখা দিল। বলাই বাহুল্য এ ধরনের সংবাদ শেষকালে সিংহাসন পর্যন্ত না পেঁছুনোর কোন কারণ ছিল না। আমাদের মহীয়সী সম্রাজ্ঞী আঁতকে উঠলেন এবং রাজমুকুটধারীদের অলঙ্করণোপযোগী মহত্ত্বে আপ্লুত হৃদয়ে তিনি এক ভাষণ দান করলেন। ভাষণের যথাযথ শব্দগুলি আমাদের কাছে এসে পেঁছুতে পারে নি বটে, কিন্তু তার গভীর তাৎপর্য অনেকের মনে ছাপ ফেলেছিল। সম্রাজ্ঞী মন্তব্য করেন: রাজতন্ত্রী শাসনে আত্মার উন্নত ও মহৎ প্রেরণা অবদমিত হয় না, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, কাব্য ও শিল্পসৃষ্টি উপেক্ষিত ও নির্যাতিত হয় না; বরং তার বিপরীত, — একমাত্র রাজারাই ছিলেন তাদের পৃষ্ঠপোষক; সেক্সপীয়র ও মলিয়েরের মতো প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে তাঁদেরই রক্ষণাবেক্ষণে, অথচ দান্তে তাঁর প্রজাতন্ত্রী স্বদেশে কোন ঠাঁই পান নি; যথার্থ প্রতিভার জন্ম হয় তখনই যখন জাতি এবং জাতির প্রভুরা ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার তুঙ্গে অবস্থান করেন, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও প্রজাতন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের আমলে তা ঘটতে পারে না — আজ পর্যন্ত পৃথিবী একটি

কবিও সেখান থেকে উপহার পায় নি। কবি ও শিল্পীদের কদর দেওয়া দরকার, কেন না তাঁরা উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সঞ্চার না করে মানুষের মনে আনে কেবল শান্তি ও পরম প্রশান্তি; জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, কবি এবং শিল্পকলার প্রবক্তারা সকলেই হলেন আসলে রাজমুকুটের হীরামুক্তামাণিক্য: তাঁরা সার্বভৌম অধিপতির রাজত্বকালের সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। এক কথায়, এই কথাগুলি উচ্চারণের মুহূর্তে সম্রাজ্ঞী বিরাজ করছিলেন তাঁর দিব্য মহিমায়। আমার মনে আছে, প্রাচীনেরা এর উল্লেখ করতে গিয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এই মামলায় সকলেই জড়িয়ে পড়ল। আমাদের জাতীয় গর্বের খাতিরে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রুশী হৃদয়ে সর্বদাই নিপীড়িতের পক্ষ অবলম্বনের অপূর্ব প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি তাঁর উপর অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পেলেন, তিনি পদচ্যুত হলেন। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ শাস্তি তিনি পাঠ করলেন তাঁর স্বদেশবাসীদের অভিব্যক্তিতে। তা ছিল সর্বসাধারণের প্রবল ধিক্কার। আত্মম্ভরী হৃদয়ের সেই কষ্ট অবর্ণনীয়; অহঙ্কার, প্রতারিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশাভঙ্গ — সব একত্রে এসে মিলল এবং ভয়ংকর উন্মত্ততা ও ক্ষিপ্ততায় আক্রান্ত হয়ে অবশেষে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

'সকলের মনে রাখার মতো আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের আবির্ভাব ঘটল: আমাদের উত্তরের মহানগরীতে তখন সুন্দরীর কমতি না থাকলেও তাদের মধ্যে একজন বিশেষ করে সকলের ওপর টেক্কা মারে। এই সুন্দরীটি ছিল যেন দক্ষিণের দীপ্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের উত্তরের সৌন্দর্যজ্যোতির এক আশ্চর্য সমন্বয়, জগতের দুর্লভ রত্ন। আমার বাবা স্বীকার করেন যে তিনি তাঁর সারা জীবনে কদাচ এর কোন তুলনা দেখতে পান নি। সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মার মাধুর্য — সব যেন তার মধ্যে এসে মিলেছে। পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল অগণিত, আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে অসামান্য ছিলেন প্রিন্স র. — তরুণদের সকলের সেরা, পরম সম্ভ্রান্ত — কী চেহারায়, কী ঔদার্যে, বীরধর্মে তিনি ছিলেন অতুলনীয়, নারীদের ও গল্প-উপন্যাসের পক্ষে আদর্শের পরাকাষ্ঠা, সর্বতোভাবে একজন গ্র্যান্ডিসন*[1]। প্রিন্স র. পাগলের মতো, প্রচণ্ড ভাবে প্রেমে পড়লেন; প্রতিদানে তিনিও লাভ করলেন ঐ একই ধরনের দীপ্ত প্রেম। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের কাছে এই জুটি অসমান বলে মনে হল। কৌলিক ভূসম্পত্তির অধিকার প্রিন্স বহুকাল হল

হারিয়েছেন, তাঁর বংশমর্যাদা আর নেই, তাঁর অবস্থা যে শোচনীয় এ সংবাদও কারও অজানা নয়। হঠাৎ প্রিন্স কিছু দিনের জন্য রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন — ভাবটা এই যেন বিষয়াদির সুব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন; স্বল্পকাল বাদেই তিনি ফিরে এলেন অবিশ্বাস্য রকমের জাঁকজমক ও গৌরবে পরিবৃত হয়ে। জমকাল বলনাচের আসর আর উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তিনি রাজদরবারে খ্যাতি অর্জন করলেন। সুন্দরীর পিতৃদেব প্রসন্ন হলেন, ফলে শহরে এক অতি আকর্ষণীয় বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হল। পাত্রের অবস্থার এমন পরিবর্তন এবং অতুল বিভব কোথা থেকে এলো তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভবত কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব ছিল না; তবে লোকে আড়ালে বলাবলি করতে লাগল যে তিনি এক রহস্যময় মহাজনের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। সে যাই হোক না কেন, গোটা শহর এই বিয়েতে মেতে উঠল। পাত্র-পাত্রী দু'জনেই হল সাধারণের ঈর্ষার বস্তু। তাদের গাঢ়, একনিষ্ঠ প্রেম, নিরুপায় দু'পক্ষের দীর্ঘকালীন ব্যাকুল প্রতীক্ষা, দু'জনের পরম গুণাবলী কারও অজানা ছিল না। অত্যুৎসাহী মহিলারা আগে থাকতে নববিবাহিত দম্পতীর স্বর্গসুখ উপভোগের রঙিন ছবি আঁকল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা গড়াল অন্য রকম। এক বছরের মধ্যে স্বামীর চরিত্রের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটে গেল। এতকাল যে চরিত্র ছিল মহৎ ও উদার তা সন্দেহ, ঈর্ষা, অসহিষ্ণুতা ও সদা বিরক্তির বিষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন স্বৈরাচারী, তাঁর স্ত্রীকে উৎপীড়ন করতে লাগলেন এবং যে কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, চূড়ান্ত অমানুষিক আচরণের পরিচয় দিলেন — স্ত্রীকে প্রহার পর্যন্ত করতে লাগলেন। এই কিছুকাল আগেও যে মহিলার এত জৌলুস ছিল, আজ্ঞানুবর্তী স্তাবকের বিরাট দল যাকে অনুসরণ করত, এক বছরের মধ্যে তাকে আর চেনার উপায় রইল না। অবশেষে নিজের এই দুর্ভাগ্য আর সহ্য করতে না পেরে সে-ই প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব দিল। একথার উল্লেখমাত্র স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্ষিপ্ততার প্রথম ধাক্কায় তিনি ছুরি হাতে স্ত্রীর ঘরে হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন, তৎক্ষণাৎ তাকে ছুরি মেরেও বসতেন যদি না অন্যেরা ধরে থামিয়ে দিত। উন্মত্ততা ও হতাশার ঘোরে তিনি ছুরিটা নিজের দিকে ঘোরালেন এবং অতি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেলেন।

'গোটা সমাজের চোখের উপর সংঘটিত এই দুটি ঘটনা বাদেও লোকে

নীচু শ্রেণীর মধ্যে সংঘটিত এমন অসংখ্য ঘটনার কথা বলে যার প্রায় সবগুলিরই পরিণতি ছিল ভয়ানক। সৎ ও প্রকৃতিস্থ লোকেরা মদ্যপ হয়ে পড়ে; এক দোকান-কর্মচারী তার মালিকের তহবিল তছরূপ করে; একজন গাড়োয়ান বহু বছর সৎ ভাবে গাড়ি চালিয়ে জীবিকা অর্জনের পর একদিন সামান্য কয়েকটি কপর্দকের জন্য এক সওয়ারীকে খুন করে বসল। এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ অনেক সময়ই অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেত, ফলে কলোম্‌নার সাদাসিধে অধিবাসীদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার না করে পারত না। অশুভ শক্তির উপর লোকটার অধিকার সম্পর্কে কারও সন্দেহ রইল না। লোকে বলাবলি করত সে এমন শর্ত আরোপ করত যাতে মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় এবং পরে হতভাগ্য ব্যক্তির আর কখনই সাধ্য হত না তা অন্য কারও ওপর চালান করার; শোনা যেত যে তার টাকার নাকি সর্বনাশা শক্তি আছে, তা নাকি আপনা-আপনি গনগনে হয়ে ওঠে আর কেমন যেন সব অদ্ভুত লক্ষণ ধারণ করে... এক কথায়, নানা উদ্ভট উদ্ভট কথা শোনা যেত। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে কলোম্‌নার সমস্ত অধিবাসী, গরিব বুড়ি, নগণ্য সরকারী কর্মচারী ও ছোটখাটো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গোটা এই জগৎটা, অর্থাৎ যে চুনোপুঁটিদের উল্লেখ আমরা এই মাত্র করলাম, তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে ভয়ংকর মহাজনটির শরণাপন্ন হওয়ার চেয়ে চরম দুঃখদুর্দশা ভোগ করা ও সহ্য করা ভালো; এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় বুড়িদের মরতেও দেখা গেছে, যেহেতু তারা বিবেচনা করে দেখেছে যে আত্মাকে বিনষ্ট করার চেয়ে দৈহিক মৃত্যু বরণ করা শ্রেয়। তাকে রাস্তায় দেখতে পেলে লোকে আপনা থেকে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পথচারীরা সন্তর্পণে পিছু হটে যায় এবং তারপরও অনেকক্ষণ পিছু ফিরে দেখে দূরে অপসৃয়মাণ তার অতি দীর্ঘকায় আকৃতিটিকে। একমাত্র তার বাহ্যিক রূপেই এত অসাধারণত্ব ছিল যে তাকে অতিপ্রাকৃত জীব ছাড়া আর কিছু লোকে ভাবতে পারত না। এত গভীর ভাবে খোদাই করা এই প্রখর মুখাকৃতি যা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, মুখের এই উগ্র তামাটে রঙ, এই অত্যধিক ঘন ভুরু, অসহনীয়, ভীতিপ্রদ চোখ, এমন কি তার এশীয় পোশাকের প্রশস্ত ভাঁজ — সব মিলে মনে হত যেন এই দেহের অভ্যন্তরে প্রবাহিত কামনার সামনে আর সকলের কামনা-বাসনা ম্লান হয়ে যায়। আমার বাবা প্রতিবারই তাকে দেখতে পেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং প্রতিবারই উচ্চারণ না করে পারতেন না: 'শয়তান, সাক্ষাৎ শয়তান!' যাই

হোক শিগগিরই আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হচ্ছে আমার বাবার সঙ্গে, প্রসঙ্গত, যিনি এই বৃত্তান্তের প্রধান উপলক্ষ।

'আমার বাবা বহু দিক থেকে ছিলেন এক অসামান্য মানুষ। তিনি ছিলেন মুষ্টিমেয় সেই সমস্ত শিল্পীদের একজন, সেই সমস্ত বিস্ময়ের একটি, যার উৎসার ঘটে জননী রাশিয়ার উদার, অকলঙ্ক বক্ষোদেশে। তিনি ছিলেন এক স্বশিক্ষিত শিল্পী, কোন শিক্ষাগুরু ও শিক্ষালয় কিংবা নিয়মকানুন ছাড়াই, একমাত্র উৎকর্ষসাধনের প্রবল তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে তিনি আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং হয়ত তিনি নিজেও বলতে পারবেন না কেন, অনুসরণ করে চলেন কেবল তাঁর আত্মার নির্দেশিত পথ। তিনি ছিলেন প্রকৃতিদত্ত গুণের অধিকারী, সেই সমস্ত বিস্ময়ের একটি, যাঁদের গালাগাল দিতে গিয়ে সমসাময়িকরা প্রায়শ ব্যবহার করে থাকেন অপমানকর 'অমার্জিত' শব্দটি, অথচ যাঁরা নিন্দাবাদে, নিজেদের অসাফল্যে হতোদ্যম না হয়ে লাভ করেন কেবল নব নব উদ্যম ও শক্তি আর যে রচনার জন্য এককালে অমার্জিত আখ্যা পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত মনেপ্রাণে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যান অনেক দূরে। সুগভীর সহজাত প্রবৃত্তিবশত তিনি প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন; নিজের চেষ্টায় 'ঐতিহাসিক চিত্রকলার' তাৎপর্য অনুধাবন করেন; অনুধাবন করতে পারলেন কেন রাফাএল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, টিশিয়ান বা কররেজিওর আঁকা সাধারণ একটা মাথা, সাধারণ একটা পোর্ট্রেট ঐতিহাসিক চিত্রকলা আখ্যা পেতে পারে, কেনই বা ঐতিহাসিক চিত্রকলার সমস্ত দাবি সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর উপর শিল্পীর আঁকা বিশাল ছবিকে tableau de genre* ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। অন্তরের উপলব্ধি এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির তাগিদে তাঁর তুলিকা মহিমার পরম ও চরম সোপানের নির্দেশ দিল, খ্রীষ্টীয় বিষয়বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করল। বহু শিল্পীর মধ্যে যে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও খিটখিটে স্বভাব দেখতে পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তা ছিল না। তাঁর চরিত্র ছিল দৃঢ়, তিনি ছিলেন সৎ, অকপট এমন কি রূঢ়, বাইরে থেকে বেশ খানিকটা কঠিন খোলসে ঢাকা, ভেতরে ভেতরে তাঁর খানিকটা গর্ববোধও ছিল, তিনি একই সঙ্গে যেমন প্রশ্রয়ের সুরে, তেমনি কটু ভাষায় কারও সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। 'ওদের দিকে

---

* জেনর পেইন্টিং — সাধারণ জীবন থেকে আঁকা দৃশ্য (ফরাসী)।

দৃষ্টি দেবার কী আছে?' তিনি সচরাচর বলতেন, 'আমি ত আর ওদের জন্য কাজ করি না। আমি বৈঠকখানায় ছবি যোগান দিই না, আমার আঁকা ছবি রাখা হয় গির্জায়। আমাকে যারা বুঝতে পারবে, তারা কৃতজ্ঞতা জানাবে, আর যারা বুঝতে পারবে না তারাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। জাগতিক মানুষ যে চিত্রকলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না তার জন্য তাকে দোষ দেওয়া চলে না; তবে সে তাসের ব্যাপার-স্যাপার বোঝে, ভালো মদ আর ঘোড়াটোড়া সম্পর্কেও তার মোটামুটি জ্ঞান আছে — এর চেয়ে বেশি আর ভদ্রসন্তানের জানার কী দরকার? আর একটা কথা, সে যদি এটা ওটা দুটোরই স্বাদ নিতে যায়, যদি নিজের বিদ্যাবুদ্ধিও জাহির করতে যায় তা-হলে লোকের জীবন সে করে তুলবে দুর্বিষহ! যার যা কাজ, যার যা সাজে তাই নিয়েই থাকা উচিত। যে-লোক ভন্ডামি করে, যা জানে না তা জানে বলে জাহির করে, সব কিছু কেবলই নোংরা করে আর নষ্ট করে, তার চেয়ে, আমার কাছে সেই লোক অনেক ভালো যে সরাসরি তার অজ্ঞতা স্বীকার করে।' তিনি কাজ করতেন সামান্য পারিশ্রমিকে, অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য এবং কাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংস্থানের জন্য যতটুকু না হলে নয়, কেবল ততটুকুই পারিশ্রমিক নিতেন। পরন্তু তিনি কখনও, কোন পরিস্থিতিতেই অন্যকে সাহায্য করতে, কোন দরিদ্র শিল্পীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ইতস্তত করতেন না। তিনি পূর্বপুরুষদের অনাড়ম্বর, সাত্ত্বিক ধর্মবিশ্বাস পোষণ করতেন, আর সম্ভবত সেই কারণে তাঁর আঁকা সমস্ত চেহারায় আপনা থেকেই ফুটে উঠত এত উন্নত ভাব যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পর্যন্ত সাধ্য হত না সে পর্যায়ে পেঁছানোর। অবশেষে নিজের শিল্পকর্মের স্থায়ী গুণে এবং নিজস্ব পন্থার অবিচল অনুসরণের ফলে, যারা অমার্জিত ও গৃহপালিত শখের শিল্পী বলে তাঁর নিন্দা করত তাদের কাছ থেকেও তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করতে লাগলেন। তিনি অনবরত গির্জার কাজের ফরমাস পেতে শুরু করলেন, তাঁর কাজের কোন অভাব রইল না। ফরমাসগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে একটি তাঁর মনকে অধিকার করে বসে। বিষয়বস্তুটা যে ঠিক কী ছিল এখন আর আমার তা মনে নেই, কেবল এটাই মনে আছে যে ছবিতে তামসিক আত্মার রূপ থাকার কথা। তার রূপটা কী রকম হবে এই নিয়ে তিনি অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করলেন; তাঁর ইচ্ছে ছিল সেটা যেন মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক, উৎকট সমস্ত কিছুর প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সময় তাঁর

মাথায় অনেক সময় ঘ্রতে থাকে রহস্যজনক মহাজনের চেহারা, মনে মনে তিনি না ভেবে পারলেন না: 'হ্যাঁ একে মডেল করেই আমার উচিত শয়তানকে আঁকা।' ব্ঝতেই পারেন তিনি কী রকম অবাক হয়ে গেলেন, যখন একদিন নিজের স্টুডিওতে কাজ করার সময় দরজায় ধাক্কা শ্নতে পেলেন এবং পরক্ষণেই দেখতে পেলেন সরাসরি তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে বিকটদর্শন মহাজনটি। তিনি ভেতরে ভেতরে একটা শিহরন অন্ভব না করে পারলেন না, আপনা থেকে তাঁর সর্বাঙ্গে খেলে গেল কম্পন।

''তুমি কি ছবি-আঁকিয়ে?' কোন রকম শিষ্টাচারের বালাই না রেখে লোকটা বাবাকে জিজ্ঞেস করল।

''হ্যাঁ,' বাবা হতব্দ্ধি হয়ে বললেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন অতঃপর কী হয়।

''ভালো কথা। আমার একটা ছবি এ'কে দাও। আমি হয়ত শিগগিরই মারা যাব, ছেলেপ্লে আমার নেই; কিন্তু আমি একেবারে মরে যেতে রাজী নাই, আমি বে'চে থাকতে চাই। তুমি কি এমন ছবি আঁকতে পার যা সম্প্র্ণ জ্যান্ত বলে মনে হয়?'

'বাবা মনে মনে ভেবে দেখলেন: 'এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? লোকটা নিজে থেকে এসে আমার ছবির শয়তান হওয়ার জন্য অন্নয় করছে।' তিনি কথা দিলেন। সময় এবং দরদাম সম্পর্কে তাদের দ্'জনের মধ্যে পাকা কথাবার্তা হল। পরের দিনই প্যালিট আর তুলি নিয়ে বাবা তার কাছে গিয়ে হাজির। উ'চু প্রাঙ্গণ, কুকুর, লোহার দরজা ও আগল, ধন্কের আকারের জানলা, অদ্ভুত গালিচায় ঢাকা তোরঙ্গ এবং সর্বোপরি তাঁর সম্ম্খে নিশ্চল আসীন, অসাধারণ চেহারার গ্হকর্তাটি — সব মিলে তাঁর মনে একটা অদ্ভুত ছাপ পড়ল। জানলাগ্লির নীচের দিকে যেন ইচ্ছে করেই এমন ভাবে জিনিসপত্র গাদাগাদি করা ও ঠেস দেওয়া ছিল যে তার ফলে আলো আসছিল কেবল ওপরের অংশের ফাঁক দিয়ে। 'শয়তানের কারবার আর কাকে বলে! ওর ম্খের ওপর আলোটা কী চমৎকার এসে পড়েছে!' মনে মনে এই কথা বলে তিনি দার্ণ প্রল্ব্ধ হয়ে আঁকতে লেগে গেলেন, যেন তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল সৌভাগ্যক্রমে এই যে আলোকপাত ঘটেছে তা পাছে মিলিয়ে যায়। 'ওঃ কী শক্তি!' তিনি আবার মনে মনে বললেন। 'ওকে এখন যেমন দেখাচ্ছে, আমি যদি তার অর্ধেকও ছবিতে

ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলে ও আমার সমস্ত সাধুপুরুষ ও দেবদূতদের মৃত্যু ঘটাবে; ওর সামনে তাঁরা সকলে বিবর্ণ হয়ে যাবেন। কী নারকীয় শক্তি! আমি যদি মডেলের অন্তত যৎসামান্য আদল বজায় রাখতে পারি তাহলে সে একেবারে ক্যানভাস থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে। কী অসাধারণ মুখরেখা!' তিনি অবিরাম বলে চললেন আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল তাঁর তীব্র ব্যাকুলতা। ইতিমধ্যে তিনি নিজে দেখতে পাচ্ছিলেন ক্যানভাসে ফুটে উঠছে চেহারার কিছু কিছু রেখা। কিন্তু যত বেশি তিনি সমাপ্তির কাছাকাছি চলে আসছিলেন ততই বেশি করে এমন এক যন্ত্রণাদায়ক, উদ্বেগজনক অনুভূতি তাঁর উপর ভর করতে লাগল যা তাঁর নিজের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হল। তা সত্ত্বেও তিনি লক্ষণীয় প্রতিটি রেখা ও প্রকাশভঙ্গি অবিকল, অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা থেকে ক্ষান্ত হলেন না। সর্বোপরি তিনি মনোযোগ দিলেন চোখ আঁকার দিকে। সেই চোখ দুটিতে এত বেশি শক্তি নিহিত ছিল যে মনে হচ্ছিল ক্যানভাসে তাদের যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তোলার চিন্তা নেহাৎই অর্থহীন। কিন্তু তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে-উপায়েই হোক চোখজোড়ার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি রেখা ও সূক্ষ্ম আভাস খুঁজে বার করতে হবে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে তাদের গোপন রহস্য। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি তুলির সাহায্যে তাদের অভ্যন্তরে ও গভীরে প্রবেশ করতে গেলেন, অমনি তাঁর মনের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণার ভাব, একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার অনুভূতি জেগে উঠল যে কিছুক্ষণের জন্য তিনি তুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তারপর আবার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, অনুভব করলেন চোখদুটি যেন তার হৃদয়ে এসে বিঁধছে, সেখানে উদ্রেক করছে এক দুরধিগম্য উদ্বেগের ভাব। পরের দিন সেই ভাব বৃদ্ধি পেল, তৃতীয় দিন হয়ে উঠল তীব্রতর। তাঁর মনে ভয় ধরল। তিনি হাতের তুলি ফেলে দিয়ে সরাসরি বললেন যে তিনি ওর পোর্ট্রেট আর আঁকতে পারছেন না। এই কথায় অদ্ভুত মহাজনটির যে পরিবর্তন ঘটল তা দেখার মতো বটে। সে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে পোর্ট্রেটটা শেষ করার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল, বলল যে এটার ওপর পৃথিবীতে তার ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করছে, সে আরও বলল যে ইতিমধ্যেই বাবার তুলির টান তার জীবন্ত রূপকে স্পর্শ করেছে, তিনি যদি সে রূপকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাহলে কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তির বলে তার জীবন পোর্ট্রেটটার ভেতরে থেকে

যাবে, ফলে সম্পূর্ণ মরণ তার ঘটবে না, তাছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকাও তার বড় দরকার। এই কথায় আমার বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন: কথাগুলি এতই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর মনে হল যে তিনি তুলি ও প্যালিট দুইই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

'যে ঘটনা ঘটে গেল তার চিন্তায় সারা দিনরাত তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকলেন, আর পর দিন সকালে মহাজনের কাছ থেকে তিনি পোর্ট্রেটটা ফেরত পেলেন। সেটা নিয়ে এসেছিল কোন এক মহিলা — একমাত্র প্রাণী যে তার কাছে চাকরীতে বহাল ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল যে পোর্ট্রেটে তার প্রভুর প্রয়োজন নেই, এর জন্য সে কিছু দিতেও রাজী নয়, এটা সে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেই দিনই সন্ধ্যায় বাবা জানতে পারলেন যে মহাজন মারা গেছে এবং তার ধর্মের রীতি অনুযায়ী তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজনও করা হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটি বাবার কাছে বড় অদ্ভুত, ব্যাখ্যার অতীত ঠেকল। ইতিমধ্যে, সেই সময় থেকেই তাঁর চরিত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল: এমন এক অস্থিরতা, উদ্বেগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে-অবস্থার কারণ তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না, আর শিগগিরই তিনি এমন কাণ্ড করে বসলেন যা তাঁর কাছ থেকে কেউ আশা করতে পারে নি। কিছুকাল হল তাঁর কোন এক ছাত্রের কাজ কলাবিদ ও কলারসিকদের ছোটখাটো মহলের নজরে পড়তে শুরু করছে। আমার বাবা সব সময় ছাত্রটির প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তার জন্য তাকে বিশেষ খাতিরও করতেন। হঠাৎ তিনি তার প্রতি ঈর্ষা বোধ করতে লাগলেন। তার সম্পর্কে আগ্রহ ও আলাপ-আলোচনা বাবার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। অবশেষে তাঁর আক্ষেপ চরমে উঠল যখন তিনি জানতে পারলেন যে সম্প্রতি নতুন করে তৈরি কোন এক সম্পদশালী গির্জার ছবি আঁকার জন্য ছাত্রটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এতে তিনি ফেটে পড়লেন। 'না, না এই দুগ্ধপোষ্যের জিত হবে তা হতে দিচ্ছি না!' তিনি মনে মনে বললেন। 'না হে ছোকরা, বুড়োদের কাদায় ফেলার মতলবটা বড় সকাল সকাল করে ফেলেছ! ভগবানের আশীর্বাদে, আমার এখনও শক্তি আছে। এই বার দেখা যাবে কে কাকে প্রথমে কাদায় ফেলে।' এই সরলমতি সৎচরিত্রের মানুষটি আশ্রয় নিলেন ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার, যা এযাবৎ তিনি সর্বদা ঘৃণায় পরিহার করে এসেছেন; শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে ছবি আঁকার জন্য ঘোষণা করতে হল এক প্রতিযোগিতার, যাতে অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁদের কাজের

নমুনা নিয়ে যোগ দিতে পারেন। অতঃপর তিনি নিজের ঘরে খিল এ'টে দিয়ে প্রবল উৎসাহে কাজে হাত দিলেন। মনে হল তাঁর সমস্ত শক্তির, সমগ্র সত্তার এখানে সমাবেশ ঘটানোর জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব! আর ঠিকই, তিনি যে ছবি আঁকলেন তা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে দেখা দিল। কারোই সন্দেহ রইল না যে প্রথম পুরস্কারটা তিনি না পেয়ে যান না। ছবিগুলি হাজির করা হল, তার ছবির পাশে আর সব ছবি দিনের পাশে রাতের মতো মনে হতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ উপস্থিত সদস্যদের একজন, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, যাজকমণ্ডলীর কেউ হবেন, যে মন্তব্য করলেন তাতে সকলে স্তম্ভিত। 'শিল্পীর ছবিতে যথার্থই প্রভূত প্রতিভার স্বাক্ষর আছে,' তিনি বললেন, 'কিন্তু মুখমণ্ডলে পবিত্রতার চিহ্ন নেই; বরং আছে ঠিক তার বিপরীত ভাব — চোখে এমন একটা পৈশাচিক ভাব যে দেখে মনে হয় কোন অশুভ উপলব্ধির বশে শিল্পীর হাত চলেছে।' উপস্থিত সকলেই মনোযোগ দিয়ে দেখার পর এই উক্তির সত্যতা স্বীকার না করে প্যারলেন না। আমার বাবা যেন এই অপমানজনক মন্তব্যের সত্যতা নিজে যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যেই ছবির দিকে ছুটে গেলেন এবং আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলেন যে ছবির প্রায় প্রতিটি মুখে তিনি বসিয়েছেন মহাজনের চোখ। সেই চোখগুলি এমন সর্বগ্রাসী পৈশাচিক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল যে তিনি নিজে আঁতকে না উঠে পারলেন না। ছবিটি প্রত্যাখ্যাত হল এবং অবর্ণনীয় বিরক্তির সঙ্গে তাঁকে শুনতে হল যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে তাঁর শিষ্যটি। যে রকম ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি প্রায় মাকে মেরে বসেন, ছেলেমেয়েদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন, তুলি আর ইজেল ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন, দেয়াল থেকে মহাজনের পোর্ট্রেটটা পেড়ে নিলেন, ওটাকে ফালা ফালা করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ছুরি চাইলেন, চুল্লীতে আগুন জ্বালাতে বললেন। তাঁরই মতো চিত্রশিল্পী, তাঁর এক বন্ধু ঘরে প্রবেশ করে এই অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলেন। বন্ধুটি ফুর্তিবাজ মানুষ, সদা আত্মতৃপ্ত, কোন রকম দুরাকাঙ্ক্ষা তিনি মনে পোষণ করতেন না, যা কাজ পেতেন তা-ই খুশিমনে করে যেতেন এবং আরও বেশি খুশি হতেন ভালো খাবারদাবার ও ভোজের সুযোগ পেলে।

'‘কী করছ? কী জিনিস পোড়ানোর মতলব করছ?' এই বলে তিনি পোর্ট্রেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'দোহাই তোমার এটা যে তোমার সেরা

কাজগুলোর একটা! এটা দেখছি সেই মহাজন, যে কিছু দিন আগে মারা গেছে; হ্যাঁ এমন নিখুঁত জিনিস আর হয় না। তুমি ওকে মোক্ষম ধরেছ। তোমার ছবিতে চোখজোড়া এমন ভাবে তাকাচ্ছে যে জ্যান্ত অবস্থায়ও তেমন তাকাতে পারত না।'

''হ্যাঁ, এখন আমি দেখতে চাই আগুনের মধ্যে কেমন দেখায়,' এই বলে বাবা ওটাকে চুল্লীর ভেতরে ছুঁড়ে ফেলতে প্রবৃত্ত হলেন।

''ঈশ্বরের দোহাই, থাম!' বন্ধু তাঁকে ধরে ফেলে বললেন, 'এটা যদি তোমার এতই চক্ষুশূল হয়ে থাকে তাহলে বরং আমাকে দিয়ে দাও।'

'বাবা প্রথমে জেদ ধরে রইলেন, অবশেষে রাজী হয়ে গেলেন। ফুর্তিবাজ বন্ধুটিও একটা নতুন জিনিস বাগাতে পেরে দারুণ খুশি হলেন, পোর্ট্রেটটা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

'বন্ধুটি চলে যাবার পর আমার বাবা অনেকটা স্বস্তি অনুভব করলেন। তাঁর মনে হল যেন পোর্ট্রেটটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুক থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। নিজের বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবে, ঈর্ষায় আর চরিত্রের এহেন সুস্পষ্ট পরিবর্তনে তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। নিজের আচরণ পর্যালোচনা করার পর তাঁর মনে দুঃখ হল, আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করে তিনি বললেন:

''না, এ হল ভগবানের শাস্তি; আমার ছবি সঙ্গত কারণেই ধিক্কৃত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল একজন সহজীবী শিল্পীকে বিনষ্ট করা। আমার তুলিতে এসে ভর করেছিল ঈর্ষার পৈশাচিক অনুভূতি, তাই পৈশাচিক অনুভূতির প্রতিফলন তাতে ঘটতে বাধ্য।'

'তিনি অবিলম্বে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রটির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন, আন্তরিক আবেগভরে তাকে আলিঙ্গন করলেন, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছেন তা মোচনের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখলেন না। তাঁর কাজ আগের মতো নির্বিঘ্নে চলতে লাগল; কিন্তু তাঁর মুখে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল গভীর চিন্তার ছাপ। তিনি আরও ঘন ঘন প্রার্থনা শুরু করে দিলেন, প্রায়ই চুপচাপ থাকতেন, লোকজন সম্পর্কে এখন আর তিনি আগের মতো কটু মন্তব্য প্রকাশ করেন না; তাঁর চরিত্রের বাহ্যিক রুক্ষতা অনেকটা যেন কোমল হয়ে এলো। শিগগিরই অন্য একটি ব্যাপারে তিনিও আরও বড় ধাক্কা খেলেন। যে বন্ধুটি তাঁর কাছ থেকে পোর্ট্রেটটা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, বহুকাল হল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই।

বাবা তার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধুটি নিজেই তাঁর ঘরে এসে হাজির। দু'পক্ষ থেকেই সংক্ষিপ্ত বাক্য ও প্রশ্ন বিনিময়ের পর বন্ধুটি বললেন:

''আরে ভাই, পোর্ট্রেটটা পুড়িয়ে ফেলার যে মতলব তুমি করেছিলে সেটা দেখছি অহেতুক নয়। জাহান্নামে যাক ওটা, ওটার মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু আছে।... আমি ডাইনী-টাইনীতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তুমি যাই বল না কেন: ওটার মধ্যে অশুভ শক্তি বাসা বেঁধেছে...'

''কী বলতে চাও তুমি?' বাবা বললেন।

''বলতে চাই এই যে পোর্ট্রেটটাকে আমার নিজের ঘরে ঝোলানোর পর থেকে এমন একটা আকুলি-বিকুলি ভাব অনুভব করলাম যেন কাউকে খুন করার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। অনিদ্রারোগ কাকে বলে জীবনে আমার জানা ছিল না, আর এখন কেবল অনিদ্রাই নয়, এমন সমস্ত দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম ... আমার নিজের পক্ষেই বলা সম্ভব নয় সেগুলো স্বপ্ন, না আর কিছু: যেন বাস্তুভূত গলা টিপে ধরেছে, আর কেবলই চোখের সামনে ভাসছে হতচ্ছাড়া বুড়োটা! এক কথায়, আমার অবস্থার বর্ণনা তোমাকে দিতে পারছি না। এমন অবস্থা আমার কস্মিনকালে ঘটে নি। ঐ কয় দিন আমি ক্ষ্যাপার মতো ছটফট করে ঘুরে বেড়াই: অনুভব করতে লাগলাম কেমন যেন একটা ভীতি, অপ্রীতিকর কিসের যেন একটা আশঙ্কা। আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে কাউকে ফুর্তির কথা, আন্তরিক কোন কথাও বলতে পারছি না; ঠিক মনে হচ্ছিল কোন চর যেন আমার পেছনে লেগে আছে। আমার এক ভাইপো পোর্ট্রেটটার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করায় তাকে যখন ওটা দিয়ে দিলাম কেবল তখনই অনুভব করলাম হঠাৎ যেন আমার কাঁধ থেকে কোন পাথর নেমে গেল; হঠাৎ আবার আমার ফুর্তি ফিরে এলো, দেখতেই পাচ্ছ। ওঃ ভাই, মানতেই হবে যে তুমি শয়তানকে গড়েছ!'

'এই বৃত্তান্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বাবা জিজ্ঞেস করলেন:

''পোর্ট্রেট কি এখন তাহলে তোমার ভাইপোর কাছে?'

''ভাইপোর কাছে আর থাকে! তারও সহ্য হল না,' ফুর্তিবাজ বন্ধুটি বললেন, 'মনে হয় খোদ মহাজনের আত্মা ওটাতে ভর করেছে: সে ফ্রেমথেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। ভাইপো যে বৃত্তান্ত দিল বুদ্ধিতে তার কোন ব্যাখ্যাই চলে না। আমি ওকে বাতুল বলেই ভাবতাম যদি নিজে সেই অভিজ্ঞতার কতকটা ভাগীদার না হতাম। ভাইপো

ছবিটা কে কোন এক আর্ট কালেক্টরের কাছে বেচে দিয়েছে, সে লোকেরও সহ্য হল না ওটা, সেও যেন আবার কাকে গছিয়ে দিয়েছে।'

'এই বৃত্তান্ত আমার বাবার মনের ওপর তীব্র ছাপ ফেলল। তিনি যথার্থই গভীর চিন্তায় পড়লেন, স্নায়বিক বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর হাতের তুলি শয়তানের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে, মহাজনের জীবনের একাংশ সত্যি সত্যিই কেমন করে যেন পোর্ট্রেটে সঞ্চারিত হয়েছে, এখন তা লোকজনকে উতলা করে তুলছে, তাদের মনের মধ্যে পৈশাচিক প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটাচ্ছে, শিল্পীকে বিপথগামী করছে, তার মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঈর্ষার জ্বালা ইত্যাদি ইত্যাদির সঞ্চার করছে। এর পরই তিনটি শোকাবহ ঘটনা — স্ত্রী, কন্যা ও শিশুপুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা — তিনি নিজের উপর ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তিস্বরূপ বিবেচনা ক'রে অবিলম্বে সংসার পরিত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। আমি নয় বছরে পড়তে না পড়তে তিনি আমাকে শিল্পকলা একাডেমিতে ভর্তি করে দিলেন এবং যেখানে যা ঋণ ছিল সমস্ত শোধ করে দিয়ে চলে গেলেন এক নিভৃত মঠে, সেখানে শিগগিরই তিনি অবলম্বন করলেন সন্ন্যাসধর্ম। মঠে কঠোর জীবনচর্যায়, সেখানকার সমস্ত নিয়মকানুন অক্লেশে পালন করে তিনি সহ-সন্ন্যাসীদের সকলের বিস্ময় উদ্রেক করলেন। মঠাধ্যক্ষ তাঁর তুলির শিল্পগুণের কথা জানতে পেরে তাঁকে গির্জার প্রধান আইকন আঁকতে বললেন। কিন্তু বিনম্র সন্ন্যাসী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে তুলি ধরার যোগ্যতা তাঁর নেই, তাঁর তুলি অপবিত্র হয়ে গেছে, এ ধরনের কাজে হাত দেবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে তাঁকে কঠোর তপশ্চর্যা ও পরম আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। তাঁকে পীড়াপীড়ি করার ইচ্ছে কারও ছিল না। তিনি নিজেই নিজের জন্য যতদূর সম্ভব সন্ন্যাস-জীবনের কঠোরতা বৃদ্ধি করে চললেন। শেষ পর্যন্ত এটাও তাঁর কাছে যথেষ্ট এবং ততটা কঠোর বলে মনে হল না। তিনি সম্পূর্ণ নির্জনে থাকার উদ্দেশ্যে মঠাধ্যক্ষের আশীর্বাদ নিয়ে বনবাসী হলেন। সেখানে গাছের ডালপালা দিয়ে তিনি নিজের জন্য এক আশ্রম-কুটির বানালেন, তিনি কেবল কাঁচা কন্দ-মূল খেয়ে থাকতেন, স্থান থেকে স্থানান্তরে পাথর বহন করতেন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকাশের দিকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবিরাম প্রার্থনা উচ্চারণ করতেন। এক কথায়, মনে করা যেতে পারে সহিষ্ণুতার সমস্ত স্তর এবং এমন

দুরধিগম্য আত্মত্যাগের পরীক্ষা তিনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন যার তুলনা মিলতে পারে একমাত্র মহাপুরুষদের জীবনচর্যার মধ্যে। এই ভাবে অনেক কাল, বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি দেহকে ক্লিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার সঞ্জীবনী শক্তির সাহায্যে তাকে পোক্ত করে তুললেন। অবশেষে একদিন তিনি মঠে এসে দৃঢ়তার সঙ্গে মঠাধ্যক্ষকে জানালেন: 'এখন আমি প্রস্তুত। ঈশ্বরের অভিরুচি হলে আমি আমার কাজ সম্পাদন করতে পারি।' বিষয়বস্তুরূপে তিনি বেছে নিলেন যীশুর জন্ম। পুরো এক বছর তিনি কাজ করলেন। সেই সময় তিনি তার কুঠুরি থেকে বেরোতেন না, সন্ন্যাসীদের সাত্ত্বিক আহারও তিনি কদাচিৎ গ্রহণ করতেন, নিরন্তর প্রার্থনা করতেন। বছর পেরোলে ছবি তৈরি হল। ছবিটাতে যথার্থই প্রকাশ পায় তুলির অলৌকিক ক্ষমতা। এখানে বলা দরকার যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বা মঠাধ্যক্ষ—কারোই চিত্রকলা সম্পর্কে তেমন একটা জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সকলে মূর্তিগুলির অসাধারণ পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শিশুসন্তানের উপর আনত দেবমাতার মুখে দিব্য প্রশান্তি ও নম্রতার ভাব, দিব্য শিশুসন্তানের চোখে এমন একটা গভীর বুদ্ধিদীপ্তি যাতে মনে হয় সে চোখের দৃষ্টি এখনই বহু দূরে প্রসারী, ঐশ্বরিক অলৌকিকতায় মুগ্ধ এবং তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত ভূপতিদের গম্ভীর নীরবতা—সর্বোপরি সমগ্র ছবি জুড়ে একটা পবিত্র, অনির্বচনীয় নিস্তব্ধতা—সবই সৌন্দর্যের বিপুল ক্ষমতা ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল যে তার প্রভাব ছিল ঐন্দ্রজালিক। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সকলে এই নতুন আইকনের সামনে নতজানু হয়ে পড়লেন আর অভিভূত মঠাধ্যক্ষ বললেন: 'না, মানুষের সাধ্য নয় নিছক মানবিক শিল্পকলার সহায়তায় এমন ছবি রচনা করা: পবিত্র, পরম শক্তি তোমার তুলিতে এসে ভর করেছে, স্বর্গের আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে তোমার সৃষ্টির উপর।'

'এই সময় আমি একাডেমীতে আমার পাঠ শেষ করলাম, সোনার মেডেল পেলাম আর সেই সঙ্গে ইতালি পর্যটনের পরম আনন্দদায়ক আশা—বিশ বছর বয়সের একজন শিল্পীর এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর হতে পারে না। এখন বাকি রইল কেবল বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া—বারো বছর হল তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বলতে বাধা নেই তাঁর চেহারা পর্যন্ত অনেক কাল হল মুছে গেছে আমার স্মৃতি থেকে। আমি অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁর সুকঠোর পবিত্র জীবনচর্যার কথা কিছু কিছু শুনেছি, তাই আগে

থাকতে মনে মনে ধারণা করে রেখেছিলাম যে দেখতে পাব অনবরত নিশিপালনে ও উপবাসে ক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ এমন এক নির্জনবাসী তপস্বীর রুক্ষ চেহারা, যিনি নিজের কুটির ও প্রার্থনা ছাড়া জগৎসংসারের আর কিছু জানেন না। কিন্তু আমার সামনে যখন এসে দাঁড়ালেন এক সৌম্যদর্শন, দিব্যকান্তি পুরুষ তখন আমি কী অবাকই না হলাম! তাঁর মুখে শীর্ণতার কোন চিহ্ন ছিল না; তাতে ছিল স্বর্গীয় আনন্দের উজ্জ্বল উদ্ভাস। তুষারশুভ্র শ্মশ্রুরাজী এবং ঐ একই রকম রুপোলি রঙের, প্রায় বায়বীয়, হালকা কেশগুচ্ছ আঁকা-ছবির মতো ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বুক বয়ে, আলখাল্লার ভাঁজের ওপর, লুটিয়ে পড়েছে তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ অনাড়ম্বর বসনের কোমরবন্ধনী পর্যন্ত; কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল তাঁর মুখে শিল্পকলা সম্পর্কে এমন সমস্ত কথা ও ধ্যানধারণা শুনে, যেগুলি, স্বীকার করতেই হবে, অনেক কাল আমার মনে থাকবে এবং আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমার পেশার আর সকলেও যেন মনে রাখেন।

''আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বৎস,' আমি আশীর্বাদ চাইবার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে তিনি বললেন। 'তোমার সামনে যে পথ সেই পথেই এখন থেকে প্রবাহিত হবে তোমার জীবনের ধারা। তোমার পথ অকলঙ্ক, সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ো না। তোমার প্রতিভা আছে; প্রতিভা হল ঈশ্বরের মহার্ঘ দান—তাকে নষ্ট করো না। যা-ই দেখ না কেন, তাকে বিশ্লেষণ কর, অধ্যয়ন কর, তুলিকে পুরোপুরি নিজের বশে আন, কিন্তু সমস্ত জিনিসের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে শেখ, আর সবচেয়ে বড় কথা হল, চেষ্টা কর সৃষ্টির পরম রহস্য অনুধাবনের। তাঁর প্রিয়পাত্র সেই ব্যক্তিই ধন্য যাঁর এই অধিকার আছে। সেই ব্যক্তির কাছে প্রকৃতিতে হীন বিষয় বলে কিছু নেই। নির্মাণকর্তা শিল্পী যেমন তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যে, তেমনি মহত্তের মধ্যেও মহান; যা অবজ্ঞাজনক তা তাঁর কাছে মোটেই অবজ্ঞার বিষয় নয়, কেননা বিধাতার মধুর অন্তর্দৃষ্টি অদৃশ্যভাবে ভেদ করে চলেছে সেই বিষয়কে, আর তারই ফলে তাঁর আত্মার শোধনাগার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে তা লাভ করছে সমুন্নত অভিব্যক্তি। শিল্পের মধ্যে মানুষের জন্য নিহিত আছে দিব্য জগতের, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের ইঙ্গিত, আর একমাত্র এই কারণেই তা সব কিছুর ঊর্ধ্বে। যে-কোন পার্থিব অশান্তির চেয়ে পরম প্রশান্তি যত গুণ উন্নত, ধ্বংসের তুলনায় সৃজন তত গুণ উন্নত। দেবদূতে একমাত্র তাঁর বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ আত্মার ঔজ্জ্বল্যে শয়তানের অপরিমেয় শক্তি

ও উদ্ধত কামনার চেয়ে যত গুণ উন্নত, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর চেয়ে তত গুণই উন্নত হল পরম শিল্পসৃষ্টি। সব কিছু এনে তাকে উৎসর্গ কর, সর্বান্তঃকরণে তাকে ভালোবাসতে শেখ। তোমার সেই ভালোবাসার আবেগ পার্থিব কামনা-বাসনায় আচ্ছন্ন হলে চলবে না, তাকে হতে হবে শান্ত, স্বর্গীয়; এ ছাড়া পৃথিবীর ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা মানুষের নেই, সে সঞ্চার করতে পারে না সান্ত্বনার আলৌকিক সুর। আর সকলকে সান্ত্বনা দান ও সকলের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারের জন্যই ত পৃথিবীতে পরম শিল্পসৃষ্টির আবির্ভাব। এই সৃষ্টি আত্মার মধ্যে যা জাগিয়ে তোলে তা কোন অস্ফুট গুঞ্জরণ নয়, এ হল ঈশ্বরের উদ্দেশে নিরন্তর উচ্চারিত ব্যাকুল স্তোত্র। কিন্তু কখন কখন এমন মুহূর্তও আসে যাকে বলা যায় অন্ধকার মুহূর্ত...'

'তিনি থামলেন, আমিও লক্ষ করলাম হঠাৎ তাঁর উজ্জ্বল মুখের উপর পড়ল বিষাদের ছায়া, যেন পলকের মধ্যে তা ঢেকে গেল কালো মেঘে।

''এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে,' তিনি বললেন। 'যে অদ্ভুত রূপের প্রতিমূর্তি আমি এঁকেছিলাম আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না সেটা আসলে কী ছিল। ওটা কোন নারকীয় ঘটনা না হয়ে যায় না। আমি জানি যে বিশ্বসংসার শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাই তার কথা আমি বলছিও না। কিন্তু কেবল একটি কথাই বলি: আমি মনের মধ্যে প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকে এঁকেছিলাম, নিজের কাজের প্রতি কোন ভালোবাসার উপলব্ধি সেই সময় আমার ছিল না। আমি জোর করে নিজেকে বশে এনে, সমস্ত আবেগ-অনুভূতি দমন করে, হৃদয়বৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতির অনুগত হতে চেয়েছিলাম। এটা শিল্পসৃষ্টি হয় নি, তাই তাকে দেখামাত্রই যে-অনুভূতি সকলকে আছন্ন করে ফেলে তা হল অস্থিরতার অনুভূতি, অস্বস্তিকর অনুভূতি—শিল্পীর উপলব্ধি নয়, কেননা উদ্বেগের মধ্যেও শিল্পীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রবাহিত হয়ে থাকে প্রশান্তি। আমি শুনেছি এই পোর্ট্রেটটা নাকি হাতে হাতে ঘুরছে, অশান্তি ছড়াচ্ছে, শিল্পীর মনে জাগিয়ে তুলছে তার সতীর্থের প্রতি ঈর্ষার, প্রবল ঘৃণার অনুভূতি, নিগ্রহ ও নিপীড়নের দুষ্ট বাসনা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে এই সমস্ত কামনার হাত থেকে রক্ষা করুন। এর থেকে ভয়ঙ্কর আর কিছু হতে পারে না। অন্যকে সামান্যতম নিগ্রহ করার চেয়ে যত রকমের সম্ভব নিগ্রহের যাবতীয় তিক্ততা নিজে ভোগ করা শ্রেয়। নিজের অন্তরের শুদ্ধতা রক্ষা করে চল। যার মধ্যে প্রতিভা আছে তার অন্তঃকরণকে হতে হবে সকলের চেয়ে শুদ্ধ।

অন্যদের অনেক কিছু ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তার কোন ক্ষমা নেই। যে লোক উৎসবের ঝলমলে সাজ পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার গায়ে যদি চলমান গাড়ির চাকা থেকে এক ফোঁটা কাদা এসেও ছিটকে পড়ে তা হলে অমনি লোকজন তাকে ঘিরে ধরবে, আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখাবে, তার পোশাকের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে বলাবলি করবে, অথচ সেই একই লোকজন সাধারণ বেশভূষাধারী অন্যান্য পথচারীর পোশাকের ওপরকার অসংখ্য দাগ লক্ষও করে না; কেননা দৈনন্দিন বেশভূষায় দাগ থাকলে তা চোখে পড়ে না।'

'তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে আলিঙ্গন করলেন। জীবনে কখনও আমি এমন উদাত্ত প্রেরণা অনুভব করি নি। যে-ভাবে পরম ভক্তিভরে আমি তাঁর বুকের সংলগ্ন হয়ে তাঁর ছড়িয়ে পড়া রুপোলি চুলের রাশিতে চুমো খেলাম তা পুত্রের উপলব্ধিকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর চোখে জল এলো।

''আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর বৎস,' বিদায়ের শেষ মুহূর্তে তিনি আমাকে বললেন। 'যে পোর্ট্রেটের কথা আমি তোমাকে বললাম সেটা হয়ত কোথাও চোখে পড়ার সুযোগ তোমার ঘটবে। তুমি ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারবে অসাধারণ চোখজোড়া আর তাদের অস্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি থেকে—যে উপায়েই হোক, ওটাকে নষ্ট করে ফেল...'

'আপনারা নিজেরাই বিচার করে দেখুন, এমন অনুরোধ পালন করব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হয়ে কি আমি পারতাম? গত পনেরো বছর হল এমন কিছুই চোখে পড়ে নি যা আমার বাবার দেওয়া বর্ণনার অন্তত খানিকটা ধারে কাছে আসে, এমন সময় আজ এই নিলামে...'

শিল্পী তাঁর বাক্য শেষ না করে এই সময় দেয়ালের দিকে চোখ তুলে তাকালেন পোর্ট্রেটটাকে আরও একবার দেখার উদ্দেশ্যে। চোখের পলকে, একসঙ্গে ঐ একই ভঙ্গির আশ্রয় নিল সমগ্র জনমণ্ডলী, যারা তার কথা শুনছিল — তারা চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগল অসাধারণ পোর্ট্রেটটাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ওপরে আশ্চর্য এই যে পোর্ট্রেটটা আর দেয়ালে ছিল না। সমগ্র জনমণ্ডলীর মধ্যে উঠল একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ও কোলাহল, আর তার পরই স্পষ্ট শোনা গেল এই কথাটি 'চুরি হয়ে গেছে'। শ্রোতারা যখন সাগ্রহে, গভীর মনোযোগ দিয়ে বৃত্তান্ত শুনছিল সেই ফাঁকে কেউ ওটাকে সরিয়েছে। উপস্থিত সকলে এর পরও অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল—তারা বুঝতে পারছিল না, সত্যি সত্যিই ঐ অসাধারণ চোখজোড়া তারা দেখেছিল কিনা, নাকি ওটা ছিল নেহাৎই স্বপ্ন—বহুক্ষণ ধরে পুরনো বহু ছবি দেখার ফলে ভারাক্রান্ত চোখের ক্ষণিক ভ্রমমাত্র!

ওভারকোট

কোন এক ডিপার্টমেণ্টে... কোন্ ডিপার্টমেণ্টে সেটা না হয় না-ই বললাম। এই সব ডিপার্টমেণ্ট, রেজিমেণ্ট আর দফতরের চেয়ে—এক কথায়, নানা শ্রেণীর পদস্থ চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের চেয়ে বদমেজাজী আর কোন চিজ হতে পারে না। আজকাল আবার যে-কোন লোক ব্যক্তিগত ভাবে অপমানিত হলে তা গোটা সমাজের অপমান বলে গণ্য করে। শোনা যায় অতি সম্প্রতি—মনে করতে পারছি না কোন্ শহরের—কোন এক পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে একটি নিবেদন আসে যাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে সরকারী হুকুম-নির্দেশ সব রসাতলে যেতে বসেছে এবং নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে অযথাই উচ্চারিত হচ্ছে তার পুণ্য নাম। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি তাঁর নিবেদনের সঙ্গে প্রেরণ করেন কোন এক বিপুলায়তন রোমাণ্টিক রচনা, যেখানে প্রতি দশ পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এক পুলিশ অফিসারের — সময় সময় আবার হদ্দ মাতাল অবস্থায়। সুতরাং কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার যাতে না ঘটে সেই জন্য, যে-ডিপার্টমেণ্টের কথা হচ্ছে, তাকে বরং আমরা কোন এক ডিপার্টমেণ্ট বলেই উল্লেখ করব।

সুতরাং, কোন এক ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করত কোন এক কর্মচারী। কর্মচারীটিকে দেখতে খুব একটা আহা-মরি বলা চলে না: বেঁটেখাটো গড়নের, খানিকটা বসন্তের দাগওয়ালা, খানিকটা কটা, এমন কি চোখের দৃষ্টিও তার খানিকটা ক্ষীণ, কপালের ওপরে ছোটখাটো টাক, গালের দুপাশেই বলিরেখা আর মুখের রঙ, যাকে বলে, অর্শরোগগ্রস্তের... কী আর করা যাবে! এর জন্য দায়ী সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জলবায়ু। পদমর্যাদার দিক

থেকে (কেননা সকলের আগে আমাদের জানানো দরকার সে কোন্ শ্রেণীর কর্মচারী) সে ছিল সেই চিরকেলে কেরানি—যাকে বলে নিম্নপদস্থ কেরানি; আর একথা সুবিদিত যে যারা পাল্টা আঘাত করতে জানে না, তাদের কোণঠাসা করার প্রশংসনীয় অভ্যাস যাঁদের আছে সেই ধরনের নানা লেখক এদের নিয়ে হাসিঠাট্টা ও তামাসার চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। কর্মচারীটির পদবী ছিল বাশ্মাচ্‌কিন। খোদ পদবী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোন এক কালে বাশ্মাক, অর্থাৎ পাদুকা থেকে তার উদ্ভব; কিন্তু কখন, কোন্ সময় এবং কী ভাবে পাদুকা থেকে তার উদ্ভব, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। বাপ-ঠাকুর্দা, মায় শ্যালক এবং বলতে গেলে বাশ্মাচ্‌কিনরা সকলেই জুতো পরত—কেবল বছরে বার তিনেক তলি বদল করে। তার নাম ছিল আকাকি আকাকিয়েভিচ। নামটা পাঠকের কাছে খানিকটা অদ্ভুত এবং বানানো মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এটা মোটেই খুঁজে-পেতে বার করা নয়, পরিস্থিতি আপনা থেকে এমন দাঁড়ায় যে অন্য কোন নাম দেবার উপায় ছিল না। ঘটনাটা আসলে যে ভাবে ঘটেছিল বলি। আকাকি আকাকিয়েভিচের জন্ম হয়—আমার যত দূর মনে পড়ে—২২ মার্চ রাতে। স্বর্গীয় মাতৃদেবী ছিলেন বড় চমৎকার মহিলা, জনৈক সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী। তিনি ভেবেছিলেন ছেলেটির যথারীতি ধর্মমতে নামকরণ করবেন। মাতৃদেবী তখনও দরজার মুখোমুখি একটি খাটে শুয়ে ছিলেন, তাঁর ডান পাশে ছিলেন ধর্মপিতা ইভান ইভানভিচ ইয়েরোশ্‌কিন—অতি চমৎকার মানুষ, সিনেটের একজন হেড ক্লার্ক; আর ছিলেন ধর্মমাতা—থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের স্ত্রী — অসাধারণ গুণী মহিলা আরিনা সেমিওনভ্না বেলোব্রিউশ্‌কভা। প্রসূতিকে বেছে নিতে বলা হল তিনটি নামের যে কোন একটি: মোক্‌কি, সোস্‌সি অথবা শহিদ খোজ্‌দাজাতের নামেও তিনি শিশুর নাম দিতে পারেন। 'না,' মা মনে মনে ভাবলেন, 'নামের কি ছিরি দেখ!' তাঁকে খুশি করার জন্য পঞ্জিকার আরও একটা জায়গা খোলা হল, এবারেও তিনটি নাম: ত্রিফিলি, দুলা ও ভারাখাসি। 'না, এটাকে আর শাস্তি ছাড়া কী বলা যায়?' প্রৌঢ়া শেষ পর্যন্ত বললেন, 'কী সব নাম! সত্যি বলছি বাপের জন্মেও শুনি নি। ভারাদাত কিংবা ভারুখ হলেও না হয় বুঝতাম, তা নয়, ত্রিফিলি, ভারাখাসি।' এবারেও পৃষ্ঠা ওলটানো হল—বের হল পাভ্‌সিকাখি ও ভাখ্‌তিসি। প্রৌঢ়া তাতে বললেন, 'না এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমার ভাগ্য। তা-ই যদি হয়

তাহলে বরং ওর বাপের নামেই নাম রাখা হোক। বাপ ছিল আকাকি, ছেলেও হোক আকাকি।' এই ভাবেই আকাকি আকাকিয়েভিচ নামের উদ্ভব। শিশুর জাতকর্ম হল; সেই সময় সে কেঁদে উঠল এবং এমন মুখভঙ্গি করল যেন আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পারছিল যে ভবিষ্যতে একজন নিম্নপদস্থ কেরানি হবে।

সুতরাং এই হল ঘটনা। আমাদের এই বৃত্তান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে পাঠক নিজেই দেখতে পারেন যে এটা ঘটে সম্পূর্ণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং অন্য নাম কোন মতেই দেওয়া সম্ভব ছিল না। কবে, কোন্ সময় সে ডিপার্টমেণ্টে কাজ নিল এবং কে তাকে নিয়োগ করল তা কেউ স্মরণ করতে পারে না। কত বড় সাহেব, কত ওপরওয়ালাই না এলেন গেলেন, সে কিন্তু রয়ে গেল সেই একই জায়গায়, একই অবস্থায়, সেই একই পদে — নকলনবিস কেরানি হয়ে; ফলে লোকের মনে অতঃপর এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল যে সে নির্ঘাত ঐ রকম কেরানির পোশাক পরে পুরোদস্তুর তৈরি অবস্থায় এবং মাথায় টাক নিয়েই পৃথিবীতে জন্মেছিল। ডিপার্টমেণ্টে তার প্রতি কারও কোন ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। সে যখন পাশ দিয়ে চলে যেত তখন দরোয়ানেরা উঠে দাঁড়ান দূরের কথা, তার দিকে ফিরেও তাকাত না — ভাবটা এমন যেন রিসেপ্‌শন হল-এর ভেতর দিয়ে নেহাৎই একটা মাছি উড়ে গেল। তার সঙ্গে ওপরওয়ালাদের ব্যবহার ছিল আবেগশূন্য ও স্বৈরাচারী ধরনের। কোন এসিস্টেণ্ট হেড ক্লার্ক হলে তিনি সরাসরি ওর নাকের সামনে কাগজ বাড়িয়ে দিতেন, এমনকি 'নকল করুন' কিংবা 'এই যে একটা ছোটখাটো, চমৎকার, ইণ্টারেস্টিং কাজ' কিংবা ভদ্র চাকুরীর জায়গায় যে-সমস্ত শিষ্টাচার প্রয়োগের রীতি আছে তা বলাও বাহুল্য মনে করতেন। সেও কেবল কাগজটার দিকে তাকিয়ে সেটা নিয়ে নিত, একবার তাকিয়েও দেখত না কে তাকে কাগজটা দিল এবং দেবার অধিকার আদৌ সেই ব্যক্তির আছে কিনা। কাগজটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ বসে যেত লিখতে। ছোকরা কর্মচারীরা তাদের কেরানিসুলভ রসিকতায় যত দূর কুলোয়, তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, তার সামনেই বলত তার সম্পর্কে যত রাজ্যের বানানো গল্প; তার বাড়িওয়ালি সত্তর বছরের বুড়ি সম্পর্কে বলত সে নাকি ওকে মারে, প্রশ্ন করত কবে ওদের বিয়ে হচ্ছে, তার মাথার ওপর কাগজের কুটি ছড়িয়ে দিয়ে বলত বরফ পড়ছে। কিন্তু এর জবাবে আকাকি আকাকিয়েভিচ একটি কথাও বলত না — যেন তার সামনে কেউ নেই; এমন কি তার কাজের ওপরও এর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটত

না: এত সব হাসিতামাসার মাঝখানে সে লেখায় একটা ভুলও করত না। কেবল ঠাট্টাটা বড় বেশি অসহ্য হয়ে উঠলে, যখন ওরা তার হাতে ঠেলা মেরে কাজের ব্যাঘাত ঘটাত, তখনই সে বলত: 'ছেড়ে দিন আমাকে, আপনারা আমাকে অপমান করছেন কেন?' তার এই কথায় এবং যে রকম কণ্ঠস্বরে কথাগুলি উচ্চারিত হত, তাতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব থাকত। সেখানে কাতরতায় ভেঙে পড়া এমন একটা ভাব ফুটে উঠত যে সদ্য চাকুরীতে-ঢোকা এক যুবক ত অন্যদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তাকে নিয়ে উপহাস করতে গিয়ে থমকেই গেল — যেন আচমকা তার বুকে শেল বিঁধেছে। আর তার পর থেকে সেই যুবকের সামনে সব কিছু যেন বদলে গেল, দেখা দিল অন্য রূপে। ভদ্র, মার্জিত লোক ভেবে যাদের সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল কোন এক অপ্রাকৃত শক্তি যেন তাকে সেই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। এর পর দীর্ঘকাল, চরম আনন্দের মুহূর্তে তার মনে পড়ে যেত মাথার সামনের দিকে টাক-পড়া, বেঁটেখাটো চেহারার কেরানিটিকে আর তার সেই মর্মভেদী কথাগুলি: 'ছেড়ে দিন আমাকে, আপনারা আমাকে অপমান করছেন কেন?' —এই মর্মভেদী কথাগুলির মধ্যে যেন অনুরণিত হত আরও একটি বারতা: 'আমি তোমার ভাই!' বেচারি যুবকটি হাত দিয়ে মুখ ঢাকে এবং এর পর জীবনে তাকে বহুবার আঁতকে উঠতে হয়, যখন সে দেখতে পায় কতই না অমানুষিকতা মানুষের মধ্যে, কতই না নিষ্ঠুর স্থূলতা গোপন থাকে মার্জিত, শিক্ষা ও ভদ্রতার আড়ালে! হা ভগবান! এমন কি সেই মানুষের মধ্যেও, যাকে বিশ্বসুদ্ধ সকলে উদার ও সৎ বলে জানে...

এমন লোক আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার যার কাছে চাকুরীই ছিল জীবনের ধ্যানজ্ঞান। কম বলা হবে যদি বলি সে কাজ করত প্রবল আগ্রহ নিয়ে—না, সে কাজ করত ভালোবাসা দিয়ে। এখানে, এই নকল করার মধ্যে সে দেখতে পেত নিজস্ব এক বৈচিত্র্যময় ও মধুর জগৎ। তার চোখেমুখে ফুটে উঠত একটা তৃপ্তির ভাব। কতকগুলি অক্ষর ছিল তার বিশেষ প্রিয়, সেগুলিকে পেলে সে আত্মহারা হয়ে যেত: তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠত, সে চোখ টিপত, ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করত, ফলে তার কলমে ফুটে-ওঠা প্রতিটি অক্ষর যেন তার মুখের রেখা থেকে পাঠ করা যেত। তার উৎসাহের সমপরিমাণে যদি তাকে পুরস্কার দেওয়া যেত তাহলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকত না — সে সরকারী পরামর্শদাতা অবধি বনতে পারত,

কিন্তু কাজের পুরস্কার বলতে সে যা পেল—তার অফিসের রসিক বন্ধুদের কথায়—তা হল বোতামঘরে লাগানোর একটা ব্যাজ আর নিম্নাঙ্গে অর্জিত অর্শরোগ। প্রসঙ্গত, তার প্রতি কারও কোন মনোযোগ ছিল না একথা বলাও ঠিক হবে না। কোন এক সদাশয় বড়সাহেব দীর্ঘকালীন চাকুরীর জন্য তাকে পুরস্কৃত করার বাসনায় হুকুম দিলেন তাকে যেন মামুলি নকল করার কাজ না দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করতে দেওয়া হয়; তাকে যা করতে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তা হল পুরোপুরি তৈরি একটা কেস থেকে অন্য আরেকটি অফিসের জন্য রিপোর্ট লেখা; শিরনামা বদল করা আর ক্ষেত্রবিশেষে ক্রিয়াপদ উত্তমপুরুষ থেকে প্রথম পুরুষে পালটে দেওয়া—স্রেফ এই ছিল কাজ। এটা তার কাছে এমনই দুরূহ ঠেকল যে সে গলদঘর্ম হয়ে উঠল, কপালের ঘাম মুছে শেষ কালে বলল: 'না, আমাকে বরং কিছু নকল করতেই দিন।' এর পর থেকে চিরকালের জন্য তাকে নকলনবিস কেরানি করেই রেখে দেওয়া হল। এই নকল করার বাইরে তার কাছে যেন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সে তার নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাত না। তার অফিসের ইউনিফর্মটা আর সবুজ ছিল না, এখন কেমন যেন একটা লালচে বাদামী, ময়দা-ময়দা রঙ ধারণ করেছে। ইউনিফর্মের কলারটা ছিল সরু, নীচু, ফলে তার ঘাড় লম্বা না হলেও কলার থেকে বেরিয়ে পড়ায় অসাধারণ লম্বা দেখাত — প্লাস্টারের তৈরি মাথা-নড়বড়ে যে-সমস্ত বিড়ালছানা-পুতুল, রুশী ফিরিওয়ালারা ডজনে-ডজনে মাথায় বয়ে নিয়ে ফিরি করে বেড়ায়, অনেকটা তেমনি। আর তার ইউনিফর্মে খড়ের টুকরো কিংবা সুতো—একটা না একটা কিছু সব সময় লেগে থাকত; তার আবার লোকে যখন জানলা দিয়ে যত রাজ্যের আবর্জনা বাইরে ছুঁড়ে ফেলছে, রাস্তায় চলতে গিয়ে সময় বুঝে ঠিক সেই মুহূর্তেই জানলার নীচ দিয়ে চলার একটা বিশেষ ক্ষমতা তার ছিল। ফলে সে নিত্য তার টুপিতে বয়ে নিয়ে বেড়াত তরমুজ ও ফুটির খোসা এবং ঐ ধরনের যত জঞ্জাল। রাস্তায় রোজ কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে সে জীবনে কখনও মনোযোগ দিত না; অথচ কে না জানে যে তারই সতীর্থ যুবক কর্মচারীটি তা দেখার ব্যাপারে সদা আগ্রহী? শুধুই কি তাই?—সে লোকটি নিজের দৃষ্টিশক্তি এত দূর প্রখর করে তুলেছে যে ওপাশের ফুটপাথে কারও প্যান্টের গ্যালিস আলগা হয়ে গেলে তা-ও তার নজরে এড়াবে না—আর এমন ঘটনা তার মুখে মৃদু বিদ্রূপের হাসির উদ্রেক অবশ্যই করবে।

কিন্তু সে দিকে যদি আকাকি আকাকিয়েভিচের দৃষ্টি পড়তও তা হলে সব কিছুর মধ্যে সে দেখতে পেত তার নিজের পরিচ্ছন্ন, গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা লাইন; কেবল যখন, কোথা থেকে কে জানে, কোন উটকো ঘোড়া এসে তার কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে ব্যাঘাত ঘটাত এবং নাকের ফুটো দিয়ে দমকা হাওয়া তার গালের ওপর ছেড়ে দিত, একমাত্র তখনই তার খেয়াল হত যে সে কোন লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় নেই, আছে রাস্তার মাঝখানে। বাড়িতে ফিরে এসে সে তৎক্ষণাৎ টেবিলের ধারে গিয়ে বসে পড়ত, চটপট গিলত বাঁধাকপির সুপ, পিঁয়াজ সহযোগে গোমাংসের টুকরো, কোন স্বাদের দিকে তার আদৌ খেয়াল থাকত না; মাছি এবং আরও কিছু যদি ঈশ্বর সেই সময় পাঠিয়ে দিতেন তাহলে খাবারের সঙ্গে তাও সে গলাধঃকরণ করত। পাকস্থলী ফুলে উঠতে শুরু করেছে দেখে সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াত, দোয়াত বার করত এবং বাড়িতে যে-সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে এসেছে সেগুলি নকল করত। সেরকম কোন কাগজ না থাকলে নিজের তৃপ্তির জন্য, ইচ্ছে করে নিজের জন্য সে নকল করত, বিশেষত কাগজটা যদি হত অসামান্য — রচনাশৈলীর সৌকর্যে নয় — কোন নতুন অথবা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশে লেখা বলে।

আকাকি আকাকিয়েভিচ কখনও কোন রকম আমোদপ্রমোদের প্রশ্রয় দিত না। যখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ধূসর আকাশ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যায় এবং গোটা কেরানিকুল, যে যেমন পারে, যার যার আয় ও নিজস্ব রুচি অনুযায়ী খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়েছে, ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়েছে, যখন ডিপার্টমেণ্টে কলম ঘষটানো সাঙ্গ করার পর, নিজেদের ও অন্যদের ডিপার্টমেণ্টের অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মে ছুটোছুটির পর, বড় ছটফটে এই লোকগুলি প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত যে-সমস্ত কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, সেগুলি সারার পর — যখন সরকারী কর্মচারীরা তাদের বাকি সময়টুকু উপভোগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে: যারা একটু বেশি চট্‌পটে স্বভাবের তারা থিয়েটারে ছোটে; কেউ বা রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে মহিলাদের মাথার টুপি নিরীক্ষণ ক'রে আমোদ পায়; কেউ যায় সান্ধ্য আসরে — অফিস কর্মচারীদের ছোটখাটো মহলের তারকা, কোন রূপসী তরুণীর উদ্দেশে গদগদ প্রশস্তি ঢালে; কেউ বা — আর এটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে — যায় স্রেফ তার অফিসের বন্ধুর কাছে, চারতলা অথবা তিনতলার ফ্ল্যাটে, যেখানে আছে দুটো ছোট ছোট ঘর, যেখানে সামনের হলঘর

কিংবা রান্নাঘর জাঁক দেখানোর মতো শৌখিন জিনিসে, ল্যাম্প কিংবা অন্য কোন টুকিটাকিতে সাজানো, যেগুলি কিনতে গিয়ে উৎসর্গ করতে হয়েছে অনেক কিছু, পরিত্যাগ করতে হয়েছে দৈনন্দিন আহার এবং পানভোজন — মোট কথা, যখন সমস্ত অফিস কর্মচারীরা তাদের বন্ধুবান্ধবদের ছোট ছোট ফ্ল্যাটে দলে দলে এসে জুটে ফ্ল্যাশ খেলে, সস্তার মুড়মুড়ে সেঁকা রুটি সহযোগে গেলাসে করে চায়ে চুমুক মারে, লম্বা কাঠের পাইপে ধোঁয়া টানে, তাস বাঁটার সময় উঁচু মহলের এমন কোন কেচ্ছাকাহিনী বলে যা থেকে কোন রুশী মানুষকে কখনও, কোন অবস্থাতেই নিবৃত্ত করা যায় না, অথবা নিদেনপক্ষে, যখন কোন কথা বলার থাকে না, হাজার বার বলে সেই বস্তাপচা চুটকি কোন এক কম্যান্ডাণ্ট সম্পর্কে, যার কাছে সংবাদ এসেছিল যে ফাল্কনের স্মৃতিমূর্তির*) লেজ কাটা গেছে — অর্থাৎ কিনা, যখন সকলে আমোদপ্রমোদে মেতে ওঠার জন্য উন্মুখ, এমন কি সেই সব মুহূর্তেও আকাকি আকাকিয়েভিচ কোন রকম আমোদপ্রমোদের প্রশ্রয় দিত না। তাকে কখনও কোন সান্ধ্য আসরে দেখা গেছে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। লেখার পর পরম পরিতৃপ্তিভরে সে বিছানায় শুতে যেত আর আগামী কালের কথা ভেবে, আগামী কাল নকল করার জন্য কিছু একটা ভগবান তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন এই কথা মনে করে সে খুশি হয়ে হাসত। এই ভাবে বয়ে চলছিল এমন একজন মানুষের শান্ত জীবনযাত্রা, যে বছরে চারশ' রুব্‌ল মাইনে পেয়ে নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ক্ষমতা রাখত। এই ভাবে হয়ত বয়েই চলত চরম বার্ধক্য পর্যন্ত, যদি না জীবনের পথে ছড়ানো থাকত নানা ধরনের বিপদ-আপদ, যা কেবল নিম্নপদস্থ কেরানির নয়, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলর, একান্ত সচিব, রাজ্যসচিব ও বিভিন্ন সরকারী পরামর্শদাতার — এমন কি যাঁরা কাউকে পরামর্শ দেন না, নিজেরাও কারও কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন না — তাঁদেরও জীবনের পথে ছড়ানো থাকে।

যারা বছরে চারশ' রুব্‌ল বা তার কাছাকাছি মাইনে পায়, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাদের সকলের এক প্রবল শত্রু আছে। এই শত্রুটি আর কেউ নয় — আমাদের উত্তরের হিম, যদিও লোকে অবশ্য বলে থাকে যে স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা খুবই ভালো। সকাল নয়টার সময়, ঠিক সেই সময়টাতে, যখন রাস্তাঘাট ডিপার্টমেণ্টগামী কর্মচারীতে ছেয়ে যায়, তখন সে কোন বাছবিচার না করে সবার নাকের ওপর এত জোরে, এমন জ্বালাধরা

টুসকি মারে যে বেচারি সরকারী কর্মচারীরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই সময় হিমে যখন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও কপাল কন্‌কন্‌ করতে থাকে এবং চোখে জল আসে, তখন নিম্নপদস্থ কেরানিরা মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে অসহায়। বাঁচার একমাত্র উপায় হল পাতলা, জীর্ণ ওভারকোট গায়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে দিয়ে পাঁচ-ছয়টা রাস্তা পেরিয়ে অফিসের সামনে দরোয়ানের ঘরে এসে আচ্ছা করে মেঝেতে পা ঠোকা, যতক্ষণ না এই উপায়ে, রাস্তায় জমে যাওয়া তাদের যাবতীয় চাকুরীজীবী ক্ষমতা ও প্রতিভার আড় ভাঙে। কিছুকাল হল আকাকি আকাকিয়েভিচ অনুভব করছে যে প্রয়োজনীয় দূরত্বটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে পেরোনোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার পিঠ এবং কাঁধ বিশেষ করে কেমন যেন একটু বেশি মাত্রায় কন্‌কন্‌ করছে। শেষ পর্যন্ত সে ভাবল এটা তার ওভারকোটের কোন ত্রুটি নয় ত? বাড়িতে সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর সে আবিষ্কার করল দুটো-তিনটে জায়গায়, ঠিক পিঠে এবং কাঁধেই, সেটা হয়ে গেছে জিরজিরে বস্তার কাপড়ের মতো: বনাতটা ঘষা খেয়ে খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ভেতরের লাইনিং ছিঁড়ে ফেঁসে গেছে।

এখানে আপনাদের জানা দরকার যে আকাকি আকাকিয়েভিচের ওভারকোটও অফিসের অন্যান্য কেরানিদের ঠাট্টাবিদ্রূপের বস্তু; এমনকি অভিজাত ওভারকোট আখ্যাটি বাতিল করে দিয়ে ওটার নাম দেওয়া হয় আলখিল্লা। আসলে ওভারকোটটার গড়নই ছিল কেমন যেন একটা বেঢপ গোছের: কলারটা ওভারকোটের অন্যান্য অংশ জুতসই করে তোলার কাজে লাগানোর ফলে বছরের পর বছর ক্রমেই হ্রস্বকায় হয়ে আসছে। এই জুতসই করার কাজে দরজির শিল্পকর্মের কোন নিদর্শন থাকত না, ফলে ওভারকোটটা দেখতে হয় হুবহু বস্তার মতো, কদাকার। ব্যাপারটা কী, দেখার পর আকাকি আকাকিয়েভিচ ঠিক করল ওভারকোটটাকে নিয়ে যেতে হয় দরজি পেত্রোভিচের কাছে। পেত্রোভিচ বাস করত চার তলার কোন একটা জায়গায়, যেখানে যেতে হয় পেছনের সিঁড়ি দিয়ে। সে তার টেরা চোখ ও মুখময় বসন্তের দাগ সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য গ্রাহকদের প্যান্টলুন ও টেইলকোট মেরামতের কাজ দস্তুরমতো ভালো চালিয়ে যেত — বলাই বাহুল্য যখন প্রকৃতিস্থ থাকত, এবং অন্য কোন চাড় সে তার মাথার ভেতরে পোষণ করত না। এই দরজিটি সম্পর্কে অবশ্য বেশি কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যেমন দস্তুর, যেহেতু উপাখ্যানের

প্রতিটি পাত্রপাত্রীর চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়াটাই রীতি, অতএব আমি নাচাড় — পেত্রোভিচকেও এখানে টেনে আনতে হচ্ছে।

গোড়ায় লোকে তাকে ডাকত স্রেফ গ্রিগরি নামে। সে ছিল কোন এক জমিদারের ভূমিদাস। পেত্রোভিচ পরিচয় তার শুরু হল তখন থেকে যখন ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর সে পালাপার্বণ উপলক্ষে, মাত্রাতিরক্ত পান করতে লাগল—প্রথম প্রথম বড় বড় উৎসব উপলক্ষে, অতঃপর নির্বিচারে যে-কোন ধর্মীয় উৎসবে — পঞ্জিকায় ক্রুশচিহ্ন থাকলেই হল। এদিক থেকে সে তার পিতৃপুরুষের রেওয়াজের অনুগামী ছিল এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে তাকে বিষয়ী মহিলা ও জার্মান বলত। স্ত্রীর প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন তার সম্পর্কেও দুটি কথা বলতে হয় বৈ কি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল এইটুকুই জানা গেছে যে পেত্রোভিচের স্ত্রী আছে আর সে মাথায় লেসের টুপি পর্যন্ত পরে, রুমাল বাঁধে না; আর সৌন্দর্য নিয়ে মনে হয় তার দেমাক করার মতো কিছু ছিল না; বেশি হলে তাকে দেখে একমাত্র রক্ষিবাহিনীর সৈন্যরা লেসের টুপির কানার নীচে উঁকি মেরে গোঁফ জোড়া নাচাত আর গলা থেকে বার করত কেমন যেন বিদ্ঘুটে আওয়াজ।

যে সিঁড়ি বয়ে পেত্রোভিচের কাছে যেতে হচ্ছে, যথাযথ বর্ণনা দিতে গেলে, সেটা আগাগোড়া জলে আর এঁটোকাঁটায় একাকার, আর তার সর্বত্র এমন একটা ঝাঁঝালে গন্ধ যে চোখ জ্বালা করে এবং সকলেই জানেন যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যে-কোন বাড়ির পেছনের সিঁড়ির এটা হল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাই হোক, সিঁড়ি বয়ে উঠতে উঠতেই আকাকি আকাকিয়েভিচ ভাবতে লাগল পেত্রোভিচ কত চাইতে পারে, মনে মনে এটাও ঠিক করে নিল দু রুব্‌লের বেশি দেবে না। দরজা খোলাই ছিল, কেননা গৃহকর্ত্রী কোন একটা মাছ রান্না করতে গিয়ে রান্নাঘরে এত বেশি ধোঁয়ার আমদানী করে ফেলেছে যে আরসোলা পর্যন্ত নজরে পড়ার উপায় ছিল না। আকাকি আকাকিয়েভিচ যে কখন রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেল তা খোদ কর্ত্রীরও চোখে পড়ল না। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেল একটা রঙ-না-করা চওড়া কাঠের টেবিলের ওপর জোড়াসন করে তুর্কী পাশার ভঙ্গিতে বসে আছে পেত্রোভিচ। দরজিরা সচরাচর যেমনভাবে কাজে বসে, সেও তেমনি বসে ছিল খালি পায়ে। প্রথমেই আকাকি আকাকিয়েভিচের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অতি পরিচিত বুড়ো আঙুলের নখটার ওপর — কচ্ছপের

খোলের মতো শক্ত ও মোটা, কেমন যেন বিকৃত। পেত্রোভিচের গলায় ঝুলছিল সুতো ও রেশমের লাছি আর তার কোলের ওপর ছিল একটা পুরনো কাপড়ের ফালি। সে গত মিনিট তিনেক ধরে ছুঁচের ফুটোয় সুতো গলানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হতে না পেরে অন্ধকারের ওপর, এমন কি সুতোর ওপরও চটে গিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে গজগজ করছিল: 'এটা ছাই ফুটো দিয়ে গলেও না; আমাকে তিত-বিরক্ত করে ছাড়লি, কী আপদ রে বাবা!' আকাকি আকাকিয়েভিচ এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়ল যে সে এমন একটা মুহূর্তে এসে পড়েছে যখন পেত্রোভিচ রেগে টং হয়ে আছে। সে পেত্রোভিচকে ফরমাস দেওয়া পছন্দ করত তখনই যখন পেত্রোভিচ বেশ খানিকটা রঙে থাকত, কিংবা পেত্রোভিচের স্ত্রীর ভাষায়, যখন 'কড়া চোলাইয়ের কৃপায় কানা শয়তান ঝিম মেরে গেছে'। এই অবস্থায় পেত্রোভিচ সচরাচর নিজের দাবিদাওয়া ছেড়ে দিয়ে রফা করার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখাত, এমন কি বারবার মাথা নোয়াত, ধন্যবাদ জানাত। তার পর অবশ্য আসত তার স্ত্রী, কাঁদতে কাঁদতে বলত যে স্বামী মাতাল অবস্থায় ছিল, তাই সস্তায় কাজ করতে রাজী হয়ে গেছে; তবে তাতে বড়জোর আরও দশটা কোপেক যোগ করতে হত — তাহলেই কাজ তোমার হাসিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পেত্রোভিচ প্রকৃতিস্থ, আর সেই কারণে, কড়া মেজাজের, একগুঁয়ে — কত দর হেঁকে বসে কে জানে? আকাকি আকাকিয়েভিচ মনে মনে এটা আঁচ করে যাকে বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, সেই পন্থাই অবলম্বনে প্রবৃত্ত হল, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। পেত্রোভিচ নিজের একমাত্র চোখটা কুঁচকে তার দিকে তাকাল আর আকাকি আকাকিয়েভিচেরও মুখ থেকে বেরিয়ে এলো:

'নমস্কার পেত্রোভিচ!'

'আপনার কুশল কামনা করি মশাই,' বলেই পেত্রোভিচ আড়চোখে তাকাল আকাকি আকাকিয়েভিচের হাতের দিকে, কী ধরনের শিকার সে এনেছে তা দেখার উদ্দেশ্যে।

'পেত্রোভিচ, আমি, মানে, আমি এসিছি...'

এখানে বলা দরকার যে আকাকি আকাকিয়েভিচ বেশির ভাগই এমন সমস্ত অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ এবং ঐ রকম আরও সব শব্দের সাহায্যে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করত যেগুলির আদৌ কোন অর্থ হয় না। ব্যাপার যখন বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াত তখন তার অভ্যাস ছিল বাক্য আদৌ শেষ

না করা, ফলে অতি ঘন ঘন 'মোদ্দা কথাটা হল এই যে...' বলে বক্তব্য শুরু করেও বাকিটা আর বলতে পারত না, নিজেই খেই হারিয়ে ফেলত, তার মনে হত যেন যা বলার বলে ফেলেছে।

'কী ব্যাপার?' বলার সঙ্গে সঙ্গে পেত্রোভিচ তার একমাত্র চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আকাকি আকাকিয়েভিচের গোটা ইউনিফর্মটা — কলার থেকে শুরু করে হাতা, পিঠ, পেছনের অংশের কিনারা — এ সবই ছিল তার অতিপরিচিত, যেহেতু তারই হাতের কাজ।

এটাই হল দরজিদের দস্তুর — কোন খদ্দেরকে দেখলে প্রথমে তারা যা করে থাকে।

'হ্যাঁ ব্যাপারটা হল এই পেত্রোভিচ... আমার এই ওভারকোটটা... এর বনাতটা... দেখতে পাচ্ছ, বাদবাকি সব জায়গায় বেশ মজবুত আছে, খানিকটা ধুলো জমেছে এই যা, আর তাইতে মনে হচ্ছে যেন পুরনো, অথচ এটাকে নতুনই বলা চলে, এই ত কেবল একটা জায়গায়... পিঠের দিকে, আর এই কাঁধের একটা জায়গায় খানিকটা ফেঁসে গেছে, আর এই যে এই কাঁধটাতেও খানিকটা — দেখতেই পাচ্ছ আর কোথাও নেই। কাজেও তেমন একটা বেশি সময়ের নয়...'

পেত্রোভিচ আলখাল্লাটা তুলে নিয়ে প্রথমে সেটাকে টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখল, অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করল, মাথা নাড়ল তারপর জানলার তাকের দিকে হাত বাড়াল একটা গোল নস্যিদানের উদ্দেশ্যে, যেটার ওপর আঁকা ছিল কোন এক জেনারেলের প্রতিকৃতি — ঠিক কোন্ জেনারেলের তা জানার উপায় নেই, কেননা যে জায়গায় মুখটা ছিল সেটা আঙুলের খোঁচায় খোঁচায় ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ায় একটা চারকোনা কাগজের টুকরো তার ওপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নস্যি টানার পর পেত্রোভিচ আলখাল্লাটা হাতে করে আলোর সামনে মেলে ধরে নিরীক্ষণ করে ফের মাথা নাড়ল। তারপর লাইনিং উল্টে দেখল, এবারেও মাথা নাড়ল, কাগজের টুকরো সাঁটা জেনারেলের প্রতিকৃতিশোভিত ঢাকনাটা খুলল, নাকে নস্যি গোঁজার পর নস্যিদানটি বন্ধ করে লুকিয়ে রাখল, অবশেষে বলল:

'না মেরামত করা যাবে না: পোশাকটার দফা রফা হয়ে গেছে!'

এই কথায় আকাকি আকাকিয়েভিচের বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'কেন যাবে না পেত্রোভিচ?' প্রায় শিশুর মতো করুণ সুরে সে বলল।

'কেবল কাঁধদুটোই ফে'সে গেছে এই যা, তোমার কাছে কিছু টুকরোটাকরা আছে ত...'

'আরে টুকরোটাকরা ত খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে, সে পাওয়া যাবে,' পেত্রোভিচ বলল, 'কিন্তু সেলাই করে জোড়া লাগান যাবে না: জিনিসটা একেবারেই পচে গেছে, ছুঁচ দিয়ে ছুঁতে না ছুঁতে খসে পড়ে যাবে।'

'তা খসে পড়ে যাক গে, তুমি না হয় সঙ্গে সঙ্গে তালি লাগিয়ে দাও।'

'কিন্তু তালি যার ওপর লাগাব সেই জায়গাই ত নেই, তালিটা লেগে থাকবে কিসের ওপর? আদত কাপড়টা ত টেকসই হওয়া চাই। এককালে বনাতটা ভালোই ছিল কিন্তু এখন জোর হাওয়া বইলেই হল — টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে।'

'কিন্তু কোন রকমে জোড়াতালি লাগিয়ে দাও না। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, মানে, কী করে...'

'না,' পেত্রোভিচ জোর দিয়ে বলল, 'কিছুই করার নেই। একেবারেই সঙ্গীন অবস্থা। বরং কড়া ঠাণ্ডার সময় যখন আসবে তখন এটা কেটে বুটজুতোর ভেতরের ফেটি বানিয়ে পরুন, কেননা আপনার মোজায় পা গরম হয় না। ঐ মোজাটোজা বেরিয়েছে জার্মানদের মাথা থেকে, লোকের কাছ থেকে বেশি টাকা মারার মতলবে (পেত্রোভিচ সুযোগ পেলেই জার্মানদের খোঁচা দিতে ছাড়ত না); আর ওভারকোট আপনার, দেখা যাচ্ছে একটা নতুনই বানাতে হবে।'

'নতুন' শব্দটা শোনামাত্র আকাকি আকাকিয়েভিচ চোখে সরষে ফুল দেখল, আর ঘরের ভেতরে যা কিছু ছিল সে সবই তার সামনে গুলিয়ে যেতে লাগল। একমাত্র যে জিনিসটি সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তা হল পেত্রোভিচের নস্যিদানির ঢাকনায় জেনারেলের কাগজ-সাঁটা মুখ।

'নতুন? সে কী করে হয়?' এমন ভাবে সে কথাগুলি বলল যেন তখনও স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে। 'এর জন্য যত টাকার দরকার তা যে আমার নেই!'

'হ্যাঁ, নতুন,' নিষ্ঠুরতা মেশানো শান্ত স্বরে বলল পেত্রোভিচ।

'আর যদি নতুন বানাতেই হয় তা হলে তার জন্য কী রকম...'

'মানে, বলতে চান কত পড়বে?'

'হ্যাঁ।'

'এই ধরুন তিনটে পঞ্চাশ রুবলের প্যাতি কিংবা তার সামান্য বেশি খরচ পড়বে,' পেত্রোভিচ অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে বলল।

লোকটা তীব্র প্রতিক্রিয়া খুব বেশি পছন্দ করত, হঠাৎ কাউকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি করে দিয়ে এই ধরনের কথার পর হতবুদ্ধি ব্যক্তির মুখের চেহারা কেমন হয় তা আড়চোখে দেখতে পছন্দ করত।

'একটা ওভারকোটের জন্য দেড়শ' রুবল!' বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ আর্তনাদ করে উঠল; চিরকাল মৃদু কণ্ঠস্বরের জন্য যার বৈশিষ্ট্য, জীবনে বোধহয় এই প্রথম তার কণ্ঠস্বর চড়ল।

'হ্যাঁ মশাই,' পেত্রোভিচ বলল, 'তাও আবার দেখতে হবে কেমন ওভারকোট। যদি নেউলের লোমের কলার চান আর রেশমের লাইনিং দেওয়া মাথা-ঢাকনা দিতে হয় তাহলে দুশ' উঠে যাবে।'

'আমার কথাটা একবার শোন, পেত্রোভিচ,' পেত্রোভিচের কথায় এবং তার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার দিকে কর্ণপাত না করে, কর্ণপাতের কোন চেষ্টা না করে অনুনয়ের সুরে সে বলল, 'কোন মতে জোড়াতালি লাগিয়ে দাও যাতে অন্তত আরও কিছুটা কাল চলে যায়।'

'আরে না না, এর মানে হবে মিছিমিছি কাজ করা আর খামোকা টাকা খরচ করা,' পেত্রোভিচ এই কথা বলার পর আকাকি আকাকিয়েভিচ সম্পূর্ণ ভগ্নমনোরথ হয়ে প্রস্থান করল।

সে চলে যাবার পর পেত্রোভিচ আরও অনেকক্ষণ অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল, কাজে হাত দিল না। সে তৃপ্তি পাচ্ছিল এই ভেবে যে নিজের ইজ্জত সে নষ্ট করে নি, আর সূচীশিল্পের প্রতি বেইমানিও করে নি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আকাকি আকাকিয়েভিচের মনে হচ্ছিল সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

'ব্যাপারটা তা হলে এই,' সে আপন মনে বলল, 'আমি অবশ্য ভাবতেই পারি নি যে এরকম দাঁড়াবে...' এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার যোগ করল: 'এই তা হলে ব্যাপার! শেষ অবধি তাহলে এই দাঁড়াল, আমি অবশ্য আগে থাকতে একেবারেই আন্দাজ করতে পারি নি যে এমন হবে।' অতঃপর আবার নেমে এলো দীর্ঘ নীরবতা, যার পর সে বলল: 'হুঁ, বোঝ কাণ্ড! বোঝ দেখি... একেবারে যাকে বলে আচমকা... তাহলে... এটা যে কোন মতেই... কী যে অবস্থা!'

একথা বলার পর সে বাড়ির দিকে না গিয়ে আনমনে হাঁটা দিল সম্পূর্ণ উলটো দিকে। পথে এক চিমনিওয়ালা কালিঝুলিমাখা পুরো একটা পাশ ঘষটে আকাকি আকাকিয়েভিচের গা ঘেঁষে চলে যেতে তার একটা কাঁধ পুরোপুরি কালো হয়ে গেল; একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল — সেখানকার ওপরতলা থেকে তার ওপর ঝরে পড়ল গোটা এক রাশ চুন। এসবের কোনটাতেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না; ইতিমধ্যে গুমটিতে প্রহরারত এক কনস্টেব্‌ল্ যখন তার হাতিয়ার টাঙ্গিটা পাশে রেখে শিঙের নস্যিদান থেকে কড়া-পড়া হাতের তালুতে নস্যি ঝাড়ছিল ঠিক সেই সময় তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতে আকাকি আকাকিয়েভিচের হুঁশ ফিরে এলো — তা-ও আবার তখনই যখন কনস্টেব্‌ল্‌টি তাকে বলল: 'আরে গেল যা, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? ফুটপাতে আর কোন জায়গা নেই?' এর ফলে সে ফিরে তাকিয়ে বাড়ির দিকে মোড় নিতে বাধ্য হল। কেবল বাড়ি ফিরে এসেই সে গুছিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে লাগল, তার নিজের অবস্থার স্পষ্ট ও খাঁটি স্বরূপ অনুধাবন করতে পারল। এবারে আর বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, যুক্তিতর্ক দিয়ে ও অকপটে সে নিজের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করল, যেমন লোকে বলে কোন বিচক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে, যার সঙ্গে নিতান্তই ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে।

'না, এভাবে নয়,' আকাকি আকাকিয়েভিচ বলল, 'এখন পেত্রোভিচের সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই: ওর অবস্থাটা এখন... দেখেশুনে মনে হয় বউ বোধহয় ওকে একচোট ধোলাই দিয়েছে। আমি বরং রোববার সকালে আসব: তার আগের দিনের — শনিবারের সন্ধের মৌজের পর সে তেরছা চোখে তাকাবে আর ঢুলু ঢুলু অবস্থায় থাকবে, ঠিক তখনই দরকার হবে খোঁয়ারি ভাঙার, কিন্তু বউ পয়সা দেবে না। এই সময় আমি ওর হাতে গুঁজে দেব দশটা কোপেক, তাহলেই ও অনেকটা বাগে আসবে আর ওভারকোটটাও তখন...'

মনে মনে এই বিবেচনা করে আকাকি আকাকিয়েভিচ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পরের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর দূর থেকে যখন দেখতে পেল যে পেত্রোভিচের স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে, তখনই গিয়ে হাজির হল সটান পেত্রোভিচের কাছে। ঠিকই তাই, শনিবারের পর পেত্রোভিচের দৃষ্টি বেশ টেরিয়ে গেছে, তার মাথাটা মেঝের দিকে ঝুঁকে আছে, ভাবটা রীতিমতো ঢুলু ঢুলু; কিন্তু তা হলে কী হবে, যেই

মুহূর্তে জানতে প্যারল ব্যাপারটা কী অমনি যেন শয়তান তার ওপর এসে ভর করল।

'সে হয় না,' পেত্রোভিচ বলল, 'নতুন ওভারকোটের ফরমাস দিতেই হবে আপনাকে।'

আর ঠিক এই সময়ই আকাকি আকাকিয়েভিচ দশটা কোপেক তার হাতে গংজে দিল।

'আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ মশাই, আপনার স্বাস্থ্য কামনায় সামান্য দু-এক ঢোক খেয়ে একটু বল পাব,' পেত্রোভিচ বলল। 'তবে মাফ করবেন, ঐ ওভারকোটের কথা আর তুলবেন না: ওটা কোন কাজেই আসবে না। আমি আপনাকে একটা নতুন ওভারকোট সেলাই করে দেব, খাসা বানিয়ে দেব, আর কোন কথা নয়।'

আকাকি আকাকিয়েভিচ তখনও মেরামতের প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেত্রোভিচ কোন আমল না দিয়ে বলল:

'নতুন ওভারকোট আমি আপনাকে সেলাই করে দেবই দেব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। এমন কি বিলকুল হাল ফ্যাশনেরও হতে পারে: রুপোর বকলস-আঁটা কলার বসানো যেতে পারে।'

তখনই আকাকি আকাকিয়েভিচ বুঝতে পারল যে নতুন ওভারকোট ছাড়া চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটাও একেবারে দমে গেল। আসলে কী উপায়ে, কী দিয়ে, কোন্ টাকায় তা বানানো সম্ভব? অবশ্য অংশত নির্ভর করা যেতে পারত উৎসব উপলক্ষে ভবিষ্যতে যে বোনাসটা পাওয়া যাবে তার ওপর, কিন্তু সেই টাকা বহুকাল হল খাটানো হয়ে গেছে, আগে থেকেই তার বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। নতুন প্যান্টলুন দরকার, পুরনো বুটজোড়ায় সোল্ লাগাতে হয়েছে — সেই বাবদ মুচির পাওনা পুরনো ঋণ শোধ দিতে হবে, সেলাইয়ের ফরমাস দিতে হয়েছে তিনটে জামার আর গোটা দুয়েক অন্তর্বাসের — যার উল্লেখ ছাপার অক্ষরে করা শিষ্টাচার সম্মত নয়: সব টাকাই পুরোপুরি খরচ হয়ে যাবার কথা। এমন কি বড় সাহেব যদি তেমন দয়াপরবশ হয়ে চল্লিশ রুব্লের বদলে পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ রুব্লও বোনাস দেন তবু যা থেকে যাচ্ছে তা নিতান্তই নগণ্য — ওভারকোটের পুঁজি হিশেবে হবে সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। যদিও সে অবশ্যই জানত যে অনেক সময় পেত্রোভিচ হঠাৎ খেয়ালের বশে এমন

একটা বিতিকিচ্ছিরি রকমের চড়া দর হেঁকে বসে যে তার স্ত্রী পর্যন্ত স্থির না থাকতে পেরে বলে ফেলে: 'এ কী কাণ্ড, খেপে গেলে ন্যাকি, বুদ্ধু কোথাকার! অন্য সময় বিনি পয়সায় কাজ নেবে, আর এখন দেখ এমন এক দাম হেঁকে বসল, যে দরে ও নিজেও বিকোবে না।' যদিও সে অবশ্যই জানত যে পেত্রোভিচ আশি রুব্‌লেও কাজটা নিতে রাজী হবে; কিন্তু এই আশিটা রুব্‌লই বা আসবে কোত্থেকে? খুঁজে পেতে দেখলে বড়জোর কুড়িয়ে বাড়িয়ে অর্ধেকটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে — এমন কি হয়ত বা তার একটু বেশিও; কিন্তু বাকি অর্ধেক কোথায় পাওয়া যায়?.. তবে, আগে পাঠকের জানা দরকার প্রথম অর্ধেকটা এলো কোথা থেকে। আকাকি আকাকিয়েভিচের অভ্যাস ছিল খরচের প্রত্যেকটি রুব্‌ল থেকে একটি করে দু কোপেকের মুদ্রা সরিয়ে রাখা। সেগুলি রাখত সে চাবি দিয়ে আটকানো একটা ছোট বাক্সের মধ্যে, আর বাক্সটার ঢাকনায় ছিল পয়সা ফেলার জন্য একটা ফুটো। প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর সে জমানো তামার মুদ্রা গুনে দেখে সেগুলির বদলে সমান পরিমাণ খুচরো রুপোর মুদ্রা রাখত। এটা সে অনেক দিন যাবৎ করে আসছে। এই ভাবে কয়েক বছরে জমানো অর্থের পরিমাণ চল্লিশ রুব্‌লেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং অর্ধেক হাতে আছে; কিন্তু বাকি অর্ধেক আসবে কোথা থেকে? কোথা থেকে আসবে বাকি চল্লিশ রুব্‌ল? আকাকি আকাকিয়েভিচ ভেবে ভেবে শেষকালে ঠিক করল তার রোজকার খরচপত্র কমাতে হবে — অন্তত এক বছরের জন্য ত বটেই: সন্ধ্যাকালীন চায়ের অভ্যাস ছাড়তে হবে, সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালানো চলবে না, আর নেহাৎই যদি দরকার হয় তা হলে বাড়িওয়ালির ঘরে গিয়ে তার মোমবাতির আলোয় কাজ করতে হবে; রাস্তায় চলতে গিয়ে যতদূর সম্ভব আলতো করে ও সন্তর্পণে, প্রায় আলগোছে বাঁধানো ফলক ও খোয়ার ওপর পা ফেলতে হবে যাতে জুতোর তলি তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে না যায়; ধোপার বাড়িতে জামাকাপড় যতদূর পারা যায় কম ধুতে দিতে হবে, আর জামাকাপড় যাতে বেশি পরার ফলে ফেঁসে না যায় তার জন্য বাড়িতে এসেই তা খুলে ফেলে পরতে হবে মোটা সুতীর কাপড়ের ড্রেসিং গাউনটা — বহুকালের পুরনো বটে, তবে খোদ সময় পর্যন্ত সেটার প্রতি কৃপাপরবশ। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, প্রথম প্রথম এহেন বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে অভ্যস্ত হওয়া তার পক্ষে খানিকটা কঠিন মনে হয়, কিন্তু পরে কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেল এবং দিব্যি

চলতে লাগল; এমন কি সন্ধ্যাবেলায় সম্পূর্ণ উপোস দেবার অভ্যাসও সে করল; অবশ্য উপোস দিলে কী হবে, তার মনের খোরাক ছিল, একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল ভবিষ্যতের ওভারকোট। এই সময় থেকে তার অস্তিত্বটাই কেমন যেন পূর্ণতর হয়ে উঠল, মনে হল যেন সে বিয়ে করেছে, যেন তার সঙ্গে সঙ্গে আছে অন্য একটি মানুষ, যেন সে আর একা নয়, যেন কোন মোহিনী জীবনসঙ্গিনী জীবনের পথ পরিক্রমায় তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে; সেই সঙ্গিনীটি আর কেউই নয়, সে হল মোটা তুলোয় ঠাসা, মজবুত লাইনিং দেওয়া, টেকসই সেই ওভারকোট। সে খানিকটা সজীব হয়ে উঠল, এমন কি তার চরিত্রও হয়ে উঠল আরও দৃঢ় — এমন একজন মানুষের মতো যার নির্দিষ্ট, বিশেষ লক্ষ্য আছে। তার মুখ থেকে, আচার-আচরণ থেকে আপনাআপনি মিলিয়ে গেল সংশয়, দ্বিধা — এক কথায়, যাবতীয় ইতস্তত ও অনিশ্চিত ভাব। সময় সময় তার চোখে দেখা যায় আলোর উদ্ভাস, এমন কি মাথার ভেতরে খেলে যায় অতি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া চিন্তা — আচ্ছা সত্যিই ত, কলারে নেউলের পশম লাগালে কেমন হয়? এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা তাকে প্রায় অন্যমনস্ক করে ফেলে। একবার ত কাগজে লেখা নকল করতে গিয়ে সে আরেকটু হলেই এমন একটা ভুল করে ফেলেছিল যে তার মুখ দিয়ে প্রায় জোরে 'উঃ!' আওয়াজ বেরিয়ে আসে এবং সে ক্রুশ করে বসে। প্রতি মাসে অন্তত একবার করে হলেও সে পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যেত ওভারকোট সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য, জানতে চাইত কোথায় পশমী কাপড় কেনা ভালো, কোন্ রঙের কেনা উচিত এবং কতই বা দর হতে পারে; খানিকটা চিন্তিত হলেও সব সময় বাড়ি ফিরে আসত উৎফুল্ল হয়ে, মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে যে অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন এ সবই কেনা হবে, যখন ওভারকোটটা তৈরি হবে। কাজটা সে যেমন আশা করেছিল তার চেয়ে বরং তাড়াতাড়িই এগিয়ে গেল। সমস্ত প্রত্যাশার মাত্রা ছাড়িয়ে বড় সাহেব আকাকি আকাকিয়েভিচকে যে বোনাস দিলেন তা চল্লিশ নয়, পঁয়তাল্লিশও নয়, পুরো ষাট রুব্‌ল: তিনি কি আঁচ করে ফেলেছেন যে আকাকি আকাকিয়েভিচের ওভারকোট দরকার, নাকি অমনি অমনিই এমন কাণ্ড ঘটে গেল? — সে যাই হোক না কেন, কেবল এই ভাবেই আকাকি আকাকিয়েভিচের হাতে এসে গেল বাড়তি বিশ রুব্‌লে। এই পরিস্থিতির ফলে কাজ দ্রুত এগিয়ে গেল। আরও দু-তিন মাস অল্পস্বল্প অনশনে কাটানোর পর আকাকি

আকাকিয়েভিচের ঠিকই জমে গেল প্রায় আশি রুবল মতো। তার হৃৎপিন্ড সাধারণত রীতিমতো শান্ত থাকে, কিন্তু এখন তা দ্রুত ওঠা-পড়া করতে লাগল। প্রথম দিনই সে পেত্রোভিচকে সঙ্গে নিয়ে গেল দোকানে। তারা একটা খুব চমৎকার পশমী কাপড়ের থান কিনল — এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই, কেন না গত কয়েক মাস ধরেই তারা এ নিয়ে ভাবছিল এবং এমন মাস কদাচিৎ গেছে যখন তারা দোকানে ঘুরে ঘুরে দাম যাচাই করে দেখে নি; এমন কি পেত্রোভিচ নিজেও বলল যে এর চেয়ে ভালো পশমী কাপড় আর হয় না। লাইনিং-এর জন্য তারা পছন্দ করে কিনল ক্যালিকো, তবে এত টেকসই ও ঘন জমিনের যে পেত্রোভিচের কথায়, রেশমী কাপড়ের চেয়েও ভালো, এমন কি দেখতেও অনেক চমৎকার, অনেক চকচকে। নেউলের লোমশ চামড়া তারা কিনল না, কেন না সত্যি সত্যিই বেশ দাম; তার বদলে তারা দোকানে খুঁজে পেতে যতটা ভালো পাওয়া যায় বিড়ালের চামড়া কিনল — এমনই চামড়া যে দূর থেকে যে কোন সময় নেউলের চামড়া বলে মনে হতে পারে। পেত্রোভিচ পুরো দুটি সপ্তাহ ওভারকোট তৈরির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকল, যেহেতু ভেতরে গদি পুরে অনেক ফোঁড় দিতে হয়েছে; নইলে অনেক আগেই তৈরি হয়ে যেত। কাজের জন্য পেত্রোভিচ নিল বারো রুবল — এর কমে আর কোনমতে সম্ভব নয়: খুদে খুদে দ্বিগুণ ফোঁড় দিয়ে সমস্তটা রেশমী সুতোয় চূড়ান্ত ভাবে সেলাই করা; আর প্রতিটি ফোঁড়ের ওপর পেত্রোভিচ পরে নিজের দাঁত চালিয়ে যাবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ অলঙ্করণ।

ঠিক কোন্ দিন তা বলা কঠিন — তবে সম্ভবত সেটা ছিল আকাকি আকাকিয়েভিচের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন — যে দিন শেষ পর্যন্ত পেত্রোভিচ বয়ে আনল ওভারকোটটা। নিয়ে এলো ভোরবেলায়, যখন ডিপার্টমেন্টে যাওয়া দরকার তার ঠিক আগে আগে। ওভারকোটের পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর হতে পারত না, কেন না ইতিমধ্যে রীতিমতো তীব্র হিম শুরু হয়ে গেছে এবং তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একজন ভালো দরজির মতো ভাব করে পেত্রোভিচ হাজির হল ওভারকোট নিয়ে। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল এমন একটা গুরুগম্ভীর ভাব যা আকাকি আকাকিয়েভিচ এর আগে কখনও দেখে নি। সে যেন পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করতে পারছিল যে একটা বেশ বড় কাজ করে ফেলেছে; যে-সমস্ত দরজি নতুন পোশাক বানায় এবং যারা কেবলই লাইনিং

সেলাই করে ও পোশাক মেরামত করে তাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এ সম্পর্কে হঠাৎ যেন সে সচেতন হয়ে পড়েছে। নাক মোছার বড় রুমালে করে সে ওভারকোটটা বয়ে এনেছিল — সেখান থেকে সে ওটাকে বার করল: রুমালটা ছিল সদ্য ধোপার বাড়ির কাচা। অতঃপর সে রুমাল ভাঁজ করে পকেটে পুরল ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে। ওভারকোটটা বার করার পর সে রীতিমতো গর্বভরে তাকাল এবং দু হাতে তুলে ধরে বেশ কায়দা করে আকাকি আকাকিয়েভিচের কাঁধে ছুঁড়ে দিল; পরে ওটাকে টেনেটুনে পেছন দিকে নীচ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে পাট করে দিল; এর পর বোতাম খোলা অবস্থায়ই ওভারকোট দিয়ে আকাকি আকাকিয়েভিচকে ঢেকে দিল। মধ্যবয়সী লোকের যেমন স্বভাব — আকাকি আকাকিয়েভিচ হাতা গলিয়ে ওটা পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পেত্রোভিচ তাকে হাতা গলিয়ে পরতেও সাহায্য করল — দেখা গেল হাতাও চমৎকার ফিট করেছে। মোটকথা, ওভারকোটটা গায়ে যেখানে যেমন লাগার দস্তুরমতো তেমনি লেগেছে। পেত্রোভিচ এই সুযোগে বলতে ছাড়ল না যে যেহেতু সে সাইনবোর্ড ছাড়া ছোট রাস্তার ওপর আছে, তায় আবার আকাকি আকাকিয়েভিচকে বহুকাল হল জানে, একমাত্র এই কারণেই এত কম দাম নিয়েছে; নেভ্স্কি এভিনিউতে গেলে একমাত্র কাজের জন্য তার কাছ থেকে নিয়ে নিত পঁচাত্তর রুব্ল। এ নিয়ে পেত্রোভিচের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছে আকাকি আকাকিয়েভিচের ছিল না, তা ছাড়া যে-সমস্ত চড়া চড়া অঙ্কের উল্লেখ করে পেত্রোভিচ লোককে হকচকিয়ে দিতে ভালোবাসত তাতে আকাকি আকাকিয়েভিচের ভয় ছিল। সে তার দাম শোধ করে দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল এবং তৎক্ষণাৎ নতুন ওভারকোট পরে রাস্তায় বেরিয়ে রওনা দিল ডিপার্টমেণ্টের দিকে। পেত্রোভিচও তার পেছন পেছন বেরিয়ে এলো, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সে আরও অনেকক্ষণ ধরে দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওভারকোটটা, তারপর ইচ্ছে করে এক পাশে চলে গেল, বাঁক নিয়ে পাশের একটা আঁকাবাঁকা গলির ভেতরে ঢুকে পড়ে আবার বড় রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে এসে অন্য পাশ থেকে অর্থাৎ সরাসরি সামনাসামনি তার ওভারকোটটাকে আরও একবার দেখার উদ্দেশ্যে। এদিকে আকাকি আকাকিয়েভিচ চলছিল পরম উল্লসিত হয়ে। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতি মিনিটে সে অনুভব করছিল যে তার কাঁধে রয়েছে নতুন ওভারকোট, মনে মনে তৃপ্তি বোধ করে কয়েক বার মৃদু হাসলও।

সত্যি কিন্তু, লাভটা দু দিক থেকে: প্রথমত গরম, দ্বিতীয়ত দেখাচ্ছে দিব্যি। পথ সে আদৌ লক্ষ করল না, হঠাৎই এসে পড়ল ডিপার্টমেণ্টে। প্রবেশ-পথে দরোয়ানের ঘরে সে ওভারকোট খুলল, চারপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে, দরোয়ানের বিশেষ হেফাজতে অর্পণ করল। কেমন করে যেন ডিপার্টমেণ্টে সকলে হঠাৎ জেনে গেল যে আকাকি আকাকিয়েভিচ নতুন ওভারকোটের অধিকারী হয়েছে, আলখিল্লা আর নেই। সকলে তৎক্ষণাৎ দরোয়ানের ঘরে ছুটে এলো আকাকি আকাকিয়েভিচের নতুন ওভারকোট দেখতে। শুরু হয়ে গেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের পালা, ফলে গোড়ার দিকে সে কেবল হাসল, পরে তার কেমন যেন লজ্জাই হতে লাগল। সকলে যখন তার ওপর চড়াও হয়ে বলল যে নতুন ওভারকোট উপলক্ষে তার উচিত হবে সকলকে পানভোজনে, নিদেনপক্ষে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করা তখন আকাকি আকাকিয়েভিচ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল, সে বুঝতে পারল না তার কী করা উচিত, কী উত্তর দেওয়া যায়, কী ভাবেই বা তাদের ঠেকানো যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আগাগোড়া লাল হয়ে উঠে নেহাৎই সরল মনে তাদের বোঝাতে গেল যে ওভারকোটটা মোটেই নতুন নয়, আসলে এটা সেই পুরনোটাই। অবশেষে কর্মচারীদের একজন — এমনকি একজন এসিস্‌টেণ্ট হেডক্লার্ক — তাঁর যে বিন্দুমাত্র দেমাক নেই এবং অধস্তনদের সঙ্গে পর্যন্ত মেলামেশায়ও কোন আপত্তি নেই, সম্ভবত এটাই দেখানোর উদ্দেশ্যে বললেন:

'আপনারা যা বলছেন তা-ই হবে। আকাকি আকাকিয়েভিচের বদলে আমিই আপনাদের আপ্যায়ন করছি, আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ রইল: এমনই সৌভাগ্যজনক যোগাযোগ যে আজই আমার নামকরণের দিন।'

কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ এসিস্‌টেণ্ট হেডক্লার্কটিকে অভিনন্দন জানাল এবং সোৎসাহে তার প্রস্তাব লুফে নিল। আকাকি আকাকিয়েভিচ ওজর-আপত্তি তুলতে গেল, কিন্তু সবাই বলতে লাগল যে এটা অভদ্রতা, স্রেফ লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। ফলে সে আর কোন মতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। পরে অবশ্য তার ভালোই লাগল যখন মনে হল যে এই সুযোগে সে নতুন ওভারকোট পরে একটা সান্ধ্য আসরে পর্যন্ত যেতে পারছে। সমস্ত দিনটা আকাকি আকাকিয়েভিচের কাছে একটা মহাসমারোহপূর্ণ বিরাট উৎসবের দিন বলে মনে হল। সে মনে মনে পরম পুলকিত হয়ে বাড়ি

ফিরল, ওভারকোটটা গা থেকে খুলে সন্তর্পণে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে আরও একবার নিরীক্ষণ করল সেটার পশমী কাপড় ও ভেতরের লাইনিং, তারপর ইচ্ছে করে তুলনা করে দেখার উদ্দেশ্যে বার করল তার আগেকার সেই ঝরঝরে ফেঁসে যাওয়া আলখিল্লাটা। ওটার দিকে তাকাতে সে নিজেই হেসে ফেলল: এমনই আকাশ পাতাল ফারাক! এর পরেও, খাবার খেতে বসে আরও অনেকক্ষণ ধরে আলখিল্লাটার শোচনীয় অবস্থার কথা মনে হতেই তার সমানে হাসি পেতে লাগল। সে ফুর্তি করে খেল, খাওয়াদাওয়ার পর আজ আর কিছু লিখল না, কোন কাগজই না। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবাবী কায়দায় আয়েস করল। অতঃপর কালবিলম্ব না করে জামাকাপড় পরল, ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। নিমন্ত্রণকর্তা কর্মচারীটি ঠিক কোথায় বাস করত, দুর্ভাগ্যবশত আমরা বলতে পারি না: এ ব্যাপারে স্মৃতিশক্তি আমাদের সঙ্গে বড় বেশি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করছে এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যা কিছু আছে, সেখানকার সমস্ত রাস্তাঘাট, বাড়িঘর মাথার ভেতরে এমন ভাবে মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যে সেখান থেকে সঠিক আকারে কোন কিছু উদ্ধার করা বড় কঠিন। সে যাই হোক না কেন, এটা অন্তত ঠিক যে কর্মচারীটি বাস করত শহরের এক ভদ্র পল্লীতে, যেটা অবশ্যই আকাকি আকাকিয়েভিচের বাসস্থানের খুব একটা কাছাকাছি নয়। প্রথমে আকাকি আকাকিয়েভিচকে পেরিয়ে যেতে হল স্বল্পালোকিত কতকগুলি নির্জন রাস্তা, কিন্তু কর্মচারীটির ফ্ল্যাটের যত কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল, রাস্তাঘাট ততই হতে শুরু করল উত্তরোত্তর প্রাণচঞ্চল আরও জনবহুল, অনেক বেশি আলো-ঝলমল। অনেক ঘন ঘন পথচারিদের যাতায়াত চোখে পড়ে, চমৎকার সাজগোজ পরা মহিলাদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে থাকে, পুরুষদের পোশাকের কলারে দেখা যায় বীবরের লোম, এখন ক্রমশ কদাচিৎ চোখে পড়ে পাড়াগেঁয়ে ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানদের আর তাদের গিল্টি করা পেরেক বসানো ও কাঠের জাফরি কাটা স্লেজ—তার বদলে ঘন ঘন চোখে পড়ে লাল টকটকে মখমলি টুপি-মাথায় ফিটফাট চেহারার কোচম্যান আর ভালুকের চামড়ায় বিছানো তাদের পালিশ করা চকচকে স্লেজগাড়ি, তুষারের ওপর চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে পরিপাটি কোচবক্স সমেত রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে জুড়িগাড়ি। আকাকি আকাকিয়েভিচ এ সবই এমন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল যেন এগুলি তার কাছে সংবাদ। সে বেশ কয়েক বছর হল সন্ধ্যায় আর রাস্তায় বেরোত

না। একটা দোকানের আলোকিত জানলার সামনে সে কৌতূহলী হয়ে থমকে দাঁড়াল একটা ছবি দেখার জন্য—সেখানে আঁকা ছিল কোন এক সুন্দরী নারী। মহিলা তার পায়ের জুতো খুলতে গিয়ে আগাগোড়া পা নগ্ন করে দিয়েছে, আর সেটা দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয়; এদিকে তার পেছনে অন্য ঘরের দরজা থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ঠোঁটের নীচে সুন্দর, ছোট ছুঁচালো দাড়িওয়ালা, জুলপিধারী এক পুরুষ। আকাকি আকাকিয়েভিচ মাথা নেড়ে মৃদু হাসল, তারপর আবার নিজের পথ ধরল। সে যে হাসল তার কারণ কি এই যে সে দেখতে পেয়েছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ এমন কোন বস্তু যার সম্পর্কে হাজার হলেও সকলের মনেই কেমন যেন একটা সহজাত জ্ঞান থাকে, না কি কারণ এই যে কেরানিকুলের আরও অনেকের মতো সেও ভেবেছিল: 'ওঃ এই ফরাসীগুলো! কী আর বলব, একটা কিছু যদি ধরে বসে তা হলে তার একেবারে... একেবারেই...' আবার এমনও হতে পারে যে সে হয়ত এটাও ভাবছিল না—যাই হোক না কেন, মানুষের মনের ভেতরে হানা দিয়ে সে কী ভাবছে না ভাবছে তা আর জানা সম্ভব নয়। অবশেষে যে বাড়িতে এসিস্‌টেণ্ট হেডক্লার্কটির ফ্ল্যাট, সেখানে সে পেঁছুল। ভদ্রলোক বাস করেন দস্তুরমতো ঠাটে: সিঁড়িতে আলো জ্বলছে, ফ্ল্যাটটা দোতলায়। সামনের হল্‌-এ প্রবেশ করে আকাকি আকাকিয়েভিচ দেখতে পেল মেঝের ওপর সারি সারি গ্যালোশ-জুতোর পাটি। সেগুলির মধ্যখানে, ঘরের মাঝখানে রাখা ছিল একটা সামোভার, সামোভারটা হিসহিস শব্দে বাষ্পের কুণ্ডলী তুলছে। দেয়ালে ঝুলছিল রাজ্যের যত ওভারকোট আর ক্লোক। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার বীবরের লোমের কলার দেওয়া, কোন কোনটির কলারের ভাঁজে মখমল লাগানো। দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেসে আসছিল কোলাহল আর টুকরো টুকরো কথাবার্তার আওয়াজ—সে আওয়াজ হঠাৎ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যখন দরজার পাল্লা খুলে যেতে খানসামা বেরিয়ে এলো একটা ট্রেতে করে এঁটো গেলাস, শূন্য ক্রীমের জগ ও খালি বিস্কুটের ঝুড়ি নিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে যে অফিস-কর্মচারীরা অনেক আগেই জমায়েত হয়েছে এবং তারা এক প্রস্ত চাপান সেরেছে। আকাকি আকাকিয়েভিচ নিজেই নিজের ওভারকোট ঝুলিয়ে রেখে ঘরে প্রবেশ করল—সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে এক সঙ্গে খেলে গেল মোমবাতির আলো, কর্মচারীদের চেহারা, পাইপ, তাস খেলার টেবিল। চারদিক থেকে অনর্গল কথাবার্তার স্রোত এবং চেয়ার নড়ান-চড়ানোর আওয়াজ তার কানে এসে

বিঁধে তালা ধরিয়ে দিল। সে নেহাৎই আনাড়ীর মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, সন্ধানী দৃষ্টি বুলোল আর ভাবার চেষ্টা করতে লাগল কী করা যায়। কিন্তু ততক্ষণে সে লোকজনের নজরে পড়ে গেছে। তারা হৈচৈ করে তাকে অভ্যর্থনা জানাল আর সকলেই তৎক্ষণাৎ সামনের হলঘরে গিয়ে আবার তার ওভারকোটটা দেখল। আকাকি আকাকিয়েভিচ খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বটে কিন্তু যেহেতু সে ছিল খোলা মনের মানুষ তাই সকলে ওভারকোটটার যেমন প্রশংসা করছে তাতে উৎফুল্ল না হয়ে পারল না। অতঃপর, বলাই বাহুল্য, সকলেই তাকে এবং তার ওভারকোটকেও ছেড়ে দিয়ে—সচরাচর যেমন হয়ে থাকে—মনোযোগ দিল হুইস্ট খেলার জন্য নির্দিষ্ট টেবিলের দিকে। এসবই—এই হৈচৈ, কথাবার্তা, লোকজনের ভিড়—সবই আকাকি আকাকিয়েভিচের কাছে কেমন যেন আশ্চর্য লাগছিল। সে আদৌ বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত, কোথায় রাখা যায় নিজের হাত, পা ও গোটা মূর্তিটা; অবশেষে যারা তাস খেলছিল তাদের পাশে বসে পড়ে তাস খেলা দেখতে লাগল, একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিছুক্ষণ বাদে সে শুরু করল হাই তুলতে, অনুভব করল যে একঘেয়ে লাগছে; তা ছাড়া সচরাচর যে সময় সে ঘুমোতে যায় সেই সময়ও অনেকক্ষণ হল পেরিয়ে গেছে। সে গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইল, কিন্তু তাকে কেউ ছাড়ল না, সকলে বলল যে নতুন জিনিস কেনার সম্মানে এক গ্লাস করে শ্যাম্পেন অবশ্যই পান করা উচিত। এক ঘণ্টা বাদে খাবার পরিবেশন করা হল: খাবারের মধ্যে ছিল মেশানো স্যালাড, ঠাণ্ডা বাছুরের মাংস, মাংসের প্যাটি, পেস্ট্রি আর শ্যাম্পেন। আকাকি আকাকিয়েভিচকে ওরা জোর করে দু গ্লাস পান করাল। এর পর তার মনে হল ঘরটাতে বেশ ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, এদিকে কিন্তু সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে বারোটা বেজে গেছে, অনেক আগে তার বাড়ি যাওয়া উচিত ছিল। পাছে গৃহকর্তা আবার একটা কিছু ওজর ভেবে বার করে তাকে আটকে রাখেন, এই ভয়ে সে চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সামনের হলঘরে খুঁজে খুঁজে বার করল তার ওভারকোট—সে বেশ কষ্ট পেল এই দেখে যে ওটা মেঝেতে পড়ে আছে। যাই হোক ওভারকোটটা ঝেড়েঝুড়ে, তার গা থেকে সমস্ত রকম ফেঁসো তুলে ফেলে দিয়ে সে ওটাকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে সিঁড়ি বয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

রাস্তায় তখনও আলো ছিল। কিছু কিছু খুচরো দোকান-পাট তখনও

খোলা ছিল—এগুলি ছিল চাকরবাকর ও দরোয়ান শ্রেণীর লোকজনের স্থায়ী আড্ডার জায়গা। অন্যগুলি বন্ধ হলে কী হবে, দরজার আগাগোড়া ফাঁক দিয়ে যে-রকম দীর্ঘ আলোর রেখা এসে পড়ছিল তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে সেগুলি এখনও সমাজপরিত্যক্ত নয় এবং সম্ভবত বড়লোকের খাস চাকরানিরা বা খানসামারা নিজেদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে মনিবদের সম্পূর্ণ ধাঁধার মধ্যে রেখে দিয়ে তখনও তাদের সান্ধ্য গল্পগুজব সারছে। আকাকি আকাকিয়েভিচ চলল উৎফুল্ল মেজাজে, এমন কি কেন কে জানে, হঠাৎই কোন এক মহিলাকে সর্বাঙ্গে অস্বাভাবিক হিল্লোল খেলিয়ে বিজলীর মতো পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে সে তার পিছু ধাওয়া করতে পর্যন্ত প্রবৃত্ত হল। কিন্তু যাই হোক না কেন সে তৎক্ষণাৎ থমকে দাঁড়াল, আগের মতোই আবার চলতে লাগল মৃদু পদক্ষেপে এবং কোথা থেকে যে এই জোর কদম তার ওপর এসে ভর করেছিল তা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। শিগগিরই তার সামনে এলো সেই নির্জন রাস্তাগুলি, যেগুলি দিনের বেলায় পর্যন্ত তেমন প্রীতিকর নয়, আর সন্ধ্যাবেলায় ত কথাই নেই। এখন সেগুলি আরও নির্জন, আরও পরিত্যক্ত: ল্যাম্প-পোস্টের আলোর সারি এখানে তেমন ঘন ঘন চোখে পড়ে না—বোঝাই যাচ্ছে, এখানে তেল সরবরাহের খানিকটা ঘাটতি আছে। কাঠের ঘরবাড়ি আর বেড়া শুরু হয়ে গেল; কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই; রাস্তায় একমাত্র আলোর ঝলক তুলছে তুষার, এদিকে খড়খড়ি বন্ধ করে দিয়ে নিদ্রামগ্ন নীচু কুঠুরিগুলিকে দেখাচ্ছিল শোচনীয় রকমের কালো। দেখতে দেখতে আকাকি আকাকিয়েভিচ যে জায়গাটার কাছাকাছি এলো সেখানে রাস্তা গিয়ে মিশেছে একটা ধু ধু স্কোয়ারের সঙ্গে, তার ওপারে বাড়িঘর চোখে দেখা যায় না বললেই চলে। স্কোয়ারটা দেখাচ্ছিল ভয়ানক নির্জন।

দূরে, ভগবান জানেন কোথায়, পাহারাদার একটা গুমটির আলো দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ওটা যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে আছে। এই সময় আকাকি আকাকিয়েভিচের ফুর্তি যেন অনেকটা দমে গেল। স্কোয়ারে পা ফেলতে নিজের অজ্ঞাতেই একটা ভীতি তার ওপর এসে ভর করল, তার মন যেন খারাপ একটা কিছুর আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে পেছনে, এবং এপাশে ওপাশে ফিরে তাকাল: তার চতুর্দিকে যেন অথৈ সমুদ্র। 'না, না তাকানোই বরং ভালো,' এই ভেবে সে চলল চোখ বন্ধ করে, আর যখন স্কোয়ার শিগগির শেষ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য চোখ খুলল তখন হঠাৎ দেখতে পেল

তার সামনে, তার প্রায় নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন চেহারার গুণ্ডো দুটি লোক—ঠিক কেমন, তা বোঝার কোন সাধ্য তার ছিল না। সে চোখে সরষে ফুল দেখল, তার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

'আরে এই ওভারকোট ত আমার!' ওদের একজন বাজখাঁই গলায় এই কথা বলে খপ করে চেপে ধরল তার কলার।

আকাকি আকাকিয়েভিচ যেই সাহায্যের জন্য চেঁচাতে গেল অমনি আরেকজন তার ঠিক মুখের সামনে কেরানির মাথার সমান আকারের মুঠি বাগিয়ে ধরে গর্জন করে বলল: 'একবার চেঁচিয়েই দ্যাখ না!' আকাকি আকাকিয়েভিচ কেবল অনুভব করল ওরা ওর গা থেকে ওভারকোট খুলে নিল, একজন হাঁটু দিয়ে ওকে লাথি মারল, তাতে ও চিতপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল—আর কিছুই সে অনুভব করতে পারল না। কয়েক মিনিট বাদে সংবিৎ ফিরে আসতে যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন কাউকেই দেখতে পেল না। সে অনুভব করল যে মাঠের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগছে, ওভারকোটও নেই; সে তখন চেঁচাতে লাগল, কিন্তু স্কোয়ারের শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছুনোর কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না তার কণ্ঠস্বরের। হতাশ হয়ে অবিরাম চেঁচাতে চেঁচাতে সে স্কোয়ারের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল সোজা পাহারাদারের গুমটি লক্ষ্য করে। গুমটির পাশেই টাঙ্গিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রহরারত কনস্টেব্‌ল্‌টি—কে ছাই এই লোকটি দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে তার দিকে ছুটে আসছে তা জানার বাসনায় সে যেন কৌতূহলভরে তাকাচ্ছিল। আকাকি আকাকিয়েভিচ তার কাছে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে সে পাহারায় থেকে ঘুমোচ্ছে, এদিকে যে একটা লোকের ওপর রাহাজানি হয়ে গেল সে দিকে তার কোন দৃষ্টি নেই, চোখ নেই। কনস্টেব্‌ল্‌ উত্তর দিল যে সে ওরকম কিছুই দেখতে পায় নি, সে কেবল দেখেছিল স্কোয়ারের মাঝখানে দুটো লোক তাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়; তবে ভেবেছিল ওরা বোধ হয় তার বন্ধুবান্ধব হবে; তা ছাড়া মিছিমিছি গালিগালাজ না করে আগামী কাল পুলিশ ইনস্পেক্টরের কাছে গেলেই ত হয়—উনিই খুঁজে বার করবেন কে ওভারকোট ছিনতাই করেছে। আকাকি আকাকিয়েভিচ বাড়িতে ছুটে এলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়: তার রগের দু'পাশে এবং মাথার পেছন দিকে তখনও যে সামান্য পরিমাণ চুল অবশিষ্ট ছিল তা একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে; শরীরের দুটো পাশ, বুক আর পরনের প্যাণ্টলুন আগাগোড়া বরফের

গংড়োয় মাখামাখি। বাড়িওয়ালি বুড়ি দরজায় ভয়ঙ্কর ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, এক পায়ে চটি গলিয়ে, শালীনতাবশত গায়ের জামাটা হাত দিয়ে বুকের ওপর ধরে ছুটে গেল দরজা খুলতে; কিন্তু খুলেই পিছিয়ে গেল আকাকি আকাকিয়েভিচকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে। আকাকি আকাকিয়েভিচ ব্যাপারটা খুলে বলার পর বাড়িওয়ালি গালে হাত দিয়ে বলল যে তার উচিত সোজা পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে যাওয়া, পুলিশ-ইনস্পেক্টর ফাঁকি দেবে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবে, তাকে কেবলই ঘোরাবে; তাই সবচেয়ে ভালো হবে সরাসরি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে যাওয়া—তা ছাড়া লোকটা তার জানাও বটে, কেন না আন্না নামে যে ফিন মেয়েটি তার এখানে আগে রাঁধুনির কাজ করত সে এখন সুপারিনটেণ্ডেণ্টের বাড়িতে আয়ার কাজ নিয়েছে, বাড়িওয়ালি প্রায়ই স্বয়ং পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চড়ে যেতে দেখে। তিনি প্রতি রবিবার গির্জায় যান প্রার্থনা করতে, আর সকলের দিকেই তাকান হাসিখুসি দৃষ্টিতে—সুতরাং সব দেখেশুনে মনে হয় লোকটা ভালোই। এই সিদ্ধান্ত শোনার পর আকাকি আকাকিয়েভিচ বিষণ্ণ মনে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল, আর কী ভাবে সে সেখানে রাতটা কাটাল তা বিচার করার ভার ছেড়ে দিলাম তাদের ওপর, অন্যের অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা যাদের আছে।

খুব ভোরবেলা সে রওনা দিল পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে; কিন্তু শুনল যে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঘুমোচ্ছেন। দশটার সময় এলো, তখনও শুনল ঘুমোচ্ছেন; এগারোটার সময় এলো — এবারে শুনল বাড়ি নেই। সে এলো দুপুরের খাবারের ছুটির সময়—কিন্তু সামনের ঘরের কেরানিরা তাকে কোন মতেই ঢুকতে দেবে না, কী কাজে সে এসেছে, অফিসারের সঙ্গে তার কী দরকার এবং কী ঘটেছে তা অতি অবশ্য তারা জানতে চাইল। ফলে আকাকি আকাকিয়েভিচ শেষকালে জীবনে এই এক বারই নিজের চরিত্রবলের পরিচয় দিল, তাদের স্রেফ বলল যে ব্যক্তিগত ভাবে খোদ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গেই তার দেখা করা দরকার, তাকে আটকানোর কোন এক্তিয়ার তাদের নেই, সে ডিপার্টমেণ্ট থেকে এসেছে সরকারী কাজ নিয়ে, সে যখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে তখন বাছাধনরা টের পাবে। এর পর কেরানিরা আর কিছু বলার সাহস পেল না, তাদের মধ্যে একজন ডেকে আনতে গেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। ওভারকোট ছিনতাইয়ের বৃত্তান্তটি পুলিশ

সন্পারিনটেন্ডেণ্ট যে-ভাবে গ্রহণ করলেন তা রীতিমতো অদ্ভুতই বলা যায়। কেসটার মূল পয়েণ্টের ধারে কাছে না গিয়ে তিনি আকাকি আকাকিয়েভিচকে জেরা করতে লাগলেন কেন সে এত দেরি করে বাড়ি ফিরছিল, সে কোন আজেবাজে বাড়িতে গিয়েছিল কিনা, সেখানে ছিল কিনা। ফলে আকাকি আকাকিয়েভিচ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, তাঁর কাছ থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখন নিজেই বুঝতে পারছিল না ওভারকোটের কেসটার কোন সদগতি হবে কিনা। ঐ দিন—জীবনে এই প্রথম—সারা দিন সে অফিসে অনুপস্থিত থাকল।

পর দিন সে হাজির হল আগাগোড়া পাণ্ডুর চেহারা নিয়ে, তার সেই পুরনো আলখিল্লা পরে, যেটার অবস্থা হয়েছে আরও করুণ। ওভারকোট ছিনতাইয়ের সংবাদে অবশ্য অনেকেই মনে ব্যথা পেল, যদিও এমন কিছু কিছু কর্মচারীও ছিল যারা এই সংবাদে পর্যন্ত আকাকি আকাকিয়েভিচের ওপর এক চোট হাসার সুযোগ ছাড়ল না। তৎক্ষণাৎ ঠিক করা হল তার জন্য চাঁদা তোলা হবে, কিন্তু যা উঠল তা যৎসামান্য, যেহেতু কর্মচারীদের এ বাদেও অনেক টাকাপয়সা খরচ হয়ে গেছে বড়সাহেবের পোর্ট্রেটের পেছনে এবং কোন একটা বই কিনতে গিয়ে—যেটা আবার সুপারিশ করেছিলেন গ্রন্থকারের বন্ধু, তাদেরই সেকশনের কর্তা। কাজে কাজেই টাকার অঙ্ক হল নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। তাদের মধ্যে একজন সমবেদনায় বিচলিত হয়ে আকাকি আকাকিয়েভিচকে অন্তত পক্ষে সৎপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা উচিত বিবেচনা করে বলল যে পুলিশ-ইনস্পেক্টরের কাছে গিয়ে কাজ নেই, কেননা এমনও ত হতে পারে যে পুলিশ-ইনস্পেক্টর হয়ত কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার বাসনায় কোন না কোন উপায়ে ওভারকোট উদ্ধার করল, কিন্তু তা হলেও ওভারকোটটা যে তারই, আইনসঙ্গত ভাবে তা প্রমাণ না করা গেলে ওটা থানায়ই পড়ে থাকবে; তাই সবচেয়ে ভালো হয় যদি সে জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিটি উপযুক্ত জায়গায় লেখালেখি করে ও যোগাযোগ স্থাপন করে কাজটা অনেক এগিয়ে দিতে পারেন। অগত্যা আকাকি আকাকিয়েভিচ গণ্যমান্য ব্যক্তিটির কাছে যাবে বলে ঠিক করল।

গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ঠিক কোন্ পদে কাজ করতেন, তাঁর পদমর্যাদাই বা কী ছিল, সেটা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে জানা দরকার যে জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি গণ্যমান্য হয়েছেন হালে, এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন নগণ্য ব্যক্তি। তাছাড়া তাঁর অফিসটা অপেক্ষাকৃত গণ্যমান্য

অন্যান্যদের অফিসের তুলনায় এখনও তেমন গণ্য করার মতো নয়। কিন্তু সব সময়ই খুঁজলে এমন লোকজন পাওয়া যাবে যাদের মহলে অন্যদের চোখে নগণ্য হয়েও গণ্যমান্য হওয়া যায়। তায় আবার সেই ব্যক্তিটি আরও নানাবিধ উপায়ে তাঁর গণ্যমান্য ভাব বাড়িয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন: যেমন, তিনি নির্দেশ দিলেন যে তিনি যখন কাজে আসেন তখন যেন সিঁড়ির মুখেই নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে; তাঁর কাছে সরাসরি হাজির হওয়ার দুঃসাহস যেন কারও না হয়, সব কিছু যেন চলে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মাফিক: রেজিস্ট্রার জানাবে সেক্রেটারীকে, সেক্রেটারী—নিম্নপদস্থ কেরানিকে কিংবা অন্য কোন কর্মচারীকে, কেবল এই ভাবেই কোন বিষয় গিয়ে পৌঁছুবে তাঁর দরবারে। পুণ্য রুশভূমিতে সব কিছু অনুকরণে এমনই কলুষিত হয়ে গেছে, সবাই উঠে পড়ে লেগেছে যার যার ওপরওয়ালাকে নকল করতে ও ভেংচাতে। এমন কি এও শোনা যায় যে কোন এক নিম্নপদস্থ কেরানি কোন এক আলাদা ছোটখাটো দপ্তরের পরিচালক পদে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিশন দিয়ে নিজের জন্য একটা বিশেষ ঘর বানিয়ে নিয়ে সেটাকে নাম দেয় 'হেড অফিস' আর দোরগোড়ায় লাল কলার আঁটা ও লেসের সাজগোজ পরা চাপরাসীদের দাঁড় করিয়ে রাখে—তারা দরজার হাতল ধরে থাকত, যে কেউ দেখা করতে এলে দরজা খুলে দিত, যদিও 'হেড অফিসে' জোরজার করে একটা সাধারণ লেখার টেবিলের বেশি আর কিছুর স্থান সঙ্কুলান হত না। গণ্যমান্য ব্যক্তিটির রীতিনীতি ছিল জমকালো ও গরিমান্বিত, তবে জটিল আদৌ নয়। তাঁর প্রণালীর মূল ভিত্তি ছিল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। 'নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা আর নিয়মানুবর্তিতা', সচরাচর তাঁর এই ছিল বুলি, আর শেষ কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে যার উদ্দেশে বলা তার দিকে সচরাচর তাকাতেন চেহারায় রীতিমতো গণ্যমান্য ভাব ফুটিয়ে তুলে। যদিও আসলে এর কোন সঙ্গত কারণই ছিল না, যেহেতু যে ডজনখানেক কর্মচারী নিয়ে দপ্তরের পুরো সরকারী ব্যবস্থা চলত তারা অমনিতেই ভীতসন্ত্রস্ত থাকত: তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেলেই সমস্ত কাজকর্ম ফেলে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করত যতক্ষণ না কর্মকর্তা ঘর পেরিয়ে যান। অধস্তনদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার ধরণ হত সচরাচর কঠোর, তাতে প্রায় থাকত তিনটি বাঁধা বুলি: 'কী আস্পর্ধা! আপনি কি জানেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন? আপনার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছেন কি?' সে যাই হোক না কেন, অন্তরের

দিক থেকে তিনি লোকটা ছিলেন সদাশয়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন, তাদের উপকার করতেন; কিন্তু উঁচু পদ তাঁর মাথাটা বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছিল। উঁচু পদ লাভ করার পর তিনি কেমন যেন বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, আদৌ বুঝতে পারছিলেন না কেমন আচরণ তাঁর করা উচিত। তাঁর সমপর্যায়ের কারও সঙ্গে যখন তিনি মিলতেন তখন তিনি একজন দিব্যি মানুষ, রীতিমতো ভদ্র এমন কি বহু ক্ষেত্রে নির্বোধও তাকে বলা চলে না; কিন্তু যে মুহূর্তে নিজের অন্তত এক ধাপ নীচের লোকজনেরও মহলে গিয়ে পড়তেন তখনই তিনি একেবারেই অচল: চুপচাপ থাকতেন, তাঁর অবস্থাটা হত করুণ, পরন্তু তিনি নিজেও বুঝতে পারতেন যে এর চেয়ে অনেক ভালো ভাবে সময়টা কাটানো যেত। এককে সময় তাঁর চোখে ফুটে উঠত কোন আকর্ষণীয় কথাবার্তায় বা লোকজনের দলে যোগ দেবার তীব্র বাসনা, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিত তাঁর চিন্তা: এটা কি তাঁর দিক থেকে বেশি বাড়াবাড়ি হবে না, এতে কি বড় বেশি গা মাখামাখি করা হবে না, তাঁর মর্যাদা কি এর ফলে ক্ষুণ্ণ হবে না?—এই সমস্ত বিচার বিবেচনার ফলে তাঁকে চিরকাল থাকতে হত সেই একই মৌনী অবস্থায়, কেবল কদাচিৎ উচ্চারণ করতেন স্বল্পাক্ষরের দু-একটা ধ্বনি; এই উপায়ে তিনি চরম রসকষহীন আখ্যা অর্জন করেন। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিটির কাছেই এসে হাজির হল আমাদের আকাকি আকাকিয়েভিচ, আর এসে হাজির হল নিতান্তই প্রতিকূল এক সময়ে—আকাকি আকাকিয়েভিচের পক্ষে রীতিমতো অসময় বটে, কিন্তু গণ্যমান্য ব্যক্তিটির পক্ষে সুসময়। গণ্যমান্য ব্যক্তিটি তাঁর অফিস কামরায় বসে বসে মহা ফুর্তিতে গল্প করছিলেন সম্প্রতি রাজধানীতে আগত তাঁর এক পুরনো পরিচিত ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে, যার সঙ্গে কয়েক বছর তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। এই সময় তাঁর কাছে খবর এলো যে কোন এক বাশ্‌মাচ্‌কিন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন: 'কে সে?' উত্তরে শুনলেন: 'কোন এক সরকারী কর্মচারী।' 'বটে! অপেক্ষা করুক, আমার এখন সময় নেই,' গণ্যমান্য ব্যক্তিটি বললেন। এখানে বলা দরকার যে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি ডাহা মিথ্যে কথা বললেন: সময় তাঁর ছিল, বন্ধুর সঙ্গে যাবতীয় আলাপ তাঁর অনেকক্ষণ হল শেষ হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ হল কথাবার্তায় ক্ষান্ত হয়ে তাঁরা দু'জনে সুদীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করে আছেন, কেবল থেকে থেকে একে অন্যের ঊরুতে মৃদু চাপড় মেরে বলছেন: 'তা হলে, ইভান আব্রামভিচ!' 'হুঁ হুঁ, স্তেপান ভার্লামভিচ!'

অথচ তা সত্ত্বেও তিনি কর্মচারীটিকে অপেক্ষা করতে বললেন, যেহেতু বহুকাল হল চাকরীর সঙ্গে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই, যিনি গ্রামের বাড়িতে কালাতিপাত করছেন, এমন একজন লোককে, এই বন্ধুটিকে তাঁর দেখানোর উদ্দেশ্য যে একজন সরকারী কর্মচারীকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাঁর অফিস কামরার সামনের ঘরে বসে। অবশেষে প্রাণ ভরে কথাবার্তা বলার পর, তার চেয়েও যথেষ্ট পরিমাণে চুপচাপ থেকে দিব্যি হেলান-দেওয়া আরামের চেয়ারে বসে বসে দু'জনেই যখন সিগার ধ্বংস করলেন, তখন রিপোর্ট নিতে এসে দোরগোড়ায় কাগজ হাতে তাঁর সেক্রেটারীটি দাঁড়িয়ে পড়লে শেষকালে হঠাৎ যেন মনে পড়ে যেতে তিনি তাকে বললেন: 'ও হ্যাঁ, ওখানে একজন কেরানি দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? তাকে বলুন, আসতে পারে।' আকাকি আকাকিয়েভিচের নিরীহ চেহারা আর জরাজীর্ণ ইউনিফর্ম দেখে তিনি হঠাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন: 'কী চাই আপনার?' তাঁর কণ্ঠস্বর কড়া, রুক্ষ। আগে থাকতেই, পদোন্নতি লাভের, অর্থাৎ বর্তমান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই নির্জনে নিজের ঘরে আয়নার সামনে বিশেষ যত্ন নিয়ে তিনি এই কণ্ঠস্বরটি রপ্ত করেছিলেন। আকাকি আকাকিয়েভিচ এদিকে ঠিক সময়মতো যথোচিত ভয় পেয়ে গেল, খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং যতটা পারা যায়, যতটা তার ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে কুলোয়, অবশ্য অন্য সময় যা করে থাকে তার চেয়েও ঘন ঘন 'মানে'-র সংমিশ্রণে, সে ব্যাখ্যা করে বলল যে তার একটা আনকোরা নতুন ওভারকোট ছিল, তার ওপর অমানুষিক রাহাজানি হয়েছে, এখন সে তাই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে যাতে তিনি যে-করেই হোক পুলিশ কমিশনারের কাছে মানে, নয়ত অন্য কারও কাছে একটা সুপারিস লিখে দেন, যাতে তারা ওভারকোটটা খুঁজে বার করার ব্যাপারে সাহায্য করেন। কেন জানি না এ ধরনের আচরণ হুজুরের কাছে অশিষ্ট বলে মনে হল।

'এসব কী ব্যাপার মশাই?' তিনি রুক্ষস্বরে বলে চললেন, 'বলতে চান, আপনি নিয়মকানুন জানেন না? আপনি কোথায় এসেছেন? কাজকর্ম কোন্ ধারায় চলে জানেন না? এ ব্যাপারে আপনাকে আগে দরখাস্ত দেওয়া উচিত ছিল দপ্তরে; দপ্তর থেকে সেটা যাবে হেড ক্লার্কের কাছে, তারপর সেক্‌শনের হেডের কাছে, তারপর সেটা যাবে সেক্রেটারীর কাছে, সেক্রেটারী সেটাকে শেষকালে দেবে আমার হাতে...'

'কিন্তু হুজুর,' ছিটেফোঁটা যেটুকু মনোবল অবশিষ্ট ছিল তার সবটা

প্রয়োগের চেষ্টা করতে করতে এবং সেই সঙ্গে সে যে ভয়ানক ঘেমে উঠেছে তা অনুভব করে আকাকি আকাকিয়েভিচ বলল, 'আমি হুজুর সাহস করে আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে গেলাম, কেন না, মানে,... ওসব সেক্রেটারী-টেক্রেটারীদের ওপর ভরসা করা যায় না...'

'কী, কী বললেন?' গণ্যমান্য ব্যক্তিটি বললেন। 'আপনার এত সাহস হল কোত্থেকে? কোথা থেকে আপনার এমন ধারণা হল? কর্মকর্তা আর ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে এ কী ঔদ্ধত্য ছড়িয়েছে যুবকদের মধ্যে!'

গণ্যমান্য ব্যক্তিটি সম্ভবত খেয়ালই করেন নি যে আকাকি আকাকিয়েভিচের বয়স ইতিমধ্যে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে তাকে যদি যুবক আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে সেটা নেহাৎই আপেক্ষিক অর্থে—অর্থাৎ যাদের বয়স ইতিমধ্যে সত্তর পেরিয়ে গেছে, তাদের তুলনায়।

'আপনি কি জানেন কাকে এই কথা বলছেন? বুঝতে পারছেন কি আপনার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারছেন কি? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

এই কথাগুলি বলার সময় তিনি মেঝেতে পা ঠুকলেন এবং এত উঁচু পর্দায় গলা চড়ালেন যে আকাকি আকাকিয়েভিচের কেন, অন্য যে কারও আঁতকে ওঠার কথা।

আকাকি আকাকিয়েভিচ ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল, তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, সে টাল খেল, কোন মতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না: সেই মুহূর্তে দরোয়নরা যদি ছুটে এসে তাকে ধরে না ফেলত তা হলে সে হয়ত ধপ করে মেঝের ওপর পড়েই যেত। তাকে যখন বাইরে বয়ে আনা হল তখন সে প্রায় অসাড়। এদিকে প্রতিক্রিয়া আশারও অতিরিক্ত হওয়ায় সন্তুষ্ট এবং তাঁর মুখের কথা যে মানুষের সংজ্ঞা পর্যন্ত লোপ করে দিতে পারে এই ভাবনায় সম্পূর্ণ মশগুল গণ্যমান্য ব্যক্তিটি আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন—তিনি এটা কী ভাবে নেন জানার উদ্দেশ্যে, আর বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন যখন দেখতে পেলেন যে তাঁর বন্ধুটির অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। দেখেশুনে তাঁর নিজেরও কেমন যেন ভয়-ভয় হতে লাগল।

সিঁড়ি বয়ে কী ভাবে নামল, কী ভাবে বেরিয়ে এলো রাস্তায়—এসবের কিছুই আর আকাকি আকাকিয়েভিচের মনে ছিল না। হাত, পা কোনটাতেই সে কোন সাড় পাচ্ছিল না। জীবনে কখনও কোন জাঁদরেল কর্তার কাছ

থেকে সে এমন দাবড়ানি খায় নি — তাও আবার অন্য অফিসের। তুষার-ঝড় তখন রাস্তায় শিস দিয়ে বয়ে চলছিল, তারই মধ্যে বেসামাল হয়ে ফুটপাথ থেকে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে, মুখ হাঁ করে সে চলল; সেণ্ট পিটার্সবুর্গীয় রীতি অনুযায়ী বাতাস চতুর্দিক থেকে, সমস্ত অলিগলি থেকে এসে তার গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলল। মুহূর্তের মধ্যে সে তার কণ্ঠনালীতে অনুভব করল প্রদাহ, বাড়িতে যখন সে পেঁছুল তখন একটি কথাও বলার ক্ষমতা তার ছিল না; তার গলা সম্পূর্ণ ফুলে গেছে, সে শয্যা গ্রহণ করল। উপযুক্ত ধাতানির কখনও কখনও এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় বৈ কি!

পর দিন দেখা গেল তার প্রচণ্ড জ্বর উঠেছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জলবায়ুর সহৃদয় সহায়তার কল্যাণে রোগ আশাতিরিক্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল, আর ডাক্তার যখন এসে উপস্থিত হলেন তখন নাড়ী টিপে দেখার পর পুলটিসের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার রইল না — তাও একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে রোগী চিকিৎসার উদার সহায়তা ছাড়া পড়ে না থাকে; তথাপি সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন যে দেড় দিনের মধ্যে রোগী নির্ঘাত অক্কা পাবে। এর পর বাড়িওয়ালির উদ্দেশে তিনি বললেন:

'আপনি কিন্তু মা বৃথা সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্তে ওর জন্যে পাইন কাঠের কফিন অর্ডার দিয়ে ফেলুন, কেন না ওক কাঠের কফিন ওর পক্ষে দামে পোষাবে না।'

আকাকি আকাকিয়েভিচ তার সম্পর্কে উচ্চারিত এই মারাত্মক কথাগুলি শুনেছিল কিনা, শুনে থাকলেও সেগুলি তার উপর কোন বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কিনা, নিজের এই হতভাগ্য জীবনের জন্য তার মায়া হচ্ছিল কিনা — এর কিছুই আমাদের জানা নেই, যেহেতু সেই সময় সে ছিল প্রবল জ্বর ও বিকারের ঘোরে। তার চোখের সামনে খেলে যাচ্ছিল একের পর এক দৃশ্য — একটি অন্যটির চেয়ে উদ্ভট: কখনও সে দেখতে পেল পেত্রোভিচকে, তাকে সে ফরমাস দিচ্ছে এমন একটা ওভারকোট বানানোর যাতে আছে চোর ধরার এক রকমের ফাঁদ, এদিকে তার কেবলই মনে হচ্ছিল চোরেরা যেন খাটের নীচে আছে। এমন কি একটা চোরকে তার কম্বলের ভেতর থেকে টেনে বার করার জন্য সে থেকে থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল বাড়িওয়ালিকে; কখনও সে জিজ্ঞেস করতে লাগল তার নতুন ওভারকোট থাকা সত্ত্বেও কেন চোখের সামনে পুরনো আলখাল্লাটা ঝুলছে, কখনও বা তার মনে হল সে যেন সরকারী অফিসের জাঁদরেল কর্তাটির

সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত ধাতানি খাচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে: 'অপরাধ হয়ে গেছে হুজুর!' আর শেষ কালে বেজায় মুখ খারাপ করে এমন সব অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথাও উচ্চারণ করতে লাগল যে বুড়ি বাড়িওয়ালি পর্যন্ত ক্রুশ চিহ্ন আঁকল—তার মুখ থেকে এরকম কথা সে জীবনেও শোনে নি, তায় আবার প্রতিটি শব্দ সরাসরি অনুসরণ করছিল 'হুজুর' সম্বোধন। অতঃপর সে যা বলতে শুরু করল তার পুরোটা এমনই আবোল-তাবোল, যে কিছু বোঝার উপায় থাকল না। কেবল দেখা যাচ্ছিল যে অশ্লীল কথা ও ভাবনার মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছিল সেই একই ওভারকোট। অবশেষে বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

তার ঘর বা জিনিসপত্র কোনটাই সীল করা হল না, যেহেতু প্রথমত উত্তরাধিকারী বলতে কেউ ছিল না, আর দ্বিতীয়ত সম্পত্তি সে রেখে গিয়েছিল সামান্যই, যা ছিল তা হল এক গোছা পালকের কলম, সরকারী দপ্তরখানার দিস্তাখানেক সাদা কাগজ, তিন পাটি মোজা, প্যাণ্টলুন থেকে খসে-পড়া দু-তিনটে বোতাম আর পাঠকবর্গের পূর্বপরিচিত সেই আলখিল্লাটি। এসব কার কপালে জুটল ভগবানই জানেন: স্বীকার করতে বাধা নেই, এমনকি বর্তমান কাহিনীর বিবরণদাতারও এ সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। আকাকি আকাকিয়েভিচের মৃতদেহ বার করে নিয়ে যাওয়া হল, কবর দেওয়া হল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জীবনযাত্রা চলতে লাগল আকাকি আকাকিয়েভিচকে বাদ দিয়ে—যেন ঐ নামে কোন লোকে কখনও সেখানে ছিল না। অদৃশ্য হল, অন্তর্ধান করল একটি প্রাণ, যাকে রক্ষা করার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না, যে প্রাণ কারও কাছে মূল্যবান নয়, কারও কোন কৌতূহল জাগ্রত করে না—এমনকি যে-প্রকৃতিবিজ্ঞানী সাধারণ একটা মাছিকে পিনে গেঁথে তাকে অনুবীক্ষণের নীচে রেখে পর্যবেক্ষণের সুযোগ ছাড়েন না, তারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না; এমনই এক প্রাণী, যে দপ্তরের কেরানিকুলের হাসিঠাট্টা মুখ বুজে সহ্য করেছে, কোন অসাধারণ কর্ম সমাপন না করেই কবরে গেছে। সে যাই হোক না কেন, অন্তত জীবনের অন্তিমকালের অব্যবহিত পূর্বেও তার কাছে ওভারকোটের রূপ ধরে ঘর-আলো-করা ক্ষণিকের অতিথি এসেছিল, ক্ষণিকের জন্য তার হতভাগ্য জীবনকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল, কিন্তু তার ওপর পরে আবার নেমে আসে দুর্ভাগ্যের দুঃসহ আঘাত, যেমন ভাবে নেমে আসে পৃথিবীর

অধিপতি আর রাজারাজড়াদের ওপর।... তার মৃত্যুর কয়েক দিন বাদে ডিপার্টমেণ্ট থেকে তার ফ্ল্যাটে পাঠানো হল এক পেয়াদাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে যে ওপরওয়ালার কাছ থেকে তলব এসেছে অবিলম্বে যেন সে কাজে হাজির হয়; কিন্তু পেয়াদাকে ফিরে আসতে হল কিছুই সঙ্গে না নিয়ে, সে এসে রিপোর্ট করল যে তার আর আসার উপায় নেই। 'কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলল: 'ও মারা গেছে কিনা, তিন দিন আগে ওকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে।' এই ভাবে ডিপার্টমেণ্টে লোকে আকাকি আকাকিয়েভিচের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারল, আর তার পর দিনই অফিসে তার জায়গায় বসে থাকতে দেখা গেল এক নতুন কেরানিকে, তার চেয়ে অনেক লম্বা; এ লোকটার হাতের লেখা অক্ষরগুলি তেমন সোজা সোজা ধরনের নয়, অনেক বেশি হেলানো আর তেরছা।

কিন্তু এমন কে ভাবতে পেরেছিল যে এখানেই আকাকি আকাকিয়েভিচ সংক্রান্ত কাহিনীর পরিসমাপ্তি নয়, কে ভাবতে পেরেছিল যে অবহেলিত জীবনের পুরস্কার স্বরূপেই বা বুঝি মৃত্যুর পর আরও কয়েক দিন আলোড়ন সৃষ্টি করে বাঁচা তার ভাগ্যে ছিল? অথচ তা-ই ঘটল, ফলে আমাদের নিরানন্দ ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত ভাবে অলৌকিক পরিসমাপ্তি লাভ করছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে কালিন্‌কিন ব্রিজের কাছে এবং তারও অনেকটা দূরে রাতের বেলায় এক প্রেতাত্মার আনাগোনা শুরু হয়েছে। দেখতে সে কেরানির মতো, মনে হয় যেন কোন ওভারকোট খোয়া যাওয়ায় তা খুঁজছে আর ওভারকোট ছিনতাই হওয়ার অজুহাতে সরকারী পদমর্যাদা ও খেতাবের কোন বাছবিচার না করে যার কাঁধ থেকে যেমন পারছে — বেড়ালের লোম, বীবরের লোমের, র‍্যাকুনের, শেয়ালের ও ভালুকের লোমের ওভারকোট — অর্থাৎ লোকে নিজের চামড়া ঢাকার জন্য যত রকমের পশুলোম ও চামড়া ভেবে বার করেছে, সে সমস্তই টেনে নামিয়ে নিচ্ছে। ডিপার্টমেণ্টের কোন এক কর্মচারী নিজের চোখে সেই প্রেতাত্মাটাকে দেখেছে, দেখামাত্রই সে চিনে ফেলে আকাকি আকাকিয়েভিচকে; কিন্তু এতে সে এমন ভয় পেয়ে যায় যে প্রাণপনে ছুটতে শুরু করে, ফলে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে দেখার সুযোগ সে পায় নি — শুধু দেখতে পায় মূর্তিটা দূর থেকে তাকে আঙ্গুল তুলে শাসাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে অনবরত এই মর্মে অভিযোগ আসতে লাগল যে কেবল নিম্নপদস্থ কেরানিদের হলেও কথা ছিল, মায় প্রিভি কাউন্সিলরদের পিঠ ও কাঁধ পর্যন্ত ওভারকোটের ওপর নৈশ

হামলার ফলে ঠান্ডার কবলে ক্ষতিগ্রস্ত। পুলিশ থেকে যে-কোন উপায়ে, জীবিত বা মৃত যে-কোন অবস্থায় প্রেতাত্মাটাকে গ্রেপ্তার করে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠোরতম শাস্তিবিধানের হুকুম জারি করা হল। এ ব্যাপারে তারা প্রায় সফলও হয়েছিল। যথার্থই কোন এক পাড়ার প্রহরারত কনস্টেব্‌ল্‌ কিরিউশ্‌কিন লেন-এ প্রেতাত্মাটার কলার সম্পূর্ণ চেপে ধরেছিল একেবারে অকুস্থলে, যখন সে এক কালের বাঁশি-ফোঁকা কোন এক অবসরপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পীর মিহি পশমী সুতোর ওভারকোট ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তার কলার চেপে ধরে সে চেঁচামেচি করে ডেকে আরও দুটি সাথীকে জোটাল, তাদের হাতে ওকে ধরে রাখার ভার দিয়ে সে কেবল মিনিট খানেকের জন্য নিজের বুটের ভেতরে হাত গলাল সেখান থেকে চেপটা নস্যিদানিটা বার করে ঠান্ডায় জমে যাওয়া তার অচল নাকটাকে ক্ষণেকের জন্য চাঙ্গা করে তোলার উদ্দেশ্যে; কিন্তু নস্যিটা সম্ভবত এমন জাতের ছিল যে মড়া মানুষের পক্ষেও তার ধক সামলানো সম্ভব নয়। কনস্টেব্‌ল্‌টি তার একটা আঙ্গুল দিয়ে ডান নাকের ফুটো চেপে ধরে বাঁ ফুটো দিয়ে আধ মুঠো পরিমাণ নস্যি টেনেছে কি টানে নি, অমনি প্রেতাত্মাটা এমন বেদম হাঁচি মারল যে বর্ষণের তোড়ে তারা তিনজনেই চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। হাতের মুঠি তুলে চোখ রগড়াতে তাদের যে সময় লাগল ততক্ষণে প্রেতাত্মা বেমালুম উধাও, এমন কি তারা এখন নিশ্চয় করে বলতেও পারছে না যে সেটা আদৌ তাদের হাতে ধরা পড়েছিল কিনা। এর পর থেকে প্রহরারত কনস্টেব্‌ল্‌দের মনে মড়া মানুষ সম্পর্কে এমন ভয় ধরে গেল যে জ্যান্ত মানুষ পর্যন্ত ধরতে তাদের আশঙ্কা হত, তারা কেবল দূর থেকে চেঁচিয়ে বলত: 'এই কে ওখানে? তফাত যাও!' এদিকে কালিন্‌কিন ব্রীজ ছাড়িয়েও কেরানি-ভূতটাকে দেখা যেতে লাগল, যত গোবেচারি মানুষের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল সে। ও হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বিলকুল ভুলে গেছি জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তিটিকে, আসলে যাঁকে প্রায় আমাদের এই কাহিনীর—প্রসঙ্গত, খাঁটি সত্য কাহিনীর—অলৌকিক গতিপরিবর্তনের কারণ বলা যেতে পারে। সর্বাগ্রে, সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে ধাতানি খেয়ে তুলোধুনো হয়ে বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ প্রস্থান করার অনতিকাল পরেই জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি মনে মনে খানিকটা যেন করুণা অনুভব করলেন। সমবেদনা তাঁর অপরিচিত ছিল না; বহু সুকুমার বৃত্তি তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন তুলত — যদিও প্রায়শই তাঁর পদমর্যাদা

সেগুলি প্রকাশের অন্তরায় হত। তাঁর সঙ্গে যিনি দেখা করতে এসেছিলেন সেই বন্ধুটি তাঁর অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় পর্যন্ত মগ্ন হয়ে পড়লেন। আর এর পর থেকেই তিনি প্রায় প্রতিদিন চোখের সামনে দেখতে লাগলেন পদমর্যাদা উপযোগী ধাতানিতে ভেঙ্গে-পড়া বেচারি আকাকি আকাকিয়েভিচের চেহারা। আকাকি আকাকিয়েভিচের চিন্তায় তিনি এত দূর বিচলিত হয়ে পড়লেন যে এক সপ্তাহ বাদে তার কাছে এক জন কর্মচারী পর্যন্ত পাঠাতে মনস্থ করলেন, তার ব্যাপারটা কী এবং তাকে সত্যি সত্যিই কোন ভাবে সাহায্য করা সম্ভব কিনা জানার উদ্দেশ্যে; আর যখন তাঁর কাছে খবর এলো যে জ্বরে আকাকি আকাকিয়েভিচের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে তখন তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বিবেকের যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন, সারাটা দিন তাঁর মন খারাপ হয়ে থাকল। অন্তত খানিকটা আমোদ-ফুর্তি করে অপ্রীতিকর ঘটনার ছাপ মন থেকে মুছে ফেলার বাসনায় তিনি সন্ধ্যাটা কাটানোর জন্য রওনা দিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে, যাঁর বাড়িতে ভদ্র সমাজের লোকজনের সাক্ষাৎ মেলে, আর সবচেয়ে বড় কথা — সেখানে সকলেই প্রায় সমপর্যায়ের পদাধিকারী, ফলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যায়। তাঁর মানসিক অবস্থার ওপর এর বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঘটল। তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করলেন, আলাপের ব্যাপারে তাকে প্রীতিকর ও অমায়িক দেখা গেল — মোট কথা সন্ধ্যাটা তাঁর খুবই ভালো কাটল। নৈশভোজের সময় তিনি পান করলেন গ্লাস দুয়েক শ্যাম্পেন — উৎফুল্ল ভাব সঞ্চারের পক্ষে যা হল একটি সুপরিচিত উপকরণ। শ্যাম্পেন তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলল নানা রকম জরুরী তাগিদ, বিশেষত তিনি ঠিক করলেন এখনই বাড়ি না গিয়ে যাবেন এক পরিচিতা মহিলার কাছে। মহিলাটি হলেন ক্যারোলিনা ইভানভ্না — জন্মসূত্রে সম্ভবত জার্মান, যাঁর প্রতি তিনি ছিলেন পরম বন্ধুভাবাপন্ন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গণ্যমান্য ব্যক্তিটি বিগত যৌবন, স্বামী হিশেবে তিনি ভালো, পরিবারে তিনি শ্রদ্ধেয় পিতা। তাঁর দুই পুত্র, একটি ইতিমধ্যেই দপ্তরে চাকরী করছে, আর আছে সুশ্রী চেহারার ষোড়শী কন্যা — নাকটা তার সামান্য বাঁকা বটে, তবে সুন্দরই বলা চলে — রোজই সে তাঁর কাছে এসে হাতে চুমো খেত আর বলত

'Bonjour, papa'*। তাঁর পত্নীটি — এখনও বেশ তরতাজা মহিলা, বিশ্রী তাঁকে আদৌ বলা যায় না — প্রথমে তাঁকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিতেন চুমো খাবার জন্য, তারপর হাতটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে চুমো খেতেন। সে যাই হোক না কেন, গার্হস্থ্যজীবনে পারিবারিক স্নেহপ্রীতিতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য শহরের অন্য এক অংশে এক বান্ধবী থাকার ব্যাপারে তাঁর রুচিগত কোন আপত্তি ছিল না। এই বান্ধবীটি তাঁর পত্নীর চেয়ে কোন অংশে সুন্দরী ছিলেন না, বয়সেও ছোট ছিলেন না; কিন্তু পৃথিবীতে কত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাই না ঘটে, আর সে সবের বিচার করাও আমাদের কাজ নয়। সুতরাং গণ্যমান্য ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে নামলেন, স্লেজে চেপে বসে কোচম্যানকে বললেন: 'ক্যারোলিনা ইভানভ্‌নার বাড়ি'— এদিকে নিজে তিনি তাঁর গরম ওভারকোটটা দিব্যি জুত করে গায়ে জড়িয়ে এমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করলেন যার চেয়ে ভালো অবস্থা কোন রুশীর পক্ষে কল্পনায়ও আনা সম্ভব নয়, অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যখন লোকে নিজে কিছুই ভাবে না, অথচ ভাবনাচিন্তাগুলি আপনাআপনিই মাথায় আসতে থাকে — সেগুলির একটি অন্যটির চেয়ে মধুর, তাদের পিছু ধাওয়ার জন্য, তাদের খোঁজার জন্য কোন কষ্ট পর্যন্ত করার দরকার হয় না। পরম তৃপ্তির বশে সহজেই একে একে তাঁর মনে পড়তে লাগল সান্ধ্য আসরে অতিবাহিত প্রতিটি আমোদের মুহূর্ত, প্রতিটি শব্দ, যা ছোটখাটো মহলটিকে হাসিতে মাতিয়ে তোলে; ঐ সব শব্দের অনেকগুলি তিনি আবার অর্ধস্ফুট স্বরে আওড়ালেন, আর আবিষ্কার করলেন যে সেগুলি আগেকার মতোই মজার লাগছে। তাই তিনি নিজেও যে প্রাণভরে হেসে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি! তবে থেকে থেকে তার আনন্দটা মাটি করে দিচ্ছিল দমকা হাওয়া — ভগবান জানেন, কোথা থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসছে, কী তার কারণ তাই বা কে জানে? — কিন্তু সে হাওয়া তাঁর মুখের ওপর ডেলা ডেলা বরফ ছুঁড়ে দারুণ কেটে বসছিল, তাঁর ওভারকোটের কলার নৌকোর পালের মতো ফুলিয়ে তুলছিল, কিংবা আচমকা কোন এক অস্বাভাবিক শক্তিতে কলারটা তার মাথার ওপর ছুঁড়ে ফেলছিল; ফলে সেখান থেকে বার বার নিজেকে টেনে বের করে আনার ঝঞ্ঝাট তাঁকে পোহাতে হচ্ছিল। হঠাৎ

* 'শুভ দিন, বাবা' (ফরাসী)।

গণ্যমান্য ব্যক্তিটির মনে হল কে যেন বেশ জোরে তাঁর কলার চেপে ধরেছে। পিছু ফিরে তাকাতে তাঁর নজরে পড়ল ছোটখাটো আকারের একটি মানুষ, তার গায়ে পুরনো জরাজীর্ণ ইউনিফর্ম। লোকটাকে আকাকি আকাকিয়েভিচ বলে চিনতে পাবার পর তিনি আতঙ্কিত না হয়ে পারলেন না। কেরানিটির মুখ ছিল বরফের মতো ফেকাসে, তাকে দেখাচ্ছিল পুরোপুরি একটা মড়ার মতো। কিন্তু গণ্যমান্য ব্যক্তিটির আতঙ্ক সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন তিনি দেখতে পেলেন যে মড়ার ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেল, তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কবরের পূতিগন্ধ, সে উচ্চারণ করল এই কথাগুলি:

'আচ্ছা! এই ত শেষকালে তোর নাগাল পেলাম! শেষ কালে আমি, মানে, তোর কলার পাকড়ানোর সুযোগ পেলাম! তোর ওভারকোটটাই ত আমার দরকার! আমার জন্যে চেষ্টা ত করলিই না, আবার ধমকানির বহরটা দেখ! এবারে নিজেরটা দে ত!'

বেচারি গণ্যমান্য ব্যক্তিটির তখন মারা যাবার দশা! অফিসে তিনি অসাধারণ মনোবলের অধিকারী — সাধারণত অধস্তনদের সামনে ত বটেই, একমাত্র তাঁর পৌরুষদীপ্ত চেহারা ও মূর্তির দিকে তাকিয়েই লোকে বলাবলি করত; 'ওঃ কী চরিত্র!' — তবু, এক্ষেত্রে তিনি শালপ্রাংশু আকৃতির অধিকারী আরও অনেকের মতোই এমন আতঙ্ক অনুভব করলেন যে এমনকি সঙ্গত কারণে তার এও আশঙ্কা হতে লাগল যে কোন এক কঠিন রোগের কবলে পড়ে তিনি মূর্ছা যাবেন। তিনি তাই নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চটপট কাঁধ থেকে ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে কোচম্যানকে চেঁচিয়ে বললেন:

'জলদি বাড়ির দিকে হাঁকাও!'

এই ধরনের কণ্ঠস্বর সচরাচর উচ্চারিত হয় কোন চরম মুহূর্তে, তার বাস্তব প্রতিক্রিয়াও হয়ে থাকে অনেক বেশি। তাই কণ্ঠস্বর কানে যেতেই কোচম্যান অবস্থা বুঝে দুই কাঁধের ভেতরে মাথা গুঁজে চাবুক হাঁকিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মিনিট ছয়েকেরও বেশি হবে কি হবে না, গণ্যমান্য ব্যক্তিটি তাঁর বাড়ির প্রবেশপথের সামনে এসে হাজির হলেন। ক্যারোলিনা ইভানভ্‌নার কাছে যাবেন কি, তার বদলে ওভারকোটবিহীন ভয়ার্ত, পাণ্ডুর তিনি ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে, টলতে টলতে কোন রকমে গিয়ে পেঁছুলেন নিজের কামরায়, সারাটা রাত

এমন একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কাটালেন যে পর দিন সকালে চায়ের টেবিলে কন্যা তাঁকে সরাসরি বলে বসল: 'তোমাকে আজ একেবারে ফেকাসে দেখাচ্ছে, বাবা।' কিন্তু বাবা চুপ করে রইলেন, কী ঘটেছিল, কোথায় গিয়েছিলেন কিংবা কোথায় যেতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে বললেন না। এই ঘটনা তাঁর উপর গভীর ছাপ ফেলল। এখন তিনি অধস্তনদের সঙ্গে কথাবার্তায় কদাচিৎ বলে থাকেন: 'কী আস্পর্ধা! আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে?' আর কথাগুলি যদি উচ্চারণ করতেনও তাহলে এখন আর ব্যাপারটা ভালোমতো না শোনার আগে নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে এর পর থেকে কেরানি-ভূতের উপদ্রব একেবারে বন্ধ হয়ে গেল: সম্ভবত জাঁদরেল অফিসারের ওভারকোট তার কাঁধে পুরো ফিট করেছে; অন্তত পক্ষে এখন আর কারও কাছ থেকে ওভারকোট ছিনিয়ে নেবার কোন ঘটনা কোথাও শোনা যায় না। তবে বহু সক্রিয় ও হুঁশিয়ার লোকজন কিছুতেই প্রবোধ মানতে চান না, তাঁরা বলাবলি করেন যে শহরের দূরে দূরে অংশে এখনও কেরানি-ভূতকে দেখা যায়। আর ঠিকই, কলোম্‌না জেলায় প্রহরারত এক কনস্টেব্‌ল্‌ স্বচক্ষে দেখেছে একটা বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটতে; কিন্তু কনস্টেব্‌ল্‌টি স্বভাবতই ছিল দুর্বল — এতই দুর্বল যে একবার একটা ধাড়ি গোছের সাধারণ শুওরছানা করে বাড়ি থেকে যেন ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলে, আর তার ফলে যে-সমস্ত কোচম্যান আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারা দারুণ হাসাহাসি করে উঠলে এ ধরনের বিদ্রূপের জন্য তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সে একটি করে পয়সা নস্যির জন্য আদায় করে ছাড়ে — সুতরাং দুর্বল হওয়ার ফলে সে আর প্রেতমূর্তিটাকে থামাতে ভরসা পায় নি, নেহাৎই অন্ধকারের মধ্যে তাকে অনুসরণ করে চলতে থাকে; এদিকে প্রেতাত্মাটাও চলতে চলতে শেষকালে হঠাৎ চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল: 'ইচ্ছেটা কী শুনি?' বলেই এমন একটা ঘুষি দেখাল যা কোন জীবন্ত মানুষের হতে পারে না। কনস্টেব্‌ল্‌টি বলল: 'কিছু না', আর সঙ্গে সঙ্গে পিঠটান দিল। তবে এই ভূতটা ছিল অনেক লম্বা, তার গোঁফজোড়া বিশাল, আর মনে হল সে যেন ওবুখোভ ব্রীজের দিকে পা বাড়িয়ে রাতের আঁধারে বেমালুম অন্তর্ধান করল।

দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা

'দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বরে, দ্বিতীয় খণ্ড — ১৮৩২ সালের গোড়ায়। দুটি খণ্ডের প্রতিটিতে আছে ভূমিকা, শব্দার্থ, প্রতিটিতে — চারটি করে উপাখ্যান। দুটি খণ্ডেই প্রথমে স্থান পেয়েছে গোগলের সমকালীন ইউক্রেনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সংক্রান্ত উপাখ্যান: 'সরোচিন্‌ৎসির মেলা' ও 'খ্রীস্টমাসের আগের রাত'। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সুপ্রাচীন কিংবদন্তীধর্মী উপাখ্যান: 'সন্ত ইভানের উৎসবের প্রাক্কালীন সন্ধ্যা' ও 'ভয়ংকর প্রতিহিংসা'। তৃতীয় স্থানে — প্রথম খণ্ডে আছে সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কল্পনাধর্মী ও স্বপ্নধর্মী উপাখ্যান — 'মে মাসের রাত অথবা জলডুবি,' দ্বিতীয় খণ্ডে — 'ইভান ফিওদরভিচ শ্‌পোন্‌কা ও তার মাসী' — কঠোর বাস্তববাদী ভঙ্গিতে লেখা, ভাবী গোগলের বাণী। সর্বশেষে দুটি গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতেই আছে রহস্যে ও রোমহর্ষকতায় পরিপূর্ণ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত দুটি উপাখ্যান: 'হারানো দলিল' ও 'মন্ত্র-পড়া গণ্ডী'।

মে মাসের রাত অথবা জলডুবি

উপাখ্যানটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৩১ সালে, 'দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা'-র প্রথম খণ্ডে। 'মে মাসের রাত' লিখিত হয় লৌকিক উপাদানের অর্থাৎ লৌকিক উপকথা ও সংস্কারের ভিত্তিতে। তবে গোগল এখানে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, তিনি কোন পরিচিত লৌকিক বিষয়বস্তুর পুনর্বিবরণ দান করেন নি, তিনি নিজস্ব মায়াময় কাব্যিক চিত্ররূপ গড়ে তুলেছেন।

পৃষ্ঠা ১৬

হোপাক — ইউক্রেনীয় লোকনৃত্য বিশেষ।

পৃষ্ঠা ১৭

অনেক অনেক কাল আগে... মহারানী একাতেরিনা... — রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় একাতেরিনার (১৭৬২-১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ১৭৮৩ খৃীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার রাশিয়া-অন্তর্ভুক্তির পর ১৭৮৭ খৃীষ্টাব্দে তিনি ক্রিমিয়া সফর করেন।

পৃষ্ঠা ২৩

স্বর্গত বেজ্‌বরোদ্‌কো... — বেজ্‌বরোদ্‌কো আলেক্সান্দ্র আন্দ্রেয়েভিচ (১৭৪৭-১৭৯৯) — ১৭৭৫ সাল থেকে দ্বিতীয় একাতেরিনার মুখ্য সচিব ছিলেন; পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিশেবে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে ক্রিমিয়া সফর করেন।

ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা

১৮৩২ সালে 'দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যা'র দ্বিতীয় খণ্ডে উপাখ্যানটি মুদ্রিত হয়। 'ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা' লৌকিক কিংবদন্তী ও ইউক্রেনীয় ঐতিহাসিক গীতিকার সুরে বাঁধা আর এই সুরের মধ্যে অনেক সময়ই লক্ষ করা যায় মহাপাতকী ও দেশদ্রোহীর রূপ।

'ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা'য় ইউক্রেনের অতীতের প্রতি, পোলীয় অভিজাত বর্গের শাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি গোগলের প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এই দিক থেকে গোগলের এই উপাখ্যানটি তাঁর দেশপ্রেমমূলক মহাকাহিনী 'তারাস বুলবা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

পৃষ্ঠা ৪৭

ইউক্রেনে যে এখন পোলীয় রোমান ক্যাথলিক যাজকরা... — ১৫৬৯

সালের লিউবলিন ইউনিয়ন অনুযায়ী ইউক্রেনে যে ক্যাথলিকবাদের প্রবর্তনা ঘটে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (১৩০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

পৃষ্ঠা ৪৭

লবণ হ্রদের উপকূলে খান সাম্রাজ্যের... — ১৬২০ সালে ইউক্রেনের কম্যান্ডাণ্ট পিওতর সাগাইদাচ্‌নির নেতৃত্বে ক্রিমিয়ার খানদের বিরুদ্ধে জাপরোজীয়দের (নীপার কসাকদের) অভিযান এবং আজভ সাগরের পশ্চিম অংশে — সিভাশের (লবণ হ্রদের) তীরে তাতারদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের প্রসঙ্গ।

পৃষ্ঠা ৫৩

এরা ইউনিয়েটদের মতনও নয়... — ইউনিয়েট — সনাতন ক্যাথলিক গির্জার সম্মিলন, তথা ইউনিয়ন ধর্ম অবলম্বনকারী (১৩০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

পৃষ্ঠা ৭৪

...**সেই বুড়ো কনাশেভিচ...** — কনাশেভিচ (সাগাইদাচ্‌নি) পিওতর — ইউক্রেনের কম্যান্ডাণ্ট (৪৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

পৃষ্ঠা ৭৪

...**রোমের পোপের অধীনে ঐক্যধর্ম গ্রহণ করে...** — (১৩০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

পৃষ্ঠা ৮২

ভালাখিয়া ও সেদ্‌মিগ্রাদ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে... গালিচ ও হাঙ্গেরীয় জাতির রাজ্যসীমার মাঝখানে... — ভালাখিয়া — আধুনিক রুমানিয়ার ভূখণ্ডে ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্কশাসিত সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য। সেদ্‌মিগ্রাদ অঞ্চল — ট্রানসিলভানিয়া। গালিচ জাতি — ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে চতুর্দশ শতাব্দীতে পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার অধিকৃত গালিচ ভূমির অধিবাসী।

পৃষ্ঠা ৯০

কানেভ, চেরকাসি, শুম্স্ক, গালিচ — ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরের নাম।

পৃষ্ঠা ৯১

...সেদ্মিগ্রাদ এমন কি তুরস্ক ভূমিও... — (৮২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

পৃষ্ঠা ৯২

...আগেকার দিনের কম্যান্ডান্টের আমল সম্পর্কে, সাগাইদাচ্নি ও খ্মেল্নিৎস্কির কথা — সাগাইদাচ্নি — ৪৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ; খ্মেল্নিৎস্কি — জিনোভি বগ্দান মিখাইলভিচ (আনুমানিক ১৫৯৫-১৬৫৭) — ইউক্রেনের কম্যান্ডান্ট, উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনেতা, ১৬৪৮-১৬৫৪ সালে পোলীয় ভূস্বামীদের শাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনীয় জনগণের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সংঘের (১৬৫৪) উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা।

পৃষ্ঠা ৯২

মহামহিম স্তেপান তখন সেদ্মিগ্রাদের প্রিন্স... — স্তেফান বাতোরি, সেদ্মিগ্রাদের (ট্রান্সিলভানিয়ায়) সামরিক শাসনকর্তা, ১৫৭৬ থেকে ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত — পোলীয় রাজা।

মিরগোরদ

'মিরগোরদ' উপাখ্যান সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালের গোড়ার দিকে। সঙ্কলনটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত — প্রথম খণ্ডে আছে 'সাবেকী জমিদার পরিবার' ও 'তারাস বুলবা', দ্বিতীয় খণ্ডে — 'ভিই' এবং 'ইভান নিকিফোরোভিচ ও ইভান ইভানভিচ কলহ-কথা'।

সাবেকী জমিদার পরিবার

উপাখ্যানটি প্রথমে মুদ্রিত হয় ১৮৩৫ সালে 'মিরগোরদ' সঙ্কলনগ্রন্থে। জন্মস্থান ভাসিলিয়েভ্‌কায় গ্রীষ্ম কাটানোর পর ১৮৩২ সালের শেষ দিকে গোগল এই উপাখ্যানটি পরিকল্পনা করেন এবং সেই সময়ই এর রচনার সূত্রপাত।

'রুশ উপাখ্যান ও শ্রীযুক্ত গোগলের উপাখ্যান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে 'সাবেকী জমিদার পরিবার' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক ভিস্‌সারিওন বেলিনস্কি, দৈনন্দিন গদ্যময় জীবন থেকে তীব্র ও গভীর কাব্যরস নিষ্কাশনে এবং 'সেই জীবনের যথাযথ চিত্ররূপের সাহায্যে হৃদয়ে আলোড়ন সঞ্চারে' লেখকের বিশিষ্ট ক্ষমতার উল্লেখ করেছেন।

পৃষ্ঠা ১০০

বিউকোলীয় জীবন — শান্ত, অনাড়ম্বর, সুখী জীবন। রোমক কবি ভার্জিলের 'বিউকোলিকাস' কাব্যমালা থেকে এই নামের উদ্ভব।

পৃষ্ঠা ১০১

ফিলেমন ও বাউকিস — প্রাচীন গ্রীক উপকথায় নায়ক-নায়িকা: স্বামী-স্ত্রী। গভীর বার্ধক্য পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগ ছিল। তাদের নাম একনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শস্বরূপ।

পৃষ্ঠা ১০৩

কাউন্টেস লাভালিয়ের — ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের প্রেমিকা।

তারাস বুলবা

'তারাস বুলবা' রচনার ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। কাহিনীটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'মিরগোরদ' (১৮৩৫) সঙ্কলনে। ১৮৪২ সালে গোগল তাঁর

রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'তারাস বুলবা'কে স্থান দেন আমূল পরিমার্জিত, নতুন রূপে। দ্বিতীয়বার সম্পাদনার ফলে রচনাটি যথেষ্ট পরিবর্ধিত হয় — নয়টি অধ্যায়ের জায়গায় আয়তনে হয় বারোটি অধ্যায়। কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকার উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটে, সেচ ও যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির বর্ণনা আরও বিশদ রূপ পায়। কাহিনীর উপর কাজ চলে ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত — অবশ্য মাঝে মাঝে ছেদ ছিল।

'তারাস বুলবা' রচনাকালে গোগল বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক গবেষণার, ইউক্রেনীয় ঘটনাপঞ্জীর সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর রচনার পরম গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল — গোগলের নিজেরই সাক্ষ্য অনুযায়ী — ইউক্রেনের ঐতিহাসিক লোকগীতি ও কিংবদন্তী।

পৃষ্ঠা ১২৮

আকাদমি — কিয়েভের ধর্মযাজকদের প্রস্তুতির জন্য উচ্চশিক্ষার গির্জাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

পৃষ্ঠা ১২৮

সেমিনারি — ধর্মীয় আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; অন্য ধরনের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায়, গির্জায় সেবাইতের কাজের জন্য যারা প্রস্তুত হত না তারাও এখানে শিক্ষাগ্রহণ করত।

পৃষ্ঠা ১৩০

...পাঠাতে হবে জাপোরোজ্য়েতে — এখানে জাপোরোজীয় সেচ্ — ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে নীপারের অপর তীরে ইউক্রেনীয় কসাকসম্প্রদায়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন, জাপোরোজ্য়ের স্থানীয় সেনাবাহিনী। নীপার কসাকদের জাপোরোজীয় সেচ্ ছিল এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'কসাক প্রজাতন্ত্র'। এখানে সব কসাক আইনত স্বাধীন ও সমাধিকারী রূপে গণ্য হত, যদিও বস্তুতপক্ষে ধনী কসাকরাই ছিল প্রভুত্বকারী।

ইউক্রেনে সামন্ততান্ত্রিক দাসপ্রথার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং

বিশেষত ১৫৬৯ সালের পর সেখানে জাতীয় ও ধর্মীয় নিপীড়নের যে মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাপরোজীয় সেচ্ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল থেকে সমস্ত প্রধান প্রধান কসাক কৃষক অভ্যুত্থানে জাপরোজীয়রা যোগ দেয়, তাদের মধ্যে প্রতিভাবান পরিচালকদের আবির্ভাব ঘটে।

পৃষ্ঠা ১৩০

...যখন ইউক্রেনে শুরু হয়েছিল গির্জার ঐক্যধর্ম প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘর্ষ — গ্রীক অর্থডক্স চার্চ কর্তৃক ক্যাথলিক গির্জার প্রধানের অর্থাৎ রোমের পোপের বশ্যতা স্বীকার সমেত সমস্ত গির্জার সংযুক্তীকরণ সম্পর্কে ১৫৬৯ সালে যে ঘোষণা করা হয় তা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পোলীয় রাজতন্ত্রের পক্ষে ইউক্রেনীয় ও বেলোরুশীয়দের জাতীয় স্বকীয়ত অবদমনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এই গির্জার ঐক্যধর্ম। গির্জার ঐক্যধর্ম প্রবর্তনের প্রয়াস ইউক্রেনীয় ও বেলোরুশীয় জাতির কাছ থেকে চরম বাধার সম্মুখীন হয়।

পৃষ্ঠা ১৩২

আর্খিমান্দ্রিত — মঠের গুরুজন; এখানে সেমিনারির অধ্যক্ষ।

পৃষ্ঠা ১৩৩

...রাশিয়া...মঙ্গোলীয় লুণ্ঠনকারীদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে বিধ্বস্ত ও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল — তাতার-মোঙ্গল বিজেতাদের আক্রমণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তীকাল থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এদের অধীন ছিল।

পৃষ্ঠা ১৩৩

কুরেন — জাপোরোজ্য়ের জনসমষ্টি, সেই সঙ্গে সেনা সংগঠন, যার নেতৃত্বে থাকত কুরেনের আতামান (সেনাপতি)।

পৃষ্ঠা ১৪২

আদাম কিসেল (১৬০০-১৬৫০) — কিয়েভের জনৈক স্থানীয় শাসনকর্তা, নগরের সামরিক ও পৌরপ্রধান।

পৃষ্ঠা ১৪৮

...হোর্‌তিৎসা দ্বীপের তীরে পেঁছিল — হোর্‌তিৎসা — নীপার নদীর নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত একটি দ্বীপ।

পৃষ্ঠা ১৫৩

ক্যাম্প-সর্দার (কোশেভয়) — নীপার কসাকদের জাপরোজীয় সেনাবাহিনীর আতামান (সেনাপতি), এক বছরের জন্য নির্বাচিত।

পৃষ্ঠা ১৬০

বালালাইকা -- তিন-তারের রুশ লোক-বাদ্যযন্ত্র।

পৃষ্ঠা ১৬২

আনাতোলিয়া — কৃষ্ণসাগরতীরস্থ তুরস্কের অঞ্চল।

পৃষ্ঠা ১৬৪

...কম্যান্ডান্টের অধীন এলাকা নিয়ে — রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের পুনঃসংযুক্তির পর (১৬৫৪ সাল) কিয়েভ সমেত নীপার নদীর বাম তীরে অবস্থিত ইউক্রেনের যে অংশ রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, সপ্তদশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তার আধা সরকারী নাম। কম্যান্ডাণ্ট শাসিত অঞ্চল শাসন করতেন সাধারণ সেনাপরিষদ নির্বাচিত কম্যান্ডাণ্ট।

পৃষ্ঠা ১৬৬

...কম্যান্ডাণ্টকে তামার ষাঁড়ে করে আগুনে ঝলসে রেখেছে — কিংবদন্তী অনুযায়ী, কসাক আন্দোলনের (১৭৯৪-১৭৯৬ সাল) নেতা কম্যান্ডাণ্ট নালিভাইকো পোলীয় রাজকীয় বাহিনীর হাতে বন্দী হলে তাঁকে তামার ষাঁড়ে আগুনে ঝলসে মারা হয়। ইউক্রেনের মহাকবি তারাস শেভচেঙ্কোর রচনায় (১৮১৪-১৮৬১) নালিভাইকোর নাম একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা ১৮৪

জেরার্দো della notte — হল্যান্ডের শিল্পী গের্‌রিত্‌ (ভ্যান গেরার্দ) গণ্টগোর্স্ত (১৫৯০-১৬৫৬)। রাতের বাতি, প্রদীপ ইত্যাদিতে আলোকিত বিভিন্ন দৃশ্য আঁকতে তিনি ভালোবাসতেন, সেই জন্য ইতালীয় ভাষায় তিনি আখ্যা পান 'দেল্লা নোত্তে' (নৈশ)।

পৃষ্ঠা ১৮৪

কিয়েভের ভূগর্ভস্থ গুহা — রুশ ভূমির প্রাচীনতম খৃষ্টীয় সনাতনী মঠ।

পৃষ্ঠা ২১১

পেরেকোপের পথে চলে গেছে — পেরেকোপ যোজক — ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রিমিয়া উপদ্বীপের সংযোজক।

পৃষ্ঠা ২২৬

ট্রেবিজণ্ড — কৃষ্ণসাগরের তীরে তুরস্কের একটি শহর।

পৃষ্ঠা ২৫৭

কম্যান্ডাণ্ট অস্ত্রানিৎসা — পোলীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কসাকদের অন্যতম নেতা। ১৬৩৮ সালে ওয়ারশয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল।

গুন্যা — লেওন গুন্যা, ১৬৩৮ সালের অভিযানকালে অস্ত্রানিৎসার সহকারী।

পৃষ্ঠা ২৫৭

চিগিরিন, পেরেয়াস্লাভ্, বাতুরিন, গ্লুখভ্ — ইউক্রেনের বিভিন্ন শহর ও জনবসতি।

পৃষ্ঠা ২৫৮

রাজকীয় কম্যান্ডাণ্ট নিকোলাই পোতোৎস্কি... অসহায় হয়ে পড়ল — পোলীয় কম্যান্ডাণ্ট নিকোলাই পোতোৎস্কি জাপরোজীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; ১৬৩৮ সালে অস্ত্রানিৎসার কাছে পরাজয় বরণ করেন, ১৬৪৮ সালে বগ্‌দান খ্মেলনিৎস্কির সেনাবাহিনীর কাছেও পরাস্ত হন।

পৃষ্ঠা ২৫৮

পোলোন্নয়ে — পোলোন্নয়ের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৬৩৮ সালে। অস্ত্রানিৎসার হাতে নিকোলাই পোতোৎস্কি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। সম্পূর্ণ **বিনাশের সম্ভাবনায় শঙ্কিত পোলীয় ভূস্বামীবর্গ শান্তি চুক্তি** উত্থাপন **করলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরাই আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে সে** চুক্তি লঙ্ঘন করেন, অস্ত্রানিৎসা ও তাঁর অনুচরদের হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন।

১৮৪২ সালে গোগল তাঁর প্রথম রচনাসংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে 'নেভ্স্কি এভিনিউ', 'নাক', 'পোর্ট্রেট', 'ওভারকোট', 'ঠেলাগাড়ি' ও 'বাতুলের লিপি' (এই ক্রমানুসারে)—এই ছয়টি উপাখ্যানের সমন্বয় ঘটিয়ে 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গের উপাখ্যান' পর্যায়ের কাহিনীগুলিতে ভাবগত ও শিল্পগত ঐক্য সঞ্চার করেন।

নাক

উপাখ্যানটি রচনার সূত্রপাত ১৮৩৩ সালে, গোগল রচনাটির পরিসমাপ্তি ঘটান ১৮৩৬ সালের গোড়ায়। আলেকসান্দর পুশ্‌কিন ১৮৩৬ সালের 'সভ্রেমেন্নিক' (সমকালীন)-এর তৃতীয় খণ্ডে এর মুদ্রণকালে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন: 'নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল এই জিনিসটি মুদ্রণের ব্যাপারে দীর্ঘকাল আপত্তি করেন; কিন্তু এর মধ্যে আমরা এমন অনেক অপ্রত্যাশিত, কল্পনাপ্রবণ, আনন্দোচ্ছল ও মৌলিক বস্তুর সন্ধান পাই যে তাঁর প্যাণ্ডুলিপি আমাদের যে-তৃপ্তি দান করে জনসাধারণকে সেই তৃপ্তির ভাগীদার করার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে নিই।' উপাখ্যানটির বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত হয়ত গোগল পেয়ে থাকবেন ২০-৩০-এর দশকে প্রচলিত অনুরূপ বিষয়মূলক কমিক উপন্যাস ও গল্পকথার মধ্যে।

পৃষ্ঠা ২৭১

ককেশাসে যাঁরা কালেক্টর পদ লাভ করেন...—সরকারী কালেক্টর—অষ্টম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, পদমর্যাদার বিচারে সামরিক বাহিনীভুক্ত মেজরের সমান। শাসনদপ্তরের অপব্যবহারের দরুন রাশিয়ার প্রদেশগুলিতে কালেক্টরের পদ লাভ করার চেয়ে ককেশাসে উক্ত পদ প্রাপ্তি সহজসাধ্য ছিল।

'আর্জরুম ভ্রমণ' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)-এ পুশ্‌কিন ককেশাস সম্পর্কে লেখেন: 'অল্পবয়সী নিচুপদস্থ কেরানিকুল এখানে আগমন করে কালেক্টর পদ লাভের আশায়।'

পৃষ্ঠা ২৯৩

যুংকারের দোকান—সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নেভ্স্কি এভিনিউ ও বলশায়া মরস্কায়া স্ট্রীটের কোনায় অবস্থিত সেকালের শৌখিন দোকান।

পৃষ্ঠা ২৯৪

খোজরেভ মির্জা—পারস্যদেশীয় প্রিন্স। পারস্যদেশস্থ তৎকালীন রুশ রাষ্ট্রদূত গ্রিবয়েদভ তেহেরানে নিহত হওয়ার পর ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আগত পারস্য প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে অবস্থানকালে প্রিন্স বাস করতেন তাভ্রিচেস্কি প্রাসাদে।

পোর্ট্রেট

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে 'আরাবেস্কি'তে। 'পোর্ট্রেট'-এর ওপর গোগল কাজ করেন ১৮৩৩-১৮৩৪ সালের মধ্যে। পরবর্তীকালে গোগল উপাখ্যানটির পরিমার্জনা করেন। বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে নতুন করে সম্পাদিত রচনাটি, যার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৪২ সালে 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকায়।

উপাখ্যানের নায়ক—শিল্পী চার্ত্কোভের রূপমূর্তি, তার ঘর, স্কেচ, নবীন শিল্পীসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ইত্যাদির বর্ণনায় শিল্পকলা একাডেমিতে যাতায়াতের ফলে গোগলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ছাপ আছে। উক্ত একাডেমিতে গোগল চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন।

পৃষ্ঠা ২৯৯

শচুকিন দ্ভোর—সেণ্ট পিটার্সবুর্গের একটি বাজার।

পৃষ্ঠা ২৯৯,৩০০

মিলিক্‌রিসা কির্‌বিতিয়েভ্‌না, ইয়েরুস্‌লান লাজারেভিচ, অতিভুক ও অতিপায়ী কিংবা ফোমা ও ইয়েরেমা — লৌকিক রূপকথা ও বটতলা-মার্কা ছবির চরিত্র।

ওখ্‌তা — পূর্বতন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের একটি উপকণ্ঠ।

পৃষ্ঠা ৩০৬

গুইদো — গুইদো রেনি (১৫৭৫-১৬৪২) — বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী।

পৃষ্ঠা ৩০৮

ভাসারি, জর্জো (১৫১১-১৫৭৪) — ইতালীয় শিল্পী, স্থপতি, কলাবিদ, ঐতিহাসিক; বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতিদের সম্পর্কে বহুখণ্ড সংবলিত জীবনীগ্রন্থের রচয়িতা।

পৃষ্ঠা ৩২২

ভ্যান ডাইক — আণ্টোনিস ভ্যান ডাইক (১৫৯৯-১৬৪১) বিখ্যাত ফ্লেমিশ চিত্রকর, বিশেষত প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর খ্যাতি।

পৃষ্ঠা ৩২৩

টেনিয়ার — ডেভিড টেনিয়ার (১৬১০-১৬৯০) — দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যাদি অঙ্কনকারী ফ্লেমিশ শিল্পী।

পৃষ্ঠা ৩২৯

কররেজিও — রেনেসাঁস যুগের বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর কররেজিও (আন্তোনিও আল্‌লেগ্রি) (১৪৯৪-১৫৩৪)।

পৃষ্ঠা ৩৩২

করিন্না, উণ্ডিনা, অ্যাস্পাসিয়া—করিন্না — ফরাসী লেখিকা দে স্তাল্-এর (১৭৬৬-১৮১৭) উক্ত নামাঙ্কিত উপন্যাসের নায়িকা। উণ্ডিনা — দে লা মোত্ ফুকে লিখিত উপাখ্যানের নায়িকা। জুকোভ্স্কি এই উপাখ্যানটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। অ্যাস্পাসিয়া—প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত সুন্দরী।

পৃষ্ঠা ৩৩৩

মিকেল-আঞ্জেলো—মিকেলাঞ্জেলো বুওনার্রোত্তি (১৪৭৫-১৫৬৪) — রেনেসাঁস যুগের মহান ইতালীয় ভাস্কর, চিত্রকর ও স্থপতি।

পৃষ্ঠা ৩৪২

পুশ্কিন যে ভয়াল দানবের...—আলেক্সান্দর পুশ্কিনের 'দানব' কবিতার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

হার্পিদানবীর—হার্পি—প্রাচীন গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত দানবী বিশেষ: মুখাবয়ব নারীর, দেহের অপরার্ধ পাখির মতো; হিংস্রতা ও কুটিলতার প্রতীক।

পৃষ্ঠা ৩৪৩

পবনদেব আর মদনদেবতাদের মাঝখানে মধুর তন্দ্রায়...—গ্রিবয়েদভের 'বুদ্ধি দুঃখ আনে' কমেডি থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ৩৫১

গ্র্যাণ্ডিসন—ইংরেজ উপন্যাসিক এস. রিচার্ডসনের (১৬৮৯-১৭৬১) 'চার্লস গ্র্যাণ্ডিসনের উপাখ্যান' উপন্যাসের নায়ক। আদর্শ, সজ্জন ব্যক্তি।

ওভারকোট

প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৪২ সালে, গোগলের রচনাসঙ্কলনের তৃতীয় খণ্ডে।

'ওভারকোট'-এর প্রাথমিক পরিকল্পনা ১৮৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। অতঃপর ১৮৩৯-১৮৪০ সালের মধ্যে গোগল বারবার এটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কেবল ১৮৪১ সালেই উপাখ্যানটি শেষ করেন।

আলেক্সান্দর গের্ৎসেন (১৮১২-১৮৭০) 'ওভারকোটকে' 'কলোসাস রচনা' আখ্যা দিয়েছেন। স্বৈরাচারী ভূমিদাস সমাজে 'নগণ্য মানুষের' ভাগ্য সংক্রান্ত যে বিষয়বস্তু গোগল উত্থাপন করেন এতে কেবল তার উপসংহারই রচিত হল না, এতে রুশ লেখকদের রচনায় উক্ত বিষয়বস্তুর ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হল। ফরাসী সমালোচক ম. দে ভোগিউয়ের সঙ্গে ৪০-৬০-এর দশকের রুশ লেখকদের সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি মন্তব্য করেন যে তাঁদের সকলেরই আবির্ভাব গোগলের 'ওভারকোট' থেকে।

পৃষ্ঠা ৩৭৩

ফাল্কনে'র স্মৃতিমূর্তি — সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পিটার দি গ্রেটের অশ্বারূঢ় মূর্তি। ফরাসী ভাস্কর এ. ফাল্কনে'র (১৭১৬-১৭৯১) সৃষ্টি।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য, আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

১৯৮৬ সালে 'রাদ্যগা' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে

পাভেল ক্লুশান্‌ৎসেভ। টেলিস্কোপ কী বলে

পৃথিবী কেন সূর্যের চারধারে ঘোরে, কেন তার ভেতরে পড়ে যায় না, কিংবা মহাকাশে উড়ে চলে যায় না? কেন চাঁদ কখনও বা একটা ফালির মতো, কখনও বা থালার মতো? মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে প্রাণী আছে কি? কেন আকাশে কোন কোন তারা চলে ফিরে বেড়ায় আবার কোন কোনটা তাদের অবস্থান পালটায় না?

চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে এসবেরই বৃত্তান্ত দিয়েছেন জ্যোতির্বিদ্যার ওপর বহু জনপ্রিয় গ্রন্থের রচয়িতা, লেখক পাভেল ক্লুশান্‌ৎসেভ।

বইটি মোটা সেলোফেনের মলাটে বাঁধানো, রঙবেরঙের চিত্রে শোভিত।

১৯৮৬ সালে 'রাদুগা' প্রকাশন থেকে
প্রকাশিত হবে

কোন্ সে দেশের কোন্ সাগরের পারে:
রুশ কথাশিল্পীদের রচিত রূপকথাসংকলন

বইটিতে সংকলিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ কথাশিল্পীদের রচিত রূপকথা। লোকসাহিত্যের মেজাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখে আক্সাকভ, দাল, পগরেল্‌স্কি ও অদয়েভ্‌স্কির লেখা রূপকথাগুলি শিশুদের সামনে উন্মোচন করে এক মায়াজগৎ, ভালো হতে, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শেখায় তাদের।

সংকলনটিতে লেভ তলস্তয়, কন্‌স্তান্‌তিন উশিন্‌স্কি, ভ্‌সেভলদ গার্‌শিন এবং আরও অনেক লেখকের রচিত রূপকথা স্থান পেয়েছে।

বইটি অলংকরণ করেছেন চিত্রশিল্পী ওলেগ করোভিন।

নিকোলাই গোগল · রচনাসপ্তক

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ধ্রুপদী সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগলের (১৮০৯-১৮৫২) রচনা লেখকের জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় ব্যাপক অনূদিত হয়। গোগলকে খাঁটি জাতীয়, মৌলিক এবং বিদেশীদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় কবি আখ্যা দিয়ে তাঁর সমসাময়িক, মহাপ্রতিভাধর রুশ সমালোচক ভিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি বলেন:

'গোগল লেখেন না, তিনি আঁকেন, তাঁর রূপমূর্তিগুলির নিশ্বাসপ্রশ্বাসে আছে বাস্তবতার সজীব রঙ। সেগুলিকে দেখা যায়, শোনা যায়।'

সমালোচনামূলক বাস্তবতার — 'গোগলীয় ধারা' নামে এক নতুন ধারার প্রবর্তক গোগলের রচনার মধ্যে যুগপৎ স্থান পেয়েছে রুশ বাস্তবতার দুই যুগ — শতাব্দীর সূচনাকালীন বাস্তবতা — পুশকিনের জীবননিষ্ঠ বাস্তববাদ এবং শতাব্দীর সমাপ্তিকালীন — দস্তয়েভ্‌স্কির মর্মান্তিক দ্বৈধ মতবাদ। 'আমরা সবাই বেরিয়েছি গোগলের 'ওভারকোট' থেকে' — গোগলের 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গের উপাখ্যান' সম্পর্কে এই বিখ্যাত মন্তব্যের দ্বারা দস্তয়েভ্‌স্কি নিজেকে গোগলের অনুগামী ও 'শিষ্য' বলে স্বীকার করেছেন।

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো